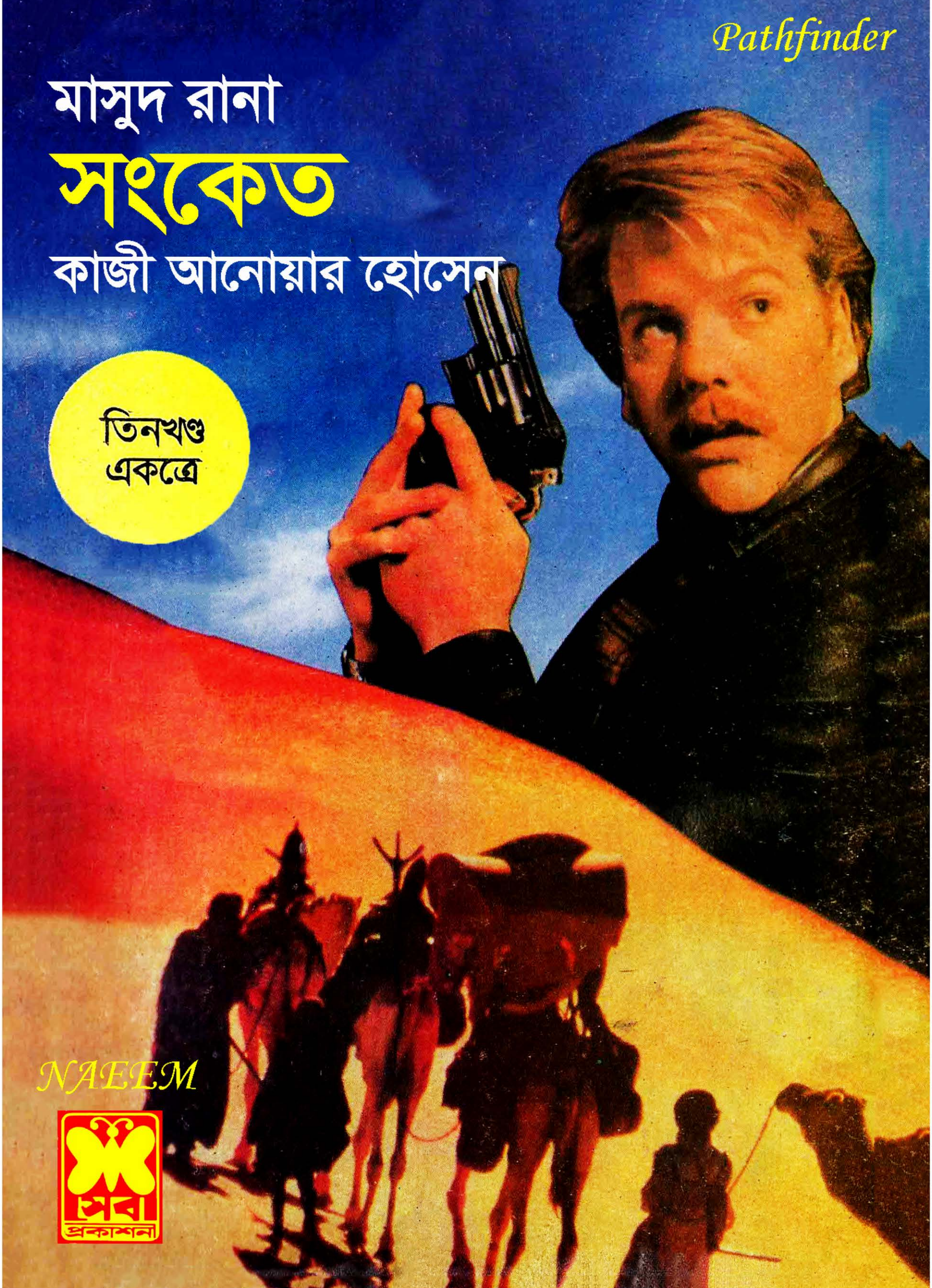

Pathfinder
মাসুদ রানা
সংকেত
কাজী আনোয়ার হোসেন
তিনখণ্ড একত্রে
NAEEM
সেবা
প্রকাশনী

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪

প্রচ্ছদ: হাসান খুরশীদ রুমী

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.co

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮ ১৯০২০৩

Masud Rana
SHANGKET
(Part-I, II & III)
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

আটাশি টাকা

সংকেত-১	৫—১১৬
সংকেত-২	১১৭—২৩০
সংকেত-৩	২৩১—৩৪৪

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৬৪/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৬৭/-
৭-৩৭২	শত্রু ভয়ঙ্কর+অরক্ষিত জলসীমা	৫৯/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৫৯/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪৯/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৫৮/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৪৬/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৩৩/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৩৮/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৮/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৫২/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	৪৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৫৯/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৫০/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৬০/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৬০/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১.২ (একত্রে)	৫৭/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৯৬/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৪২/-

৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৮/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৮৮/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৮/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৬৪/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৭৫/-
১৫৬-১৫৭	মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৫৯/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৯০/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৮৫/-
১৬৮-১৬৯	অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-

১৭০-১৭১ যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩ জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৭৪-১৭৫ কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭ কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮০-১৮১ সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৬১/-
১৮২-১৮৩ যাত্রীরা হুশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৮৪-১৮৫ আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৬৫/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৭৫/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৬৭/-
২১৭-২১৮ অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৬০/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭ অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে)	৬৩/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে)	৫৬/-
২৬৯-২৮৫ বিগব্যাঙ+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৯/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৫২/-
২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৯-২৮২ মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৫১/-
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭ আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪৬/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৪৭/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-

২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে)	৪১/-
২৯০-২৯৩ গুডবাই, রানা+কান্তার মরু	৪৬/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩০১-৩৪৪ জন্মশত্রু+ক্রাইম বস	৪১/-
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী	৪৭/-
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম	৫৪/-
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা	৪১/-
৩১১-৩১৪ বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ	৪৭/-
৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু	৪৯/-
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা	৪০/-
৩১৮-৩৪৭ চরসদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা	৫০/-
৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর	৪৩/-
৩২২-৩৩৬ আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা	৫৪/-
৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা	৬২/-
৩২৪-৩২৮ অষ্টম প্রহর+অপারেশন ইজরাইল	৫৮/-
৩২৫-৩৫১ কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ	৪৪/-
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ	৪৬/-
৩৩১-৩৪১ ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার	৪২/-
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সঙ্কেত+সবুজ সঙ্কেত	৫০/-
৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+প্রজেক্ট X-15	৫৯/-
৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন	৫৪/-
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব	৪৮/-
৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে)	৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী	৫০/-
৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন	৪৮/-
৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ	৫০/-
৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুঈন কন্যা	৫৫/-
৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৩৬০-৩৬৭ কমান্ডো মিশন+সহযোদ্ধা	৬৬/-
৩৬৩-৩৬৪ স্মাগলার+বন্দি রানা	৫৯/-
৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন	৫৪/-
৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+অমানুষ	৭৯/-
৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
৩৭৫-৩৭৭ সর্পলতা+অখণ্ড অবসর	৭৮/-
৩৭৮-৩৭৯ স্নাইপার ১,২ (একত্রে)	৫৭/-
৩৮২-৩৮৩ মৃত্যুশীতল স্পর্শ ১,২ (একত্রে)	৭৮/-
৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+নিখোঁজ	৭০/-
৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে)	৬৭/-
৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বুশ পাইলট	৬৭/-
৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা	৬৪/-
৩৯৩-৩৯৪ অন্তর্ধান ১,২ (একত্রে)	৭০/-
৩৯৭-৩৯৮ গুপ্ত আততায়ী ১,২ (একত্রে	৮৪/-
৪০০-৪০১ চাই ঐশ্বর্য ১,২ (একত্রে)	৯৪/-

সংকেত-১

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৮৪

এক

ঠিক দুপুর। মাথার ওপর মিশরীয় সূর্যের দারুণ প্রতাপ। সামনে আগুন হয়ে আছে বালির খানিকটা বিস্তৃতি। তারপর আবার ছোট একটা পাহাড়। এই পাহাড়ের মাথায় উঠে এসে হার মানল শেষ উটটাও।

সাদা, পুরুষ। বছর পাঁচেক বয়স। গিয়ালো থেকে কিনেছিল সে। তিনটের মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে কম বয়েসী আর শক্ত-সমর্থ। পশু হিসেবে উট তার কাছে বরাবরই ঘৃণ্য, তবে এটা সেরকম বদমেজাজী নয় বলে অনুযোগ করার তেমন কোন কারণ ঘটেনি।

প্রায় ছ'ফিট লম্বা লোকটা। পেশীবহুল চওড়া শরীর। রোদে পুড়ে ফর্সা রঙ তামাটে হয়ে গেছে, একটু লক্ষ্য করলে চেহারায় জার্মান লক্ষণ পাওয়া যায়। উঁচু কাঁধ, লম্বা হাত-পা, প্রশস্ত চোয়াল—দেখে বোঝা যায়, এ লোক একাই একশো, প্রচণ্ড শক্তি রাখে দেহে-মনে।

পাথরের ছোট পাহাড়, কোথাও কোথাও বালি দিয়ে ঢাকা। হাতে রশি আর পিছনে উট নিয়ে মাথায় উঠে এল সে। ঢিল পড়ল রশিতে, পাশে এসে দাঁড়াল উট। সামনে তাকিয়ে থাকল ওরা। একটা নয়, দুটো নয়, দিগন্তরেখা ছাড়িয়ে আরও অনেক দূর পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য পাহাড়। এতগুলো পাহাড় ডিঙানো সম্ভব নয়, যেন এই হতাশাবোধ থেকেই মুষড়ে পড়ল উট। প্রথমে সামনের পা দুটো ভাঁজ হয়ে গেল তার, তারপর পিছনের দুটো। পাহাড়ের মাথায় গড়া নিষ্প্রাণ মনুমেন্টের মত দেখাল তাকে, নিঃস্ব মরুভূমির দিকে নির্লিপ্ত চোখে তাকিয়ে থাকল, যেন মেনে নিয়েছে পরাজয়।

উটের সামনে এসে রশি ধরে টান দিল লোকটা। সামনে বাড়ল মাথা, লম্বা হলো গলা, কিন্তু উট দাঁড়ায় না। পিছন দিকে চলে এসে তার নিতম্বে ঝেড়ে কটা লাথি কষল সে। কাজ হলো না। এবার পকেট থেকে একটা বেদুইন ছুরি বের করল সে। ধারাল ফলা গেঁথে দিল উটের পাছায়। ফলার সাথে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। আশ্চর্য, উটটা এমন কি পিছন ফিরে একবার তাকাল না পর্যন্ত।

কি ঘটছে, বুঝল লোকটা। পুষ্টির অভাবে অসাড় হয়ে গেছে উটের টিস্যু আর স্নায়ু, কাজ করছে না। তেল ফুরিয়ে যাওয়া ইঞ্জিনের মত। একটা মরুদ্যানের কাছে এ-ধরনের ঘটনা আগেও ঘটতে দেখেছে সে—সামনে প্রিয় খাবারের পাহাড় সাজিয়ে দিয়েও উটকে নড়ানো যায়নি, নড়াচড়ার উৎসাহ বা শক্তি কোনটাই অবশিষ্ট ছিল না।

এখন তার সামনে সম্ভাব্য দুটো পথ খোলা আছে। উটের নাকে পানি ঢালতে পারে, অথবা পাছায় ধরিয়ে দিতে পারে আগুন। এখনও অনেক দূর যেতে হবে তাকে, কাজেই পানি হাতছাড়া করা সম্ভব নয়। সাথে পেট্রল নেই, নেই প্রচুর কাঠ বা কয়লা, কাজেই আগুন ধরানোও যাচ্ছে না। তাছাড়া, এসবে যে কাজ হবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।

যাত্রা বিরতির সময় হয়েছে। মাথার ওপর উঠে এসে গোটা আকাশে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে সূর্য। সাহারা মরুর দীর্ঘ গ্রীষ্ম শুরু হতে যাচ্ছে, ছায়াতেই এখন একশো দশ ডিগ্রী টেমপারেচার।

উটের পিঠ থেকে না নামিয়েই লোকটা তার একটা ব্যাগ খুলে ভেতর থেকে তাঁবু বের করল। জানে লাভ নেই, তবু চারদিকে একবার চোখ বুলাল সে। যা ভেবেছিল, এক ইঞ্চি ছায়া নেই কোথাও। অগত্যা মুমূর্ষু উটের পাশে, পাহাড়ের মাথায়, তাঁবু টাঙাল সে।

পা দুটো লম্বা করে মেলে দিয়ে তাঁবুর খোলা মুখের সামনে চা বানাতে বসল সে। হাত দিয়ে বালি সরিয়ে চৌকো একটা গর্ত করল। অমূল্য কয়েকটা শুকনো কাঠের টুকরো দিয়ে সেটার ওপর তৈরি করল খুদে একটা পিরামিড, তারপর আগুন জ্বালল।

ঢাউস এক জোড়া স্যান্ডউইচ আর গরম দু'কাপ কড়া চা শরীরের সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দিল। সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে না পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছে সে। আর উটটা অপেক্ষা করছে, কখন মৃত্যু এসে গ্রাস করবে তাকে।

আঙুলের গিঁট গুণে দিন তারিখের হিসেব কষল কিছুক্ষণ। অনেক পথ পেরিয়ে এসে এই মরুভূমিতে পৌচেছে সে। হাজার মাইলের কম নয়। দু'মাস আগে লিবিয়ার উপকূল শহর এল এজেলা ছেড়েছে সে। গিয়ালো আর কুফরা হয়ে দক্ষিণ দিকে পাঁচশো মাইল এগিয়ে ঢুকে পড়েছে সাহারার মাঝখানে। তারপর পুব দিকে বাঁক নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে চলে এসেছে মিশরে, কাকপক্ষীও টের পায়নি। পাথুরে, দুর্গম পশ্চিম-মরু পেরিয়ে এসে খারগার কাছে উত্তর দিকে বাঁক নিয়েছে। তার ধারণা, গন্তব্য এখনও দূরে হলেও, খুব বেশি দূরে নয়।

এই মরুভূমি তার চেনা বটে, কিন্তু সব বুদ্ধিমান বেদুইন যাযাবরের মতই, সে-ও মরুভূমিকে ভয় করে। এই ভয় তাকে আতঙ্কিত করে তোলে না, বরং সতর্ক সচেতন হয়ে উঠতে সাহায্য করে। মরুভূমিতে পথ নির্দেশ পাবার বিশ্বস্ত কোন উপায় নেই। গন্তব্যের একেবারে কাছে পৌছেও দিক্‌ভ্রান্ত হতে পারে মানুষ। পরিচিত মরুদ্যানটিকে দু'মাইল ডানে রেখে বিশ মাইল সামনে এগিয়ে তারপর হয়তো ভুলটা ধরা পড়তে পারে। বিপদ কোন্‌দিক থেকে আসবে কেউ বলতে পারে না। পানির বোতল ফেটে বা ভেঙে যেতে পারে। স্বাস্থ্যবান উট দু'দিনের পথ বাকি থাকতেই অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। বেদুইন যাযাবরদের মত সে-ও জানে, সাবধান থাকলে এসব বিপদ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব।

এক সময় পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ল সূর্য। উটের পিঠে ভারী বোঝা ব্যাগগুলোর

দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করল সে, দু'একটা ফেলে যাবে কিনা। তিনটে ইউরোপিয়ান সুটকেস রয়েছে, দুটো ভারী, একটা হালকা। এছাড়া রয়েছে, কাপড়চোপড়ে ঠাসা একটা ব্যাগ, একটা সেক্সট্যান্ট, ম্যাপ, খাবারদাবার ও পানির বোতল। তাঁবুটা বাদ দেয়া যায়, বাদ দেয়া যায় টি-সেট, জিন আর ভারী পঞ্জিকাটা।

একটার ওপর একটা সাজিয়ে সুটকেস তিনটেকে একটা রশি দিয়ে বাঁধল সে। সবগুলোর ওপর রাখল কাপড়চোপড়, সেক্সট্যান্ট আর খাবার। রশি দিয়ে দুটো স্ট্র্যাপ তৈরি করে দু'কাঁধে গলিয়ে নিল, বোঝাটা থাকল পিঠের ওপর। ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি পানির ব্যাগটা ঝুলিয়ে নিল গলায়, বুকের ওপর দুলতে থাকল সেটা। সব মিলিয়ে খুব ভারী একটা বোঝা। পথশ্রমে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে, রওনা হবার পর থেকে বিশ পাউন্ড ওজন কমে গেছে তার, তবু এখনও দশজনের বোঝা একাই বইতে পারবে সে। হাতে কম্পাস নিয়ে সাবলীল ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল।

কম্পাসের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলল সে। পাহাড় এড়িয়ে সহজ পথ অনুসরণ করার ঝোঁক চাপল বটে, কিন্তু প্রতিবার সেটাকে দমন করল। গন্তব্যের এত কাছাকাছি এসে ভুল করার ঝুঁকি নিতে চায় না। কম্পাসের নির্দেশ এক চুল অমান্য করলে ভুল শোধরাবার জন্যে পরে হয়তো কয়েক মাইল পিছিয়ে আসতে হতে পারে। লম্বা লম্বা পা ফেলে ধীর, শান্ত ভঙ্গিতে হাঁটছে সে। ভয় ও আশা, দুটোকেই বিদায় করে দিল মন থেকে, সমস্ত মনোযোগ থাকল কম্পাস আর বালির ওপর। হাঁটছে তো হাঁটছেই।

শরীরের ক্ষত আর ব্যথাগুলো নতুন করে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলেও গ্রাহ্য করল না সে। নিজেকে যন্ত্র হিসেবে কল্পনা করতে চেষ্টা করল, এক পায়ের সামনে আরেক পা ফেলাই যার একমাত্র কাজ।

বিকেলের পর থেকে ঠাণ্ডা হয়ে এল দিন। বার বার পানি খাওয়ায় বুকের ওপর হালকা হয়ে গেছে ব্যাগ। আর কতটুকু পানি আছে তার হিসেব নেয়া দরকার, কিন্তু মন তাতে সায় দিল না। সাধারণ একটা ধারণা থেকে জানা আছে তার, দিনে ছ'পাইন্ট করে পানি খেয়েছে সে, তার মানে আর যেটুকু পানি আছে তাতে আরও একটা পুরো দিন চলা যাবে না। কিচিরমিচির করতে করতে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল এক ঝাঁক পাখি। কপালে হাত তুলে রোদ ঠেকিয়ে ওপরদিকে তাকাল সে। এই পাখি তার চেনা, রোজ সকাল-সন্ধ্যায় পানির কাছে উড়ে যায়। কম্পাস তাকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেদিকেই গেল ওরা। এর একটা মানে এই হতে পারে—সঠিক পথেই যাচ্ছে সে। কিন্তু সেই সাথে এ-ও তার জানা আছে যে পানির জন্যে পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে এই পাখি।

মরুভূমি ঠাণ্ডা হয়ে আসার সাথে সাথে আকাশের কোণে মেঘ জমতে শুরু করল। তার পিছনে, দিগন্তরেখার কাছে নেমে গিয়ে হলুদ একটা প্রকাণ্ড বেলুনের আকৃতি পেয়েছে সূর্য। খানিকপর লালচে বেগুনী আকাশে চাঁদ উঠল সাদা।

তার ইচ্ছে হলো, এবার থামে। শরীরে ব্যথা আর ক্লান্তি নিয়ে সারারাত হাঁটতে পারে না কেউ। কিন্তু তারপরই মনে পড়ল, তাঁবু, কম্বল, চা, চাল কিছুই নেই সাথে। শুধু একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে থামার কোন দরকার নেই। তার ধারণা, কুয়ার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে সে।

আগের মতই হাঁটতে থাকল সে। কিন্তু মনের শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন ভাবটা বিদায় নিয়েছে। ঊষর মরু পেরিয়ে গন্তব্যে পৌছুনোটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিল সে, এখন মনে হচ্ছে মরুভূমিরই জিত হবে। পাহাড়ের মাথার ওপর ছেড়ে আসা উটের কথা মনে পড়ল তার। উটটা যেমন হাল ছেড়ে দিয়ে পরাজয় মেনে নিয়েছে, অপেক্ষা করছে মৃত্যু এসে কখন তাকে গ্রাস করবে, তার নিজের বেলায় সেরকম কিছু ঘটতে দেবে না সে। পরাজয় হয়েছে জানতে পারলে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করবে না, তাতে শুধু কষ্টই বাড়বে—বরং তাড়াতাড়ি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি আদায় করে নেবে। মৃত্যুর জন্যে পথচেয়ে বসে থাকার মধ্যে এক ধরনের কাপুরুষতা আছে। আর কিছু না হোক, তার কাছে ছুরি তো রয়েছেই।

চিন্তাটা তাকে মরিয়া করে তুলল, অনুভব করল ভয়টাকে এখন আর মন থেকে তাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। চাঁদটা ডুবে গেল, তবে তারার আলোয় অনেকটা দূর পর্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে থাকল। হঠাৎ সে তার মাকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। জার্মান ভাষায় বলছে, 'তোকে তো আমি আগেই সাবধান করেছিলাম!' চারদিকে খাঁ খাঁ মরুভূমি, কিন্তু পরিষ্কার ট্রেনের বাঁশি শুনল সে। আবিষ্কার করল, কখন থেকে যেন নিজের অজান্তেই বিড়বিড় করছে সে, 'আমি পড়ে যাব না, পড়ব না, হাঁটব, হাঁটতে থাকব, পড়ব না···' তার মনে হলো, পায়ের নিচে নুড়ি পাথরগুলো প্রত্যেকটি জ্যান্ত এক একটা ইঁদুর হয়ে গেছে। সেদ্ধ মাংসের ঘ্রাণ পেল সে। একটা বালিয়াড়ি টপকে নামার সময় আগুন দেখতে পেল। আগুনের সামনে বসে রয়েছে একজন বয়স্ক লোক, আর একটা বাচ্চা ছেলে দাঁত দিয়ে হাড় থেকে মাংস ছিঁড়ে নিচ্ছে। আগুনের চারপাশে তাঁবু দেখতে পেল সে। পিঠ উঁচু কয়েকটা উট শুয়ে-বসে রয়েছে গাছের নিচে। আরও সামনে দেখা গেল পাঁচিল ঘেরা কুয়ো। নিজে থেকেই বুঝতে পারল সে, এসবই মায়া, দৃষ্টিভ্রম। তবু আগুনের দিকে এগিয়ে চলল সে। আগুন ঘিরে বসে থাকা লোকগুলো এক দুই করে স্পষ্ট হয়ে উঠল। একজনের দেখাদেখি তারা সবাই মুখ তুলে অবাক চোখে তাকাল তার দিকে। তাদের মধ্যে থেকে উঠে দাঁড়াল একজন। প্রায় ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল সে। লোকটা প্রায় তার মতই লম্বা, কিন্তু একহারা। তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটা। একটা হাত দিয়ে তার মাথা থেকে পাগড়িটা খুলে নিল সে। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'ভাই! আমার ভাই! আমার আব্বাস ভাই!'

আগন্তুক বুঝল, এসবই সত্যি, দৃষ্টিভ্রম বা মায়া নয়। ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটল তার ঠোঁটে। পরমুহূর্তে জ্ঞান হারাল সে।

ঘুম ভাঙার পরমুহূর্তের জন্যে কৈশোরে ফিরে গেল সে. বর্তমান জীবনটাকে মনে

হলো স্বপ্ন।

অনুভব করল, কে যেন তার কাঁধে হাত রেখে ডাকছে, 'আব্বাস ভাই, ওঠো।' এই মরুর ভাষা, তার এই নাম অনেক বছর পর আবার শুনল সে। চোখ না মেলেই বুঝতে পারল, কর্কশ একটা কম্বল দিয়ে জড়িয়ে রাখা হয়েছে তাকে, ঠাণ্ডা বালির ওপর শুয়ে আছে সে, মাথার নিচে পাগড়ি। ধীরে ধীরে চোখ মেলল সে। সরল, কালো দিগন্তরেখার নিচ থেকে নিখুঁত রঙধনুর আকৃতি নিয়ে উঠে আসছে সূর্য। সকালে হিমেল হাওয়া লাগল চোখেমুখে। এক এক করে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল তার।

বাবা ছিল মিশরীয় ইহুদি। তার মাকে বিয়ে করে জার্মানী থেকে নিয়ে আসে আলেকজান্দ্রিয়ায়। আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্ম বলে তার নামের প্রথম অংশে জুড়ে দেয়া হয় আলেক শব্দটা। তার চোদ্দ বছর বয়সে বাবা মারা গেলে একজন মিশরীয় মুসলমানকে বিয়ে করে মা, আলেক বোগান নামটা পাল্টে তার নতুন নামকরণ করা হয়, আলেক আব্বাস।

পনেরো বছর বয়সের সেই সকালটার কথা আজও তার পরিষ্কার মনে আছে, কায়রোয় প্রথম যেদিন তার ঘুম ভাঙল। হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠতে প্রচুর সময় লেগেছিল তার। প্রথমেই যে চিন্তাটা মাথায় এল—আমার বাবা মারা গেছে, এখন থেকে নতুন একজন অচেনা লোককে বাবা ডাকতে হবে। এখন থেকে সে আর ইহুদি নয়, মুসলমান। একজন মুসলিমকে বিয়ে করে তার বাবার ওপর অবিচার করেছে মা, এটুকু সে বুঝল। কিন্তু মায়ের ওপর নয়, তার সমস্ত রাগ আর ঘৃণা গিয়ে পড়ল সৎ-বাপের ওপর। এর আগে পর্যন্ত ধর্মের ব্যাপারে খুব একটা সচেতন ছিল না সে, কিন্তু সৎ-বাবা মুসলমান জানার পর থেকেই মুসলমান ও তাদের ধর্মের ওপর তার মনে একটা ঘৃণা জন্ম নিল। সেই কৈশোরেই তার মনে একটা প্রতিজ্ঞা দানা বেঁধে উঠল—সুযোগ পেলে প্রতিশোধ নেবে সে। যেমন করে হোক।

সেদিনই তার মুসলমানী করানো হলো। ব্যথাটার কথা এখনও মনে আছে তার। মনে আছে, রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ করে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছিল তার সৎ-ভাই আর আত্মীয়-স্বজনরা। তাদেরকে বলতে শোনা গেল, একজন ইহুদির বাচ্চাকে মুসলমান করার মধ্যে প্রচুর সওয়াব আছে।

কায়রোয়, সৎ-বাবার বাড়িতে মাস কয়েক ছিল তারা। তাকে মুসলমান করার বাকি কাজ এই সময়ের মধ্যে সারা হয়। সূরা, কলেমা আর নামাজ শেখানো হয়। রোজ সকালে উঠে কোরান শরিফ পড়তে হত। এই অত্যাচার তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল সৎ-বাবা। মায়ের অত্যাচারও কম ছিল না। প্রথমে ইহুদি এবং পরে মুসলমানকে বিয়ে করলেও নিজের খ্রীস্টান ধর্মের প্রতি গোপন টান তার মধ্যে বরাবরই ছিল। সময় এবং সুযোগ পেলেই ছেলেকে বাইবেলের জার্মান সংস্করণ পড়াতে চেষ্টা করত।

এরপর তারা কায়রো থেকে রওনা হলো মরুভূমির দিকে, সৎ-বাবার বেদুইন আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কিছুদিন বসবাস করার জন্যে। লম্বা একটা ট্রেন জার্নির

কথা মনে আছে তার। মরুভূমিতে তার জ্ঞাতি ভাই-বোনেরা কি রকম হবে তার একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করেছিল মা। ট্রেন থেকে স্টেশনে নেমে খানিকটা হাঁটতে হয় ওদেরকে, অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে একটা বালিয়াড়ির ওপর একজোড়া উট নিয়ে অপেক্ষা করছিল দু'জন আরব। প্রথম দর্শনে রহস্যময় দস্যু বলে মনে হয়েছিল ওদেরকে। ওদের পরনের বিচিত্র পোশাকই ছিল এমন মনে হওয়ার কারণ। ঢোলা কাপড় দিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢাকা। পাগড়ি দিয়ে শুধু মাথা নয়, ঠোঁট আর চোখ বাদে গোটা মুখও আড়াল করা। উটের পিঠে চড়িয়ে ওরা তাকে নিয়ে এল কুয়োর কাছে।

গোটা ব্যাপারটা উদ্ভট, দুঃস্বপ্নের মত লাগছিল তার কাছে। পথে কেউ তার সাথে একটা কথাও বলেনি! বেদুইনদের তাঁবুর কাছে ভিড় করেছিল সবাই, তাকে দেখে নিজেদের মধ্যে তারা গা টেপাটেপি শুরু করে দিল, সে যেন চিড়িয়াখানার আজব এক প্রাণী। ভাব প্রকাশের জন্যে তারা সবাই ইঙ্গিত-ইশারার সাহায্য নিচ্ছিল। সন্ধের দিকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল সে। কোথায় গিয়ে খালাস হওয়া যায় জানার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলেও লজ্জায় কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছিল না সে। তার আড়ষ্ট ভাব লক্ষ্য করে চাচাতো মামাতো ভাই-বোনেরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি শুরু করে দিল। একটা সময় এল, যখন তার মনে হলো এবার কাপড়চোপড় নষ্ট হয়ে যাবে। তখন বাধ্য হয়ে আরবী ভাষায় প্রশ্নটা করল সে। কয়েক মুহূর্ত কেউ নড়ল না, একটা শব্দ করল না। তারপরই হেসে গড়িয়ে পড়তে শুরু করল সবাই। ওদের ধারণা ছিল, আরবী ভাষা জানা নেই তার, সেজন্যেই আকার ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করছিল তারা। টয়লেট কোথায় জানার জন্যে বাচ্চাদের মুখে শোনা যায় এই রকম একটা শব্দ ব্যবহার করেছিল সে, হেসে অস্থির হবার সেটাই কারণ ওদের। হাসি থামতে কেউ একজন ব্যাখ্যা করে বোঝাল তাকে, তাঁবুর পিছনে গিয়ে একটা বালিয়াড়ির আড়ালে বালিতে বসেই কাজ সারতে হবে। টয়লেট নেই শুনে প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল সে, কিন্তু সেই মুহূর্তে প্রকৃতির ডাক তীব্র হয়ে ওঠায় ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ভাবার অবকাশ ছিল না। ওরা তার সাথে কথা বলায়, এরপর থেকে আড়ষ্ট ভাব অনেকটাই দূর হয়ে যায়। দিন কয়েকের মধ্যে উপলব্ধি করে সে, এরা সবাই কঠোর পরিশ্রমী, এদের আচরণে কর্কশ, চাঁছাছোলা একটা ভাব আছে, কিন্তু এদেরকে ঠিক নিষ্ঠুর বলা যায় না—সব মিলিয়ে মানুষ হিসেবে এরা মন্দ নয়। কিন্তু তবু, শুধু একটি কারণে—এদেরকে মনেপ্রাণে আপন করে নিতে পারল না সে। সেই কারণটা হলো, ইহুদিদের ওপর এদের সবার মনে রয়েছে প্রচণ্ড ঘৃণা। প্রায়ই তাকে শুনতে হত, তুমি ভাগ্যবান, মুসলমান হওয়ার সুযোগ পেয়েছ। এ-ধরনের কথা শুনতে শুনতে তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল, মুসলমানদের ক্ষতি করার একটা প্রতিজ্ঞা মাথাচাড়া দিয়ে উঠত মনের মধ্যে।

আজ পনেরো বছর পর মরুভূমির ঠাণ্ডা বালির ওপর শুয়ে সূর্য ওঠা দেখতে দেখতে কৈশোরের এসব কথা মনে পড়ে গেল তার। তার কাঁধে আবার মৃদু ধাক্কা দিল হাতটা। নিজের নাম আবার শুনতে পেল সে, 'আব্বাস ভাই, ওঠো।'

ঝট করে উঠে বসল সে, অতীত থেকে মুহূর্তে ফিরে এল বর্তমানে। মনে পড়ে গেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা মিশন নিয়ে দুস্তর মরু পেরিয়েছে সে। ভাগ্যগুণে পৌঁছে গেছে কুয়ার কাছে, ব্যাপারটা দৃষ্টিভ্রম নয়। তার জ্ঞাতি ভাই-বেরাদাররা সবাই আছে এখানে, বছরের এই সময়টায় যেমন থাকার কথা। বুঝল, ঠিক জ্ঞান হারায়নি সে, প্রচণ্ড ক্লান্তিতে প্রথমে নির্জীব হয়ে, তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওরা তাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে শুইয়ে দিয়েছিল আগুনের পাশে। হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক, ব্যাগগুলোর কথা মনে পড়ে গেছে। চোখের পলকে আতঙ্কে নীল হয়ে উঠল চেহারা। কাল রাতে এখানে যখন পৌঁছুল সে, ওগুলো কি তার সাথে ছিল? কিছুতেই মনে পড়ল না। তারপর দেখতে পেল, পায়ের কাছে একটার ওপর একটা নিখুঁত সাজানো রয়েছে তিনটে সুটকেস।

পাশে উবু হয়ে বসে রয়েছে মাহমুদ, তার চাচাতো ভাই। অনেকগুলো বছর এই মরুতে একসাথে কাটিয়েছে ওরা। শহুরে আব্বাসের অন্ধ ভক্ত এই মাহমুদ। আব্বাসর অঙ্গুলি হেলনে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করবে না সে।

'আব্বাস ভাই,' উদ্বেগের সাথে বলল মাহমুদ, 'তোমাকে খুব অস্থির আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে। এত বছর পর…'

'একটা যুদ্ধ হবে, মাহমুদ,' গম্ভীর সুরে বলল আলেক আব্বাস। যেন আশা করছে, এই খবরের ভেতরই তার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে মাহমুদ।

'যুদ্ধ?' মাহমুদের চোখে কৌতূহল। 'হ্যাঁ, এইরকম একটা গুজব আমরাও শুনছি বটে…'

'গুজব নয়,' ফিসফিস করে বলল আলেক। 'যুদ্ধের জন্যে, খুব বড় একটা যুদ্ধের জন্যে সমস্ত প্রস্তুতি প্রায় শেষ করে ফেলেছে ইসরায়েল।' মাহমুদের হাত থেকে নকশা কাটা একটা পিতলের গ্লাস নিল সে। মুখ ধুয়ে পাশে রাখা প্লেটগুলোর ঢাকনি সরিয়ে কবুতরের সুপ আর সাদা ভাতের দিকে তাকাল।

'কিন্তু যুদ্ধের সাথে তোমার কি সম্পর্ক, আব্বাস ভাই?' অবাক হয়ে জানতে চাইল মাহমুদ।

মুচকি একটু হাসল আলেক। বলল, 'আমার নাম আলেক আব্বাস। আমি একজন মুসলমান। মিশর আমার জন্মভূমি। ইসরায়েল আমার শত্রু। একটা যুদ্ধ বাধলে, সেই যুদ্ধের সাথে আমার সম্পর্ক কি হবে, বুঝতে পারো না?'

একটু বোকা বোকা দেখাল মাহমুদকে। বলল, 'কিন্তু তুমি তো সৈনিক নও, আব্বাস ভাই!'

'তোমার ধারণা, শুধু সৈনিকরাই বুঝি যুদ্ধ করে?' আবার মুচকি একটু হাসল আলেক। 'তুমি জানো না, একজন ব্যাটেলিয়ান সৈনিকের সমান একজন স্পাই।'

'তুমি…তুমি…আব্বাস ভাই, তুমি একজন স্পাই?' মাহমুদের চোখেমুখে বিস্ময় আর শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল।

'আস্তে!' চাপা কণ্ঠে ধমক দিল আলেক। 'খবরদার, এ-কথা যেন দু'কান না হয়।'

'কেউ জানবে না,' তাড়াতাড়ি কথা দিল মাহমুদ। আরও অনেক কথা জিজ্ঞেস করার ছিল তার, কিন্তু তাঁবু থেকে মেয়েরা বেরিয়ে আসছে দেখে চুপ করে গেল সে।

ওদের কারও পরনে ঘাগরা আর ব্লাউজ, কেউ পরেছে ঢোলা সালোয়ার কামিজ। প্রত্যেকের মাথায় একটা করে কাপড়ের আবরণ রয়েছে, সেটা দিয়ে চোখ জোড়া ছাড়া মুখের বাকি অংশ ঢাকা, বুক ঢাকার জন্যে ওড়নার কাজও করছে ওই লম্বা কাপড়। ওদের একজনের হাতে একটা ট্রে, তাতে চায়ের সরঞ্জাম। এই মেয়েটি আলেকের চাচাতো বোন। চার-পাঁচজন যুবতীকে সাথে নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে সে। এরা সবাই আলেকের চাচাতো ভাবী।

এগিয়ে এসে আলেককে ঘিরে দাঁড়াল তারা। অবিবাহিত বোনটি হাতের ট্রে নামিয়ে রাখল আলেকের সামনে। মেয়েটা আবার সিধে হয়ে দাঁড়াবার আগে কয়েক সেকেন্ড ঝুঁকে থাকা অবস্থায় স্থির হয়ে থাকল। আলেকের দৃষ্টির সাথে আটকে গেছে তার দৃষ্টি। খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েরা।

ওদের সাথে আলেকও গলা ছেড়ে হাসল। লজ্জা পেয়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়েই ত্রস্ত পায়ে তাঁবুর দিকে চলে গেল মেয়েটা। কেটলি থেকে কাপে চা ঢেলে চুমুক দিল আলেক, ভাবীদের বসতে অনুরোধ করল সে। তার কথা শুনে আরেক দফা হাসল সবাই, কিন্তু বসল না কেউ। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে আলাপ আর হাসাহাসি চলল; আলেকের চা খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওখান থেকে নড়বে না কেউ।

কৌতূহলে বুক ফেটে যাবার অবস্থা হয়েছে মাহমুদের, স্ত্রী আর ভাবীদের ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দিল সে। তারপর জানতে চাইল, 'কিন্তু আব্বাস ভাই, স্পাইরা তো বিদেশে কাজ করে—সেই রকমই শুনেছি। কিন্তু তুমি...'

'তুমি ঠিকই শুনেছ, কিন্তু শত্রু স্পাই আমাদের দেশে যারা রয়েছে তাদেরকে ধরতে হলে দেশেও কাজ করতে হয় আমাদের।'

'এতদিন তাহলে কোথায় ছিলে তুমি?'

'ইসরায়েলে। তারপর জার্মানীতে। আমার কাছে ভয়ঙ্কর সব খবর আছে।'

'কি খবর?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল আলেক। 'তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। সব কথা জানা চাই, না?'

'তোমাকে আমি ভালবাসি, আব্বাস ভাই,' বিড়বিড় করে বলল মাহমুদ। 'তোমার কথা শুনতে কি যে ভাল লাগে, সে আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আমি তোমার মত কোনদিনও হতে পারব না, সেজন্যেই তুমি আমার হিরো। প্লীজ, আব্বাস ভাই, তোমার সব কথা শোনাও আমাকে।'

মাহমুদের পিঠে একবার হাত বুলিয়ে দিল আলেক। 'তুমি আর সবার মত নও, জানি। সেজন্যেই তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। খবরটা হলো, দেশে ইসরায়েলের কিছু স্পাই কাজ করছে। তাদের তালিকা নিয়ে এসেছি আমি। একজন একজন

করে ওদের সবাইকে ধরতে হবে। অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ, আমার কাছে তালিকাটা আছে জানতে পারলে ওরা আমাকে খুন করার চেষ্টা করবে।'

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল মাহমুদ। আব্বাসের প্রতিটি কথা বিশ্বাস করেছে সে। আব্বাসের আচরণ সব সময় রহস্যময় লাগত তার, সে একজন স্পাই জানার পর অনেক রহস্যের মীমাংসা পেয়ে গেল সে। দেশের সেবা করার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছে আব্বাস ভাই, সন্দেহ নেই এটাই তার যোগ্য ভূমিকা। শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে বিগলিত হয়ে উঠল সে।

গাছের ছায়ায় বসে তাঁবুর চারদিকে তাকাল আলেক। পরিবারের এই অংশটা বেশ ভালই আছে, লক্ষ করল সে। চাকরবাকরদের সংখ্যা আগের চেয়ে বেড়েছে। বেড়েছে পরিবারের সদস্য সংখ্যা। শুধু কুয়ার আশপাশেই রয়েছে বিশ-বাইশটা উট। ভোর অন্ধকার থাকতে পরিবারের বয়স্ক লোকজন উট নিয়ে বেরিয়ে গেছে দূর শহরের দিকে। ভেড়ার যে পালটা দেখা যাচ্ছে, এরচেয়ে বড় এক পাল ভেড়া মাইল কয়েক দূরে ঘাস খেতে গেছে।

উঠে দাঁড়াল আলেক। এগিয়ে এসে ব্যাগগুলোর সামনে দাঁড়াল। একটাতেও তালা দেয়া নেই। সবচেয়ে ওপরে রয়েছে ছোট একটা লেদার সুটকেস। ঢাকনি তুলে ভেতরে তাকাল সে। চৌকো সুটকেসের ভেতর খাপে খাপে মিলে রয়েছে একটা রেডিও, সেটার গায়ে অসংখ্য ডায়াল, নব আর সুইচের ভিড়। ওগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তেলআবিব, মিউনিকের কথা মনে পড়ে গেল তার।

কপার স্ট্রীটে পাঁচতলা একটা বাড়ি। তিনতলায় সাজানো-গোছানো একটা অফিস কামরা। জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের চীফ চোখ বুজে বসে আছেন রিভলভিং চেয়ারে। দুরু দুরু বুকে ঘরে ঢুকল আলেক। চোখ মেলে তাকালেন চীফ, তীক্ষ্ণ চোখে কিছুক্ষণ দেখলেন তাকে। তারপর বললেন, 'প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কায়রোয় একজন স্পাই পাঠাতে চাইছে। আমি তোমার কথা ভাবছি।'

ঘণ্টা কয়েক আলোচনার পর স্থির হলো, প্রথমে নিজের কাজের জায়গা জার্মানীতে ফিরে যাবে আলেক, মিশরে যাবার জন্যে ওখান থেকে প্রস্তুতি নেবে সে। সুয়েজ পেরিয়ে কারও পক্ষে মিশরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়, তাই উল্টো দিক থেকে, যেদিক থেকে অনুপ্রবেশ আশা করছে না মিশরীয়রা, কায়রোয় ঢুকবে সে। ইসরায়েল এবার মিশরের ওপর একটা মরণ ছোবল দেবার প্ল্যান তৈরি করতে যাচ্ছে, সেটাকে সম্পূর্ণ করতে হলে কায়রোয় একজন স্পাই দরকার, যার কাজ হবে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্য যোগাড় করে রেডিওর সাহায্যে তেলআবিবে পাঠানো। এই স্পাই যদি কায়রোয় সফল হয় তাহলে এ বছরই, এই ছেষট্টি সালেই মিশরের ওপর হামলা চালাবে ইসরায়েল, তা না হলে আরও দু'চার বছর দেরি হয়ে যাবে।

লেদার কেসে একটা বই রয়েছে, ইংরেজী উপন্যাস। আনমনে বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম লাইনটা পড়ল, 'লাস্ট নাইট আই ড্রেমট আই ওয়েন্ট টু ম্যানডারলি

এগেন।' দুই পাতার মাঝখান থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজের টুকরো বালির ওপর পড়ে গেল, অত্যন্ত যত্নের সাথে সেটা তুলে আবার বইয়ের ভেতর রেখে দিল আলেক। বইটা সুটকেসে ভরল সে, তারপর সুটকেসের ঢাকনি নামিয়ে দিল।

তার কাঁধের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মাহমুদ, জানতে চাইল, 'আব্বাস ভাই, তুমি কি অনেক দূর থেকে এসেছ?'

'জার্মানী থেকে লিবিয়ায় আসতে কোন অসুবিধে হয়নি,' বলল আলেক। 'মরুতে পা দিই লিবিয়ার এল এজেলা থেকে।' হঠাৎ তার খেয়াল হলো, দেশ বা শহরের নাম মাহমুদের কাছে কোন অর্থ বহন করে না। 'আমি সাগর থেকে এসেছি।'

'সাগর থেকে!'

'হ্যাঁ।'

'একা?'

'কয়েকটা উট নিয়ে রওনা দিই আমি।'

বিস্ময়ে যেন পাথর হয়ে গেল মাহমুদ। তার জানা আছে, এমন কি বেদুইনরাও এত লম্বা পথ পাড়ি দিতে সাহসী হয় না। সাগর—সে তো অনেক, অনেক, অনেক দূর! আর সব বেদুইনদের মত আজও তার সাগর দেখা হয়নি।

বন্ধ সুটকেসের দিকে মাহমুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল আলেক। 'এটা তোমার কাছে জমা রেখে যেতে চাই আমি। কেউ জানবে না। রাখতে পারবে?'

গর্বে ফুলে উঠল মাহমুদের বুক, আব্বাস ভাইয়ের কোন কাজ করার সুযোগ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করে সে। দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো, সেই সাথে জানতে চাইল, 'আর কি করতে হবে, আব্বাস ভাই?'

'আর কিছু না,' বলল আলেক।

সুটকেসটা নিয়ে নিজের তাঁবুর দিকে চলে গেল মাহমুদ! একটা পেয়ালার ঢাকনি তুলল আলেক, দাড়ি কামাবার জন্যে পানি রয়েছে এতে। আরেকটা ব্যাগ খুলে ভেতর থেকে শেভিং ক্রীম, ব্রাশ, আয়না আর রেজার বের করল সে। বালির ওপর আয়নাটা বসিয়ে নিজের চেহারা দেখতে গিয়ে প্রায় আঁতকে উঠল। ফর্সা মুখটা রোদে পুড়ে এখানে সেখানে ঘা হয়ে গেছে। চোখ দুটো ছোট ছোট হয়ে আছে, পাতা জোড়া পুরোপুরি মেলতে গেলে ব্যথা লাগে। টিকালো নাকের লালচে রঙ বদলে গিয়ে কালচে হয়ে গেছে। ইঞ্চিখানেক লম্বা বিবর্ণ দাড়ি কুঁকড়ে রয়েছে। ঠোঁটজোড়া একটু ফাঁক করল সে, হলুদ একটা আস্তরণ পড়েছে দাঁতের ওপর।

দাড়ি কামাতে শুরু করল সে।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে তার সামনে বালির ওপর হাঁটু গেড়ে বসল মাহমুদ। হাসি হাসি চেহারা। বলল, 'তোমার মনে আছে, আব্বাস ভাই, তুমি বলতে মরুভূমিতে সিংহ আছে?'

'নেই মানে! তোমরা কেউ বিশ্বাস করতে না।'

সেই কৈশোরে বই পড়ে জেনেছিল আলেক, বহুকাল আগে মরুভূমিতে সিংহ

ছিল। তারা সবাই মারা গেছে, এটা তার বিশ্বাস হত না। পাহাড় এলাকায় দু'একটা আজও লুকিয়ে থাকতে পারে। এই নিয়ে তর্ক হত ওদের। সেই বয়সে এই তর্কে জেতাটা ওদের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

'তখন করতাম না,' বলল মাহমুদ, 'আজ আমি বিশ্বাস করি, মরুভূমিতে সত্যি সিংহ আছে।'

'মানে?'

'মানে তুমিই আমাদের সেই মরু-সিংহ, আব্বাস ভাই।'

হাত দুটো স্থির হয়ে গেল আলেকের, মুখ তুলে মাহমুদের দিকে তাকাল সে। দু'জন দু'জনের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল। তারপর হা হা করে হেসে উঠল আলেক।

নিচু গলায়, ভক্তিতে গদ গদ হয়ে কথা বলে চলল মাহমুদ। তার একটা কথাও মিথ্যে বা অতিরঞ্জিত নয়। বেদুইন কিশোররা শুধু অকুতোভয় ছিল না, তাদের শরীরে ছিল ইস্পাতের শক্তি। কিন্তু তারা দশ-বারোজন মিলেও একা আলেকের সাথে শক্তির লড়াইয়ে পেরে উঠত না। নিষ্ঠুর প্রকৃতির যুবক বেদুইনরাও অনেকে তাকে যমের মত ভয় করত। শুধু শক্তির দিক থেকেই নয়, বুদ্ধির দিক থেকেও বেদুইন কিশোরদের তাক লাগিয়ে দিত আব্বাস ভাই। পথ চিনে কোথাও যেতে হলে মানচিত্র ব্যবহার করত সে। এর আগে পর্যন্ত মানচিত্র শব্দটাই জানা ছিল না বেদুইনদের। ছবি ভরা বই ছিল তার কাছে, সে-সব বই পড়ে ওদেরকে দেশ-বিদেশের মজার মজার গল্প শোনাত সে।

মক্কায় হজ করতে গেল আলেক, সাথে নিল মাহমুদকে। এই প্রসঙ্গে এসেই চোখে পানি এসে গেল মাহমুদের। হজ থেকে ফিরে এসে আবার বেরিয়ে পড়ল আব্বাস ভাই, এবার মাকে নিয়ে। ইতোমধ্যে তার সৎ-বাবা মারা গেছে। হার্টের অসুখ ছিল মায়ের, পথেই মারা গেল সে। তিনদিন পর একদল বেদুইন খবরটা জানিয়ে যায় মাহমুদকে। সেই থেকে আব্বাস ভাইয়ের কোন খবর পায়নি সে। তারপর আজ প্রায় বছর পাঁচেক পর আব্বাস ভাই ফিরে এল। স্পাই হয়ে।

একটু একটু করে নিজের পুরানো চেহারা ফিরে পেল আলেক। চওড়া হাড়ের ওপর চেহারাকে সুন্দর বলা যাবে না, কিন্তু কঠোর বলতে দ্বিধা করবে না কেউ। চোখে রয়েছে সাপের ঠাণ্ডা দৃষ্টি।

দাড়ি কামানো শেষ করে মাহমুদের তাঁবুর দিকে এগোল আলেক, ব্যাগগুলো নিয়ে তাকে অনুসরণ করল মাহমুদ। আলেককে তাঁবুতে ঢুকতে দেখে মাহমুদের বউ পাশ কাটিয়ে স্যাৎ করে বেরিয়ে গেল বাইরে। গায়ের ঢোলা কাপড়টা খুলে শার্ট পরল আলেক, টাই লাগাল, গ্রে-রঙের মোজা আর ব্রাউন রঙের চেক স্যুট পরল। বিপদ দেখা দিল জুতো পরতে গিয়ে। গরম বালির ওপর হেঁটে ক্ষত বিক্ষত হয়ে আছে পা দুটো, জুতোর ভেতর গলাতে গেলেই ব্যথা লাগে। ছুরি দিয়ে জুতোর পিছন দিক খানিকটা করে কেটে ফেলল সে, এরপর পা গলাতে তেমন অসুবিধে হলো না।

এই মুহূর্তে আরও অনেক কিছু দরকার আলেকের। গরম পানিতে গোসল করতে হবে তাকে। চুল ছাঁটাতে হবে। ক্ষতগুলোয় লাগাবার জন্যে দরকার অ্যান্টিসেপটিক মলম। গোল্ড ব্রেসলেট, সিল্ক শার্ট, শ্যাম্পেনের একটা ঠাণ্ডা বোতল এবং নরম একটা মেয়েমানুষ—কোনটার চেয়ে কোনটা কম দরকারী নয়। কিন্তু এসবের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে তাকে।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল আলেক। বেদুইনরা তার দিকে এমন ভাবে তাকাল, সে যেন অচেনা একজন আগন্তুক। হ্যাটটা মাথায় পরে নিয়েছে আলেক। দু'হাতে দুটো সুটকেস—একটা ভারী, অপরটা হালকা। তার পিছু পিছু হাতে পানির একটা বোতল নিয়ে মাহমুদও বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। পরস্পরকে আলিঙ্গন করল ওরা।

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল আলেক। প্রথমে নিজের আইডেনটিটি কার্ডের ওপর চোখ বুলাল। এখন থেকে আবার সে আলেক বোগান বলে পরিচিত হবে: বয়স ত্রিশ, ঠিকানা ভিলা লে অলিভিয়ার্স, গার্ডেন সিটি, কায়রো, পেশায় ব্যবসায়ী, জাতি জার্মান।

মানিব্যাগ থেকে কড়কড়ে কিছু নোট বের করল সে। মাহমুদের হাতে সেগুলো গুঁজে দিয়ে বলল, 'এর অর্ধেক তোমার, বাকি অর্ধেক সবার মধ্যে ভাগ করে দিয়ো।'

মাহমুদের গালে আলতোভাবে চুমু খেল আলেক, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা ধরল। সকালে ঠাণ্ডা বাতাসে এলোমেলো হয়ে গেল তার চুল। এই শেষ ক'মাইল পেরোতে পারলেই শহরে পৌঁছে যাবে সে।

দুই

মরুবাসী অভিযাত্রীদের প্রাচীন পথ, এক মরুদ্যান থেকে আরেক মরুদ্যান হয়ে এতদূর এসেছে আলেক। এই পথের শেষ অংশটা চলে গেছে পর্বতমালার ভেতর দিয়ে। তারপর মিলেছে গিয়ে সাধারণ একটা রাস্তার সাথে। ম্যাপে এই রাস্তাটা আঁকা আছে, সরু একটা সুতোর মত। রাস্তার একদিকে হলুদাভ পাহাড় আর ধুলো, অপরদিকে ছোট ছোট খাল আর তুলোর চাষ। কৃষকরা খেতে কাজ করছে. সংখ্যায় তারা খুবই কম, প্রত্যেকের পরনে ঢোলা আলখাল্লা ধরনের কাপড়। রাস্তা ধরে উত্তর দিকে চলেছে আলেক। ভিজে, ঠাণ্ডা বাতাস পেয়ে বুঝল, নীল নদের কাছাকাছি চলে এসেছে। খেতের পাশে দু'একটা ঘর চোখে পড়ছে এখন। সভ্যতার চিহ্ন এক দুই করে বাড়ছে সংখ্যায়। আরও আধ ঘন্টা হাঁটার পর গাড়ির আওয়াজ পেল সে। বুঝল, এখন সে নিরাপদ।

আসিউত শহরের দিক থেকে আসছে গাড়িটা। একটা বাঁক ঘুরে দৃষ্টিপথে বেরিয়ে এল সেটা। দেখেই ছ্যাঁৎ করে উঠল আলেকের বুক। চিনতে ভুল হয়নি, একটা সামরিক জীপ। দ্রুত কাছে চলে আসছে। সামনের সীটে মিশরীয় সামরিক

বাহিনীর পোশাক পরা লোক দেখল সে। মনে মনে প্রমাদ গুনল। শহরে পা দিতে না দিতে বিপদ, না জানি কি আছে কপালে!

ভয় তাড়িয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল আলেক। ভাবল, এখানে আমার উপস্থিতি বেআইনী বলে প্রমাণ করা যাবে না। আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মেছি আমি। আমার জাতীয়তা মিশরীয়। কায়রোয় আমার একটা বাড়ি আছে। গরীব-ফকির নই, আমি একজন ধনী মানুষ। মিশরীয়, সেই সাথে আমি একজন ইউরোপিয়ানও।

ঘ্যাচ করে ব্রেক করল ড্রাইভার। জীপ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল একজন লোক। তার ইউনিফর্ম শার্টে তিনটে ব্যাজ দেখে আলেক বুঝল, ক্যাপ্টেন। খুবই অল্প বয়স ক্যাপ্টেনের, একটু যেন খুঁড়িয়ে হাঁটে।

'কে আপনি? ওদিক থেকে···কোত্থেকে?'

হাতের ব্যাগগুলো নামিয়ে রেখে আঙুল দিয়ে কাঁধের পিছনটা দেখাল আলেক, বলল, 'ডেজার্ট রোডে আমার গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে।'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন, ব্যাখ্যাটা সাথে সাথে মেনে নিল। তার বা আর কারও মাথায় এই সম্ভাবনা ঢোকার কথা নয় যে একজন লোক সেই লিবিয়া থেকে পায়ে হেঁটে এখানে পৌঁচেছে। বলল, 'আপনার কাগজ-পত্র, প্লীজ।'

পকেট থেকে কাগজ বের করে ক্যাপ্টেনের হাতে ধরিয়ে দিল আলেক। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল ক্যাপ্টেন, তারপর মুখ তুলে তাকাল। আলেক ভাবল, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সে নিশ্চয়ই কোথাও ফুটো আছে, মিশরের প্রতিটি অফিসার খুঁজছে আমাকে—অথবা শেষবার আমি যখন এখানে ছিলাম তখন যে সব কাগজ-পত্র চালু ছিল তা এখন বদলে গেছে, আউট অভ ডেট হয়ে গেছে আমারগুলো, অথবা···'

'সাংঘাতিক কাহিল দেখাচ্ছে আপনাকে, মি. বোগান,' বলল ক্যাপ্টেন। 'কতক্ষণ ধরে হাঁটছেন আপনি?'

তার বিধ্বস্ত চেহারা ক্যাপ্টেনের সহানুভূতি জাগাতে পারে ভেবে আলেক বলল, 'কাল সেই বিকেল থেকে,' কাঁধ দুটো নিচু করে ক্লান্ত একটা ভঙ্গি করল সে। মুখে দুর্বল একটু হাসি টানল। 'পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম আর কি!'

'বলেন কি! সারারাত আপনি খোলা আকাশের নিচে ছিলেন!' গলা একটু বাড়িয়ে দিয়ে আলেককে আরও কাছ থেকে ভাল করে লক্ষ করল ক্যাপ্টেন। 'কি সর্বনাশ! আপনি যে এখনও পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন সেটাই তো আশ্চর্য! উঠুন, উঠুন, গাড়িতে উঠুন। আপনাকে পৌঁছে দিই।' জীপের দিকে ফিরল সে। 'করপোরাল, ভদ্রলোকের সুটকেসগুলো!'

আপত্তি করার জন্যে মুখ খুলল আলেক, পরমুহূর্তে বন্ধ করে ফেলল। সারারাত ধরে হাঁটছে এমন লোকের হাত থেকে কেউ বোঝা নিতে চাইলে খুশি এবং কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত তার। আপত্তি করলে তার বলা গল্পটা মিথ্যে বলে সন্দেহ করা হতে পারে, সেক্ষেত্রে ওরা হয়তো তার সুটকেসগুলো খুলে দেখতেও চাইতে পারে।

করপোরাল সুটকেসগুলো জীপের পিছনে তুলছে, সেগুলোর একটাতেও তালা

দেয়া নেই খেয়াল করে নিজেকে অভিশাপ দিতে শুরু করল আলেক। এই রকম একটা বোকামি কিভাবে করতে পারল সে! বুঝল, মরুভূমি পেরোবার সময় যে অভ্যেসটা গড়ে উঠেছে সেটা এখনও ত্যাগ করতে পারেনি সে। মরুভূমিতে হপ্তায় যদি একবারও লোকজনের দেখা পাওয়া যায় ভাগ্যের কথা, তাছাড়া কোন অবস্থাতেই এইসব বেদুইন যাযাবররা একটা রেডিও ট্র্যান্সমিটার চুরি করতে যাবে না। ট্র্যান্সমিটারটা প্লাগ দিয়ে পাওয়ার আউটলেটের সাথে জোড়া লাগানো আছে চুরি করতে হলে প্লাগটা আগে খুলতে হবে, কিন্তু বেদুইনরা কলকজা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। উপলব্ধি করল, তার বোধ আর অনুভূতি সূর্যের গতি, বাতাসের গন্ধ, কতটা পথ পেরোনো গেল তার হিসেব, নিঃসঙ্গ একটা গাছের খোঁজে দিগন্তরেখার ওপর নজর রাখা, ইত্যাদি বিষয়ে এখনও সতর্ক হয়ে আছে—এই মুহূর্তে যার কোন প্রয়োজন নেই। এসব ভুলে গিয়ে এখন থেকে তাকে পুলিস, মিলিটারি, কাগজ-পত্র আর তালা-চাবির কথা ভাবতে হবে। চিন্তা করতে হবে বিপদের সময় কিভাবে মিথ্যে বলে পার পাওয়া যায়।

আরও সাবধান হও, আলেক! জীপে ওঠার সময় নিজেকে সতর্ক করে দিল সে। এমন জায়গায় এসে পৌঁচেছ তুমি, ভুল করলে শোধরাবার সুযোগ মিলবে না।

তার পাশে বসল ক্যাপ্টেন। ড্রাইভারকে বলল, 'শহরে ফেরো।'

ধুলো উড়িয়ে রাস্তার উপর গাড়ি ঘুরিয়ে নিল ড্রাইভার, এতক্ষণে আলেকের খেয়াল হলো, অভিনয়টা নিখুঁত করার জন্যে আরও আগে পানি খেতে চাওয়া উচিত ছিল তার। 'পানি···গাড়িতে আছে নাকি?'

'অবশ্যই,' বলে সীটের পাশ থেকে একটা বোতল তুলে আলেকের হাতে ধরিয়ে দিল ক্যাপ্টেন। ছিপি খুলে ঢক ঢক করে পানি খেল আলেক।

'ধন্যবাদ,' কোটের আস্তিনে ঠোঁট মুছে বলল আলেক। বোতলটা ফিরিয়ে দিল।

বোতলটা একবার দেখে নিয়ে ক্যাপ্টেন বলল, 'দারুণ তেষ্টা পেয়েছিল-দেখছি আপনার, এক চুমুকে সেরখানেক নামিয়ে দিয়েছেন। স্বাভাবিক। ও, হ্যাঁ, ভাল কথা, আমি ক্যাপ্টেন আহসান।' আলেকের দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সে।

করমর্দনের সময় ক্যাপ্টেনকে ভাল করে লক্ষ করল আলেক। বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়স, তাজা নবীন চেহারা। মুখে তৈরি হয়ে আছে হাসি, চোখের দৃষ্টিতে ছেলেমানুষি ভাবটুকু পরিষ্কার ফুটে আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অবয়বে রয়েছে কাঠিন্য, প্রথম জীবনেই যা অর্জন করে যোদ্ধারা। আলেক তাকে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাকশনে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে?'

বিষণ্ন একটু হাসি ফুটল ক্যাপ্টেন আহসানের ঠোঁটে। 'ই বাহিনীর একটা কমান্ডো গ্রুপ সিনাইয়ে ঢুকে পড়েছিল, ওদেরকে তাড়া করে সীমান্তের ওপারে বিশ মাইল ঢুকে পড়েছিলাম আমরা। ওরা আমাদের ঘিরে ফেলে। ঘেরাওর মধ্যে তিনদিন আটকা ছিলাম। ওরা ছিল চারশো, আমরা বাহান্ন জন। ঘেরাও ফুঁড়ে

বেরিয়ে আসি আমরা। সবাই নয়, আমরা তেরো জন। ওখানেই পায়ে চোট পাই আমি।' একমুহূর্ত থেমে জানতে চাইল সে, 'আপনার উচ্চারণ ভঙ্গি, এটা কোত্থেকে পেলেন?'

হঠাৎ করে এ-ধরনের একটা প্রশ্ন শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল আলেক। অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলার জন্যেই প্রশ্নটা করা হয়েছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না। ক্যাপ্টেনকে দেখে যা মনে হয়, অত সরল নয় সে। বুদ্ধিমান, সন্দেহপ্রবণ লোক। তবু মনে মনে হাসল আলেক, উত্তর তার তৈরি করাই আছে। 'আমার বাবা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মিশরে এসেছিলেন। আফ্রিকান এবং অ্যারাবিক, দুটো ভাষাই শেখা হয়েছে আমার।' এক সেকেন্ড ইতস্তত করল সে, গড়গড় করে ব্যাখ্যা দিতে থাকলে ক্যাপ্টেন আবার কি না কি ভেবে বসে। 'বোগান নামটা আসলে ডাচ, আমার জন্ম আলেকজান্দ্রিয়ায় বলে নামের আগে আলেক লাগানো হয়েছে।'

সবিনয় আগ্রহের সাথে জানতে চাইল ক্যাপ্টেন, 'এদিকে কি মনে করে আসা হলো?'

এরও উত্তর তৈরি করা আছে আলেকের, 'আপার ঈজিপ্টে ব্যবসায়িক স্বার্থ আছে আমার!' হাসল সে। 'হঠাৎ দেখা দিয়ে ওদেরকে আমি চমকে দিতে চাই।'

আসিউতে ঢুকছে ওরা। ষাট দশকের মিশরীয় শহর হিসেবে এটাকে মাঝারি শহর বলা চলে। প্রচুর কল-কারখানা, কয়েকটা হাসপাতাল, একটা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, নামকরা একটা কনভেন্ট এবং প্রায় দেড় লাখ লোক রয়েছে। তাকে রেল-স্টেশনে নামিয়ে দিলেই চলবে, কথাটা আরেকটু হলে বলে ফেলেছিল আলেক, ভুলটা করা থেকে তাকে বাঁচিয়ে দিল ক্যাপ্টেন আহসান।

বলল, 'আপনার একটা গ্যারেজ দরকার। আমরা আপনাকে ফাইয়াদের কাছে নিয়ে যাব, সে আপনাকে টো ট্রাক দিয়ে সাহায্য করতে পারবে।'

ঢোক গিলল আলেক। ঠাস করে চড় মারতে ইচ্ছে করল নিজের গালে। এখনও সে সাবধান হওয়া কাকে বলে শেখেনি। শালার মরুভূমির প্রভাব এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি সে, বুদ্ধিশুদ্ধি সব একেবারে ঘোলা করে রেখেছে। চট করে একবার হাতঘড়ি দেখে নিল সে। উপায় নেই, গ্যারেজে গিয়ে খানিকটা অভিনয় করতে হবে। হিসেব করে দেখল, তবু কায়রোয় যাবার জন্যে ডেইলি মেল ট্রেনটা ধরার সময় পাবে সে।

কিভাবে কি করবে, ভাবতে লাগল আলেক। গ্যারেজে পৌঁছে দিয়ে নিশ্চয়ই বিদায় নেবে ক্যাপ্টেন। গ্যারেজের মালিক ফাইয়াদকে গাড়ির পার্টস সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করবে সে, তারপর ওখান থেকে সোজা পায়ে হেঁটে চলে যাবে স্টেশনে।

ভাগ্য সহায়তা করলে ক্যাপ্টেন আহসান পরে আর আলেক বোগানের গাড়ি উদ্ধার হলো কিনা জানার জন্যে ফাইয়াদের সাথে যোগাযোগ করবে না।

ব্যস্ত রাস্তা ধরে দ্রুত ছুটছে গাড়ি। আবার অনেকদিন পর মিশরীয় শহরের পরিচিত দৃশ্য দেখে মনটা খুশি হয়ে উঠল আলেকের। পুরুষরা গাঢ় রঙের জমকালো কাপড় পরেছে। মেয়েদের মাথায় লম্বাটে বোঝা। ফিটফাট পুলিস। তীক্ষ্ণ

চেহারার যুবকদের চোখে সান-গ্লাস। দোকানদাররা দোকান ছাড়িয়ে ফুটপাথের ওপরও পশরা সাজিয়ে বসেছে। বেশির ভাগ প্রাইভেট কার পুরানো। লোক ভর্তি বাসগুলোর চেহারা ক্ষত-বিক্ষত, টোল খাওয়া। হাজারো গাড়ির ভিড় হলে কি হবে, সাইকেল আরোহীরা বন বন প্যাডেল মেরে ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে। গদাইলশকরী চালে, এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সার বেঁধে চলেছে গাধার দল, তাদের পিঠে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে বোঝা।

নিচু, মাটির তৈরি কয়েকটা বাড়ির সামনে থামল জীপ। বিধ্বস্ত চেহারার একটা ট্রাক রাস্তার অর্ধেকটাই আটকে দাঁড়িয়ে আছে। রেঞ্চ নিয়ে সিলিন্ডারের ওপর কাজ করছে এক কিশোর।

'কাজে ফিরতে হবে,' বলল ক্যাপ্টেন, 'আপনাকে এখানেই ছেড়ে যেতে হচ্ছে।'

তার সাথে করমর্দন করল আলেক। 'অনেক করেছেন আপনি। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'এভাবে আপনাকে ছেড়ে যেতে খারাপই লাগছে আমার,' বলল ক্যাপ্টেন। 'বিষম একটা ধকল গেছে আপনার ওপর দিয়ে।' ভুরু কুঁচকে উঠল তার, পরমুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারা। 'পেয়েছি!'

'কি?' মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেও চেহারায় হাসি ধরে রাখল আলেক।

'আপনার সাহায্য দরকার, তাই করপোরাল মিসাকে রেখে যাচ্ছি। ও আপনাকে সব রকম...'

'ধন্যবাদ, কিন্তু সত্যি তার কোন দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না...'

কিন্তু আলেকের কথা শুনছে না ক্যাপ্টেন। 'ভদ্রলোকের সুটকেসগুলো নামাও, মিসা। সবদিকে নজর রাখবে তুমি, ওঁর যেন কোন রকম অসুবিধে না হয়। চোর-ছ্যাঁচড়রা চারদিকে ঘুর ঘুর করছে, দেখো, উনি যেন কোন বিপদে না পড়ে যান। বুঝেছ?'

'ইয়েস, স্যার!'

হতাশায় মনে মনে গুঙিয়ে উঠল আলেক। শালা বানচোত বলে গাল পাড়তে শুরু করল ক্যাপ্টেনকে। এত থাকতে দয়া দেখাবার জন্যে তাকেই বেছে নিল হারামজাদা! করপোরাল ব্যাটাকে বিদায় করতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে! আচ্ছা, ক্যাপ্টেন কি কিছু সন্দেহ করে বসেছে, সেজন্যেই কি একে তার ওপর পাহারায় বসিয়ে যাচ্ছে?

জীপ থেকে আলেক আর করপোরাল নামল। গাড়ি ছেড়ে দিল ড্রাইভার। গম্ভীর, বাঘের মত চেহারা নিয়ে ফাইয়াদের গ্যারেজে ঢুকল আলেক। তার পিছু পিছু এল করপোরাল মিসা, দু'হাতে দুটো সুটকেস নিয়ে।

ঢোলা জোব্বা পরা প্রৌঢ় লোক ফাইয়াদ। জোব্বাটা বোধহয় তৈরি করার পর থেকে আর সাবান বা পানির মুখ দেখেনি, চিমটি কাটলে ময়লা উঠবে। গ্যারেজের ভেতরই ওঅর্কশপ, ল্যাম্প জেলে একটা কার-ব্যাটারির ওপর কাজ করছিল

ফাইয়াদ। হাসিখুশি লোক সে, ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে কথা বলল, 'ঝকঝকে একটা অটোমোবাইল ভাড়া করতে চান? আমার কাছে সব দেশের গাড়ি আছে—ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, আমেরিকান...'

মিশরীয় আরবীতে দ্রুত বলল আলেক, 'আমার গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে। শুনলাম তোমার নাকি একটা টো ট্রাক আছে?'

'আছে। বলেন তো এখুনি রওনা হতে পারি আমরা। কোথায় আছে গাড়ি?'

'ডেজার্ট রোডে,' বলল আলেক। 'পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন মাইল দূরে। ওটা একটা ফোর্ড। কিন্তু আমরা কেউ তোমার সাথে যাচ্ছি না।' পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে একশো পাউন্ডের তিনটে নোট বের করে ফাইয়াদের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'গাড়িটা নিয়ে এসে আমার সাথে দেখা করবে তুমি। রেল-স্টেশনের কাছে, গ্রীন হোটেলে উঠছি আমি।'

ছোঁ মেরে টাকা নিল ফাইয়াদ, একগাল হেসে বলল, 'আল্লা ভরসা, এখুনি বেরিয়ে পড়ছি আমি।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল আলেক। পিছনে মিসাকে নিয়ে গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এল, মনে মনে ভাবছে ফাইয়াদের সাথে এই কথা বলার পরিণাম শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে। মরুভূমিতে গিয়ে গরু খোঁজা করবে মেকানিক, কিন্তু ফোর্ডের ছায়া পর্যন্ত দেখতে পাবে না সে। ঘণ্টা কয়েক পর শহরে ফিরে আসবে, গ্রীন হোটেলে গিয়ে দেখবে আলেক বোগান চলে গেছে। খাটনির তুলনায় পয়সা কম পায়নি বিবেচনা করে তার ওপর হয়তো অসন্তুষ্ট হবে না লোকটা, কিন্তু তার মানে এই নয় যে গায়েব হয়ে যাওয়া আলেক বোগান ও ফোর্ড সম্পর্কে ঠোঁটে তালা দিয়ে থাকবে সে। হয় তখুনি, নয়তো পরে কোন এক সময় ক্যাপ্টেন আহসানের কানেও কথাটা যাবে। এসবের কি অর্থ তা হয়তো ধরতে পারবে না ক্যাপ্টেন, তবে এটা যে তদন্ত করে দেখার মত একটা রহস্য, তা বুঝতে অসুবিধে হবে না তার।

মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল আলেকের। চুপিসারে কায়রোয় ঢোকার ওপর নির্ভর করছে তার মিশনের সাফল্য। গোড়াতেই যদি গলদ থেকে যায়, ধরা পড়ে যাবে সে।

যা ঘটে গেছে তা আর বদলানোর সাধ্য নেই তার, নিজেকে বুঝ দিল সে। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে মাথা গরম না করে যতটা সম্ভব নিরাপদে শহর ছাড়তে হবে তাকে। আবার হাতঘড়ি দেখল সে। এখনও সময় আছে, ট্রেন ধরা যায়। হোটেলের লবিতে পৌঁছে করপোরালকে বিদায় করবে। তাকে চলে যাবার সময় দেয়ার জন্যে হোটেলের রেস্তোরাঁয় বসে অপেক্ষা করার সময় হালকা কিছু খেয়ে নেবে সে।

রোগা-পাতলা লোক করপোরাল, তারই মত বয়স। এখনও করপোরাল, তার মানে খুব একটা বুদ্ধিশুদ্ধি নেই।

মাইদান এল-মাহাতা পেরোবার সময় পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল মিসা, 'এটা

আপনার পরিচিত শহর, স্যার?'

'হ্যাঁ, আগেও এসেছি,' জবাব দিল আলেক।

গ্রীনে ঢুকল ওরা। একশো দশটা কামরা নিয়ে শহরের দ্বিতীয় বৃহত্তম হোটেল এটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে মিসার মুখোমুখি হলো আলেক, বলল, 'ধন্যবাদ, করপোরাল। আপনাদের সাহায্য অনেকদিন মনে থাকবে। এবার আপনি ডিউটিতে ফিরে যেতে পারেন।'

'আমার কোন তাড়া নেই, স্যার,' বলল করপোরাল। হাসিটা লেগেই আছে ঠোঁটে। 'আরও খানিকটা খাটিয়ে নিতে পারেন আমাকে। চলুন, সুটকেসগুলো ওপরে তুলে দিই।'

'দরকার কি! নিশ্চয়ই পোর্টার আছে...'

'বলেন কি, স্যার! পোর্টারদের হাতে সুটকেস ছেড়ে দিলে অর্ধেক খালি করে দেবে না! এদেরকে আপনি চেনেন না! বিশ্বাস করেছেন কি মরেছেন!'

পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে ক্রমে। ছোট্ট একটা মিথ্যে কথা বলার খেসারত দিতে হচ্ছে তাকে, ভাবল আরেক। ব্যাপারটা এমন হয়ে উঠছে, কোথাকার পানি কোথায় গড়ায় কে জানে। সন্দেহটা আবার উঁকি দিল মনে, তার সাথে এই আচরণটা কি ইচ্ছে করে করা হচ্ছে? ওর আসল পরিচয়, মিশরে আসার উদ্দেশ্য সবই কি জানে ওরা, সুযোগ পেয়ে ওকে নিয়ে ইঁদুর-বেড়াল খেলছে?

দূর!

মুখে হাসি টেনে করপোরালকে বলল, 'ঠিক বলেছেন। পোর্টারদের বিশ্বাস করা উচিত নয়।' এগিয়ে গিয়ে ডেস্কের সামনে দাঁড়াল সে। কেরানীকে বলল, 'আমার একটা কামরা দরকার।' ফরমটা তাড়াতাড়ি পূরণ করার সময় হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল। হাতে সময় আছে আর মাত্র পনেরো মিনিট। ফরমে কায়রোর একটা ঠিকানা লিখল, এই মুহূর্তে বানানো। এই সতর্কতার অবশ্য কোন মানে হয় না, কারণ তার আইডেনটিটি কার্ডে আসল ঠিকানাটা লেখা আছে। তবে ক্ষীণ একটু আশা আছে মনে, ক্যাপ্টেন আহসান হয়তো ঠিকানাটা ভাল করে লক্ষ করেনি, করলেও হয়তো ভুলে যাবে।

পালিশ করা কালো চামড়ার মত চেহারা নিয়ে এগিয়ে এল একজন পোর্টার। তার অনুরোধের উত্তরে একটা শব্দ পর্যন্ত করল না করপোরাল মিসা, হাতে সুটকেস নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল নিজের জায়গায়। পথ দেখিয়ে আগে আগে চলল পোর্টার, তাকে অনুসরণ করল ওরা দু'জন। দোতলায় উঠে একটা কামরার দরজা খুলে দিয়ে চলে গেল পোর্টার। ভেতরে ঢুকে বিছানার ওপর সুটকেস দুটো নামিয়ে রাখল মিসা।

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল আলেক, তার ধারণা বকশিশের আশায় দাঁড়িয়ে রয়েছে করপোরাল। 'কিছু মনে করবেন না, করপোরাল,' খানিক ইতস্তত করে বলল আলেক, 'আপনার নিশ্চয়ই ছেলেমেয়ে আছে, তাদেরকে চকলেট কিনে দেবেন...' মানিব্যাগ থেকে একটা দশ পাউন্ড নোট বের করল সে।

এমন ভাব করল করপোরাল, আলেকের কথা যেন শুনতে পায়নি, টাকাটাও দেখতে পায়নি। বলল, 'আপনি, স্যার, ফ্যান ছেড়ে দিয়ে সোফায় বসে বিশ্রাম নিন। সুটকেসের জিনিসপত্র বের করে আমি সব গোছগাছ করে দিয়ে যাই। ক্যাপ্টেন বলেছেন, আপনার যেন কোন অসুবিধে না হয়। উনি খুব কড়া মানুষ, যদি শোনেন...'

'সুটকেস খোলার দরকার নেই,' দৃঢ় স্বরে বলল আলেক। 'আমি খুব ক্লান্ত। দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুতে চাই।'

'ঠিক। শুয়ে পড়ুন আপনি। ঘুমিয়েও পড়তে পারেন। আমার কাজ শেষ হয়ে গেলে যাবার আগে জাগিয়ে দেব, স্যার।' একটা সুটকেস টেনে নিল সে।

'না! থামো! খুলো না!' আর্তনাদ করে উঠল আলেক। দেখল সুটকেসের ডালা খুলে ফেলছে মিসা। জ্যাকেটের ভেতর হাত গলিয়ে দিল আলেক। মাথার ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। শালা নিজের মরণ ডেকে আনল নিজেই! সুটকেসে তালা দেয়া থাকলে এভাবে, এত সহজে ফাঁস হয়ে যেতাম না আমি। এখন প্রশ্ন হলো, কাজটা কি নিঃশব্দে সারতে পারব?

ছোট সুটকেসের ভেতর থরে থরে সাজানো রয়েছে মিশরীয় নোটের বান্ডিল। হাঁ করে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল করপোরাল, বিস্ময়ে বোবা বনে গেছে। 'ইয়াল্লা! ইয়াল্লা! একসাথে এত টাকা বাপের কালেও দেখিনি!'

সামনে বাড়ল আলেক। হাতে বেদুইন ছুরি।

পিছন দিকে ফিরতে শুরু করল করপোরাল, সেই সাথে কথা বলছে, 'এত টাকা! আপনি, স্যার...?'

পরস্পরের সাথে চোখাচোখি হলো ওদের। মিসা দেখল, আলেকের উঁচু করা হাতে চকচক করছে লম্বা ছুরি। আঁতকে উঠে মাথাটা পিছিয়ে নেবার চেষ্টা করল সে। বুঝল, দেরি করে ফেলেছে। ঘ্যাচ করে গলায় ঢুকল ছুরির ফলা। ভয়ার্ত চিৎকারটা আর গলা থেকে বেরুতে পারল না, সদ্য তৈরি ফুটো থেকে কল কল করে বেরিয়ে এল রক্ত আর ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ।

বিছানার ওপর পড়ে গেল মিসা। মারা যেতে খুব বেশি টাইম নিল না সে।

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল আলেক, ভাবল, এইমাত্র কবর খুঁড়লাম নিজের।

তিন

মে মাস, ধুলো উড়িয়ে গরম মরু-বাতাস বইতে শুরু করেছে। শাওয়ারের নিচে ভিজতে ভিজতে মাসুদ রানা ভাবল, সারাদিনে এইমাত্র একটিবারই ঠাণ্ডার ছোঁয়া জোটে কপালে। শাওয়ার বন্ধ করে তোয়ালে দিয়ে দ্রুত গা মুছল ও। রোজকার মত সকাল ন'টায় নয়, ছ'টার আগেই বেরিয়ে যেতে হবে ওকে—মিশ্রী খান আর আতাসীর বিদায় উপলক্ষে অনাড়ম্বর একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সে-

ই উদ্যোক্তা হয়ে সবাইকে ব্রেকফাস্ট খাওয়াবে বলে কথা দিয়েছে।

গা মোছার সময় একটু ব্যথা ব্যথা অনুভব করল শরীরে। অনেকদিন পর কাল আবার ক্রিকেট খেলেছে ও। ফিল্ড হসপিটালের ডাক্তারদের সাথে ম্যাচ খেলার জন্যে জেনারেল স্টাফ ইন্টেলিজেন্স একটা টীম তৈরি করেছে, সিরিজের প্রথম খেলায় এক উইকেটে জিতেছে জেনারেল স্টাফ ইন্টেলিজেন্স। নিজের দলের হয়ে একনাগাড়ে দশ ওভার বোলিং করতে হয়েছে রানাকে, আর ব্যাটিঙের সময় পিচে ছিল চার ঘণ্টা। প্রতিপক্ষের মোট তিনটা উইকেট পেয়েছে ও, রান করেছে চুয়াত্তর। বেশ ভাল খেলেছে, সেজন্যে ওর ওপর রেগে বোম হয়ে আছে লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোসাদ্দেক হাসান। তার ধারণা, ম্যান অভ দা ম্যাচের সম্মানটা রানার নয়, তারই পাওয়া উচিত ছিল—যেহেতু সে-ই দলের ক্যাপ্টেন। দাড়ি কামাতে শুরু করে একা একাই হাসল রানা। আজব এক চিড়িয়া, এই লেফটেন্যান্ট কর্নেল।

দাড়ি কামাবার এই দৈনিক ঝামেলাটা বড় একঘেয়ে লাগে, সেটা দূর করার জন্যে রোজকার মত আজও সিগারেট ধরাল রানা। ভাবল, দাড়ি রেখে দিলে কেমন হয়? কিন্তু রোজকার মত আজও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারল না ও।

ইউনিফর্ম পরল। ভারী জুতো, মোজা, বুশ শার্ট আর খাকি শর্টস। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে। ডাইনিং রুমে বাটলার কুরবান আলিকে দেখা গেল না, তবে টেবিলে দু'জনের আন্দাজ ব্রেকফাস্ট সাজানো রয়েছে।

'কুরবান আলি!'

শান্ত চেহারার একজন প্রৌঢ় কিচেন থেকে বেরিয়ে এল। গায়ের রঙ চকচকে কালো, মাথাজোড়া চকচকে টাক। এক ইংরেজ সাহেবের কাছে অনেকদিন চাকরি করে দক্ষ হয়েছে নিজের পেশায়। অত্যন্ত সৎ লোক, এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে সচরাচর যা দেখা যায় না।

'নাস্তা আমি বাইরে করব,' বলল রানা। 'তুমি শুধু আমাকে এক কাপ কফি দাও।'

'এই দিচ্ছি, স্যার!' দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে কিচেনের দিকে এগোল কুরবান আলি।

পিছন থেকে রানা বলল, 'কফির পানি চড়িয়ে দেখো, ডন ঘুম থেকে উঠেছে কিনা। আজ ওর জন্যে সময় দেয়া সম্ভব নয়। খেতে বসিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে।'

রানার কথা শেষ হতেই কিচেন থেকে বেরিয়ে এল ডন। কুরবান আলির ঠোঁটে মুচকি একটু হাসি ফুটে উঠেই এক নিমেষে মিলিয়ে গেল। দ্রুত কিচেনে ঢুকে পড়ল সে।

এগিয়ে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াল ডন। চেহারাটা গম্ভীর। ভারী গলায় বলল সে, 'গুডমর্নিং, ফ্রেন্ড।'

'মর্নিং।' সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে রানা বলল, 'বসো।'

নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল ডন, গম্ভীর চেহারা আরও একটু থমথমে হয়ে উঠল। 'তোমার সাথে আমার অন্তত একটা সম্পর্ক বোধহয় শেষ হয়ে যাচ্ছে, ফ্রেন্ড,' বলল সে। 'তুমি বলো বটে, গেরিলাদের ট্রেনিং দাও, কিন্তু কথাটা আমি কখনোই বিশ্বাস করিনি। খুব বেশি হলে তুমি সেন্ট্রি বা গার্ড, কিংবা কারও দেহরক্ষী। বন্দুক চালাতে জানো, কিন্তু কুংফু, কারাতে, জিজুতসু জানো না।'

সাবধান হয়ে গেল রানা। এ-প্রসঙ্গে আগেও তর্ক হয়েছে ওদের মধ্যে। হঠাৎ বিপদে পড়ে গেলে আত্মরক্ষার জন্যে মার দেয়ার কিছু কৌশল শিখে রাখা দরকার বলে আবদার জানালেও, রানা শেখায়নি। প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্যে মৃদু সুরে প্রশ্ন করল ও, 'ক্লাসের পড়া তৈরি হয়েছে? কোন অঙ্ক কঠিন লাগলে বলো।'

'আপনাকে তো বলেছি, স্যার, অঙ্ক বইতে এমন কোন অঙ্ক নেই যা আপনি আমাকে শেখাননি,' বলল ডন। পাশের বাড়ির এই কিশোর যেমন খেয়ালি তেমনি অভিমানী। লেখাপড়া বা কিছু শেখা প্রসঙ্গে কথা বলার সময় রানাকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করবে, বাকি সময়ে রানা তার বন্ধু। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, আবার বলল, 'ভেবেছিলাম, আমার জীবনে বন্ধু, গুরু, শিক্ষক বলতে একজনই থাকবে, কিন্তু এখন দেখছি তা সম্ভব নয়। সব মানুষের মধ্যে সব গুণ থাকে না। কুরবান আলির সাথে কথা হয়েছে, ওর কাছে আমি কারাতে শিখতে চেয়েছি।'

কুরবান আলি ওর কাছ থেকেই গোটা কয়েক কৌশল শিখে নিয়েছে, কিন্তু ডন অপ্রস্তুত হতে পারে ভেবে কথাটা চেপে গেল রানা।

নিঃশব্দে ঢুকল কুরবান আলি, টেবিলে কফি দিয়ে নিঃশব্দেই বেরিয়ে গেল। কাপে চুমুক দিয়ে জানতে চাইল রানা, 'কারাতে শেখার জন্যে হঠাৎ এমন মরিয়া হয়ে উঠলে কেন বলো তো?'

'ফারুকের কথা আগেও বলেছি আপনাকে, মনে আছে?' দ্রুত বলল ডন। 'একই ক্লাসে পড়ি আমরা। আমার মামার বয়েসী, আমার নয় হলে ওর বয়স তেরো। টফি দিতে চাইনি বলে খামোকা ধরে পেটাল।' হঠাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল ডন। 'কনুই দিয়ে তিনটে গুঁতো দিয়েছে পিঠে, এখনও ব্যথা করছে। এভাবে যদি মারই খাব, তাহলে তোমার সাথে বন্ধুত্ব করে আমার লাভ কি হলো?'

চুমুক দিতে গিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল রানা। চেহারাটাকে থমথমে করে তুলে ম্লান সুরে বলল, 'তোমার কথায় যুক্তি আছে। তা, হেডস্যারের কাছে নালিশ করোনি?'

'করেছি। খুব পিটিয়েছেন ফারুককে। কিন্তু এই রকম পিটুনি রোজই খায় ও, তবু শিক্ষা হয় না। যাকে মারতে আসবে তার হাতে উত্তমমধ্যম খেলে তবে যদি ওর টনক নড়ে।'

'ব্যাপারটা এত সিরিয়াস, আগে তা বুঝিনি,' বলল রানা। 'ঠিক আছে, সমাধান একটা বের করতেই হয়। রাগ করে তুমি বন্ধুত্ব নষ্ট করতে চাইছ, সত্যি ভয় পেয়ে গেছি আমি। তোমার মত বন্ধু আর কোথায় পাব আমি, বলো! এখন চিন্তা করে দেখো, কোনভাবে এই বন্ধুত্বটা টিকিয়ে রাখা যায় কিনা।'

চোখে সন্দেহ আর সংশয় নিয়ে কয়েক সেকেন্ড রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ডন, তারপর ছোট্ট কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি তো কোন সম্ভাবনা দেখছি না।'

'ধরো, আজ, এখুনি আমি যদি তোমাকে কয়েকটা প্যাঁচ শিখিয়ে দিই?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'দু'একটা সামান্য কৌশল, কিন্তু কেউ তোমার গায়ে হাত দিতে এলে উচিত শিক্ষা পেয়ে পিছিয়ে যাবে, ভবিষ্যতে আর কোনদিন তোমার সাথে লাগতে আসবে না। তাহলে?'

শার্টের আস্তিনে চোখ মুছে পিট পিট করে তাকাল ডন। তারপর হেসে ফেলল। 'তাহলে বোধহয় বন্ধুত্বটা টিকে যায়। কিন্তু…সত্যি তুমি কারাতে, কুংফু, এসব জানো?'

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল রানা, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এদিকে এসো।'

রানার সামনে এসে দাঁড়াল ডন।

'যে ব্যায়ামগুলো করতে বলেছিলাম, ঠিকমত করছ তো?'

'রোজ।'

'আমার মত এইভাবে ডান হাতটা তোলো,' বলল রানা। 'শপথ নিতে হবে।' ডন হাত তুলল। 'আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে কাহারও কোন ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে এই বিদ্যা কখনোই ব্যবহার করিব না। নারী জাতির সম্মান রক্ষার্থে…'

খালি হাতে আত্মরক্ষার কয়েকটা সাধারণ নিয়ম শেখাল রানা। গলা, বুক আর হাতের কয়েকটা নার্ভ-সেন্টার দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'এসব জায়গায় একটু জোরে চাপ পড়লেই ফারুকের মত দুষ্টু ছেলেরা বাবারে মারে করে ডাক ছাড়বে। কিন্তু এসব প্যাঁচ ব্যবহার করার আগে প্র্যাকটিস করে হাত পাকিয়ে নেয়া দরকার। এ-ব্যাপারে তুমি কুরবান আলিকে বলে দেখতে পারো, ও হয়তো তোমাকে প্র্যাকটিস দিতে পারবে।'

'থ্যাংক ইউ, ফ্রেন্ড,' বলে চেয়ার টেনে টেবিলের সামনে বসল ডন। রোজ সকালে রানার সাথেই ব্রেকফাস্ট সারে সে। মা-বাবা নেই, দুলাভাই আর বোনের কাছে মানুষ হচ্ছে। দুলাভাই আখতার হুসেন কোটিপতি ব্যবসায়ী, বোনটি সমাজসেবিকা। এই অ্যাপার্টমেন্ট ভবনটা ওদেরই। ব্যাচেলর বলে রানাকে ফ্ল্যাট ভাড়া দিতে প্রথমে আপত্তি করেছিল ওরা, কিন্তু ব্রিগেডিয়ার নুরুদ্দিন হাফিজ ডনের দুলাভাইয়ের বন্ধু, তাঁর সুপারিশে কাজ হয়। রানা ব্যাচেলর বলেই সম্ভবত, সেই প্রথম দিন থেকেই রোজ দু'বেলা ভাল-মন্দ খাবার পাঠাতে শুরু করে ডনের বোন, সায়মা আখতার। বাড়ির চাকরের পিছু পিছু আসা-যাওয়া শুরু করে ডন, ছেলেটির বুদ্ধিমত্তা আর বিচিত্র খেয়াল লক্ষ করে ওকে ভাল লেগে যায় রানার। দিনে দিনে অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে, রানা বলতে ডন অজ্ঞান। ওকে নিয়ে ব্রেকফাস্ট করার নিয়মটা রানাই চালু করেছে। রানা উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক, এই ফ্ল্যাটে অবাধ যাতায়াত ডনের। রানার লাইব্রেরির দিকেই ঝোঁক বেশি তার সেটা লক্ষ করে

ছোটদের উপযোগী বেশ কিছু বই কিনে লাইব্রেরিতে রাখতে হয়েছে ওর।

'আমাকে আজ একটু তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে,' বলল রানা। 'আবার হয়তো বিকেলে দেখা হবে, কেমন?'

খাওয়া থেকে মুখ তুলে ডন বলল, 'একটা প্রশ্ন ছিল।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'তাড়াতাড়ি।'

'গরু,' বলল ডন, 'নিয়ে রচনা লিখে নিয়ে যেতে হবে...'

'তুমি তো পারোই!'

'হ্যাঁ,' বলল ডন। 'কিন্তু গরু নিয়ে ভাবতে গিয়ে আমার মাথায় অন্য একটা প্রশ্ন জেগেছে।'

'কি?'

'গরু আর মানুষে তফাৎ কি?'

সময় নেই, তাই জবাবে মুখে যা এল তাই বলে গেল রানা, 'গরু খেতে পেলে আর কোন ঝামেলা করে না। কিন্তু মানুষ শুধু খায় না, সে নষ্টও করে, সেই সাথে আবার স্টকও করে।'

গম্ভীর দেখাল ডনকে। মাথাটা একদিকে কাত করে তির্যক চোখে তাকাল রানার দিকে। 'সেজন্যেই কি গরুদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ নেই, আর মানুষ শুধু নিজেদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করছে?'

'এর উত্তর পেতে হলে বড় হয়ে আরও লেখাপড়া করতে হবে তোমার,' বলে দরজার দিকে এগোল রানা। 'গুডবাই, ফ্রেন্ড।'

'বাই।'

শহরের নামকরা আকবর হোটেলে অনুষ্ঠান। চারজনের জন্যে একটা কেবিন আগেই রিজার্ভ করা হয়েছে। আতাসী আর মিশ্রী খানকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাচ্ছে রানা, ওদের তিনজনের প্রিয়পাত্রী হিসাবে দাওয়াত করা হয়েছে নাদিয়াকে। কোকিলের মত মিষ্টি গলা মেয়েটার, একটা রেস্তোরাঁয় নিয়মিত গান গায়, মাঝে মধ্যে নাচেও। যে-ধরনের মুখের আদলকে চিরায়ত সৌন্দর্যের প্রতীক বলা হয়, নাদিয়ার মুখের আদল সেরকম না হলেও, অন্য যে-কোন বিচারে রীতিমত সুন্দরী বলা চলে ওকে। শুধু গান নয়, ওর নিরীহ-নিষ্পাপ চেহারাও ভাল লাগে রানার। গত হপ্তায় নতুন দায়িত্ব কাঁধে নেবার পরপরই একজন সহকারী নেবার কথা মনে হয়েছিল রানার, ভেবেছিল নাদিয়াকে নিলে কেমন হয়। ইমিডিয়েট বস্ লে. কর্নেল মোসাদ্দেক হাসানকে অনুরোধ করেছিল ও, নাদিয়ার ব্যাপারটা যেন চেক করে দেখা হয়। চেক করা শেষ, কাল রিপোর্টও পেয়ে গেছে রানা। তাতে বলা হয়েছে, নাদিয়া কোন ধরনের রাজনীতির সাথে জড়িত নয়, ওর কোন ইহুদি বন্ধু বা বান্ধবী নেই, ইসরায়েল সমর্থক কোন দেশ সফর করেনি ও। ওর চরিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, একটু স্পর্শকাতর। তবে ইমোশনাল হয়ে পড়লেও, বাইরে সেটা প্রকাশ পেতে দেয় না। প্রেম করতে গিয়ে দু'বার ঠক খেয়েছে, তারপর থেকে আর ও-পথ

মাড়ায় না। স্বাধীনচেতা মেয়ে, রাতেবিরেতে একা চলাফেরা করতে অভ্যস্ত। ভয়-ডর একেবারেই নেই।

রিপোর্ট পড়ে মনে মনে খুশি হয়েছে রানা। নাদিয়াকে সহকারী হিসেবে নিতে কোন বাধা নেই। এখন ও শুধু রাজি হলেই হয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে আসবে বলে কথা দেয়নি ও, বলেছে চেষ্টা করে দেখবে। তারা ওর ভক্ত বৈ তো নয়, ভক্তদের আমন্ত্রণে শিল্পীরা কদাচ সাড়া দিয়ে থাকে। রানা জানে, আতাসী আর মিশ্রী খান পরস্পরকে গোপন করে, নাদিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতিযোগিতা শুরু করেছিল, কিন্তু দু'জনের কাউকেই পাত্তা দেয়নি নাদিয়া। চিঁড়ে ভিজবে না বুঝতে পেরে ওরা দু'জনেই যার যার দুঃখের কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছে রানার কাছে। একই কাহিনী দ্বিতীয়বার শোনার সময় হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে উঠেছিল।

কেবিনে ঢুকল রানা। প্রত্যাশায় ব্যাকুল চোখ তুলে তাকাল আতাসী আর মিশ্রী খান। রানাকে দেখে দু'জনেই হতাশার সুরে বলে উঠল, 'ও, তুমি!'

হেসে ফেলল রানা।

রানার হাসি দেখে গম্ভীর হয়ে উঠল পাঞ্জাবী মিশ্রী খান। ব্যস্ত হাতে একটা কিংস্টর্ক সিগারেট ধরিয়ে প্রকাণ্ড গোঁফ জোড়ায় বার দুয়েক তা দিয়ে নিল। 'কলিজায় চোট পেয়েছি, আর তুমি কিনা হাসছ, ওস্তাদ! যাবার আগে নাদিয়ার সাথে দেখা না হলে জাহাজ থেকে সামুন্দারে ঝাঁপ...'

'তুমি সাঁতার জানো, ক্যাপ্টেন,' বলল বেদুইন আতাসী। সিরিয়ার লোক সে, আল-ফাত্তাহর সদস্য। রানার দিকে ফিরল সে। 'বস্, তোমাকেই এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

চেয়ার টেনে বসল রানা। 'মানে?'

পকেট থেকে একটা নোট বুক বের করল লেফটেন্যান্ট আতাসী। 'নাদিয়ার বাড়ির ফোন নাম্বার আছে আমার কাছে। তুমি ডাকো ওকে। তুমি বললে নিশ্চয়ই আসবে ও।'

পর্দা কেঁপে উঠল লক্ষ করে ঘাড় ফেরাল সবাই, দেখল, ভেতরে ঢুকছে নাদিয়া। আতাসী ও মিশ্রী খান, দু'জনেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দু'জনের মাঝখানে একটা চেয়ার খালি রেখেছে ওরা, সেটা দেখিয়ে একযোগে বলে উঠল, 'আসুন-আসুন, বসুন!'

মেরুন রঙা সিল্কের ঢোলা সালোয়ার কামিজ পরেছে নাদিয়া, দু'দিকের ঘাড়ের ওপর থেকে নেমে এসে বুকের ওপর ঝুলছে একই কাপড়ের ওড়না, কিনারায় নীল জরির কাজ। নাকে পাথর বসানো নাকফুল, আর কোন অলঙ্কার পরেনি। বাঁ হাতের কব্জিতে হাতঘড়ি। রানার দিকে ফিরে মৃদু হাসল সে।

'আসতে পেরেছ, সেজন্যে আমরা খুশি,' বলল রানা। বয়সে রানার ছোটই হবে, তাই তুমি বলে সম্বোধন করল ও।

ওদের দেখানো চেয়ারটায় বসল নাদিয়া, হাতের ছোট্ট ব্যাগটা টেবিলের ওপর

নামিয়ে রেখে বলল, 'কাল রাত পর্যন্ত ভেবেছি, আসব না। যাকে বলে মিশুক, আমি ঠিক সে রকম নই।' ঘাড় ফিরিয়ে আতাসী আর মিশ্রী খানের দিকে তাকাল সে। 'আরে, আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন!'

নাদিয়ার কথায় যেন হুঁশ ফিরে পেল ওরা, তাড়াতাড়ি যে যার চেয়ারে বসে পড়ল।

'সকালে মত বদলাল কিভাবে?' জানতে চাইল রানা।

'আপনারা কে, কি এসব কিছুই আমি জানি না। আপনাদের কথা থেকে শুধু জেনেছি, মিশরীয় সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্যে এসেছেন আপনারা,' বলল নাদিয়া। 'একজন মিশরীয় হিসেবে সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। সকালে ঘুম ভাঙতে মনে হলো, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই সুযোগটা হাতছাড়া করা উচিত হবে না।'

মেনু হাতে কেবিনে ঢুকল ওয়েটার। যার যার পছন্দ মত ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল ওরা। বেয়ারা চলে যেতে হ্যান্ডব্যাগ খুলে একটা ফাউন্টেন পেন বের করল নাদিয়া, মিশ্রী খানের দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এটা আমার শুভেচ্ছা, দেশে ফিরে চিঠি লিখতে ভুলবেন না যেন!'

কলমটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল মিশ্রী খান, উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা, বলল, 'বাহ্, ভারি সান্দার!'

নাদিয়ার ব্যাগ থেকে এবার বেরুল কোরান শরীফের খুদে একটা সংস্করণ, লম্বায় দেড় ইঞ্চি, চওড়ায় সোয়া ইঞ্চি, উঁচু হবে দু'ইঞ্চির মত। কোরান শরীফের সাথে ছোট আকারের একটা ম্যাগনিফাইংগ্লাস। আতাসীর দিকে ফিরল সে, বলল, 'এটা আপনার জন্যে। আপনি যোদ্ধা, লড়াইয়ের সময় সাথে রাখবেন, আল্লার রহমতে আপনার কোন বিপদ হবে না।'

অত্যন্ত যত্নের সাথে কোরান শরীফটা হাতে নিয়ে চুমু খেলো আতাসী।

রানার জন্যে ব্যাগ থেকে একটা চেক টাই বের করল নাদিয়া। বলল, 'দেখুন তো, পছন্দ হয় কিনা।'

'চমৎকার!' মৃদু হেসে বলল রানা। 'জানতে ইচ্ছে করে এক একজনের জন্যে এক এক রকম প্রেজেন্টেশন বাছাই করার পিছনে কোন বিশেষ কারণ আছে কিনা...'

'আছে,' বলল নাদিয়া। রহস্যময় একটু হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে।

'কি সেই রহস্য?' সাগ্রহে জানতে চাইল আতাসী।

'বলুন!' মিশ্রী খানের কণ্ঠ থেকে অনুরোধ ঝরে পড়ল।

'কিছু কিছু ব্যাপারে মেয়েরা মুখ খোলে না, এটা আমার জন্যে সেইরকম একটা ব্যাপার,' বলল নাদিয়া। 'শুধু জানবেন, আপনাদের যাকে যা দিয়েছি, অন্তরের সায় না পেয়ে দিইনি।'

ওয়েটার এসে টেবিল সাজাতে শুরু করল। ওদের সবার পক্ষ থেকে নাদিয়াকে গোটা কয়েক গানের ক্যাসেট প্রেজেন্ট করল রানা। নিনা হামিদ-আবদুল আলীমের পল্লীগীতি, নূরজাহান-মেহদী হাসানের গজল আর উম্মে কুলসুমের আরবী গান আছে

ওগুলোয়।

নাস্তার শেষ দিকে হঠাৎ একটা প্রশ্ন করল নাদিয়া, 'স্রেফ কৌতূহল থেকে জানতে চাইছি, আপনারা মিশরে এসেছিলেন তিনজন একসাথে, কিন্তু একজনকে রেখে বাকি দু'জন ফিরে যাচ্ছেন যে?'

নাদিয়ার প্রশ্ন শুনে মৃদু হাসল রানা।

প্ল্যানটা ছিল আল-ফাত্তাহ সিক্রেট অপারেশনের প্রধান জেনারেল সালেহ দীন আরাবীর। আল-ফাত্তাহ ও মিশরীয় সেনাবাহিনীকে গেরিলা ট্রেনিং দেয়ার প্রয়োজনীয়তা বেশ কিছুদিন থেকেই অনুভব করছিলেন তিনি। মিশরীয় সেনাবাহিনীর চীফ অভ স্টাফের সাথে কথা বলে তাঁর অনুমতি আদায় করা গেল। উঁচুদরের ট্রেনার হিসেবে পূর্ববাংলার মাসুদ রানার নাম আগেই ভেবে রেখেছিলেন জেনারেল আরাবী। রানার ক'জন সহকারী দরকার হবে, তাই পাঁচজনের একটা তালিকা তৈরি করেন তিনি, এই পাঁচজনের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের মিশ্রী খান আর সিরিয়ার আতাসীও ছিল। জেনারেল আরাবীর অনুরোধ রক্ষা করলেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। মাসুদ রানাকে হাতের কাজ শেষ করার জন্যে এক হপ্তা সময় দিতে হলো। তারপর ঢাকা থেকে করাচী হয়ে কায়রোর উদ্দেশে ফ্লাই করল সে।

প্ল্যানটা ছিল এই রকম। পঁচিশজনের একটা দলকে গেরিলা ট্রেনিং দেবে রানা। ছ'মাসের মধ্যে দক্ষ গেরিলা হয়ে উঠবে এই পঁচিশজন। তখন এরাই প্রচুর লোককে ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করে নিতে পারবে।

সবকিছু প্ল্যান মতই ঘটল। আতাসী আর মিশ্রী খানের সাথে রানারও দেশে ফিরে যাবার কথা। কিন্তু মেয়াদ শেষ হবার দিন কয়েক আগে আরও একটা অনুরোধ করা হলো মেজর জেনারেল রাহাত খানকে। এবার অনুরোধ জানালেন মিশরীয় সেনাবাহিনীর সিকিউরিটি অফিসার ব্রিগেডিয়ার নুরুদ্দীন হাফিজ। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্যে কয়েক ঘণ্টা ব্যয় করলেন তিনি ঢাকায়। সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য ছিল অনেকটা এই রকম, ঈজিপশিয়ান জেনারেল এবং মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে অনেক ফাঁক-ফোকর আছে বলে তাঁর ধারণা। শুধু তাই নয়, কাজেব ধারা এবং নিয়ম সবখানে প্র্যাকটিক্যালও নয়। ঢাকার অনুমোদন পেয়ে রানাকে অনুরোধ করা হলো, গোটা ব্যাপারটা একটু পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। গুরুত্ব ও মর্যাদার দিক থেকে রানার আনঅফিসিশিয়াল পদ হবে সিকিউরিটি চীফের একধাপ নিচে, কিন্তু সেটা গোপন রাখা হবে। সবাই দেখবে মেজর রানা সাধারণ একজন এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। তাতে রানার সুবিধে হবে ইন্টেলিজেন্সের সব শ্রেণীর লোকজনের সাথে অবাধে মেলামেশার। ওর মাথার ওপর একজন বসও থাকবে, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোসাদ্দেক হাসান। কিন্তু রানার সমস্ত গোপন রিপোর্ট সরাসরি পৌঁছবে ব্রিগেডিয়ার নুরুদ্দীন হাফিজের কাছে।

মাত্র তিনটে দায়িত্ব পালন করতে হবে রানাকে। এক, কাজের সিস্টেমে ভুল থাকলে সেটা সংশোধনের জন্যে সুপারিশ করবে ও। দুই, কোথাও ফুটো আছে কিনা দেখবে। তিন, বিদেশী কোন স্পাই মিশরে কাজ করছে জানতে পারলে

তাকে ধরিয়ে দেবে।

ব্রিগেডিয়ার ব্যবস্থা করলেন, রানা দায়িত্ব নেবার পর থেকে ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কিত ঘটনা যেখানে যা ঘটবে, সব জানানো হবে ওকে। সোমবার থেকে নতুন অফিসে বসতে শুরু করবে ও।

কাঁধে এই নতুন দায়িত্ব চাপল বলেই মিশ্রী খান আর আতাসীর সাথে ফিরে যেতে পারছে না রানা। কিন্তু এত কথা তো আর নাদিয়াকে বলা যায় না, তাই মিশ্রী খান আর আতাসীকে দেখিয়ে বলল ও, 'আমাকে কেন থাকতে হচ্ছে তা ওরাও জানে না। দুঃখিত, নাদিয়া।'

মৃদু হেসে নাদিয়া বলল, 'আমার দুঃখিত হবার কিছুই নেই। আপনি থাকছেন, তার মানে আবার আমাদের দেখা হবে, তাই না? তাতেই আমি খুশি।'

আতাসী আর মিশ্রী খান পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'আমিই দেখা করব তোমার সাথে,' নাদিয়াকে বলল রানা। 'তোমার সাথে আমার কিছু কাজের কথাও হওয়া দরকার।'

'নিশ্চয়ই টপ সিক্রেট?' জানতে চাইল আতাসী।

চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব টেনে রানা বলল, 'হ্যাঁ।'

'নিশ্চয়ই নির্জন, নিরিবিলি কোন জায়গা দরকার হবে কথাটা বলার জন্যে?' আবার জানতে চাইল আতাসী। 'যেখানে নীল নদ বয়ে যায়, গাছের ডালে বসে পাখিরা গান গায়, বন-গোলাপের গন্ধ থাকে বাতাসে, পাহাড়ের মাথায় চাঁদ ওঠে?'

নাদিয়ার দিকে তাকিয়ে একটা চোখ টিপল রানা, মৌন আবেদন জানাল, আতাসীর এসব কথা যেন কৌতুক বলেই গ্রহণ করে সে। তারপর আতাসীর দিকে ফিরে জোর দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

মিশ্রী খানের দিকে তাকাল আতাসী। 'ক্যাপ্টেন, বসের টপ সিক্রেট আলাপ কি, সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। জেনারেল আরাবীকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দাও। অনুরোধ করো, তিনি যেন আমাদের দু'জনকে আরও কয়েকটা দিন মিশরে থাকার অনুমতি দেন।'

'কেন?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল মিশ্রী খান।

'কেন আবার,' রানা আর নাদিয়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল আতাসী, 'ওদের বিয়ের দাওয়াতটা খেয়ে যেতে চাই!'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল মিশ্রী খান, আতাসীও যোগ দিল। প্রথমে রানা আড়ষ্ট বোধ করলেও, দেখাদেখি ওদের সাথে হাসতে যাচ্ছিল, কিন্তু নাদিয়াকে ঝট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দেখে কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারল ও। ভুল বুঝেছে মেয়েটা।

অপমানে চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে নাদিয়ার। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে, নাকের ফুটো দুটো বড় হয়ে উঠেছে। কটমট করে প্রথমে আতাসী, তারপর রানার দিকে তাকাল সে। কাউকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল

কেবিন থেকে।
পর্দাটা তখনও কাঁপছে, সেদিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল ওরা।

চার

শহরের ভেতর ক্যান্টনমেন্ট। আবার ক্যান্টনমেন্টের ভেতরও শহর। বাইরের শহর থেকে বিশাল এলাকাটিকে আলাদা করার জন্যে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে, কিন্তু ভেতরে ঢোকার ব্যাপারে তেমন কোন কড়াকড়ি নেই। ভেতরে হুকুম দখল করা হয়নি এমন সব প্লটে অসামরিক লোকজন এবং প্রতিষ্ঠান বাড়ি ঘর তৈরি করে বসেছে।

আরও একপ্রস্থ কাঁটাতারের বেড়ার ভেতর বেশ কয়েকটা বহুতল ভবন, এখানেই গেরিলা ট্রেনিং আর জেনারেল স্টাফ ইন্টেলিজেন্সের হেডকোয়ার্টার তৈরি করা হয়েছে।

রানাকে নতুন অফিস দেয়া হয়েছে দোতলায়। গত হপ্তা পর্যন্ত পাশের বিল্ডিঙে, গেরিলা ট্রেনিং সেন্টারে ছিলো ও। অফিস কামরায় ঢোকার সময় স্যালুট করল, সেন্ট্রি, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা।

এয়ারপোর্টে গিয়ে প্লেনে ওদেরকে তুলে দিয়ে এসেছে ও। বিদায় নেবার সময় আতাসী আর মিশ্রী খান, দু'জনকেই ম্লান দেখাল। আকবর হোটেলের রেস্তোরাঁ থেকে নাদিয়া বেরিয়ে যাবার পর নিজের দোষ স্বীকার করে আতাসী—সত্যি, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তার। মিশ্রী খান প্রস্তাব দেয়, নাদিয়ার সাথে দেখা করে ক্ষমা চেয়ে নেবে তারা। কিন্তু রানা বলে, হাতে সময় নেই, নাদিয়ার সাথে দেখা করতে গেলে ফ্লাইট মিস করার ঝুঁকি নিতে হবে। তারচেয়ে ওদের সবার পক্ষ থেকে সে-ই নাদিয়ার সাথে দেখা করে দুঃখ প্রকাশ করবে। রানার এই আশ্বাসে সরাসরি এয়ারপোর্টে যেতে রাজি হয় ওরা।

ডেস্কের পিছনে রিভলভিং চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরাল রানা। বন্ধ একটা ফোল্ডার রয়েছে ডেস্কের ওপর, না খুলেই বুঝল, কোন ঘটনার রিপোর্ট। অন্যমনস্ক ভাবে ফোল্ডারটা তুলে নিয়ে খুলল ও।

রিপোর্টটা এসেছে তিনশো মাইল দক্ষিণ, আসিউত থেকে। এটা ইন্টেলিজেন্সে পাঠানো হলো কেন, প্রথমে বুঝল না রানা। একটা পেট্রল রাস্তা থেকে একজন ইউরোপিয়ান লোককে লিফট দেবার জন্যে তুলে নেয়। পরে লোকটা ছুরি মেরে একজন করপোরালকে খুন করে পালায়। লাশটা পাওয়া গেছে গত রাতে, করপোরাল নিখোঁজ এই খবর জানাজানি হবার প্রায় সাথে সাথেই, কিন্তু খুন হবার কয়েক ঘণ্টা পর। রেল-স্টেশনে খবর নিয়ে জানা গেছে, ইউরোপিয়ান লোকটার চেহারার বর্ণনার সাথে মিলে যায় এইরকম একজন লোক কাউন্টার থেকে কায়রোয় আসার টিকেট কেনে। কিন্তু খবরটা যখন পাওয়া গেল তার আগেই ট্রেনটা পৌঁছে

গেছে কায়রোয়, তার মানে কায়রোর কয়েক লক্ষ লোকের সাথে মিশে গেছে খুনী।

এই হত্যাকাণ্ডের মোটিভ সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া যায়নি।

আসিউত পুলিস ফোর্স এরই মধ্যে তদন্ত শুরু করেছে। কায়রো পুলিসকেও ঘটনার সমস্ত বর্ণনা আজ সকালে জানানো হয়েছে। কিন্তু ইন্টেলিজেন্সকে ব্যাপারটা জানাবার কারণ কি?

ভুরু কুঁচকে চিন্তা করতে লাগল রানা। মরুভূমির রাস্তায় একজন ইউরোপিয়ানকে দেখে লিফট দেবার প্রস্তাব দেয়া হলো। লোকটা জানাল, মরুভূমিতে তার গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে। আসিউতে পৌঁছে একটা হোটেলে উঠল সে, তাকে সাহায্য করবার জন্যে সাথে থাকল একজন করপোরাল। কয়েক মিনিট পর হোটেল ছেড়ে ট্রেন ধরতে গেল সে। মরুভূমিতে তার গাড়িটাকে পাওয়া গেল না। সেই রাতে তার হোটেল কামরায় আবিষ্কৃত হলো করপোরালের লাশ।

কেন?

হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলে আসিউতের নাম্বারে ডায়াল করল রানা। আর্মি ক্যাম্পের সুইচবোর্ড অপারেটর ক্যাপ্টেন আহসানকে খবর দিয়ে আনতে বেশ একটু সময় নিল।

প্রথমে নিজের পরিচয় দিল রানা, তারপর বলল, 'গোপন করার মত কিছু একটা ছিল এই ইউরোপিয়ান লোকটার। করপোরাল বোধহয় সেটা জানতে পারে, তাই খুন হতে হয় তাকে। সে হয়তো লোকটার আসল পরিচয় জেনে ফেলেছিল।'

'জ্বী-স্যার,' অপরপ্রান্ত থেকে বলল ক্যাপ্টেন আহসান। 'আমারও ধারণা, এটা একটা পরিচয় ফাঁস হওয়ার ঘটনা।' গলার আওয়াজ শুনে রানার মনে হলো, ক্যাপ্টেনের বয়স খুব বেশি নয়। 'সেজন্যেই রিপোর্টটা আমি ইন্টেলিজেন্সে পাঠিয়েছি, স্যার।'

'ভাল করেছ। এখন বলো, লোকটাকে দেখে তোমার কি মনে হয়েছিল।'

'প্রকাণ্ড শরীর...'

'চেহারার বর্ণনা তো তোমার রিপোর্টেই রয়েছে—প্রায় ছয় ফুট লম্বা, প্রায় তিন মণ ওজন, কালো চুল, কালো চোখ। কিন্তু লোকটা কি রকম এসব থেকে তা আমি জানতে পারছি না।'

'কি জানতে চাইছেন বুঝেছি, স্যার,' বলল আহসান। 'সত্যি কথা বলতে কি, প্রথমে দেখে তাকে আমার একটুও সন্দেহ হয়নি। প্রকাণ্ড শরীর হলে কি হবে, একেবারে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। মরুভূমিতে গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে, তার এই গল্প ওই চেহারা দেখেই বিশ্বাস করি আমি। কিন্তু এসব বাদ দিলে, লোকটাকে আমার সভ্য এবং শহুরে বলেই মনে হয়েছে। নিখুঁত মাপের দামী স্যুট, মার্জিত আচরণ। লোকটার কাগজ-পত্রেও কোন খুঁত পাইনি...'

'কিন্তু...?'

'বলল, আপার ঈজিপ্টে তার নাকি ব্যবসায়িক স্বার্থ আছে।'

'অসম্ভব কিছু নয়।'

'হ্যাঁ, কিন্তু কেন যেন মনে হলো আমার, এই রকম দামী কাপড় পরা মার্জিত স্বভাবের একজন লোক ছোটখাট ফ্যাক্টরী আর কটন ফার্মে টাকা খাটায়, এ ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। মনে হলো, এ লোক যদি টাকা খাটায়ই, খাটাবে লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে অথবা সুইস ব্যাঙ্কে। আসলে, তাকে আমার ছোটখাট কিছু মনে হয়নি···আমি ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারছি না, স্যার, ব্যাপারটা আমার নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়···'

'তবু, তুমি যা বলতে চাইছ, আমি বুঝতে পারছি,' বলল রানা। ভাবল, ক্যাপ্টেন বেশ চালাক-চতুর, তাহলে আসিউতে তাকে ফেলে রাখা হয়েছে কেন?

বলে চলেছে ক্যাপ্টেন, '···তারপর আমি ভাবলাম, হঠাৎ করে মরুভূমিতে উদয় হতে দেখলাম লোকটাকে, কিন্তু আসলে কোত্থেকে এল সে জানা নেই আমার। সেজন্যেই বেচারী মিসাকে সাহায্য করার নাম করে লোকটার সাথে পাঠাই। ভেবেছিলাম, লোকটা একেবারে হাতছাড়া হয়ে যাবার আগে একটু খোঁজ নিয়ে দেখব। আমি জানি, স্যার, আমার উচিত ছিল লোকটাকে গ্রেফতার করা। কিন্তু সন্দেহটা এত ক্ষীণ ছিল যে···'

'তোমাকে কেউ দোষ দিচ্ছে না,' বলল রানা। 'তোমার স্মরণশক্তি ভাল, নাম আর ঠিকানাটা মনে রাখতে পেরেছ। আলেক বোগান, ভিলা লে অলিভিয়ার্স, গার্ডেন সিটি, ঠিক?'

'জী-স্যার।'

'ঠিক আছে, আর কিছু ঘটলে সাথে সাথে জানাবে আমাকে, কেমন?'

'জী-স্যার।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। এক সেকেন্ড চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিল, ব্যাপারটা নিয়ে ওর ইমিডিয়েট সুপিরিয়রের সাথে কথা বলবে ও। আজ আর কোন ফাইল ওঅর্ক নেই, ফোল্ডারটা নিয়ে অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে পড়ল ও।

সেকশন চীফ ও রানার ইমিডিয়েট বস্ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোসাদ্দেক হাসান লোকটা একটু বেশি মোটা, কথাও বলে একটু বেশি। লোকটার সবকিছু হাসির খোরাক যোগায় রানাকে। খেটেপিটে কেউ যদি কোন সাফল্য অর্জন করে, কৃতিত্বটা নিজের বলে চালাবার জন্যে একেবারে মরিয়া হয়ে ওঠে এই লোক। বুদ্ধিশুদ্ধি নেই বললেই চলে, কাজের নামেও অষ্টরম্ভা, নিজের অযোগ্যতা ঢাকার জন্যে অধঃস্তনদের ধমক-ধামক দিয়ে একটা ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টায় থাকে।

রানার বিশেষ পদমর্যাদা সম্পর্কে লেফটেন্যান্ট কর্নেলকে কিছুই জানানো হয়নি, তবে ওপর মহলের নির্দেশ পেয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রানার সাথে সহযোগিতা করতে হচ্ছে তাকে। এই সেকশনের অধীনে কায়রো আর আলেকজান্দ্রিয়ায় কাজ করছে কয়েকশো এজেন্ট, তাদের সবার সাথে রানার যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছে সে। রানার কাছে তাদের প্রত্যেকের পরিচিতি, ফটো ও স্বাক্ষর আছে। এই সূত্রে রাজনীতিকদের চাকর-বাকর কয়েকজনের সাথেও সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছে রানার,

এরা সবাই সিক্রেট এজেন্ট। কায়রোর প্রায় সব হোটেল আর ক্যাফেতে ইন্টেলিজেন্সের লোক আছে, কেউ ম্যানেজার হিসেবে, কেউ ওয়েটার হিসেবে। একটা ফাইলে আছে এরা, প্রতিদিন কিছুটা করে সময় এদের পরিচয় আর চেহারা দেখার পিছনে ব্যয় করতে হয় রানাকে। ওদের এই সেকশন থেকে মাসোহারা পায় কায়রোর সবচেয়ে ধনী চোর, তার সাথেও পরিচয় ঘটেছে রানার। টেবিলে বসে কাজ করার চেয়ে ঘুরে ফিরে ইন্টেলিজেন্স সিস্টেমের ভেতর কোথাও কোন সিকিউরিটি লিক আছে কিনা খুঁজে দেখাই আসল কাজ ওর। ও জানতে চায়, লাইন ছাড়া বেশি কথা বলে কে, কথা শোনার ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহ দেখা যায় কার মধ্যে।

তিনতলায় উঠে লে. কর্নেলের দরজায় নক করল রানা, জবাবের অপেক্ষায় না থেকে পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল। লে. কর্নেল মোসাদ্দেক হাসান ছোটখাট মানুষ, কিন্তু শরীরের তুলনায় পেটটা অস্বাভাবিক বড়। বছর পঞ্চাশেক বয়স, নিখুঁত ভাঁজ করা ইউনিফর্ম পরে, কোথাও একবিন্দু দাগ খুঁজে পাওয়া যাবে না। মাথায় কোঁকড়া চুল, আণ্ডা আণ্ডা চোখ। মাঝে মধ্যে যখন এমন হয় কি বলা উচিত বুঝতে পারছে না, নার্ভাস ভঙ্গিতে গলা পরিষ্কার করার ঢঙে খুক খুক করে কাশে—এই অবস্থায় তাকে মাঝে মধ্যে নয়, প্রায়ই পড়তে দেখে রানা। অর্ধচন্দ্র আকৃতির প্রকাণ্ড একটা ডেস্ক সামনে নিয়ে বসে আছে সে। সামনে একগাদা ফাইল। কাজের চেয়ে কথা বলা বেশি পছন্দ করে, সামনে ফাইলের পাহাড় শুধু সাজিয়ে রাখা হয়েছে। রানাকে ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখাল। ডেস্ক থেকে উজ্জ্বল লাল রঙের একটা ক্রিকেট বল তুলে নিয়ে হেলান দিল রিভলভিং চেয়ারে, বলটা বারবার শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিতে নিতে বলল, 'কাল তুমি কিন্তু মন্দ খেলোনি, মেজর।'

সবচেয়ে বেশি রান করেছে রানা, সবচেয়ে বেশি উইকেট পেয়েছে। তারপরও বলা হচ্ছে, মন্দ খেলেনি! লে. কর্নেল রান করেছে তিন, চার ওভার বোলিং করে রান দিয়েছে পঁয়ত্রিশ, একটাও উইকেট পায়নি। তবু হাসি চেপে রানা বলল, 'আপনিও ভাল খেলেছেন, কর্নেল। আসল কথা, উৎসাহ। সেটা আপনি আমাদের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়কে যুগিয়েছেন।'

কথাটার মধ্যে কিছুটা যে সত্যতা নেই তা নয়। বিশাল পেট দুলিয়ে ভাঁড়ামি যথেষ্টই করেছে লোকটা, মাঠের সব লোকের পিঠে কিল মেরে প্রচুর হাসানো হয়েছে।

'খেলার মধ্যে এক-আধটু হাসাহাসি না হলে চলে নাকি!' উৎসাহের সাথে শুরু করল মোসাদ্দেক হাসান। 'ভাল কথা...'

'এক মিনিট,' বলে হাতের ফোল্ডারটা বাড়িয়ে দিল রানা। 'এটা একটু পড়ে দেখুন।'

ফোল্ডার খুলে রিপোর্টের ওপর দ্রুত চোখ বুলাল লে. কর্নেল। কি বুঝল সে-ই জানে। বলল, 'ভাল কথা, পড়লাম।'

'এই লোকটার পেছনে আমি নিজে লাগতে চাই,' বলল রানা।

প্রথমে খোলা ফোল্ডার, তারপর আবার রানার দিকে তাকাল মোসাদ্দেক হাসান। বলল, 'বুঝলাম না।'

'আমার ধারণা, এটা পরিচয় ফাঁস হবার একটা ঘটনা।'

খুক খুক।

'খুনের কোন মোটিভ পাওয়া যাচ্ছে না, কাজেই নানা দিক থেকে দেখতে হবে ব্যাপারটাকে,' ব্যাখ্যা করে বলল রানা। 'একটা সম্ভাবনা এই হতে পারে, লোকটা নিজের সম্পর্কে যা বলেছে তা সত্যি নয়, করপোরাল সেটা জানতে পারে, তাই করপোরালকে খুন করতে হয় তার।'

'লোকটা যা বলেছে তা সত্যি নয়··· তোমার ধারণা, লোকটা স্পাই?' বিশ্রী ভাবে হেসে উঠল লে. কর্নেল। 'আসিউতে পৌঁছুল কিভাবে? ব্যাখ্যা করো! প্যারাস্যুট নিয়ে নেমেছে? নাকি পায়ে হেঁটে এসেছে? আর স্পাই মানে ইসরায়েলি স্পাই, আমার জানা মতে ইসরায়েল ওদিকে নয়, ঠিক তার উল্টো দিকে। নাকি ভুল বললাম?'

মোসাদ্দেক হাসানকে এ-ধরনের ব্যাপার ব্যাখ্যা করে বোঝাতে যাওয়া বিষম ঝকমারি। রানা বলল, 'ছোট একটা প্লেন এসে নামিয়ে দিয়ে গেলে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। পায়ে হেঁটে মরুভূমি পেরিয়ে আসাটাও একেবারে অসম্ভব কিছু নয়।'

ডেস্কের উপর দিয়ে ছুঁড়ে ফোল্ডারটা রানার সামনে ফেলল লে. কর্নেল। 'আমার দৃষ্টিতে, দুটোই অসম্ভব কাজ। আমাদের এয়ারফোর্সকে এতটা খেলো ভাবতে রাজি নই আমি। একটা প্লেন এসে একজন স্পাইকে নামিয়ে দিয়ে গেল, অথচ কেউ জানতে পারল না, এ হতে পারে না। আর পায়ে হেঁটে মরুভূমি পেরোনো, কোন মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। নিজেকে জিজ্ঞেস করে দেখো না, তুমি পারবে?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে গম্ভীর সুরে আবার বলল সে, 'এটার পিছনে তোমাকে সময় নষ্ট করতে হবে না।'

তর্ক করার প্রবৃত্তি হলো না রানার। বলল, 'ঠিক আছে, কর্নেল। পুলিসকে বলে রাখি, আরও কিছু ঘটলে আমাদেরকে যেন জানায়। স্রেফ ফাইলের জন্যে।'

'হ্যাঁ,' রাজি হলো মোসাদ্দেক হাসান। ফাইলের জন্যে কেউ কপি পাঠাতে চাইলে তাকে কখনও নিষেধ করে না সে। ফাইল মোটা করার দিকে একটা বিশেষ ঝোঁক আছে তার। 'ভাল কথা, সিরিজের দ্বিতীয় খেলায় জিততে হলে আমাদের কিছু প্র্যাকটিস করা দরকার। জেলেদের গ্রাম থেকে একটা নেট যদি ব্যবস্থা করা যায়···'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়, কর্নেল।'

'দেখো তো, কিছু করা যায় কিনা···'

চেয়ার ছেড়ে উঠল রানা। 'দেখব।'

নিজের অফিস কামরায় ফেরার সময় রানা ভাবল, এই রকম একটা গোবর-মাথা লোককে ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের সেকশন চীফ বানাবার পিছনে কি

যুক্তি থাকতে পারে! এই লোককে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবার সুপারিশ করবে ও।

নিজের অফিস কামরায় ফিরে এল ও। ক্রিকেট প্র্যাকটিসের আয়োজন করার কোন ইচ্ছে নেই ওর। আলেক বোগানকে ভুলে যাবারও কোন ইচ্ছে নেই। মোসাদ্দেক হাসান নিপাত যাক। নিজের যেটা ভাল মনে হয়, করবে ও।

প্রথমে ক্যাপ্টেন আহসানের সাথে আবার কথা বলল রানা। নির্দেশ দিল, সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় লোকটার চেহারার বর্ণনা পাঠাও।

এরপর ফোন করল পুলিস হেডকোয়ার্টারে। ওদের কাছ থেকে জানল, আলোক বোগানের খোঁজে কায়রোর সমস্ত হোটেল আর বোর্ডিং হাউসে তল্লাশী চালাচ্ছে পুলিস।

ক্যানাল ডিফেন্স ফোর্স-এর ফিল্ড সিকিউরিটির সাথে যোগাযোগ করে ওদেরকে অনুরোধ করল, আইডেনটিটি পেপার চেক করার ব্যাপারে ওরা যেন এখন থেকে আরও সতর্ক হয়।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টে ফোন করল রানা। চীফ সিকিউরিটি অফিসারকে বলল, জাল টাকা খুঁজে বের করার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

ওয়্যারলেস লিসেনিং সার্ভিসকে সতর্ক করে দিয়ে বলল ও নতুন লোকাল একটা ট্র্যান্সমিটার যে-কোন মুহূর্তে চালু হতে পারে। ভাবল, আলেক বোগান যদি সত্যি স্পাই হয়, আর তার ব্রডকাস্ট মনিটর করে ওয়্যারলেস টেকনিশিয়ানরা যদি ট্র্যান্সমিটারটা খুঁজে বের করতে পারে!

সবশেষে নিজের স্টাফদের মধ্যে থেকে একজন সার্জেন্টকে লোয়ার ঈজিপ্টের সবগুলো রেডিওর দোকানে খোঁজ করতে পাঠাল ও, ট্র্যান্সমিটার মেরামত করতে দরকার হয় এমন কোন পার্টস বা ইকুইপমেন্ট কেউ যদি বিক্রি করে থাকে, রানাকে রিপোর্ট করবে সার্জেন্ট।

এরপর ভিলা লে অলিভিয়ার্সে গেল রানা।

ছোট, নির্জন একটা গলি। রাস্তার একদিকে সুন্দর একটা সাজানো বাগান, অপর দিকে ভিলা লে অলিভিয়ার্স। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়ি, লোহা আর কাঠ দিয়ে তৈরি শক্ত গেট। কাঠের গায়ে কারুকাজ থাকায় পা রাখতে সুবিধে হলো রানার, গেটের মাথায় উঠে লাফ দিয়ে নামল ওপাশে, বাড়ির ভেতর।

মস্ত উঠান। বাড়িটার চুনকাম করা সাদা দেয়াল কোথাও কোথাও শ্যাওলা ধরায় সবুজ হয়ে গেছে। অনেকগুলো জানালা দেখল রানা, সবগুলোয় কাঁচ লাগানো, কাঁচের ভেতর খড়খড়ি দেখা গেল। চারদিকে ভাল করে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে উঠানের মাঝখানে এসে দাঁড়াল রানা। নিচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা গোলাকার একটা কৃত্রিম ঝর্ণা রয়েছে এখানে, পাঁচিলের ওপর দিয়ে নিচে তাকাল ও। নিচের শুকনো মেঝেতে গাঢ় সবুজ রঙের একটা গিরগিটি, একছুটে একদিক থেকে আরেক দিকে চলে গেল। লম্বা ঘাসের ওপর দিয়ে এগোল রানা। দেয়াল

ঘেঁষে আগাছা জন্মেছে। অন্তত বছরখানেক তো হবেই, খালি পড়ে আছে বাড়িটা। জানালার একটা কাঁচ ভেঙে খড়খড়ি তুলে ভেতরে হাত গলিয়ে দিল ও, ছিটকিনি খুলে কবাট উন্মুক্ত করল। জানালার কার্নিসে উঠে লাফ দিয়ে পড়ল একটা ঘরের ভেতর। এটা থেকে অন্য ঘরগুলোয় যেতে কোন অসুবিধে হলো না। মানুষ না থাকলেও, পরিবেশ আছে। সে-পরিবেশ একজন ইউরোপিয়ানের তৈরি বলে মনে হলো না রানার। প্রতিটি কামরা প্রায় অন্ধকার আর ঠাণ্ডা। মেঝে আর আসবাবে ধুলো জমেছে। শিকারকে বিষয়-বস্তু করে আঁকা কোন ছবি নেই দেয়ালে। রঙচঙে, ঝলমলে প্রচ্ছদের পেপার ব্যাক বই নেই একটাও। একটা থ্রী পিস স্যুট, প্যারিস বা লন্ডন থেকে আমদানী করা, তাও নেই। ঘরগুলো নিচু টেবিল আর ঢাউস আকারের আরাম কেদারা দিয়ে সাজানো। মেঝেতে হাতে বোনা শতরঞ্চি। সিলিং থেকে ঝুলছে সুতো দিয়ে বোনা শিকা। সিলিঙের একটু নিচে সরু কার্নিস মত তৈরি করা হয়েছে, সেখানে সার বেঁধে ঠাঁই পেয়েছে তৈজসপত্র।

দোতলায় একটা বন্ধ কামরা দেখল রানা। লাথি মেরে কবাট ভাঙতে তিন থেকে চার মিনিট লাগল ওর। ভেতরে ঢুকে দেখল, পড়ার ঘর।

পরিষ্কার, সাজনো গোছানো ঘর। আসবাবগুলো দামীই শুধু নয়, আরামদায়কও। নিচু, চওড়া ডিভানের ওপর ভেলভেটের আবরণ। আধখানা চাঁদ আকৃতির কফি টেবিল, একই আকৃতির তিনটে অ্যান্টিক ল্যাম্প। ডিভানের ওপর একটা ভাঁজ করা ভারী কম্বল দেখা গেল, ভালুকের চামড়া দিয়ে তৈরি। মেহগনি কাঠের ডেস্ক, সাথে খানকয়েক লেদার চেয়ার।

ডেস্কের ওপর টেলিফোন, পরিষ্কার সাদা ব্লটার, হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি হাতলওয়ালা কলম আর শুকনো একটা দোয়াত রয়েছে। দেরাজ খুলে কিছু কাগজ পেল রানা। নেড়েচেড়ে দেখে বুঝল, কোম্পানী রিপোর্ট—সুইজারল্যান্ড, জার্মানী আর যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে। মাঝারি আকারের একটা বুক শেলফ রয়েছে, তাতে বিভিন্ন ভাষার বই। প্রাচীন ফারসী উপন্যাস থেকে শুরু করে খুদে অক্সফোর্ড অভিধান, অবসিন লিটারেচার, আরবী কবিতার বই, সব আছে। একপাশে রয়েছে জার্মান ভাষায় লেখা একটা বাইবেল।

এসবের মধ্যে ব্যক্তিগত এমন কিছু নেই যা দেখে আলেক বোগার্ন লোকটা সম্পর্কে ভাল-মন্দ একটা ধারণা পাওয়া যায়। না আছে একটা চিঠি, না কোন ফটো।

ডেস্কের পিছনে, নরম লেদার চেয়ারে বসে ঘরের চারদিকে তাকাল রানা। ঘরের পরিবেশে পুরুষালি একটা ছাপ আছে। আধুনিক, শহুরে, বুদ্ধিজীবী একজন লোকের বাড়ি এটা, দেখে অন্তত এই রকম একটা ধারণা হয়। এমন একজন লোক, একদিকে সতর্ক, গোছানো স্বভাবের, নির্ঝঞ্ঝাট প্রকৃতির, অপরদিকে স্পর্শকাতর সৌখিন ও ভোগ-বিলাসী।

অস্বস্তি বোধ করতে লাগল রানা।

নাম শুনে মনে হয় লোকটা ইউরোপিয়ান, অথচ বাড়িটা সাজানো হয়েছে

সম্পূর্ণ আরবীয় ঢঙে। যন্ত্রপাতির বিবরণ জানিয়ে চিঠি লিখেছে ইউরোপের কয়েকটি কারখানা, পাশেই পাওয়া গেল আরবী কবিতা। অ্যান্টিক কফি জাগ আছে, সেই সাথে আছে আধুনিক টেলিফোন। একজন মানুষ সম্পর্কে এসব হয়তো মূল্যবান তথ্য, কিন্তু লোকটাকে খুঁজে পাবার মত একটা সূত্রও নেই কোথাও।

অর্থাৎ, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সব পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। এর মানে কি?

ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট থাকার কথা, থাকার কথা ব্যবসায়ীদের পাঠানো বিল, একটা বার্থ সার্টিফিকেট, সয়-সম্পত্তির দলিল, প্রেমিকা বা স্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া চিঠি, মা-বাবা আর বাচ্চা-কাচ্চাদের ফটো। কিন্তু এসব কিছুই নেই। নেই, কারণ, সাবধানের মার নেই ভেবে আগেই সব সরিয়ে ফেলেছে লোকটা। নিজের পরিচয় জানতে দিতে চায় না।

শুধু বুদ্ধিমান নয়, অত্যন্ত সাবধানী লোক। যেন জানত, কেউ তার খোঁজ পাবার জন্যে এখানে একদিন ঢুঁ মারবে।

স্পষ্ট করে উচ্চারণ করল রানা, 'আলেক বোগান, কে তুমি?'

চেয়ার ছেড়ে পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এল ও। উঠানে পৌঁছে ভাল করে আরেকবার তাকাল চারদিকে। গেট টপকে রাস্তায় পড়ল, দেখল, রাস্তার ওপারের বাগানে, জলপাই গাছের গোড়ায় পা লম্বা করে দিয়ে বসে রয়েছে একজন লোক। লোকটার পরনে সবুজ চেকের মিশরীয় ঢোলা গালাবিয়া, চোখ আর ঠোঁট বাদ দিয়ে মাথা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সব ঢাকা। সরাসরি রানার দিকেই তাকিয়ে আছে। জানালা ভেঙে বাড়ির ভেতর অফিশিয়াল কাজে ঢুকেছিল ও, এটা ব্যাখ্যা করে লোকটাকে বলার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল না রানা। ওর পরনের এই ইউনিফর্ম দেখেই যা বোঝার বুঝে নেবে লোকটা।

মোটরসাইকেলের দিকে এগোবার সময় বাড়ির মালিক সম্পর্কে আর কোত্থেকে তথ্য পাওয়া যায়, ভাবল রানা। মিউনিসিপ্যাল রেকর্ড দেখতে হবে। কাছেপিঠের দোকানদারদের সাথেও কথা বলতে হবে। বাড়িটায় যখন লোকজন ছিল, কেনাকাটা নিশ্চয়ই করত তারা। এই গলিতে আর কোন বাড়ি নেই, তবু সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশীর সাথেও কথা বলে দেখা দরকার। এসব কাজে দু'জন লোককে আজই লাগাবে ও। ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য মোসাদ্দেক হাসানকে মিথ্যে একটা গল্প বানিয়ে বলতে হবে। মোটরসাইকেলে চড়ে স্টার্ট দিল ও।

ধুলোর পাহাড় তুলে বেরিয়ে গেল গলি থেকে।

পাঁচ

প্রথমে রাগ হলো আলেকের। রাস্তার এপারে, বাগানের ভেতর বসে নিজের বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে সে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে রানাকে মোটরসাইকেলে

চড়তে দেখল। মোটরসাইকেল নিয়ে গলি থেকে বেরিয়ে গেল রানা। ব্যাপারটা কি ঘটল উপলব্ধি করে হতাশায় ছেয়ে গেল মন।

কিশোর বয়সে দেখা বাড়িটার ছবি এখনও পরিষ্কার মনে পড়ে তার। হাসি-আনন্দ আর কোলাহলে মুখর হয়ে থাকত পরিবেশ, সারাদিন কত রকমের লোকজনের আনাগোনা ছিল। তখন যেন নিজস্ব একটা প্রাণ ছিল বাড়িটার। ওই বিশাল গেটের বাইরে সব সময় পাহারায় থাকত ছোটখাট একটা কালোপাহাড়, লোকটার নাম এই মুহূর্তে মনে করতে পারল না আলেক। গেটের নিচের ধাপে পা লম্বা করে দিয়ে বসে থাকত সে, রোদ-বৃষ্টি বা ঝড়-তুফান কিছুই তোয়াক্কা করত না। রোজ সকালে পরনে জোব্বা আর মাথায় টুপি নিয়ে বৃদ্ধ এবং প্রায় অন্ধ মৌলবী সাহেব আসতেন কোরান পড়াতে। উঠানে তখন চাঁদোয়া খাটানো থাকত, মৌলবী সাহেব তার নিচে বসতেন। তাঁকে ঘিরে ঠাণ্ডা ছায়ায় ডিভানে আর লেদার চেয়ারে বসত বাড়ির পুরুষরা, চাকর ছোঁড়ারা লম্বা গলার জাগে করে কফি নিয়ে আসত। বয়স্করা ধূমপান করত আর চুমুক দিত কফির পেয়ালায়। আরও একজন কালোপাহাড় পাহারা দিত হারেমের দরজায়। ওই দরজার পিছনে মেয়েরা দিন দিন মোটা হত আর একঘেয়েমিতে ভুগত। দিনগুলো ছিল লম্বা আর গরম, পরিবারটির হাতে ছিল দু'হাতে খরচ করার মত অঢেল টাকা। সে-সব দিনের স্মৃতি আশ্চর্য স্বপ্নের মত লাগে আলেকের।

ইউনিফর্ম পরা ওই সামরিক অফিসার আলেকের সেই স্বপ্ন যেন ভেঙে একেবারে গুঁড়িয়ে দিল। অনেকটা দূরে ছিল আলেক, চেহারাটা ভাল করে দেখতে পায়নি, কিন্তু হাবভাব দেখে মনে হলো—খুব জেদি প্রকৃতির লোক। চেহারাটা দেখতে পায়নি বলে আবার নিজের ওপর রাগ হলো। এই লোককে খুন করতে পারলে শান্তি হত তার। একদিন হয়তো করতেই হবে। কেউ পিছু লেগে থাকলে স্বস্তির সাথে কাজ করতে পারবে না সে।

রওনা হবার পর থেকে সারাটা পথ ভেবেছে, কায়রোয় পৌঁছে এই বাড়িতে আশ্রয় নেবে সে। বার্লিনে থাকতে ভেবেছে, ত্রিপোলিতে পৌঁছে ভেবেছে, এল এজেলায় যাত্রা-বিরতির সময় ভেবেছে। দুস্তর মরু পেরোবার সময় যখনই এই বাড়ির কথা মনে পড়েছে তার, সমস্ত কষ্ট আর ক্লান্তি সব যেন এক নিমেষে দূর হয়ে গেছে শরীর থেকে। করপোরালের গলায় ছুরি বসিয়ে দিয়ে তাড়াহুড়ো করে আসিউত থেকে পালাবার সময়ও নিরাপদ আশ্রয়ের কথা ভাবতে গিয়ে ভিলা লে অলিভিয়ার্স-এর কথা মনে পড়েছে। এই বাড়ির সাথে তার সখ্য আছে, এখানে এলে তার সমস্ত আড়ষ্টতা দূর হয়ে যায়। এই বাড়ি তার কাছে নিরাপদ একটা স্বর্গের মত। বিশ্রাম নেয়ার ঠিকানা, পরিষ্কার হবার জায়গা। আপন একটা ভুবন। আসার পথে কল্পনার চোখে দেখেছে সে, বাথটাবে শুয়ে ধূমায়িত কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। দেখেছে, নরম ডিভানে বসে মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙছে কোন সুন্দরী। চোখাচোখি হতে আদুরে গলায় ডাকছে, 'এসো না!'

কিন্তু এক্ষুণি যা ঘটে গেল, এই বাড়িটার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে হবে

তাকে। এই বাড়ি এখন বাঘের খাঁচার চেয়ে কম বিপজ্জনক নয়। এতে ঢোকা মানে জেলখানায় ঢোকা।

সেই ভোর থেকে পুরোটা সকাল বাড়ির আশপাশে ঘুর ঘুর করেছে আলেক। ক্যাপ্টেন আহসান তার ঠিকানা মনে রেখেছে কিনা কে জানে, এই সন্দেহে বাড়ির ভেতর ঢুকতে সাহস পায়নি সে। ভেবেছিল, ক্যাপ্টেন যদি ঠিকানা মনে রেখে থাকে, তার খোঁজে নিশ্চয়ই কাউকে পাঠাবে। তাকে না পেলে সার্চ করবে বাড়িটা।

ঘটলও ঠিক তাই।

ভাগ্যিস বুদ্ধি করে ঢোলা গালাবিয়াটা কিনে পরে নিয়েছিল সে। জানত, একজন ইউরোপিয়ানকে খুঁজব ওরা, কোন আরবকে নয়।

আসল কাগজগুলো ক্যাপ্টেনকে দেখানো মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। দেখাবার সময়ই মনটা খুঁত খুঁত করেছিল তার। কিন্তু মুশকিল হলো, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সে যারা কাগজ-পত্র নকল করে তাদের নৈপুণ্যের ওপর আলেকের মোটেও আস্থা নেই। বন্ধু ও সহকর্মী স্পাইদের মুখে শুনেছে, ওদের তৈরি কাগজে এমন সব মারাত্মক ভুল-ক্রটি থাকে যে এক্সপার্টদের হাতে পড়া মাত্র ধরা পড়ে যেতে হবে। শুধু এই কারণে বিদেশের অনেক জায়গায় অনেক স্পাই ধরাও পড়েছে। জেলখানায় পচছে তারা। নকল কাগজ তৈরি করার সময় আশ্চর্য সব ভুল করে এরা। কখনও অন্য জাতের বা নীচু মানের কাগজ ব্যবহার করে। কখনও ছাপা নিখুঁত হয় না। বানান ভুল থেকে যায়। স্পাই স্কুলে সাইফার কোর্স শেষ করার সময় আলেক এমন কথাও শুনেছে যে মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সের লোকেরা জানে, অত নম্বর থেকে অত নম্বরের রেশন কার্ড যার কাছে আছে সে-ই-ইসরায়েলি স্পাই।

কায়রোয় নিরাপদ আশ্রয় বলতে একমাত্র এই বাড়িটার কথাই ভেবে রেখেছিল আলেক। এখন তাহলে সে যাবে কোথায়? গাছের আড়াল থেকে সুটকেস দুটো তুলে নিয়ে রাস্তায় নেমে এল সে। চিন্তার ভারে নুয়ে আছে মাথা। নিজের পরিবারের কথা মনে পড়ল। কায়রোয় সৎ তিন ভাই আর এক বোন আছে। তাকে লুকিয়ে রাখাটা তাদের জন্যে অত্যন্ত কঠিন হবে। ভিলার মালিক কে জানতে পারলেই মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স ওদেরকে খুঁজে বের করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তথ্যটা হয়তো আজই জেনে ফেলবে ওরা। সৎ-ভাইয়েরা তার স্বার্থে যদি মিথ্যে কথাও বলে, চাকর-বাকরদের বিশ্বাস করা যায় না। তাছাড়া, বিশ্বাস আসলে ভাইদেরও করা যায় না। মা একরকম জোর করেই বাবাকে বাধ্য করেছিল ভিলাটা আলেকের নামে দিয়ে যেতে। সৎ-ভাইয়েরা তীব্র প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু তাদের কথায় কান দেয়া হয়নি। আলেক আরব নয়, ইউরোপিয়ান, বাবার ঔরসজাত সন্তানও নয় সে। যাকে বলে পালিত পুত্র, আলেক তাই। সম্পত্তির সেরা টুকরোটা তাকে দেয়া হলে অসন্তুষ্ট তো হবারই কথা। এখন তারা যদি আলেককে বিপদের মধ্যে দেখে প্রতিশোধ নিতে চায়, আশ্চর্য হবার কি আছে!

বড় কোন হোটেলে উঠবে নাকি? শেরাটন কিংবা অ্যামব্যাসাডরে? চিন্তাটা

সাথে সাথে বাতিল করে দিল আলেক। হোটেল, বোর্ডিং হাউস কোনটাই এখন ওর জন্যে নিরাপদ নয়। সন্দেহ নেই, এরই মধ্যে ওর চেহারার বর্ণনা পৌঁছে গেছে সবখানে। অসচ্ছল লোকদের জন্যে কম পয়সায় শুধু রাতটুকু কাটাবার ব্যবস্থা আছে কায়রোয়, এ-ধরনের দু'একটা জায়গা চেনেও আলেক। ওসব জায়গাতেও কি খবর নেবে পুলিস? অসম্ভব নয়। এর সাথে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স জড়িত, নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবার উপায় নেই পুলিসের। তালিকাভুক্ত কোন গেস্ট হাউসেও যাওয়া যাবে না, ওসব জায়গায় বিশেষ নজর রাখবে পুলিস।

গার্ডেন সিটি থেকে শহরের মাঝখানে চলে এল আলেক। পাঁচ বছর আগে দেখা কায়রো অনেক বদলে গেছে। গাড়ি, লোকজন আর দোকান পাটের সংখ্যা আশ্চর্য রকম বেড়ে গেছে। ফুটপাথ দিয়ে হাঁটাই মুশকিল, এত ভিড়। নতুন নতুন মডেলের জাপানী আর জার্মান গাড়ি লম্বা মিছিলের আকৃতি নিয়ে ছুটছে, গুণে শেষ করা যায় না। হঠাৎ গা ছম ছম করে উঠল আলেকের। গাড়িতে, ফুটপাথে, রেস্তোরাঁয়—এমন কোন জায়গা নেই যেখানে দু'একটা ইউনিফর্ম দেখা যাচ্ছে না। পাঁচ বছর আগে কায়রোর পথেঘাটে পুলিস বা সামরিক বাহিনীর লোকজনকে এভাবে ইউনিফর্ম পরে চলাফেরা করতে দেখেনি আলেক। দুর্বল একটা মুহূর্তে তার ধারণা হলো, ওরা সবাই বুঝি তাকেই খুঁজতে বেরিয়েছে।

ধেত্তেরি! নিজেকে তিরস্কার করে সাহস সঞ্চয়ের জন্যে হাসল আলেক। ভাবল, এত ভয় পেলে চলে না। দুশ্চিন্তায় কাহিল হয়ে পড়ারও কোন মানে হয় না। এত বড় শহর, আশ্রয় একটা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

মনটাকে শান্ত করে আবার নিজের চারদিকে খেয়াল দিল আলেক। শহরে বিদেশী লোকজনের সংখ্যাও আগের চেয়ে বেড়েছে। রাশিয়ানদের ভিড় তো আছেই, ভারতীয়, পাকিস্তানী, ফিলিস্তিনী, গ্রীক এবং বেশ কিছু ইউরোপিয়ানকেও দেখা গেল।

তারপর নজর পড়ল মেয়েদের দিকে, সাথে সাথে প্রফুল্ল হয়ে উঠল আলেকের মন। লম্বা, ছিপছিপে মিশরীয় তরুণীরা আজকাল তাহলে ট্রাউজার পরতে ধরেছে! সুতি ফ্রকের নিচে ওরা কেউ ব্রেসিয়ার পরেনি, থলের ভেতর বন্দী বেড়ালের মত লাফ ঝাঁপ দিচ্ছে সুডৌল বুক। আলেক লক্ষ করল, বোরখা প্রায় উঠেই গেছে, বয়স্কা মেয়েরাও বড় একটা পরে না। আবার অনেক কিছু আগের মতই আছে, একটুও বদলায়নি। পরিচিত কারও সাথে দেখা হলে সেই আগের ঢংয়েই সামনে বাড়িয়ে দিয়ে পরস্পরের ডান হাত ধরছে পুরুষরা। এই করমর্দন এক থেকে দু'মিনিট ধরে চলে, একজন আরেকজনের কাঁধে বাঁ হাত রেখে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলতে থাকে। আরও একটা জিনিস বদলায়নি। ফকির-মিসকিনরা সদলবলে বেরিয়ে পড়েছে, বিদেশী কাউকে দেখলেই ছেঁকে ধরছে। এদের মধ্যে কুষ্ঠ-রোগী, পঙ্গু, অথর্ব বুড়ো-বুড়ি, দু'এক মাসের বাচ্চা-কোলে যুবতী মা, এবং অন্ধ যুবকও রয়েছে। ভাগ্যিস্ গালাবিয়া পরে আছে সে, ভাবল আলেক, তা না হলে তাকে ঘিরেও মাছির মত ভন ভন করত ওরা।

বদলায়নি ফুটপাথের দোকানগুলোও। সার বেঁধে বসে গলা ছেড়ে খদ্দেরদের ডাকছে কিশোর ছেলেরা, 'বুট পালিশ, বুট পালিশ!' হকাররা তাদের বিচিত্র পশরা সাজিয়ে বসেছে, সেকেন্ডহ্যান্ড রেজার থেকে শুরু করে ছ'মাসের কালির নিশ্চয়তা সহ প্রকাণ্ড আকারের কলম, কি নেই!

কোন কোন রাস্তায় ট্রাম সার্ভিস চালু হয়েছে, প্রতিটি ট্রামে বাদুড়ের মত ঝুলছে আরোহীরা। রাস্তার আরেক পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে দামী মার্সিডিজ আর টয়োটা, উর্দি পরা শোফাররা চালাচ্ছে সেগুলো, পিছনের সীটে হেলান দিয়ে বসে আছে ধনী পাশা আর শেখরা। তার মানে, আলেক ভাবল, সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি।

রাস্তায় ঘোড়ার গাড়িও দেখা গেল। গাধায় টানা গাড়ি নিয়ে এসেছে গ্রামের ব্যবসায়ীরা। সব মিলিয়ে মহা হৈ-চৈ, গোলমাল আর ব্যস্ততা। ট্রামগুলো একবার ঘণ্টা বাজাতে শুরু করলে সহজে থামতে চায় না। ট্রাফিক জ্যামের মধ্যে পড়লে সবগুলো গাড়ি একসাথে হর্ন বাজাতে শুরু করে। বেশিরভাগ দোকানে রেডিও বা ক্যাসেট রেকর্ডার আছে, ফুল ভলিউমে বাজছে সেগুলো। হকারদের চিৎকারে কান পাতা দায়। এসবের সাথে যোগ হয়েছে সহিসের হাঁক, গাধার ডাক, কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর মাথার ওপর প্রকাণ্ড সব ঘুড়ির বাতাস কেটে ওড়ার আওয়াজ।

এটা আমার শহর, ভাবল আলেক, এখানে ওরা আমাকে ধরতে পারবে না।

নিরাপদ একটা আশ্রয় খুঁজে বের না করা পর্যন্ত বিশ্রাম নেব না, প্রতিজ্ঞা করল সে। একটা রেস্তোরাঁর ভেতর খালি চেয়ার দেখে সুটকেস ধরা হাত আর ক্লান্ত পা দুটো ব্যথায় টন টন করে উঠল, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আরও জোরে পা চালাল সে।

হঠাৎ করেই মনে পড়ল সম্ভাবনাটা। বুলাক এলাকায় সস্তা দরের একটা লজিং হাউস আছে। বন্দরের কাছে, বিদেশী নাবিকদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অনেক-দিন থেকেই চালু আছে ওটা। পরিবেশ সুবিধের নয়, চুরি-ছ্যাঁচড়ামি হয়, ছোঁয়াচে অসুখ বেধে যেতে পারে। কিন্তু ওই জায়গার মস্ত সুবিধে হলো, পুলিস গিয়ে ঝামেলা করে না। হোস্টেলটা চালায় কয়েকজন নান, পুলিস না যাবার সেটাই বোধহয় কারণ।

শহর থেকে দূরে সরে এল আলেক। এদিকের রাস্তায় তেমন ভিড় নেই। নীল নদ এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না, তবে আকাশের নীল গায়ে নোঙর করা জাহাজের অনেকগুলো মাস্তুলকে খাড়া হয়ে থাকতে দেখল সে।

হোস্টেলটা ছোট নয়। এক সময় ধনী একজন পাশার প্রাসাদ ছিল এটা। ঢোকার মুখে, উঁচু খিলানের মাথায় ব্রোঞ্জের তৈরি ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি। বাড়ির সামনে কালো আলখাল্লা পরা একজন নান ফুলের ছোট একটা বেডে পানি ঢালছে। তাকে ছাড়িয়ে আরও সামনে চলে গেল আলেকের দৃষ্টি। আরও একটা খিলান, তারপর নির্জন, ঠাণ্ডা হলঘর। ভারী সুটকেস নিয়ে কয়েক মাইল হাঁটাহাঁটি হয়েছে, বিশ্রামের আশায় উন্মুখ হয়ে উঠল সে।

খিলানের ভেতর দিয়ে ঢুকে বাগানে চলে এল সে। হলঘর থেকে দু'জন লোককে বেরিয়ে আসতে দেখল। কোমরে চওড়া বেল্ট, চোখে সানগ্লাস, ছোট করে ছাঁটা চুল। একনজর দেখেই বুঝল, পুলিস! ঘাবড়ে গেল সে, কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি হারাল না। লোক দু'জনের দিকে পিছন ফিরে ফরাসী নানের সাথে কথা বলতে শুরু করল। 'গুড ডে, সিসটার।'

আলেককে দেখে সিধে হলো নান, বয়স এতই কম যে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেল আলেক। নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মেয়েটার চেহারা। ফরাসীতেই বলল সে, 'গুড ডে। আপনি আমাদের এখানে থাকবেন বলে এসেছেন?'

'না, লজিং দরকার নেই আমার,' শান্ত সুরে বলল আলেক। 'শুধু আপনার আশীর্বাদ দরকার।'

পায়ের আওয়াজ শুনে আলেক বুঝল, ওর ঠিক পিছনে চলে এসেছে পুলিস দু'জন। দাঁড়াবে, নাকি চলে যাবে? যদি কোন প্রশ্ন করে, উত্তর দেয়ার জন্যে মনে মনে তৈরি হয়ে গেল সে। যদি পালাবার দরকার হয়, কোন্‌দিকে ছুট দেবে তাও ঠিক করে রাখল। নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে লোক দু'জন, বিষয় রেস খেলা। ধীরে ধীরে দূরে চলে গেল ওরা।

'যীশু আপনাকে রক্ষা করবেন,' বলল নান।

ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল আলেক। ক্লান্ত, ধীর পায়ে খিলানের নিচ দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসে লোক দু'জনকে দেখল না কোথাও! যতটুকু ভেবেছিল সে, পরিস্থিতি তারচেয়েও খারাপ। তার সন্ধানে কোথাও আর খোঁজ করতে বাকি রাখছে না পুলিস। জুতোর ভেতর পায়ের চামড়ায় ফোস্কা পড়ে গেছে, সুটকেস ধরা হাত দুটোর অবস্থা প্রায়-অবশ। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে আবার শহরের দিকে ফিরে চলল সে। রাগে গর গর করতে করতে ভাবল, এই শহরের সবকিছুই বিশৃঙ্খল, সবখানে অনিয়ম। শুধু তাকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে সবাই কড়াকড়িভাবে নিয়ম নেমে চলেছে।

শহরের মাঝখানে ফিরে এসেছে, এই সময় খানিকটা দূরে পরিচিত একজনকে দেখল সে। আলি হুসেন—ছোটবেলার বন্ধু, এক ক্লাসে পড়ত ওরা। মুহূর্তের জন্যে পাথর হয়ে গেল আলেক। আলি হুসেনের সাথে কখনও ঝগড়াঝাঁটি হয়নি তার, ইচ্ছে করলে তাকে লুকিয়ে রাখতে পারে ও। ওকে বোধহয় বিশ্বাসও করা যায়। কিন্তু তারপরই মনে পড়ল, হুসেনের বউ আছে, তিনটে ছেলেমেয়ে আছে—বন্ধুর উপস্থিতি এদের কাছে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে হুসেন? হুসেনের কাছে সে-ই বা নিজের ব্যাপারটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?

হুসেন তার দিকে ফিরতে যাচ্ছে লক্ষ করে তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিল আলেক। দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে গা ঢাকা দিল একটা ট্রামের পিছনে। তারপর ঢুকে পড়ল সরু একটা গলির ভেতর, পিছন ফিরে একবারও তাকাল না। না, বন্ধু-বান্ধব কারও কাছে যাওয়া চলবে না তার।

সরু গলি থেকে আবার একটা বড় রাস্তায় বেরিয়ে এল আলেক। খেয়াল করে চারদিকে তাকিয়ে বুঝল, জার্মান স্কুলের কাছাকাছি চলে এসেছে সে। স্কুলটা কি আজও আছে? তখনকার দিনে অনেক জার্মান পরিবার বাস করত কায়রোয়। স্কুলটা দূর থেকে দেখতে পেল সে, সেই সাথে দেখল গেটের কাছে লোকজনের কাগজ-পত্র চেক করছে একদল ফিল্ড সিকিউরিটি অফিসার। দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল আলেক, যে পথ ধরে এসেছে সেই পথ ধরে ফিরে চলল আবার।

রাস্তা থেকে সরে থাকতে হবে তাকে।

ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত লাগল নিজেকে তার, যেদিকেই এগোতে চায় সেদিকেই বাধা। খালি একটা ট্যাক্সি দেখে হাত তুলল সে। ট্যাক্সি থামতে নিজেই দরজা খুলে উঠে বসল। চোখ বন্ধ করে কয়েক সেকেন্ড হাঁপাল সে, তারপর একটা ঠিকানা বলল ড্রাইভারকে।

ট্রাফিক জ্যামে পড়ে কয়েকবার দাঁড়িয়ে পড়ল ট্যাক্সি, মুখ লুকাবার জন্যে প্রতিবার মাথাটা জানালার নিচে নামিয়ে নিল আলেক। ড্রাইভার তাকে কপটিক কায়রোয় নিয়ে এল, প্রাচীন ক্রিশ্চিয়ান ঘেটো এলাকা এটা। ভাড়া মিটিয়ে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ টপকে ভেতরে ঢুকল। দরজার তালা মস্ত একটা কাঠের চাবি দিয়ে খুলে দিল অথর্ব এক বৃদ্ধা। তার হাতে কিছু খুচরো পয়সা গুঁজে দিল সে।

শহরের চোখ ধাঁধানো আলো, নোংরামি আর শোরগোল থেকে দূরে এই জায়গা নির্জন, পবিত্র আর অন্ধকার একটা শান্তি-দ্বীপের মত। সরু প্যাসেজ ধরে এগোবার সময় প্রাচীন গির্জাগুলো থেকে ভেসে আসা ভরাট গুঞ্জন শুনতে পেল আলেক। স্কুল, ধর্ম-মন্দির আর সেলার পেরিয়ে এল ও, মেরী মাতা নাকি তাঁর শিশু সন্তান যীশুকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। পাঁচটা গির্জার সবচেয়ে ছোটটায় ঢুকল আলেক।

প্রার্থনা শুরু হতে যাচ্ছে। সুটকেস দুটো ঘেরা একটা আসনের পাশে নামিয়ে রাখল আলেক। দেয়ালে টাঙানো সেইন্টদের ছবির দিকে ফিরে মাথা নোয়াল সে। তারপর এগোল বেদীর দিকে।

হাঁটু গেড়ে বসে প্রিস্টের হাতে চুমু খেলো আলেক। ঘেরা আসনের কাছে ফিরে এসে বসে পড়ল। আরবী ভাষায় লেখা বাইবেল থেকে একটা প্যাসেজ বেছে নিয়ে গাইতে শুরু করল গায়কের দল। আসনের ওপর গা এলিয়ে দিল আলেক। আপাতত এর চেয়ে নিরাপদ জায়গা কায়রোয় আর কোথাও পাবে না সে। ভাবল, রাত হোক, আশ্রয়ের জন্যে রোপার কাছে যাবে সে। রোপা ইরিনাই এখন তার শেষ ভরসা।

নদীর কিনারায় বাগান, বাগানের মাঝখানে খোলা মঞ্চ, এটাই নাইটক্লাব ডুম ডাম। বরাবরের মত আজও তিল ধারণের জায়গা নেই। আরও অনেকের সাথে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকল আলেক। শেষ ফাঁকা জায়গা যেটুকু আছে সেখানে টেবিল ফেলছে ওয়েটাররা। চারদিকে চোখ বুলিয়ে লক্ষ করল আলেক, পুরুষ আর মেয়েদের

সংখ্যা সমান সমানই হবে। বান্ধবী ছাড়া খুব কম লোক আসে এখানে। মঞ্চে পায়চারি করছে একজন কমেডিয়ান, তাকে নিয়ে লেখা ব্যঙ্গাত্মক গান গাইছে একদল গায়ক-গায়িকা।

ভাগ্য ভাল, নতুন করে ফেলা শেষ টেবিলটা জুটে গেল আলেকের কপালে। ওয়েটারকে ডেকে এক বোতল শ্যাম্পেনের অর্ডার দিল সে। সন্ধেটা এমনিতেই গরম, মঞ্চের চোখ-ধাঁধানো আলো আরও বিরক্ত করে তুলল তাকে।

কায়রোয় অল্প কয়েকটা ক্লাবের মধ্যে ডুম ডাম একটি যেখানে প্রকাশ্যে মদ পরিবেশন করা হয়। এটা সম্ভব হচ্ছে দুটো কারণে। নাইটক্লাব খোলার অনুমতি চাওয়ার সময় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, এটা খ্রীস্টানদের জন্যে খ্রীস্টানদের দ্বারা পরিচালিত হবে। যদিও এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয় না। দু'নম্বর কারণ হলো, প্রতিমাসে পুলিস অফিসারদের মোটা টাকা ঘুষ দেয়া হয়। মুসলমানদের এখানে ঢুকতে বাধা দেয়া হয় না, তবে মদ চাইলে পাবে না। কিন্তু পরিচয় গোপন করে দু'ঢোক গলায় ঢালার লোকের অভাব হয় না।

এখানে যারা আসে তারা কমডিয়ানের ভাঁড়ামি দেখতে বা গান শুনতে আসে না। এরা সবাই মদ আর রোপা ইরিনার লোভে আসে। এরই মধ্যে মাতাল হয়ে পড়েছে অনেকে, রোপা ইরিনাকে মঞ্চে দেখতে চাই বলে চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে।

শোরগোল যখন তুঙ্গে উঠল, রোপা ইরিনার নাম ঘোষণা করা হলো মাইকে। কিন্তু মিনিট দুয়েক পেরিয়ে যাবার পরও মঞ্চে রোপাকে দেখা গেল না। এদিকে টেবিল চাপড়াতে শুরু করেছে দর্শকরা। তারপর পরিস্থিতি যখন আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে বলে মনে হলো, ডুম ডাম ড্রাম পেটাবার আওয়াজ ভেসে এল মাইকে। এসবই রুটিন, ডুম ডাম নাইটক্লাবের নিজস্ব ধারা। ড্রামের শব্দ শুরু হতেই সব আলো নিভিয়ে অন্ধকার করে দেয়া হলো মঞ্চ।

মুহূর্তে নিস্তব্ধতা নেমে এল। কি ঘটতে যাচ্ছে, জানে সবাই। আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপরই রুদ্ধশ্বাস উপভোগের পালা।

চোখ ধাঁধানো স্পটলাইট পড়ল মঞ্চে। গোল আলোর মাঝখানে অনড় দাঁড়িয়ে আছে ইরিনা, হাত দুটো মাথার দু'পাশে খাড়া করা। রূপালি জরি দিয়ে তৈরি ট্রাউজার পড়েছে সে, শরীরের ওপরের অংশ লাল জরির ব্লাউজ দিয়ে ঢাকা।

ড্রামের সাথে বাজতে শুরু করল পাইপ। শ্যাম্পেনের গ্লাসে ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছে আলেক, হাসছে আপনমনে। ভাবল, রোপা এখনও সেই আগের রোপাই আছে। পাইপের আওয়াজ শুরু হতেই নড়ে উঠল রোপা ইরিনা।

ধীর ভঙ্গিতে নিতম্ব ঝাঁকাল সে, মেঝেতে ঠুকল এক পা, তারপর আরেক পা। হাত দুটো কাঁপতে শুরু করল, ঢেউয়ের মত ওঠা নামা করছে দুই কাঁধ। সেই সাথে ব্লাউজের ভেতর অবিরাম লাফালাফি করছে বুক, ঠিক যেন জ্যান্ত একজোড়া খরগোস।

ব্লাউজের বোতাম বোধহয় আলগা করা ছিল, শুধু কাঁধ আর বাহু ঝাঁকিয়ে

একসময় ব্লাউজটাকে খসিয়ে ফেলল রোপা। বুকে এখন শুধু একজোড়া সরু কালো ফিতে। এরপর পেটে ঢেউ তুলতে শুরু করল সে। এই ঢেউ তোলায় গোটা মধ্যপ্রাচ্যে তার তুলনা বা জুড়ি নেই। ড্রাম আর পাইপের ছন্দ দ্রুত হয়ে উঠল। চোখ বুজল সে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ আলাদা ভাবে, সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা তালে ও ছন্দে কাঁপছে। আলেক উপলব্ধি করল, তার সাথে প্রতিটি দর্শকও অনুভব করল, রোপা ইরিনার সাথে সে শুধু একাই রয়েছে। যেন, রোপা ইরিনা শুধু তার একার জন্যেই নাচছে। মনে হলো, রোপার শরীরের এই আক্ষেপ আর মোচড়, এটা কোন প্রদর্শন নয়, অভিনয় নয়—পুরুষের সঙ্গ পাবার উন্মাদ আকাঙ্ক্ষায় থরথর যৌবনের খিঁচুনি। দর্শকরা টান টান হয়ে আছে, সবাই নিশ্চুপ, ঘামছে, মন্ত্রমুগ্ধ।

রোপার কাঁপুনি বাড়তে থাকল। ড্রামের আওয়াজ বাড়তে থাকল। বাজনার দ্রুত লয় এক সময় অসহ্য হয়ে উঠল, মনে হলো এবার বিস্ফোরণ ঘটবে। রোপার কোমর থেকে খসে পড়ল বেল্ট, সেই সাথে রূপালি ট্রাউজার। সোনালি অন্তর্বাস স্পট লাইটের আলোয় চকচক করছে। এই সময় প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো ড্রামগুলো। তারপর পিন পতন স্তব্ধতা।

এক সেকেন্ড পর ছোট্ট, তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল রোপার গলা থেকে। অতৃপ্ত কান্নার মত শোনাল আওয়াজটা। পিছন দিকে পড়ে যেতে শুরু করল সে। ভাঁজ হয়ে গেল পা দুটো। হাঁটু জোড়া পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে আছে। একসময় পিছন দিকে নামতে নামতে মঞ্চের মেঝে স্পর্শ করল তার মাথা। এই অবস্থায় কয়েক সেকেন্ড স্থির থাকল রোপা। তারপর নিভে গেল আলো। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড করতালিতে ফেটে পড়ল দর্শকবৃন্দ।

আলোকিত হয়ে উঠল মঞ্চ। রোপাকে দেখা গেল না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আলেক। একজন ওয়েটারকে ডেকে তার কানে ফিসফিস করল সে। লোকটার হাতে এক পাউন্ডের একটা নোট গুঁজে দিয়ে তার পিছু পিছু ব্যাকস্টেজের দিকে এগোল। রোপা ইরিনার ড্রেসিং রূমের দরজা দেখিয়ে দিয়ে সেখানে আর দাঁড়াল না ওয়েটার।

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে দরজার নক করল আলেক।

'কে?'

জবাব না দিয়ে দরজার গায়ে মৃদু ঠেলা দিল আলেক। কবাট খুলে ভেতরে ঢুকল।

উঁচু একটা টুলে বসে রয়েছে রোপা ইরিনা। গায়ে সিল্কের একটা চাদর জড়ানো। আয়নার সামনে বসে মেকআপ তুলছে সে। আলেককে আয়নায় দেখতে পেয়ে টুলের ওপর দ্রুত ঘুরে বসল। তারপর ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল।

'হ্যালো!' ভুরু নাচাল আলেক।

তাকিয়ে থাকল রোপা। বিস্ময় কেটে গিয়ে তার চেহারায় শীতল একটা ভাব ফুটে উঠল। তারপর ফিসফিস করে বলল সে, 'ইউ বাস্টার্ড!'

ছয়

মন পাগল করা রূপ মেয়েটার, কানায় কানায় উপচানো যৌবন। ঘন কালো চুল, কোমর ছাড়িয়েও লম্বা। বড় বড়, একটু বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকা ব্রাউন রঙের চোখ, ফুলের পাপড়ির মত চোখের পাতা। চোয়াল দুটো উঁচু হওয়ায় মুখটা গোল আকৃতি পাওয়া থেকে রেহাই পেয়ে গেছে। টিকালো নাক আশ্চর্য একটা আভিজাত্য এনে দিয়েছে চেহারায়। শরীরের প্রতিটা বাঁক আর ভাঁজ সুঠাম, কিন্তু সাধারণ মেয়েদের চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক বেশি লম্বা হওয়ায় তাকে মোটা বলে মনে হয় না।

'গাল দাও আর যাই দাও,' হাসিমুখে বলল আলেক, 'তোমার সাথে আমার সম্পর্ক নষ্ট হবার নয়।'

রাগে দপ্ করে জ্বলে উঠল রোপার চোখ দুটো। 'এখানে কি করতে এসেছ তুমি?'

হাতের সুটকেস দুটো মেঝেতে নামিয়ে রেখে ডিভানে বসল আলেক, তাকিয়ে আছে রোপার দিকে। কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে রোপা, থুতনিটা সামনের দিকে বাড়ানো, সবুজ সিল্কের ওপর পরিষ্কার ফুটে আছে বুকের আকৃতি। 'তুমি যে সত্যি সুন্দরী সেটা আজ আবার নতুন করে বুঝলাম। তোমার কাছে যতদিন ছিলাম, আমাকে পাগল করে রেখেছিলে।'

'বেরিয়ে যাও এখান থেকে!'

সতর্ক চোখে রোপাকে দেখছে আলেক। এই মেয়ে তার অতি পরিচিত, ভাল বা মন্দ লাগার অনেক ঊর্ধ্বে। রোপা তার অতীতের একটা অংশ, পুরানো বন্ধুর মত, শত বিবাদ আর দীর্ঘ বিচ্ছেদ সত্ত্বেও যে কিনা চিরকাল বন্ধুই থেকে যায়। গত পাঁচ বছর তার অবর্তমানে কি কি ঘটেছে রোপার জীবনে? ও কি বিয়ে করেছে? প্রেমে পড়েছে? বাড়ি কিনেছে? আগের ম্যানেজারটাকে বিদায় করে দিয়েছে? মা হয়েছে? কিভাবে ধরনা দেবে তাই নিয়ে ঠাণ্ডা গির্জায় বসে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছে আলেক, কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। রোপা তাকে কিভাবে নেবে, আন্দাজ করতে পারেনি সে। এখনও বুঝতে পারছে না। দেখে মনে হচ্ছে রেগে গেছে, ভাবখানা তোমাকে আমি ঘৃণা করি—কিন্তু আসলেই কি তাই? যা খুশি বলুক রোপা, হেসে উড়িয়ে দেবে সে, ওকে হাসাবার চেষ্টা করবে—তাতে কি কাজ হবে? নাকি চোটপাট দেখাবে, কাল্পনিক অধিকার ফলাবার প্রয়াস পাবে? কিংবা কাকুতিমিনতি করবে, বলবে আমি অসহায়, আমাকে সাহায্য করো, প্লীজ?

'কথা আছে,' মৃদু সুরে বলল আলেক। 'আমার সাহায্য দরকার।'

সেই জায়গায় সেই চেহারা নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকল রোপা।

'আমার পিছনে পুলিস আর ইন্টেলিজেন্স লেগেছে,' বলল আলেক। 'আমার

বাড়ির ওপর নজর রাখছে ওরা, কায়রোর সব হোটেলে আমার চেহারার বর্ণনা পাঠানো হয়েছে। ঘুমোবার মত একটু জায়গা নেই আমার। এখন তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। আমি জানি, তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না।'

'তুমি যাও!'

'তোমাকে ফেলে চলে গিয়েছিলাম আমি, কিন্তু আমি যদি ব্যাখ্যা করি, তুমিও বুঝবে...'

'এত বছর পর ব্যাখ্যা দিতে এসেছ?' হাসল রোপা, কিন্তু অতি দুঃখের হাসি সেটা।

'দেরির কারণও বলব তোমাকে, একটা মিনিট সময় দাও আমাকে। ফর গডস সেক...' কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে গেল আলেক। তারপর গাম্ভীর্যের সাথে জানতে চাইল, 'তুমি কি সত্যি আমাকে ঘৃণা কর?'

জবাব দিল না রোপা।

'চুপ করে আছ কেন?' জানতে চাইল আলেক। 'তুমি আমাকে সত্যি ঘৃণা করলে আমি তোমার কাছে থাকতে চাইব না। যত বিপদই হোক, আমি আবার রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াব।'

'তোমার অধিকার তুমি হারিয়েছ,' বলল রোপা, আলেককে পাশ কাটিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পর্দা সরিয়ে কবাট উন্মুক্ত করল সে। 'সাহায্য চাইতে আমার কাছে এসেছ, লজ্জা করল না?'

রোপাকে দরজা খুলতে দেখে আলেক ভাবল, তাকে বোধহয় কামরা থেকে বের করে দেবে।

ঘরের বাইরে উঁকি দিয়ে কাকে যেন বলল রোপা, 'অ্যাই, দেখো তো একজন ওয়েটারকে পাও কিনা। আমার শ্যাম্পেন দরকার।'

একটু স্বস্তি বোধ করল আলেক।

কবাট ভিড়িয়ে দিয়ে ফিরে এল রোপা। দাঁড়াল আলেকের সামনে।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। স্পষ্ট গলায় জানতে চাইল আলেক, 'তুমি কি আমাকে জেলখানার কয়েদীর মত পাহারা দিচ্ছ? আমাকে বিপজ্জনক মনে করার কোন কারণ নেই।'

'নেই?' আলেকের দিকে ঝুঁকে পড়ল রোপা। 'তুমি বিপজ্জনক নও? দিন তো আর কম কাটাইনি তোমার সাথে, সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, তোমার মত বিপজ্জনক লোক আমি আর দেখিনি।'

চেহারা লাল হয়ে উঠল আলেকের। 'এসব কথা তখন তো বলোনি!'

'কেন বলিনি সে তুমি বুঝবে না!' পিছন ফিরল রোপা, টুলে বসে মেকআপ তোলার কাজে মন দিল। ভাবল, প্রেমে পড়লে মেয়েরা কত কি যে মুখ বুজে সহ্য করতে পারে সে-সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই, আলেক।

ইতস্তত করতে লাগল আলেক। গির্জায় বসে আরও একটা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে সে। কিছু না বলে চলে যাওয়া, এবং তারপর দীর্ঘদিন যোগাযোগ না

রাখা, এটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবে সে? অনেক ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রোপাকে বিশ্বাস করাতে হলে সত্যি কথা বলা ছাড়া উপায় নেই। সত্যি কথা বলা মানে নিজের জীবনের ওপর মস্ত ঝুঁকি নেয়া, জানে, তবু প্রথম সিদ্ধান্তেই অটল থাকল সে। যেভাবেই হোক রোপার বিশ্বাস অর্জন করতে হবে তাকে। রোপা ছাড়া আর কেউ তাকে এখন আশ্রয় দিতে পারবে না।

'তোমার মনে আছে, আমি একবার জার্মানী গিয়েছিলাম?' জানতে চাইল সে।

'না।'

'তোমার জন্যে আমি একটা পাথর বসানো ব্রেসলেট নিয়ে এসেছিলাম, মনে নেই?'

আয়নায় চোখাচোখি হলো ওদের। রোপা বলল, 'কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছি সেটা।'

আলেক বুঝল, রোপা মিথ্যা কথা বলছে। বলল, 'আসলে আমি গিয়েছিলাম ইসরায়েলি এক আর্মি অফিসারের সাথে কথা বলার জন্যে। সে-ই আমাকে ইসরায়েলের হয়ে কাজ করার প্রস্তাব দেয়। আমি রাজি হই।'

ঘাড় ফিরিয়ে আলেকের দিকে তাকাল রোপা। আলেক দেখল, রোপার চোখে ক্ষীণ একটু আলো ফুটে উঠেছে। আশার, না শুধু কৌতূহলের?

'ওরা আমাকে কায়রোয় ফিরে অপেক্ষা করতে বলেছিল, সময় হলে খবর পাঠাবে। তারপর একসময় খবর পাই আমি। আমাকে নির্দেশ দেয়া হলো, জার্মানী যাও। আমি গেলাম। ট্রেনিঙের প্রথম কোর্সটা ওখানেই শেষ করি। তারপর কয়েকবার ইসরায়েলে গেছি, কিন্তু কাজ করেছি জার্মানীতে। শেষবার তেলআবিবে যাই এই কিছুদিন আগে। ওরা আমাকে এখানে আসতে বলে।'

'মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝছি না!' রোপার চেহারায় অবিশ্বাস। 'কি বলতে চাইছ,' জিজ্ঞেস করল সে, 'তুমি একজন স্পাই?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না।'

'এই দেখো,' বলে একটা সুটকেস তুলে হাঁটুর ওপর রাখল আলেক। খুলল। 'এটা একটা রেডিও। তেলআবিবে মেসেজ পাঠাবার জন্যে।' প্রথমটা নামিয়ে রেখে দ্বিতীয় সুটকেসটা তুলে নিয়ে খুলল সে। 'এগুলো আমার খরচের টাকা।'

বাণ্ডিল করা মিশরীয় নোটের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে থাকল রোপা। 'মাই গড!' ফিসফিস করে বলল সে। 'এত টাকা! শুধু তোমার খরচের জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

নক হলো দরজায়। সুটকেসটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে ফেলল আলেক। একটা ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকল একজন ওয়েটার, তাতে শ্যাম্পেনের বোতল আর বরফ। আলেককে দেখে ওয়েটার জানতে চাইল, 'আরও একটা গ্লাস নিয়ে আসব, ম্যাডাম?'

'না,' ঝাঁঝের সাথে বলল রোপা। 'তুমি যাও।'

ওয়েটার চলে গেল। বোতলটা খুলল আলেক, গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে বাড়িয়ে দিল রোপার দিকে, তারপর সরাসরি বোতল থেকে দু'ঢোক খেল নিজে।

'শোনো,' বলল আলেক। 'ইসরায়েল খুব তাড়াতাড়ি একটা ধাক্কা দেবে মিশরকে। এমন একটা ধাক্কা, দশ বছর যেন মাথা তুলতে না পারে এরা।'

'আক্রমণ করবে?'

'হ্যাঁ,' বলল আলেক। 'কিন্তু কবে আর কিভাবে করবে তা এখনও ঠিক হয়নি। আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্য জোগাড় করার জন্যে। এগুলো হাতে না পেলে মাঠে নামতে পারছে না ওরা। মূল্যবান যে-কোন তথ্য দরকার ওদের। আমরা কায়রোয় রয়েছি, জোগাড় করতে না পারার কি আছে? এই কাজে ঝুঁকি নেই তা বলছি না, কিন্তু যুদ্ধে ইসরায়েলই জিতবে, তখন আমাদের কি রকম প্রশংসা হবে ভাবতে পারো?'

'আমাদের?'

'তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো। তুমি ইহুদি, আমিও তাই। ওদের তুমি ঘৃণা করো, আমিও করি। যুদ্ধ শেষে আমরা হয়তো ইসরায়েলে চলে যাব, ওখানে আমাদের সম্মানই হবে আলাদা, আর এখানে যে সব ইহুদি থেকে যাবে তাদের পজিশন এখনকার চেয়ে হাজার গুণ ভাল হয়ে যাবে। কেউ তাদেরকে ইহুদি বলে তাচ্ছিল্য বা ঘৃণা করতে পারবে না।'

'তুমি ছাড়া আর কেউ এই প্রস্তাব দিলে আমি রাজি হতাম,' বলল রোপা। হাতের খালি গ্লাসটা আবার ভরে নিল সে।

হাত বাড়িয়ে রোপার গ্লাসটা নিল আলেক, এক চুমুকে নিঃশেষ করল শ্যাম্পেনটুকু। 'রোপা, জার্মানী বা ইসরায়েল থেকে তোমাকে যদি চিঠি দিতাম, পুলিস তোমাকে জেলে পুরত। সব যখন জেনেছ, এখন আর আমার ওপর রাগ করে থাকা উচিত নয় তোমার।' গলা একেবারে খাদে নামিয়ে আনল সে। 'আগের সেই পুরানো দিনে ফিরে যেতে পারি আমরা, রোপা।'

নিজের অজান্তেই ঝিক্ করে উঠল রোপার চোখ।

'টাকার কোন অভাব নেই আমাদের। আমরা ভাল খাব, ভাল পরব। সবচেয়ে দামী মদ কিনব। বিদেশ থেকে কাপড় আনাব। মার্কিন গাড়ি কিনব। বিরাট বিরাট পার্টি দেব। লম্বা ছুটি নিয়ে ইউরোপ ঘুরতে যাব আমরা, ওখানে তুমি নাচবে। আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি, একটাই সাধ তোমার জীবনে—বড় বড় শহরে নাচা। তারপর, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে, ইসরায়েল আমাদেরকে সবচেয়ে বড় খেতাব দিয়ে সম্মানিত করবে। আমরা হব ইসরায়েলের নাগরিক। আমাকে ওরা কোন একটা ইউরোপীয় দেশে অ্যামব্যাসাডর বানাবে। তখন তোমাকে শুধু খেতে-পরতে পাওয়ার জন্যে নাচতে হবে না। বিশেষ পার্টিতে মিসেস আলেক বোগান হিসেবে নাচবে তুমি...' বক বক করলেও, রোপার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিল আলেক। দেখল তার একটা কথাও ওকে জায়গামত স্পর্শ করছে না। এবার শেষ অস্ত্রটা ব্যবহার করল সে। 'আচ্ছা, ফিরোজা কেমন আছে?'

চোখ নামিয়ে নিল রোপা। 'ভেগেছে…ডাইনি!'

ডিভান ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আলেক। এগিয়ে গিয়ে রোপার কাঁধে হাত রাখল। সিল্ক সরিয়ে নগ্ন কাঁধ দুটো ডলতে শুরু করল সে। ঘাড় ফিরিয়ে ওপর দিকে তাকাল রোপা, আলেকের চোখে চোখ রাখল। রোপার থুতনির নিচে আঙুলের চাপ দিয়ে তাকে দাঁড়াতে বাধ্য করল আলেক। 'কথা দিচ্ছি, তোমার জন্যে আরেকটা ফিরোজার ব্যবস্থা করব আমি,' ফিসফিস করে বলল সে। দেখল, রোপার চোখে হঠাৎ করে কেমন যেন ঘোর, আচ্ছন্ন ভাব এসে গেছে। সবুজ সিল্কের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল আলেক। 'তোমার কি দরকার, একমাত্র আমিই জানি। আমার মত আর কেউ তোমাকে বোঝে না। তুমি যা চাও, তাতে আমার সম্মতিও আছে।' তার শরীরের আরও কাছে সরে এল রোপা। দু'জোড়া ঠোঁট এক হয়ে গেল। দীর্ঘ চুমো খেল আলেক, জিভে রক্তের স্বাদ না পাওয়া পর্যন্ত ছাড়ল না।

চোখ বুজল রোপা। গুঙিয়ে ওঠার মত শব্দ করে বলল, 'আমি তোমাকে ঘৃণা করি, আলেক!'

শেষ বিকেলের ঠাণ্ডা আমেজ গায়ে মেখে নীল নদের পাশ ঘেঁষে টোপাথ ধরে হাউজবোটের দিকে চলেছে আলেক। রোদ লেগে মুখের চামড়ায় যে ঘা হয়েছিল, সেরে গেছে সব। পেট ভাল আছে, প্রস্রাবও এখন সাদা হয়। নতুন একটা সাদা স্যুট পরেছে সে, হাতে ঘর সংসারের জন্যে কেনা জিনিস-পত্রে ঠাসা দুটো ব্যাগ।

দ্বীপ শহর জামালেক শান্ত ও নির্জন। কায়রো শহরের কল-কোলাহল চওড়া পানির বিস্তৃতি পেরিয়ে এদিকে বড় একটা আসতে পারে না। নদীতে সারি সারি নোঙর ফেলে আছে হাউজবোটগুলো। নদীর পানি ঘোলা আর শান্ত, শুধু বোটের গায়ে লেগে ছলকে উঠছে পানি। ছোট বড় সব আকারের বোট রয়েছে, প্রতিটি উজ্জ্বল রঙে ইচ্ছেমত রাঙানো, দিন শেষের রোদ-ঝলমলে একটা নয়নাভিরাম দৃশ্য।

রোপার বোটটা সবচেয়ে ছোট হলেও, আর কোন বোট এত সুন্দর ভাবে সাজানো নয়। নদীর পাকা কিনারা আর টপ ডেকের মাঝখানে একটা মোটা তক্তা ফেলা আছে, বোটে ওঠা নামার জন্যে। টপ ডেকটা ব্রিজের দিকে খোলা, কিন্তু রোদ ঠেকাবার জন্যে সবুজ আর সাদা সরল রেখা আঁকা তেরপল দিয়ে ঢাকা। বোটে উঠে মই বেয়ে নিচে নেমে এল আলেক। নিচের প্রায় সবটুকুই আসবাবপত্রে ঠাসা। চেয়ার, টেবিল, ডিভান, আলমিরা। প্রাউ-এ খুদে একটা কিচেন রয়েছে, মাঝখানে মেরুন রঙের ভেলভেটের পর্দা, ওদিকে বেডরুম। বেডরুমের আরও সামনে, স্টার্নে, একটা বাথরুম।

চওড়া একটা কুশনে বসে পায়ের নখে রঙ লাগাচ্ছিল রোপা। আলেক ভাবল, ওকে কত নোংরা আর যাচ্ছেতাই লাগতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ঢোলা, রঙ-ওঠা একটা সুতি ঘাগরা পরেছে ও, মুখটাও বোধহয় ভাল করে ধোয়নি, আর চুল তো নয়-যেন কাকের বাসা। কিন্তু মাত্র আধঘণ্টা পর, ডুম ডাম ক্লাবের উদ্দেশে যখন রওনা হবে, ওকেই বিশ্ব-সুন্দরীদের একজন বলে মনে হবে তখন।

টেবিলে ব্যাগ রেখে জিনিস পত্র সব বের করতে শুরু করল আলেক। 'ফ্রেঞ্চশ্যাম্পেন ইংলিশ মারমালেড...জার্মান সসেজ...তিতির পাখির ডিম...স্কচ স্যামন...'

মুখ তুলে তাকাল রোপা, চোখে রাজ্যের বিস্ময়। 'এসব তুমি পেলে কোত্থেকে! মিশরে জরুরী অবস্থা চলছে, শুধু বিদেশীদের জন্যে এগুলো আমদানী হয়।'

মুচকি হাসল আলেক। 'কুলালিতে একটা দোকান আছে, একজন গ্রীক চালায়। ভাল খদ্দের হিসেবে আজও আমাকে মনে রেখেছে সে।'

'বিশ্বস্ত?'

'কোথায় থাকছি জানে না। ওর কাছে না গিয়ে উপায় ছিল না, কায়রোয় একমাত্র ওর কাছেই ক্যাভিয়ার পাবে তুমি।'

কুশন থেকে নেমে একছুটে টেবিলের সামনে চলে এল রোপা, উঁকি দিয়ে তাকাল ব্যাগের ভেতর। 'ক্যাভিয়ার!' ব্যাগ থেকে জার বের করে ঢাকনি খুলল সে, আঙুল দিয়েই খেতে শুরু করে দিল। 'ইস্, সেই কবে ক্যাভিয়ার খেয়েছি...'

'আমি থাকতে,' বলল আলেক। বরফের বাক্সে শ্যাম্পেনের একটা বোতল রাখল সে। 'একটু যদি অপেক্ষা করো, ওটার সাথে ঠাণ্ডা শ্যাম্পেনও পেতে পারো।'

'অতক্ষণ জিভের পানি ধরে রাখতে পারব না!'

'তা তুমি কোনদিনই পারো না,' আদর করে রোপার চুল টেনে দিল আলেক। 'এমন পেটুক মেয়ে জীবনে দেখিনি!'

'খবরদার, খাবার সময় টুকবে না বলে দিচ্ছি!' কিল তুলল রোপা।

তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে সেদিনের ইংরেজী দৈনিকটা খুলে ডিভানে বসল আলেক। কাগজটা খানিকক্ষণ ধরে উল্টেপাল্টে দেখে মুখ তুলল সে, বলল, 'কই, আমার ব্যাপারে আজও কিছু লেখেনি।' আসিউতের ঘটনাও রোপাকে বলেছে সে।

'খবর ছাপার ব্যাপারে এখানকার পত্রিকাগুলো এই রকম ঢিলেঢালাই,' মুখ ভর্তি ক্যাভিয়ার নিয়ে বলল রোপা।

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল আলেক। 'আসল কারণ তা নয়। পুলিস যদি খুনের খবর ছাপতে দেয়, মোটিভ কি তা-ও উল্লেখ করতে হবে—আর মোটিভ কি না জানালে পাঠকরা আসল ব্যাপার আন্দাজ করে নিতে পারবে। আসলে ওরা কাউকে জানতে দিতে চায় না যে মিশরে ইসরায়েলের স্পাই আছে। তাতে মানুষ আতঙ্কিত হয়, নানা গুজব রটে, নিজেদের ব্যর্থতাও প্রকাশ হয়ে পড়ে।'

আঙুল চাটতে চাটতে ভেলভেটের পর্দা সরিয়ে বেডরূমে চলে গেল রোপা, বেরুবার জন্যে তৈরি হবে। পর্দার ওদিক থেকে জানতে চাইল, 'এর মানে কি তোমাকে আর খুঁজছে না ওরা?'

'আরে না! খলিফা বলল...'

'খলিফা? এসবের সাথে খলিফার কি সম্পর্ক?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল

রোপা।

'সম্পর্ক আবার কি! শহরের খবর তো সব ওর কাছেই পাওয়া যায়। ও বলল, আসিউতের খুনটা নিয়ে পুলিস বিভাগের খুব একটা মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু ইন্টেলিজেন্সের একজন মেজর, মাসুদ রানা সে নাকি আদাজল খেয়ে লেগে-আছে। এই মেজর নাকি বিদেশী লোক, সরকারের অনুরোধে ইসরায়েলি স্পাই ধরার জন্যে কায়রোয় রয়েছে।' হাতের খবরের কাগজ নামিয়ে রাখল আলেক, ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। ভাবল, তবে কি এই মেজরই তার বাড়ি সার্চ করতে গিয়েছিল? আরও ভাল করে লোকটাকে দেখতে পাওয়া উচিত ছিল তার।

'ইন্টেলিজেন্সের এত সব খবর কোত্থেকে পায় খলিফা?' প্রশ্ন করল রোপা।

'কি জানি,' বলল আলেক। 'চোরের সর্দার, সব কথাই তার কানে আসে।' উঠে গিয়ে বরফের বাক্স থেকে শ্যাম্পেনের বোতলটা তুলল সে। এখনও তেমন ঠাণ্ডা হয়নি, কিন্তু গলা শুকিয়ে গেছে তার। দুটো গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালল।

কাপড়চোপড় পরে বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল রোপা। আলেক যা ভেবেছিল, তাই—সম্পূর্ণ বদলে গেছে রোপা। মুখের মেকআপ হালকা কিন্তু নিখুঁত। মাত্র এক প্রস্থ চেরি-রেড রঙের কাপড় দিয়ে তৈরি ড্রেস পরেছে ও, একই রঙের জুতো গলিয়েছে পায়ে, লম্বা দুটো বিনুনি কাঁধের ওপর দিয়ে বুকের ওপর ঝুলছে। চোখ ফেরাতে পারল না আলেক। বলল, 'তুমি আমারই আছ, এটা ভাবতে কি যে ভাল লাগছে…'

'থাক, তেলাতে হবে না,' কৃত্রিম মুখ ঝামটা দিয়ে বলল রোপা। 'শুধু প্রতিশ্রুতির কথা মনে রেখো।'

'প্রতিশ্রুতি?'

'তুমি বলেছ,' চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল রোপা, 'আরেকটা ফিরোজা এনে দেবে আমাকে।'

'ও, এই কথা!' হো হো করে হাসল আলেক। কিন্তু রোপার মুখে হাসি ফুটছে না লক্ষ করে থামল সে, তাড়াতাড়ি বলল, 'নিশ্চয়ই, রোপা! কথা যখন দিয়েছি, পাবে।'

গ্যাং-প্ল্যাঙ্কে পায়ের আওয়াজ। পরমুহূর্তে হ্যাচের গায়ে নক হলো। রোপাকে নিয়ে যাবার জন্যে ট্যাক্সি এসেছে। গ্লাসটা খালি করে আলেকের দিকে একবার তাকাল সে, তারপর বেরিয়ে গেল। দু'জনের কেউই গুডবাই বা আর কিছু বলল না।

কাবার্ডের সামনে এসে দাঁড়াল আলেক, রেডিওটা এই কাবার্ডের ভেতরই রেখেছে। একটা ইংরেজী উপন্যাস আর এক টুকরো কাগজ বের করল সে, কোডের কী এই টুকরোটাতেই লেখা আছে। লেখাটার ওপর সতর্ক চোখ বুলাল সে। মে মাসের আটাশ তারিখ আজ। আটাশের সাথে ছেষট্টি, ইংরেজী সনটা যোগ করতে হবে তাকে। যোগফল দাঁড়াল চুরানব্বই। উপন্যাসের চুরানব্বই পৃষ্ঠা কোড রচনার জন্যে ব্যবহার করতে হবে তাকে। বছরের পঞ্চম মাস মে, তাই

পৃষ্ঠার প্রতিটি পঞ্চম অক্ষর বাদ দিয়ে যেতে হবে ওকে।

ঠিক করল, তিনটে বাক্যে মেসেজটা পাঠাবে সে। 'হ্যাভ অ্যারাইভড। চেকিং ইন। অ্যাকনলেজ।' চুরানব্বই পৃষ্ঠার উপরের প্রথম লাইন ধরে কাজ শুরু করল সে। হ্যাভ লিখতে প্রথম অক্ষর দরকার এইচ। দেখল, দশ নম্বর অক্ষরটা এইচ, প্রতি পঞ্চম অক্ষর বাদ দিয়ে। এই এইচ-কে প্রতিনিধিত্ব করবে, তার কোড অনুসারে, বর্ণ মালার দশ নম্বর চরিত্রটি, জে। এরপর আলেকের দরকার একটা এ। উপন্যাসে এইচের তিনটে অক্ষর পর এ রয়েছে। এ-র প্রতিনিধিত্ব করবে বর্ণ মালার তৃতীয় অক্ষর, সি। দুষ্প্রাপ্য অক্ষরগুলোর বেলায় অন্য নিয়ম অনুসরণ করা হবে, যেমন এক্স-এর বেলায়।

এটা এমন একটা কোড, যাকে ভাঙা প্রায় অসম্ভব। একজন শ্রোতা যদি মেসেজটা ডিকোড করতে চায়, বই এবং কী, দুটোই দরকার হবে তার।

মেসেজটা কোড করার পর হাতঘড়ি দেখল আলেক। রেডিওটা লেটেস্ট মডেলের নয়, গরম হয়ে উঠতে খানিক সময় দিতে হয়। অবশ্য, হাতে অনেক সময় রয়েছে। গ্লাসে আরও একটু শ্যাম্পেন ঢেলে ভাবল, ক্যাভিয়ারটুকু শেষ করা যেতে পারে। একটা চামচ খুঁজে নিয়ে জারটা তুলে নিল সে।

খালি জার টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল আলেক। চেটেপুটে সবটুকু খেয়ে গেছে রোপা।

সাত

কোথায় রাগ, নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত চেহারা নাদিয়ার, বলল, 'আসুন, মেজর রানা।'

ভেতরে ঢুকে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়েই বুঝতে পেরেছে রানা, বুস্তান রেস্তোরাঁর পরিবেশ অন্যান্য রেস্তোরাঁর মতই—অনেক টেবিল, অনেক লোকজন, মেলা হৈ চৈ। টাকার কুমির বুড়ো, রঙবাজ ছোকরা, সবাই আড্ডা জমায়। নাদিয়ার পিছু পিছু খালি একটা টেবিলের দিকে এগুলো ও, জানতে চাইল, 'আজ তোমার প্রোগ্রাম নেই?'

'ছিল, আপনার টেলিফোন পেয়ে একজনকে প্রক্সি দিতে বলেছি,' ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল নাদিয়া। 'আমার সাথে আপনার নাকি কিছু কথা আছে। আমারও আপনার সাথে আছে কিছু কথা।'

'সেজন্যেই খোলা জায়গায় বসা চলে না, কেবিন দরকার।'

থমকে দাঁড়াল নাদিয়া, এদিক ওদিক তাকিয়ে একজন ওয়েটারকে দেখতে পেয়ে হাত-ইশারায় ডাকল। তারপর রানাকে নিয়ে ওয়েটারের দেখানো একটা খালি কেবিনে ঢুকল।

'ঠাণ্ডা না গরম?'

'ঠাণ্ডা,' বলল রানা।

'পেস্তা শরবত,' অর্ডার দিল নাদিয়া। ওয়েটার চলে যেতে জিজ্ঞেস করল, 'কি কথা? প্রাইভেট?'

'শুধু প্রাইভেট নয়, সিক্রেট,' বলল রানা। 'কিন্তু তার আগে সেদিনের ব্যাপারটা...সত্যি, বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল আতাসী। সেটা ও নিজেও বুঝেছে। দুঃখ প্রকাশের জন্যে ফ্লাইট বাতিল করতে চেয়েছিল ওরা, আমি বললাম...'

মাথা নিচু করে টেবিলের ওপর নখ ঘষতে শুরু করল নাদিয়া, তারপর মুখ তুলে বলল, 'বাড়াবাড়ি কেউ যদি করে থাকে তো সে আমি। হঠাৎ অমন খেপে ওঠা মোটেও উচিত হয়নি আমার। ভদ্রলোক কৌতুক করছিলেন, ব্যাপারটাকে আমার সহজভাবে নেয়া উচিত ছিল। আমি দুঃখিত, মেজর।'

'ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেল না? দুঃখ প্রকাশ করার কথা আমার...'

'না, আমার।'

'উঁহুঁ।'

হেসে উঠল নাদিয়া। 'দু'জনেই যখন এত দুঃখ বোধ করছি, তাহলে গলা জড়াজড়ি করে হাপুস নয়নে কাঁদি, আসুন!'

গলা জড়াজড়ির ধারণাটা বোধহয় ভাল চোখে দেখল না রানা, কেমন যেন আড়ষ্ট মনে হলো ওকে।

ওয়েটার পেস্তা শরবত দিয়ে গেল। নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে রানা বলল, 'আগে শোনা যাক, তোমার কি বলার আছে।'

'আমার বলার কথা শেষ হয়েছে, আপনি শুরু করতে পারেন।'

একটা সিগারেট ধরাল রানা। কথাটা কিভাবে পাড়বে, ঠিক করতে পারছে না।

রানাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে নাদিয়া। মেজরকে মাত্র দু'চারবার দেখেছে সে। আলাপ পরিচয় হয়েছে, কিন্তু তার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার কোন চেষ্টা করেনি। এদিক থেকে মেজরকে ব্যতিক্রমই বলতে হয়। নিজের রূপ সম্পর্কে সচেতন নাদিয়া, অভিজ্ঞতা থেকে জানে পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে বেয়াড়া রকম ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে সবাই। প্রথম দিন কথা বলেই বুঝেছিল সে, মার্জিত রুচির বিশিষ্ট ভদ্রলোক, নোংরা কিছুর মধ্যে নেই। চেহারাটাও দারুণ। যাকে বলে লেডিকিলার তা হয়তো নয়, কিন্তু সুদর্শন চেহারার সাথে প্রচুর পরিমাণে মিশে আছে দৃঢ়চেতা একটা ভাব, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট ছাপ। সবচেয়ে আশ্চর্য চোখ দুটো। একজোড়া গভীর অতল সাগর যেন। আর কারও দৃষ্টিতে এমন সম্মোহন দেখেনি নাদিয়া। কি কাজে মিশর সরকারকে সাহায্য করতে এসেছে মেজর, জানে না সে। তার সাথে কি নিয়ে কথা বলতে চায়, সে-সম্পর্কেও কোন ধারণা নেই।

চোখ তুলে রানা বলল, 'তোমার সম্পর্কে সব কথা আগে শুনতে চাই।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল নাদিয়া। 'আপনার সম্পর্কে সব কথা বলুন আমাকে।'

একদিকের একটা ভুরু একটু ওপরে তুলে সতর্ক চোখে নাদিয়াকে লক্ষ করল

রানা। একটু অবাক হয়েছে, একটু কৌতুকও বোধ করছে। শ্রাগ করে ক্ষীণ একটু হাসল ও। 'ঠিক আছে।' বলে এক সেকেন্ড বিরতি নিল, তারপর শুরু করল, 'কায়রোয় সরকারী বেসরকারী অনেক অফিসার আছে যারা গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য জানে। মিশরের দুর্বলতা কোথায়, শক্তি কোথায়, ভবিষ্যৎ প্ল্যান কি, এইসব টপ সিক্রেট তথ্য। এগুলো মিশরের শত্রুরা হাত করতে চায়। এই কাজে ইসরায়েল তাদের কয়েকজন স্পাই পাঠিয়েছে কায়রোয়। ওদেরকে খুঁজে বের করাই এখানে আমার প্রধান কাজ।'

স্পাই ধরার দায়িত্ব নিয়ে এসেছে, ভাবল নাদিয়া, তার মানে নিজেও নিশ্চয়ই একজন স্পাই! বলল, 'যে খুঁজতে জানে তার জন্যে এটা একটা সাধারণ কাজ।'

এক সেকেন্ড বিবেচনা করল রানা, বলল, 'সাধারণ, কিন্তু সহজ নয়।'

নাদিয়া লক্ষ করল, তার প্রতিটি কথাই গুরুত্বের সাথে নিচ্ছে মেজর। সম্মানিত বোধ করল সে, ভদ্রলোকের প্রতি শ্রদ্ধা একটু বাড়ল।

রানা অপেক্ষা করছে, বলল, 'এবার তোমার পালা।'

হঠাৎ করেই নিজের সম্পর্কে সব সত্যি কথা গড় গড় করে বলে ফেলতে ইচ্ছে করল নাদিয়ার। 'আমার গলা প্রথম শ্রেণীর নয়, তাই এই রেস্তোরাঁয় পচছি। গান গেয়ে যা পাই তাতে আমার চলে না, তাই দু'একটা নাচের প্রোগ্রামও করতে হয়। বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা মেয়ে আমি। বিয়ে করিনি, তবু পেটে বাচ্চা ধরেছি।' এক সেকেন্ড পর তিক্ত একটু হাসল সে, তারপর আবার বলল, 'আবার যদি কখনও কারও সাথে প্রেম করি, পিল খাব। এতদিনে এটুকু বুদ্ধি আমার হয়েছে।'

কিছু বলল না রানা, কিন্তু দেখে মনে হলো আহত হয়েছে ও। 'কি, ঘাবড়ে গেলেন?'

'না, মানে…'

মুখ ফিরিয়ে নিল নাদিয়া। রানার মনে কি হচ্ছে, জানে সে। একটু আগে পর্যন্ত তাকে নিশ্চয়ই ভদ্রমহিলা ভাবছিল ও, নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে এখন। কেন যেন আরও বেপরোয়া হতে ইচ্ছে করল তার, বলল, 'এখন আমি কাউকে বিশ্বাস করি না। মনের কথা কাউকে জানাই না। কিন্তু টাকা আছে এমন সব লোকদের সাথে ডিনার খেতে যাই, প্রেজেন্টেশন আদায় করি—ভালই কেটে যাচ্ছে দিন।'

'হুঁ।'

'হুঁ মানে?' একটু ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইল নাদিয়া।

'ভাবছি তোমাকে আমার কোন কাজে লাগানো যায় কি না।'

রানার দিকে ঝুঁকল নাদিয়া, ঠোঁটের কাছে গ্লাস তুলল কিন্তু চুমুক দিল না, জানতে চাইল, 'কি রকম?'

'আমার সমস্যা ইনফরমেশন,' বলল রানা। 'বিদেশী বলে আমার সামনে মুখ খুলতে চায় না কেউ। তুমি এ-দেশের মেয়ে, সবখানে যেতে-আসতে পারো, অনেক গুজব শুনতে পাও—আমার সে-সুযোগ নেই। এসব তুমি আমার কানে তুলতে পারো।'

'গুজব? কি ধরনের গুজব?'

'মিলিটারি বা ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে যারা প্রশ্ন করে, আমি তাদের সম্পর্কে আগ্রহী।' একটু থেমে চিন্তা করল রানা, ঠিক কতটুকু বলা যায় নাদিয়াকে। 'এই মুহূর্তে বিশেষ একজন লোককে খুঁজছি আমি। তার নাম আলেক বোগান। বছর কয়েক আগে এই কায়রোতেই থাকত সে, ক'দিন আগে আবার ফিরে এসেছে। আমার ধারণা, মাথা গোঁজার একটা জায়গা খুঁজছে সে। সম্ভবত প্রচুর টাকা আছে সাথে। আমার বিশ্বাস, ইজিপশিয়ান আর্মি সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করছে লোকটা।'

শ্রাগ করল নাদিয়া। 'যেভাবে ভূমিকা করে শুরু করলেন, ভাবছিলাম, আরও নাটকীয় কোন প্রস্তাব দেবেন।'

'যেমন?'

'মোশে দায়ানের পকেট মেরে মানিব্যাগটা নিয়ে এসো, বা...'

হা হা করে হেসে উঠল রানা। নাদিয়া ভাবল, ভরাট গলার এই হাসি কার না ভাল লাগবে। যতক্ষণ হাসল রানা, মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকল সে।

'তোমার উত্তর, নাদিয়া?' হাসি থামিয়ে জানতে চাইল রানা। 'সাহায্য করবে?'

'কি জানি!' আসলে জানি, ভাবল নাদিয়া—টেনে লম্বা করছি সময়টা, কারণ তোমার সঙ্গ আমার ভাল লাগছে, মেজর।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা। 'দেখার চোখ, তা তোমার আছে, নাদিয়া। তোমার কাভারটাও নিখুঁত। বোঝাই যায়, তুমি বুদ্ধিমতী। সরাসরি বলছি বলে কিছু মনে কোরো না আবার। কিন্তু ঠিক তোমার মতই একটা মেয়ে দরকার আমার। আর তোমার এই কাজটা করতে রাজি হওয়া উচিত এই জন্যে যে, দেশের জন্যে সত্যি কিছু করা হবে এতে।'

'অস্থির হবেন না, প্রশংসা শুনতে ভালই লাগছে আমার,' মুচকি একটু হেসে বলল নাদিয়া। 'বলে যান।'

'আমি যাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছি তারা শুধু টাকাটাই চেনে,' বলল রানা। 'কিন্তু তুমি...'

'এক সেকেন্ড, টাকা তো আমারও দরকার। এই কাজের বেতন কত?'

'সেটা নির্ভর করবে কি ধরনের ইনফরমেশন আনবে তুমি তার ওপর।'

'সবচেয়ে কম কত?'

'কিছু না।'

তির্যক চোখে তাকাল নাদিয়া, তারপর হেসে ফেলল। বলল, 'যা আশা করছিলাম তারচেয়ে একটু কম হয়ে গেল।'

'কত হলে চলে তোমার?' জানতে চাইল রানা।

'আমার ফ্ল্যাটের মাসিক ভাড়া বেশি নয়, ওটা পেলে বেশ হয়।'

'কত?'

'বারোশো।'

চোখ কপালে উঠল রানার। 'ওটা একটা প্রাসাদ নাকি?'

'শোনেননি, সব জিনিসের দাম বেড়ে গেছে?' হাসল নাদিয়া। 'বাড়ি ভাড়া বাড়ার জন্যে অবশ্য বিদেশীরাই দায়ী। সংখ্যায় এত বেড়ে গেছে ওরা···'

'টাচি।' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'মাসে বারোশো দিতে হলে তোমার কাছ থেকে অনেক বেশি আশা করব আমরা।'

কাঁধ ঝাঁকাল নাদিয়া। 'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?'

'ঠিক আছে, এক মাসের চুক্তি হলো,' বলল রানা।

মুখে বিজয়িনীর হাসি নিয়ে জানতে চাইল নাদিয়া, 'আপনার সাথে কোথায় কিভাবে যোগাযোগ করব?'

'মেসেজ পাঠাবে,' বলে পকেট থেকে কাগজ কলম বের করে খস খস করে লিখতে শুরু করল। 'এখানে আমার অফিস আর বাড়ির ঠিকানা, ফোন সব দেয়া থাকল। মেসেজ পেলেই জায়গামত পৌঁছে যাব আমি।'

'ঠিক আছে,' কাগজ কলম চেয়ে নিয়ে নিজের ঠিকানা লিখল নাদিয়া, ভাবল, আল্লাই জানে আমার ফ্ল্যাট দেখে কি ভাববে তুমি। 'কিন্তু কেউ যদি আমাদের দু'জনকে একসাথে দেখে?'

'তাতে কি?'

'জানতে চাইতে পারে আপনি কে?'

'সত্য কথাটা ছাড়া যা খুশি বলতে পারো তুমি।'

মুচকি হাসল নাদিয়া। 'বলব, আপনি আমার লাভার।'

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে, অন্যমনস্কতার ভান করল রানা, বলল, 'বোলো।'

'কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাকেও কিছুটা সেইমত আচরণ করতে হবে,' চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব ফুটিয়ে বলল নাদিয়া। 'লাভাররা যা করে থাকে, ফুলটুল নিয়ে যাবেন আর কি।'

'কিন্তু···'

'কেন, আপনি কখনও প্রেমে পড়েননি?' অবাক হয়ে জানতে চাইল নাদিয়া! 'নাকি আপনাদের দেশে প্রেমিকাকে ফুল দেয়ার চল নেই?'

'তা থাকবে না কেন···মানে, কাউকে ফুল দেয়ার মত সময় বা সুযোগ এখনও পাইনি আর কি।'

নাদিয়া ভাবল, ও, একেবারে আনাড়ি! বলল, 'তাহলে তো অনেক কিছুই শিখতে হবে আপনাকে।'

হাতঘড়ি দেখল রানা, জানতে চাইল, 'তোমার কোন প্রশ্ন আছে?'

নাদিয়া বুঝল, মেজর তাকে ভাগিয়ে দিতে চাইছে। ভাবল, চিন্তা কোরো না, তোমাকে দখল বা হজম করে ফেলার সিদ্ধান্ত এখনও আমি নিইনি। যদিও ইচ্ছে করলে পারি। তুমি আর সবার মত নও, এখনও কচি খোকাটি রয়ে গেছ। তবে তোমার মধ্যে একটা আভিজাত্য-বোধ আছে, সেটাকে ভেঙেচুরে ধসিয়ে দেবার জন্যেই নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে আমার। সময় হোক, দেখা যাবে কি করা

যায়।

'না, আমার কোন প্রশ্ন নেই,' বলল নাদিয়া। 'গুরুত্বপূর্ণ কিছু কানে এলে আপনাকে জানাব, কাজ বলতে তো এই, তাই না?' উঠে দাঁড়াল সে। হাতটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করল রানা। আবার বসে পড়ে বলল, 'তোমার মেসেজের জন্যে অপেক্ষা করব আমি।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে যাবার সময় কেন যেন অনুভব করল নাদিয়া, ওর দিকে তাকিয়ে নেই মেজর।

সন্ধের পর অফিসে একবার ঢুঁ মারল রানা। টেবিলে কোন ফাইল বা মেসেজ নেই। মোটরসাইকেল নিয়ে ফ্ল্যাটে ফিরে এল ও।

ইংলিশ ডিনার তৈরি করছে কুরবান আলি, এই সুযোগে নিজের দেশীয় খাবার কিভাবে তৈরি করতে হয় তার ওপর নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলল ও। খাওয়া শেষ হয়েছে, এই সময় ডন এসে হাজির। স্কুলে কাল জিয়োগ্রাফি পড়ানো হবে, পড়াটা বুঝে নিতে চায়। বই হাতে নিয়ে রানা দেখল, ঢাকার মসলিনের কথা লেখা আছে। গর্ব অনুভব করল ও।

ডনকে বিদায় করে দিয়ে ড্রয়িংরুমে বসে সিগারেট ধরাল রানা, হাতে ধূমায়িত কফির কাপ। নাদিয়ার কথা ভাবছে। ধারণা ছিল, খুব সুন্দর জীবন-যাপন করে মেয়েটা, কিন্তু তা সত্যি নয়। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে জীবনের ওপর এক ধরনের বিতৃষ্ণা এসে গেছে, সেজন্যে অবশ্য ওকে দায়ী করা চলে না। আরও আঘাত যাতে না পায়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। একটু সাবধান থাকতে হবে ওকে, এই আর কি। খুব বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়া চলবে না।

আটটার পর ফ্ল্যাট থেকে বেরুল ও। ঘুরে বেড়াবে উদ্দেশ্যহীন ভাবে।

কাঁটাতারের বেড়ার দু'পাশেই গাছ আর ঝোপ-ঝাড়, বাইরে থেকে ভেতরটা ভাল করে দেখা যায় না। গেটের দু'পাশে হকারদের ভিড়। দর কষাকষি করে দশ পাউন্ডের জিনিস আড়াই পাউন্ডে কেনা যায় এখানে, তাই ক্রেতারও অভাব হয় না। পরনে গালাবিয়া, মাথায় ফেজ টুপি, ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে কাগজের তৈরি পাখা বিক্রি করছে আলেক বোগান। বেচাকেনার দিকে তেমন খেয়াল নেই, চোরা চোখে বারবার তাকাচ্ছে গেটের ভেতর, জেনারেল স্টাফ ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টারের দিকে।

খোঁজাখুঁজির পালা শেষ হয়েছে। প্রায় এক হপ্তা ধরে রাস্তাঘাটে কোথাও পুলিস বা মিলিটারিকে আইডেনটিটি পেপার চেক করতে দেখেনি সে। ইচ্ছে করেই টহল পুলিসের সামনে পড়ে গেছে বেশ কয়েকবার, ওরা কাউকে খুঁজছে বলে মনে হয়নি তার। ধরে নিয়েছে, মেজর মাসুদ রানার উৎসাহে ভাটা পড়েছে। নিশ্চয়ই অন্য কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে লোকটা।

নিরাপদ বোধ করার পর থেকেই জেনারেল হেডকোয়ার্টারের ওপর নজর রাখতে শুরু করেছে আলেক। কায়রোয় ঢুকতে পারাটা তার জন্যে বিরাট একটা সাফল্য, কিন্তু এই সাফল্যের এক কানাকড়ি মূল্য নেই যদি সে তথ্য জোগাড় করে তেলআবিবে পাঠাতে না পারে। সময়ও একটা বিরাট ফ্যাক্টর। এসব তথ্য জোগাড় করতে দেরি হয়ে গেলে আক্রমণের প্ল্যান আমূল বদল করতে হবে ইসরায়েলকে।

কি কি তথ্য দরকার, মুখস্থ করা আছে আলেকের। ট্রুপের সংখ্যা, ডিভিশনের নাম (যেগুলো ফিল্ডে আছে এবং যেগুলোকে রিজার্ভ রাখা হয়েছে), ট্রেনিঙের ধরন। ট্যাঙ্কের সংখ্যা, শ্রেণী। অ্যামুনিশন ও তার সরবরাহ পরিস্থিতি। খাবারদাবার আর গ্যাসোলিন পরিস্থিতি। কম্যান্ডিং অফিসারদের প্রবণতা ও ব্যক্তিত্ব। স্ট্র্যাটেজিক ও ট্যাকটিকাল ইনটেনশন।

কিছু কিছু তথ্য বিশেষ চেষ্টা ছাড়াই, শুধু রাস্তা-ঘাটে হেঁটে বেড়িয়েই জোগাড় করতে পারে আলেক। ইউনিফর্ম দেখে ছুটিতে আসা সৈনিকদের চেনা যায়, কান পেতে তাদের কথাবার্তা শুনলে কোন্ ডিভিশন কোথায় আছে, কোত্থেকে কোথায় যাবে, এসব জানা যায়। মাঝেমধ্যে ভাগ্য আরও একটু বেশি সাহায্য করে—একজন সার্জেন্ট হয়তো নিজেদের ডিভিশনে নতুন কি কি অস্ত্রপাতি এসেছে তার বিশদ বর্ণনা দিতে শুরু করল। এই তো সেদিন একজন মেকানিককে বলতে শুনল সে, গত হপ্তায় নতুন যে ট্যাঙ্কগুলো তাদের ডিভিশনে পাঠানো হয়েছে তার অর্ধেকই প্রায় অচল, মেরামত না করে ফিল্ডে পাঠানো সম্ভব নয়। এগুলো সবই কাজের তথ্য, তেলআবিবে পাঠানো হলে ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিস্টরা এই রকম টুকরো-টাকরা আরও তথ্যের সাথে মিলিয়ে বড়সড় গোটা একটা ছবি তৈরি করতে পারবে। কিন্তু ইসরায়েলি সমরবিদরা শুধু এগুলোই জানতে চায় না।

জেনারেল হেডকোয়ার্টারের ভেতরে কোথাও গোপন কাগজ-পত্র আছে, সেগুলোর কোনটায় হয়তো লেখা আছে—'বিশ্রাম ও মেরামতের পর দুশো ট্যাঙ্ক ও ফুল সাপ্লাই সহ ডিভিশন এ কাল সকালে কায়রো থেকে রওনা হয়ে যাবে। ডিভিশন এ ডিভিশন বি-র সাথে যোগ দেবে সি মরুদ্যানে।' কিংবা—'ডিভিশন ডি নতুন অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান (কোড: বি-থ্রী থ্রী) পরীক্ষা করা শেষ করেছে, চলতি হপ্তার শেষে স্পেয়ার পার্টস এসে পৌঁছুলে গানগুলোকে ফিল্ডে পাঠিয়ে দেয়ার অর্ডার হয়েছে।'

এই ধরনের কাগজ-পত্র দরকার আলেকের। সেজন্যেই জেনারেল হেডকোয়ার্টারের সামনে দাঁড়িয়ে পাখা বিক্রি করছে সে।

গুরুত্বপূর্ণ কাগজ-পত্র ক্যান্টনমেন্টের বাইরেও বেরোয়, কারণ রাশিয়ান উপদেষ্টা আর আর্মি অফিসাররা শুধু ক্যান্টনমেন্টের ভেতরই নয়। শহরের নানান জায়গায় অফিস করছে। গার্ডেন সিটির প্রায় অর্ধেক বাড়ি এখন ওদের হাতে, শেখ আর পাশাদের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছে। তার বাড়িটার ওপর এখনও ওদের চোখ পড়েনি, সেজন্যে খুশি আলেক। মিশরীয় কমান্ডিং অফিসাররা অনেকেই অফিস করে ক্যান্টনমেন্টে, কিন্তু বসবাস করে শহরে যার যার নিজের বাড়িতে।

ক্যান্টনমেন্ট বা জেনারেল হেডকোয়ার্টারে ঢোকার সময় ইউনিফর্ম পরা থাকলে কাউকে বাধা দেয়া হয় না, মাঝেমধ্যে শুধু সিভিলিয়ানদের আইডেনটিটি কার্ড চেক করা হয়।

রাশিয়ানরা শহরের কয়েকটা হোটেলেও অফিস করে, মিশরীয় আর্মি, নেভী আর এয়ারফোর্সের অফিসাররা হরদম যাওয়া-আসা করে সেখানে।

মিশরীয় সেনাবাহিনীর সব রকম ইউনিফর্ম, রেজিমেন্টাল আইডেনটিফিকেশন মার্কস ইত্যাদি চেনে আলেক। ফটো দেখে মনে রেখেছে একশোর বেশি সিনিয়র অফিসারের চেহারা। ক'দিন ধরে রোজ সকালে তাদের অনেককেই দেখার সুযোগ হচ্ছে তার। বিরাট আকারের স্টাফ কারে চড়ে কর্নেল, জেনারেল, অ্যাডমিরাল, স্কোয়াড্রন লীডাররা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে ঢোকে। এদের চেহারা একটু অদ্ভুত লাগে আলেকের, কারণ এদেরকে সাদা-কালো ফটোয় দেখছে, এখন দেখছে প্রত্যেকের নিজস্ব রঙে।

জেনারেল স্টাফ সবাই গাড়িতে করে আসে, কিন্তু তাদের এইডরা আসে পায়ে হেঁটে। রোজ সকালে ক্যাপ্টেন আর মেজরের দল হাতে ব্রীফকেস নিয়ে ভেতরে ঢোকে, তারপর কাজ সেরে বেরিয়ে যায়। সকাল বেলা সবাইকে উপস্থিত থাকতে হয়, কারণ বেলা দশটার দিকে কনফারেন্স বসে। এদের বেশিরভাগই দুপুরের মধ্যে বেরিয়ে যায়।

রোজই একজন করে এইডকে অনুসরণ করে আলেক।

এইডরা বেশিরভাগই জেনারেল হেডকোয়ার্টারে কাজ করে, তাদের গোপন কাগজ-পত্র দিন শেষে অফিসে তালা-চাবির ভেতর থেকে যায়। কিন্তু অল্প কিছু এইড আছে যারা জেনারেল হেডকোয়ার্টারে আসে শুধু সকালের কনফারেন্সে যোগ দেয়ার জন্যে। কনফারেন্স শেষ করে যে যার অফিসে ফিরে যায় তারা—হয় কোন হোটেলে বা ভাড়া করা বাড়িতে। এদের সাথে কাগজ-পত্র থাকে। একজনকে অনুসরণ করে সেমিরামিসে গিয়েছিল আলেক, আরও দু'জনের পিছু নিয়ে গিয়েছিল নসর-এল-নিল-এর ব্যারাকে। চার নম্বর এইডকে ঢুকতে দেখেছে শারি সুলেমান পাশায়। এদের প্রত্যেকের সাথে ছিল একটা করে ব্রীফকেস।

এই ব্রীফকেসগুলো দরকার আলেকের।

ছিনতাই করা ছাড়া উপায় নেই। তাই করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। তারই মহড়া দেয়া হবে আজ।

গরমে সেদ্ধ হচ্ছে আলেক। পাখার বাতাসে ঠাণ্ডা নেই। এইডরা একটু পরই বেরিয়ে আসতে শুরু করবে। সময় কাটানোটাকে সহজ করার জন্যে গত রাতের কথা স্মরণ করল সে। নতুন গজানো গোঁফে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল।

কাল রাতে রোপাকে নিয়ে বিরকা এলাকায়, মাদাম হুসনার আড্ডাখানায় গিয়েছিল আলেক। ওখানে একটা মেয়েকে পেয়ে যায় ওরা। মেয়েটা হয়তো ফিরোজার নখের যোগ্যও নয়, তবে সাময়িক কাজ চালাবার জন্যে একেবারে মন্দও ছিল না। মেয়েটাকে পালা করে ভোগ করেছে ওরা তারপর একসাথে। সবশেষে

রোপার উদ্ভট, খেয়ালী খেলায় মেতে উঠেছিল দু'জনেই। রাতটা এই করেই কেটে গেছে।

এইডরা বেরিয়ে আসতে শুরু করল। গত পরশু যারা ব্যারাকে গিয়েছিল, সেই জোড়াটাকে অনুসরণ করল আলেক। মিনিটখানেক পর একটা ক্যাফের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আলেকের সাথে হাঁটা ধরল খলিফা। 'ওই দু'জন?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ।'

মোটাসোটা, দশাসই চেহারা খলিফার, নিচের পাটির দুটো দাঁত স্টীল দিয়ে বাঁধানো। কায়রোর সবচেয়ে ধনী লোকদের মধ্যে একজন সে। সাধু-শয়তান সবার সাথে সম্পর্ক তার, সবার উপকার করে, আবার কারও ক্ষতি করতেও ছাড়ে না। তার বিদঘুটে স্বভাবের মধ্যে একটি হলো, নোংরা থাকতে পছন্দ করে। পায়ে তলা খয়ে যাওয়া স্যান্ডেল, পরনে ঘামে ভেজা ধুলো মাখা জোব্বা, মাথায় তোবড়ানো ফেজ—এই তার ধরাবাঁধা পোশাক। মাথায় অকৃপণ হাতে তেল ঢালে সে, চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা। হাতের নখ সবগুলো কালো, রঙ করা। পাশাদের মত তার সম্পদ জমি থেকে আসেনি, কিংবা গ্রীকদের মত ব্যবসা থেকেও নয়, এসেছে ক্রাইম থেকে।

প্রথম জীবনে চোর ছিল খলিফা, পরে চোরদের সর্দার হয়েছে।

কি কারণে জানা যায় না, বিদেশীদের ওপর সহজে খাপ্পা হয় না খলিফা, বরং একটু সমীহ করে চলে। কোন বিদেশী যদি তার কাছে গিয়ে অভিযোগ করে যে তার পকেট মারা গেছে, দু'ঘণ্টার মধ্যে টাকাটা ফেরত দেবার ব্যবস্থা করে দেয় সে। এহেন খলিফাকে একাধিক কারণে বিশেষ পছন্দ করে আলেক বোগান। খলিফা ধুরন্ধর, নিষ্ঠুর, মিষ্টভাষী, কখনও অসীম আকাশের মতই উদার, এবং সারাক্ষণ নীল নদের মতই খল খল করে হাসছে। আদিম যুগের অন্যায়-অপরাধ সে-ই আজও জিইয়ে রেখেছে মধ্যপ্রাচ্যে। তার নিজের একটা বাহিনী আছে, সদস্য হলো ছেলেরা, নাতিরা, ভাগ্নেরা। এরা সবাই মিলে কয়েকশো, সঠিক সংখ্যা খলিফার নিজেরও বোধহয় জানা নেই। এরা গত ত্রিশ বছর ধরে কায়রোয় পকেট মারছে, বাড়িতে বাড়িতে চুরি করছে। সমাজের এমন কোন স্তর নেই যেখানে নিজের শেকড় বিস্তার করেনি খলিফা। ড্রাগস সাপ্লাই দিয়ে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে হাত করে রেখেছে সে। রাজনৈতিক দলগুলোতে মোটা টাকা চাঁদা দিয়ে বশ করে রেখেছে নেতাদের। বিরকা এলাকায় যত বাড়ি আছে তার প্রায় অর্ধেকের মালিক সে, মাদাম হুসনার বাড়িটিও আসলে তারই। পুরানো শহরে বিরাট একটা বাড়িতে চারটে বউ নিয়ে বসবাস করে সে।

এইড দু'জনের পিছু নিয়ে শহরের মাঝখানে চলে এল ওরা। খলিফা জানতে চাইল, 'দোস্ত, তুমি কি দুটো ব্রীফকেসই চাও, না একটা হলেই চলবে?'

খানিক চিন্তা করল আলেক। একটা ব্রীফকেস ছিনতাই হলে সেটাকে স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে নেয়া যায়, কিন্তু দুটো হলে লোকে এটাকে পরিকল্পিত

বলে মনে করবে। 'একটা,' বলল সে।

'কোন্‌টা?'

'একটা হলেই চলে।'

খলিফার সাহায্য চাওয়ার কথা এর আগেও একবার ভেবেছিল আলেক, যখন বুঝল নিজের বাড়িতে ওঠা নিরাপদ নয়। কিন্তু অনেক ভেবে-চিন্তে সেবার সাহায্য না চাওয়ারই সিদ্ধান্ত নেয় সে। সন্দেহ নেই, আলেককে লুকিয়ে রাখা খলিফার জন্যে কোন সমস্যাই হত না। কয়েক ডজন ব্রোথেল-এর মালিক সে, তার যে-কোন একটায় ঠাঁই হয়ে যেত তার। কিন্তু আলেক জানে, তাকে লুকিয়ে থাকার জায়গা দিয়েই পুলিস বা আগ্রহী অন্য কোন পার্টির সাথে আলোচনা শুরু করত খলিফা। কোন কাজে লাভ দেখলে তা থেকে সর্দারকে নিবৃত্ত করা অসম্ভব। দুনিয়াটাকে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছে খলিফা—একদিকে তার পরিবার, আরেক দিকে বাকি সবাই। নিজের পরিবারের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত সে, তাদের সবাইকে অন্ধের মত বিশ্বাস করে। পরিবারের বাইরে যারা আছে তাদের সবাইকে শত্রু ও শিকার বলে মনে করে সে, এদেরকে ঠকাবে বলে একপায়ে খাড়া হয়ে আছে, সেই সাথে এরাও তাকে ঠকাবে বলে ধরে রেখেছে।

খলিফার সাথে কোন কাজ করতে হলে তার ভিত্তি হতে হবে সন্দেহ। একজন অপরজনকে সন্দেহ করবে, অবিশ্বাস করবে, যদিও একটা পর্যায় পর্যন্ত পরস্পরকে সাহায্য করবে তারা। খলিফার সাথে কাজ শুরু করে আলেক আবিষ্কার করেছে, আশ্চর্য ভাল কাজ দিচ্ছে পদ্ধতিটা।

শহরের মাঝখানে থেকে পুরানো শহরের কাছাকাছি চলে এল ওরা। অফিসার দু'জন হঠাৎ এক দৌড়ে রাস্তা পেরোল। গাড়ি এসে পড়ার আগে আলেকও ছুটে রাস্তা পেরোতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার একটা হাত ধরে ফেলল খলিফা।

'কাজটা আমরা এখানে সারব,' বলল সে।

চারদিকে তাকাল আলেক। এটা একটা তে-রাস্তার মুখ। ফুটপাথে হকার আর খদ্দেরদের ভিড় লেগে আছে। রাস্তা দিয়ে শুধু কার আর বাস নয়, তাদের সাথে ঢিমেতালে চলেছে ঘোড়া আর গাধার গাড়ি। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল আলেকের মুখে। 'হ্যাঁ,' বলল সে। 'এটাই ঠিক জায়গা।'

আট

পরদিন।

ছিনতাইয়ের জন্যে জায়গাটা সত্যি ভাল বেছেছে খলিফা। এখানে ব্যস্ত একটা সাইড রোড মেইন রোডের সাথে মিশেছে। ঠিক কোণে অত্যন্ত চালু একটা কাফে। ভেতরে জায়গা হয় না, তাই ফুটপাথের ওপরও চেয়ার-টেবিল ফেলা হয়েছে। মেইন রোডের একধারে বাস স্টপ। মিশরীয়রা আজও লাইন দিয়ে বাসে

উঠতে শেখেনি, কাজেই ফুটপাথের প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে অপেক্ষারত আরোহীদের নরক গুলজার দেখার মত দৃশ্য। সাইড রোডের অবস্থা এর চেয়ে একটু ভাল, কাফের সীমানা বাড়তে বাড়তে ওখানে পৌঁছুলেও, বাসস্টপ নেই। কাজ হাসিলের জন্যে সুবিধে হবে ভেবে ওই জায়গায় ঝামেলা বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে খলিফা। দু'জন অ্যাক্রোব্যাটকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে সে। খেলা দেখাবার অজুহাতে লোকজনের ভিড় তৈরি করছে তারা।

কোণের একটা টেবিল দখল করে বসে আছে আলেক, এখানে থেকে মেইন রোড আর সাইড রোডের অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। খলিফার ওপর পূর্ণ আস্থা আছে তার, জানে, কোন কাজে ব্যর্থ হয় না লোকটা। তবু কাজটা ভালোয় ভালোয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছে না সে। ভাগ্য খারাপ হলে কত কি-ই না ঘটতে পারে।

ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে অফিসাররা আজ ব্যারাকে নাও যেতে পারে।

কিংবা, আজ তারা এই পথে নাও আসতে পারে।

হয়তো দেখা যাবে আজ তাদের সাথে ব্রীফকেস নেই।

ঘটনা ঘটতে শুরু করার সাথে সাথে পৌঁছে যেতে পারে পুলিস! হয়তো নাগালের মধ্যে যাকে পাবে তাকেই গ্রেফতার করবে ওরা।

অথবা ছেলেটা হয়তো ছিনতাইয়ের সুযোগই পাবে না, অফিসাররা ধরে ফেলবে তাকে।

কে জানে, খলিফা হয়তো দু'মুখো সাপের ভূমিকা নিয়েছে। অফিসারদের হাতে তাকে ধরিয়ে দিলেই বা কি করতে পারে সে। মেজর রানার সাথে যোগাযোগ করা খলিফার জন্যে কোন সমস্যা নয়। আলেক বোগান বেলা বারোটায় অমুক কাফেতে বসে থাকবে, এর বেশি কিছু জানার দরকার হবে না মেজরের।

মৃত্যুকে ভয় করে না আলেক, ভয় করে জেলখানাকে। ভয় নয়, জেলখানা তার জন্যে একটা আতঙ্ক। মেজর রানা তাকে গ্রেফতার করে জেলখানায় পাঠাবে, কথাটা মনে হতেই এই ভর দুপুরে ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দিল তার শরীরে। তিন বেলার জায়গায় এক বেলা উচ্ছিষ্ট খেয়েও জীবনধারণ করতে রাজি আছে আলেক, মদ আর মেয়েমানুষের কথা ভুলেও মুখে আনবে না, রাজি আছে ঊষর মরুভূমিতে চিরকালের জন্যে পথ হারাতে, তবু জেলখানায় যেতে রাজি নয়। তার এই আতঙ্কের কথা কাউকে বলেনি সে, ব্যক্তিগত দুঃস্বপ্নের মত গোপন করে রেখেছে। জেলখানার ভেতর নিজেকে কল্পনা করতে গিয়ে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার। ঘন ঘন হাঁপাতে শুরু করল। আতঙ্কটা দূর করার জন্যে নিজের ঠোঁট কামড়ে প্রায় রক্ত বের করে ফেলল সে। নিজেকে বোঝাল, খলিফাকে প্রচুর টাকা দিয়েছে সে, লোকটা তার সাথে বেঈমানী করবে না।

এগারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মাথায় মোটাসোটা, দশাসই খলিফাকে গদাইলশকরী চালে কাফের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তার চেহারায়

কোন ভাব নেই, কিন্তু ছোট ছোট চোখ দুটো চারদিকে ঘুরছে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে নিচ্ছে সব। নিজের আয়োজনে হয়তো সন্তুষ্ট হলো সে, রাস্তা পেরিয়ে গায়েব হয়ে গেল।

বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট। কয়েকশো কালো মাথার ভেতর একজোড়া মিলিটারি ক্যাপ দেখতে পেল আলেক। দূর, কিন্তু খুব বেশি দূরে নয়। নিজের অজান্তেই চেয়ারের একেবারে কিনারায় সরে এল সে, দু'হাতে জোরে চেপে ধরল টেবিলের দুই ধার। ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে অফিসাররা। কিছুটা স্বস্তি বোধ করল আলেক। অফিসারদের হাতে ব্রীফকেস দেখতে পেয়েছে সে।

রাস্তার ওপারে পার্ক করা একটা গাড়ির ইঞ্জিন খক খক করে উঠল।

স্টপে এসে দাঁড়াল একটা বাস। আলেক ভাবল, এটাও নিশ্চয়ই খলিফার প্ল্যানের মধ্যে ছিল না। বাসটা এসে পড়েছে ভাগ্যগুণে, একটা বোনাস।

আলেকের কাছে থেকে অফিসাররা আর মাত্র পাঁচ গজ দূরে।

রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটা হঠাৎ ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে সচল হলো। বড়সড় কালো একটা প্যাকার্ড, অত্যন্ত শক্তিশালী ইঞ্জিন। মত্ত হাতীর মত আড়াআড়িভাবে রাস্তা পেরোতে শুরু করল, সাইড রোডের দিকে মুখ করে। মেইন রোডের ওপর যানবাহনের মিছিল চলেছে, কিন্তু সেদিকে কোন খেয়াল নেই ড্রাইভারের। একসাথে ব্রেক করল কয়েকটা গাড়ি, অকস্মাৎ লাগামে টান পড়ায় চিঁহিঁ চিঁহিঁ ডাক ছেড়ে পিছনের পায়ের ওপর খাড়া হয়ে গেল এক জোড়া ঘোড়া। চারদিক থেকে তুমুল হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। একটা দুর্ঘটনা না ঘটেই পারে না।

কোন বিরতি ছাড়াই প্যাকার্ডের হর্ন বাজছে। রোডের কোণে আলেক যেখানে বসে আছে সেখান থেকে মাত্র কয়েক ফিট দূরে, পুরানো একটা ফোর্ড ট্যাক্সির গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গাড়িটা। আলেকের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে অফিসার দু'জন, গাড়ি দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে।

ট্যাক্সি ড্রাইভারের বয়স কম, রক্ত গরম। এক ঝটকায় দরজা খুলে লাফ দিয়ে নিচে নামল সে। শার্ট, ট্রাউজার আর ফেজ পরে আছে। চেহারাতেই লেখা রয়েছে, খাস আরব। প্রায় একই সময়ে প্যাকার্ড থেকেও একজন নামল। এরও বয়স কম, কাউকে তোয়াক্কা করে না। দেখে বোঝা গেল, গ্রীক। স্যুট পরে রয়েছে।

গ্রীকের নাকের সামনে মুঠো করা হাত নেড়ে আরব বলল, 'শুয়োরের বাচ্চা!'

আরবের নাকের সামনে, এক হাত দিয়ে আরেক হাতের তালুতে চটাস করে ঘুসি বসিয়ে দিয়ে গ্রীক বলল, 'তবে রে ঘেয়ো উটের পাছা!'

গ্রীকের চোয়ালে ধাঁই করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল আরব। আর গ্রীক ড্রাইভার মুখ দিয়ে বুম্ করে একটা প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে এক ঘুসিতে আরবের খাড়া নাকটাকে একেবারে চ্যাপ্টা করে দিল।

ভিড়ের মধ্যে থেকে খিল খিল করে হেসে উঠল একটা মেয়ে। কে হাসে দেখার জন্যে ঘাড় ফেরাল অনেকে। দেখল, পূর্ণ যুবতী একটি মেয়ে, সম্পূর্ণ

উলঙ্গ—পাগলী। আলেক ভাবল, মাই গড! এটাকে কোত্থেকে জোগাড় করল খলিফা!

আরোহীরা নামতে শুরু করেছে, কে কার চেয়ে আগে নামবে, বাসের ভেতর তারই জোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। যারা উঠবে, নিজেদের মধ্যে কিল ঘুসি কনুই চালিয়ে ধস্তাধস্তি আরম্ভ করেছে।

সাইড রোডের মুখে একজন অ্যাক্রোব্যাট সহকারীর মাথায় দাঁড়িয়ে লাঠি-খেলা দেখাচ্ছিল, ড্রাইভারদের মারপিট দেখার জন্যে ঘাড় ফেরাতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল সে। সহকারীর মাথা থেকে সরাসরি দর্শকদের গায়ের ওপর পড়ল, তার হাতের লাঠিটা ঠকাস করে ঠুকে গেল মুমূর্ষু চেহারার এক ফকিরের কপালে। লাঠির বাড়ি যেন ওষুধের কাজ করল, পালোয়ানের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ফকির। ঘণ্টায় দুশো মাইল বেগে খিস্তি বেরিয়ে আসছে তার মুখ থেকে।

ছোট একটা ছেলে ছুটে পাশ কাটাল আলেকের টেবিল। উঠে দাঁড়াল আলেক। ছেলেটার দিকে হাত তুলে চিৎকার জুড়ে দিল সে, 'পালাল! চোর!'

ছোটার গতি বেড়ে গেল ছেলেটার। আলেক তার পিছু নিল। আলেকের টেবিলের আশপাশে যারা বসে ছিল তাদের মধ্যে থেকে চারজন লোক লাফ দিয়ে উঠেই ছেলেটাকে ধরার জন্যে ছুটল।

অফিসার দুজন এখনও ড্রাইভারদের মারপিট দেখছে। তাদের মাঝখান দিয়ে ছুটল ছেলেটা। আলেক আর তার সাহায্যকারী চারজন লোক প্রায় একই সাথে অফিসারদের গায়ের ওপর আছাড় খেল। দু'জন পথচারীকে নিয়ে মোট নয়জন ওরা ফুটপাথের ওপর লম্বা হয়ে পড়ল। আলেক আর তার লোকেরা সমানে চিৎকার করে চলেছে, 'চোর, ধরো, পালাল!' ওদের সাথে পথচারীও অনেকে চোর চোর বলে গলা ফাটাচ্ছে। যদিও এদের প্রায় কারোরই ধারণা নেই, চোর কে বা কোথায়। কেউ কেউ মনে করল, বোধহয় ড্রাইভারদের মধ্যেই কেউ একজন কিছু চুরি করেছে। বাস থেকে সদ্য নেমে আসা আরোহী, লাঠি খেলার দর্শক আর কাফে থেকে বেরিয়ে আসা খদ্দেররা তিন দিক থেকে তিনটে স্রোতের মত ড্রাইভারদের দিকে এগোল। আরবরা মনে করছে গ্রীক ব্যাটাই চোর, আর গ্রীকরা মনে করছে আরব ব্যাটাই কালপ্রিট। নিরীহ চেহারার একজন খদ্দের এতক্ষণ চুপচাপ দেখছিল সব, হঠাৎ কি যেন হলো তার, একটা ফোল্ডিং চেয়ার তুলে ড্রাইভারদের ঘিরে থাকা ভিড়টাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। ভাগ্যিস একটু জোরে ছুঁড়ে দেয়ায় সবার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল সেটা, গিয়ে আছাড় খেল প্যাকার্ডের উইন্ডস্ক্রীনে। কাফের ওয়েটার আর কিচেনের লোকজন দেখল, নিরীহ দর্শন লোকটার দেখাদেখি আরও অনেকে ব্যাপারটাকে মজার খেলা হিসেবে নিতে যাচ্ছে, এরই মধ্যে কয়েকজন খদ্দের আর পথচারী একটা করে চেয়ার তুলে নিয়েছে হাতে। ম্যানেজারের নির্দেশে ওয়েটার আর কর্মচারীরা সামনে যাকে পেল তাকেই বেধড়ক পেটাতে শুরু করে দিল। চারদিক থেকে শুধু মার মার কাট কাট আওয়াজ। পাঁচটা ভাষায় সবাই সবাইকে গালাগাল দিচ্ছে।

মেইন রোডের অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। একটু ফাঁক পেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল একটা গাড়ি, জানালা দিয়ে ভেতরে একটা ঢিল পড়ল। গাড়ি থামিয়ে নিচে নামল ড্রাইভার, সেই মুহূর্তে পিছনের গাড়িটা সজোরে ধাক্কা দিল তার গাড়িটাকে।

যানবাহনের ভিড় তিন দিকে পিছু হটতে শুরু করল। দাঁড়িয়ে পড়া সবগুলো গাড়ি কোন বিরতি ছাড়াই হর্ন বাজিয়ে চলেছে। গাড়ি ঘোড়ার মাঝখানে গা ভর্তি ঘা নিয়ে আটকা পড়েছে অসুস্থ একটা গাধা, তাকে ছেঁকে ধরেছে বড়সড় দুটো কুকুর। গাধার দফা সারা, অথচ কারও খেয়াল নেই সেদিকে। সামনে যানবাহন স্থির হয়ে আছে, বাস এগোতে পারছে না, আরোহীরা সবাই শার্টের আস্তিন গুটাতে গুটাতে নেমে পড়ছে। প্রতি মুহূর্তে আকারে বাড়ছে উত্তেজিত জনতা। এরই মধ্যে যেন আকাশ থেকে পড়ল পাগলা একটা কুকুর, সামনে যাকে পাচ্ছে তারই পা কামড়ে দিচ্ছে সে। অচল দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির ছাদে উঠে পড়ল লোকজন, উঁচুতে উঠে দেখতে চায় কোথায় কি ঘটছে। গাড়ির জানালায় হাত গলিয়ে কি যেন চুরি করতে যাচ্ছিল এক কিশোর, ড্রাইভারের হাতে ধরা পড়ে গিয়ে নির্যাতিত হচ্ছে সে। ড্রাইভারকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এল আশপাশের গাড়ি থেকে আরও কয়েকজন ড্রাইভার। কিশোর ছেলেটা মারের চোটে বাবারে মারে বলে চিৎকার জুড়ে দিল, এই সুযোগে তার সঙ্গীরা অন্যান্য গাড়ি থেকে দ্রুত-হাতে যা পাচ্ছে তাই সরিয়ে ফেলছে। সন্ত্রস্ত একটা তেজী ঘোড়া লাগাম ছিঁড়ে উঠে পড়ল ফুটপাথের ওপর। কাফের টেবিল উল্টে ছুটল সে। চিনামাটির বাসন-পেয়ালা আর গ্লাস ভাঙার আওয়াজের সাথে শোনা গেল ম্যানেজারের করুণ বিলাপ। দোতলার একটা জানালায় মোটাসোটা এক গৃহিণীকে দেখা গেল। ভিড়ের মাথায় এক গামলা নোংরা পানি ঢালল সে। ব্যাপারটা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ লক্ষই করল না।

অবশেষে পুলিস এল।

হুইসেলের আওয়াজ হতেই পরিস্থিতি বদলে গেল এক নিমেষে। মারপিট, গালাগালি সব থেমে গেল। শুরু হলো কে কার আগে পালাবে তারই প্রতিযোগিতা। রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল কয়েকজন। দেখতে দেখতে ফাঁকা হয়ে এল গোটা এলাকা। খানিক আগেই ফুটপাথ থেকে উঠে রাস্তার ওপারে চলে গিয়েছিল আলেক, পুলিস দেখে ধীর পায়ে কেটে পড়তে শুরু করল সে। কালপ্রিট কাউকে ধরতে পারল না পুলিস, তবে নাগালের মধ্যে সাতজনকে পেয়ে তাদের গ্রেফতার করে ফেলল। ভিড় কেটে গেছে, ফুটপাথে এখন থাকার মধ্যে আছে ফকির বাবাজী—আবার মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে সে। উলঙ্গ পাগলীটাকে কোথাও দেখা গেল না। কাফের ভেতর দাঁড়িয়ে হাত ছুঁড়ছে ম্যানেজার, আসতে দেরি করেছে বলে চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করছে পুলিসের। এরই ফাঁকে মাঝে মধ্যে ক্ষতির পরিমাণ ঘোষণা করছে সে। প্রতিবার সেটা দ্বিগুণ হারে বেড়ে চলেছে।

কেউ বলতে পারে না কিভাবে যেন হাতের কব্জি ভেঙে ফেলেছে বাস ড্রাইভার। ফকির বাবাজী ছাড়া জখমের কেস এই একটাই, বাকি সবার চামড়া ছড়ে গেছে বা মচকে গেছে আঙুল।

মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে মাত্র একটা। কুকুরের আক্রমণে ড্রেনের ওপর মরে পড়ে আছে অসুস্থ গাধাটা। টহল পুলিস ট্রাফিক পুলিসের সহায়তায় গাড়ি দুটোকে একপাশে সরিয়ে দেবার সময় আবিষ্কার করল, রাস্তার বখাটে ছোঁড়ারা জ্যাক লাগিয়ে দুটো গাড়িরই পিছনের চাকা খুলে নিয়ে গেছে।

বাসের হেডলাইট চুরি হয়ে গেছে। কাফের অর্ধেক চেয়ার ভেঙে গেছে, বাকি অর্ধেক লোকজনের হাতে হাতে গায়েব হয়ে গেছে।

সেই সাথে চুরি হয়েছে দুটো ব্রীফকেসের একটা।

পুরানো শহরের সরু গলি ধরে হন হন করে হেঁটে চলেছে আলেক। মনটা খুব খুশি। জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে গোপন কাগজ-পত্র বের করা এক হপ্তা আগেও চিন্তার অতীত ব্যাপার ছিল। অথচ কাজটা হাসিল হবার পর এখন মনে হচ্ছে পানির মত সহজ। কৃতিত্ব খলিফারও আছে, কিন্তু নিজের কৃতিত্বটাকে খাটো করে দেখতে রাজি নয় সে। রাস্তায় হাঙ্গামা বাধাবার প্ল্যানটা সেই দিয়েছিল খলিফাকে।

ব্রীফকেসের ভেতর কি আছে সেটাই হলো প্রশ্ন।

খলিফার এটা বাড়ি তো নয়, যেন বিরাট এক চৌকো বাক্স। সম্ভবত তার বাপের আমল থেকেই বাড়ির গায়ে চুন পড়েনি। দেয়ালে শ্যাওলা ধরেছে, ফাটল দেখা দিয়েছে, ফাটলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে আগাছা। বড় সাইজের গর্তের ভেতর দল বেঁধে বসবাস করছে পায়রা। ঢোকার মুখে আকাশ ছোঁয়া একটা খিলান, কিন্তু দরজা নেই। ভেতরে প্রায় অন্ধকার একটা প্যাসেজ। প্যাসেজ ধরে খানিক দূর এসে একটা সিঁড়ি দেখল আলেক। সিঁড়ির মাথায় পর্দা ঝুলছে, সেটা সরিয়ে খলিফার লিভিং রুমে ঢুকল সে।

লিভিং রুমটা খলিফারই মত, নোংরা। কিন্তু আসবাবগুলো দামী ও আরামদায়ক। সোফা আর নিচু টেবিলগুলোকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে তিনটে বাচ্চা আর একটা নাদুসনুদুস বিড়াল ছানা। কার্পেটের ওপর বাচ্চাদের একজন এই মাত্র পেশাব করল। জানালার ওপর দাঁড়িয়ে দেয়ালে একটা পোস্টার সাঁটছে এক প্রৌঢ়া, সুন্দরী, সম্ভবত খলিফার বড় বউ। আরও কম বয়েসী একটা মেয়েলোক রাগের সাথে দুপাদাপ পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে অন্দরমহলের দিকে চলে গেল, তার হাতের গামলা থেকে দোর-গোড়ায় ছলকে পড়ল নোংরা পানি। কায়রোর প্রতিটি মুসলিম পরিবারে পর্দা প্রথা কঠোর ভাবে মেনে চলা হয়, অন্তত বাড়ির ভেতর। সেজন্যেই জানালার কার্নিসে দাঁড়ানো মেয়েলোকটাকে দেখে ইতস্তত করতে লাগল আলেক। খুক করে একবার কাশল সে।

চাপা একটা আর্তনাদ করে উঠে লাফ দিয়ে মেঝেতে নামল মেয়েলোকটা, তীরবেগে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

কামরার মাঝখানে কার্পেটের ওপর পদ্মাসনে বসে রয়েছে খলিফা, কোলে

মাসকয়েকের একটা শিশু। চুমু খেয়ে ওটাকে কার্পেটের উপর নামিয়ে দিয়ে সর্দার বলল, 'এসো, দোস্ত! কি মজাই না হলো আজ, তাই না?'

কার্পেটের ওপর খলিফার সামনে বসল আলেক। 'তোমার তুলনা হয় না, খলিফা। তুমি জাদু জানো।'

'খোদার কসম, এমন রায়ট অনেক দিন দেখিনি,' স্টীলের দাঁত বের করে হাসল খলিফা। 'আর, ঠিক সময় মত লোক ভর্তি একখানা বাসও এসে হাজির। তবে আয়োজনের একটা আইটেম কোন কাজেই আসেনি!'

'কোন্টা?' সাগ্রহে জানতে চাইল আলেক।

'পাগলী কোন হাঙ্গামা বাধাতে পারেনি....'

'ওকে তাহলে তুমিই...?'

হে হে করে হাসল খলিফা। 'আমার একটা বোথেলের ও হলো মক্ষিরাণী। বিদঘুটে কিছু করার দিকে সাংঘাতিক ঝোঁক।'

কথা বলার ফাঁকে নিজের কাজ করে চলেছে খলিফা, সেদিকে মনোযোগ দিল আলেক। সামনে স্তূপ আকারে জড়ো করা মানিব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ, হাতঘড়ি, আঙটি ইত্যাদি নাড়াচাড়া করছে খলিফা। এসবের মধ্যে থেকে এক আধটা বেছে নিচ্ছে সে, উল্টেপাল্টে দেখছে, ব্যাগ হলে খুলে তাকাচ্ছে ভেতরে। একটা ব্যাগ থেকে এক গাদা ব্যাঙ্ক নোট বের করে জোব্বার পকেটে ভরল সে। আরেকটা হ্যান্ডব্যাগ তুলে নিল।

এগুলো কোত্থেকে এসেছে বুঝতে বাকি থাকল না আলেকের। 'এক ঢিলে অনেক পাখি, তাই না? তোমার বাহিনীকে আগে থাকতেই খবর দিয়ে রেখেছিলে?'

একগাল হাসল খলিফা। বলল, 'এটাই তো আমার রেওয়াজ, আমি ব্যবসার ভেতর ব্যবসা দেখি। শুধু একটা ব্রীফকেস ছিনতাইয়ের জন্যে এত কাঠ-খড় পোড়াব, তা হয় নাকি!'

'ব্রীফকেসটা হাতে এসেছে তো?'

'আসেনি মানে!'

ঢিল পড়ল আলেকের পেশীতে। কিন্তু ব্রীফকেসটা এখানে নেই কেন? হয়তো নিরাপদ কোথাও সরিয়ে রেখেছে। তারপর আলেক ভাবল, তাই যদি হবে, বের করছে না কেন?

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল আলেক। একমনে নিজের কাজ করে চলেছে খলিফা। আলেকের উপস্থিতি সম্পর্কে তার যেন কোন ধারণাই নেই।

গলা শুকিয়ে এল আলেকের। বানচোতের মনে কি আছে কে জানে! থাকতে না পেরে সরাসরি জানতে চাইল সে, 'কই, কোথায় সেটা?'

'এখুনি দিচ্ছি,' বলল খলিফা। কিন্তু হাতের কাজ ছেড়ে ওঠার কোন লক্ষণ তার মধ্যে দেখা গেল না।

'আমার আবার কাজ আছে, যেতে হবে...' মৃদু কণ্ঠে বলল আলেক।

'কাজ থাকলে চলে যাও,' বলল খলিফা। 'পরে এক সময় এসে নিয়ে যেয়ো। তোমার জিনিস তো আর খেয়ে ফেলব না।'

নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে রাখল আলেক, শান্ত সুরে বলল, 'না, এসেছি যখন নিয়েই যাই। কই, দাও।'

'তার আগে একটা কথা,' বলল খলিফা। 'কথা ছিল, আরও পাঁচশো পাউন্ড পাব আমি। কিন্তু খরচ একটু বেশি পড়েছে, তাই সেটা আমাকে পুষিয়ে দিতে হবে।'

'কত?'

'সেটা আমি তোমার ওপরই ছেড়ে দিলাম,' উদার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল খলিফা। 'তুমি তো জানো, কাউকে চিপির মধ্যে ফেলে কিছু আদায় করা আমার স্বভাব নয়।'

মানিব্যাগ থেকে একশো পাউন্ডের সাতটা কড়কড়ে নোট বের করে খলিফার সামনে রাখল আলেক। টাকাটা নিয়ে গুনল খলিফা।

'সন্তুষ্ট?'

'বেজায়!'

জোব্বার ভেতরের পকেটে টাকা রেখে কার্পেটের প্রান্ত উঁচু করল খলিফা, নিচ থেকে বের করে আনল ব্রীফকেস। আলেকের কোলের ওপর ফেলল সেটা, জানতে চাইল, 'খুশি?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল আলেক। নেড়েচেড়ে ভাল করে ব্রীফকেসটা দেখল সে। তালা ভাঙা দেখে মাথায় রক্ত চড়ে গেল তার। জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার, এটা তুমি খুলেছ কেন?'

দাঁত বের করে হাসল খলিফা, তারপর আরবী একটা শব্দ ব্যবহার করল, যার অর্থ 'দুঃখিত' এবং 'তাতে কি'—এই দুটোই হতে পারে।

কথা বাড়ানো উচিত হবে না, বুঝল আলেক। এই লোককে ভবিষ্যতেও দরকার হতে পারে তার। একটা নিঃশ্বাস ফেলে ব্রীফকেসের ঢাকনি তুলল সে। ভেতরে কয়েক বান্ডিল কাগজ, প্রতিটি কাগজ ইংরেজীতে টাইপ করা। পড়তে শুরু করেছে, এই সময় কে যেন তার সামনে খুদে এক কাপ কফি রাখল। মুখ তুলে তাকাল আলেক। দেখল, আট দশ বছরের ফুটফুটে একটা মেয়ে।

'তোমার মেয়ে, নাকি নাতনি, খলিফা?'

'ওয়াইফ,' বলেই গলা ছেড়ে হেসে উঠল খলিফা।

মেয়েটার দিকে আরেকবার তাকাল আলেক। তারপর চোখ নামিয়ে নিল। নিজেকে মনে করিয়ে দিল, এই মেয়েটার কথা রোপাকে বলা চলবে না। কমনসেন্সের ভারি অভাব, হয়তো বায়না ধরে বসবে 'ফিরোজার বিকল্প হিসেবে খলিফার অপ্রাপ্তবয়স্কা বউটাকেই এনে দাও! আবার কাগজের ওপর মন দিল সে।

প্রথম পাতাটা পড়ে মাথা ঘুরে গেল আলেকের। একটা করে পাতা পড়ে, সেই

সাথে অবিশ্বাসে আরও একটু করে বড় হয় চোখ দুটো।

এক সময় সবগুলো কাগজ হাত থেকে ফেলে দিল সে। 'ডিয়ার গড!' বিড়বিড় করে বলল। তারপর হাসতে শুরু করল। এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যারাক ক্যান্টিনের মেনু ছিনতাই করেছে ওরা। জুন মাসে কাদের জন্যে কবে কি রান্না হবে তারই বিস্তারিত ফিরিস্তি রয়েছে কাগজগুলোয়।

নতুন একটা নির্দেশ জারি করেছে রানা: অফিসাররা জেনারেল স্টাফ-এর কোন কাগজ-পত্র বিশেষ জরুরী প্রয়োজন ছাড়া বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না।

লে. কর্নেল মোসাদ্দেক হাসান খবরটা শুনে প্রথমে কোন মন্তব্য করল না। সাদা সিল্কের রুমাল দিয়ে নতুন একটা ক্রিকেট বল পালিশ করছিল সে। ধীরে ধীরে সন্তুষ্টির হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। 'ভেরি গুড,' বলল সে। 'নতুন একটা না একটা কিছু দিয়ে সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত রাখতে হবে ওদেরকে, তবে যদি ওরা লাইনে থাকে।'

'আমার নতুন ইনফর্মার খবর পেয়েছে···'

'সেই মেয়েটা?' কোমর দুলিয়ে নাচের ভঙ্গি করল মোসাদ্দেক হাসান। 'নাচে?'

জবাব না দিয়ে বলে চলল রানা, '···রায়টটা নাকি খলিফা বাধিয়েছে।'

'খলিফা?' ভুরু কপালে উঠল লেফটেন্যান্ট কর্নেলের। 'কোন্ খলিফা।'

'সর্দার খলিফা,' বলল রানা। 'আপনি যার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আপনার কাছে শুনেছি সে নাকি ইনফরমেশনও বিক্রি করে। কিন্তু আমি কোন ইনফরমেশন আজও তার কাছ থেকে পাইনি।'

'ভাল কথা, তোমার ইনফর্মার কোত্থেকে পেল খবরটা?' জেরা শুরু করল মোসাদ্দেক হাসান। 'সোর্সটা কি?'

'ও বলছে, শহরে নাকি এই রকম গুজব শোনা যাচ্ছে।'

'গুজব? গুজব নিয়ে তুমি আমার সময় নষ্ট করছ, মেজর রানা?' বিস্মিত দেখাল লে. কর্নেলকে। 'তাহলে বলো, এই রায়ট বাধাবার পেছনে কি উদ্দেশ্য ছিল খলিফার?'

'চুরি। ছিনতাই।'

'ভাল কথা!' রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল লে. কর্নেল। 'কি কি জিনিস চুরি গেছে?'

'সে অনেক লম্বা তালিকা,' বলল রানা। সিগারেট ধরাবার জন্যে একটু থামল ও। 'আমার যেটা চিন্তার বিষয়, এসবের সাথে একটা মিলিটারি ব্রীফকেসও চুরি গেছে।'

'তার মানে, আমাদের একজন অফিসারও এই রায়টের একজন ভিকটিম?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আমার ধারণা, ব্রীফকেস ছিনতাই করার জন্যেই রায়টটা

বাধানো হয়।'

'ভাল কথা, কি ছিল ওই ব্রীফকেসে?'

'ক্যান্টিন মেনু।'

খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল মোসাদ্দেক হাসান। 'আমাদের ক্যান্টিন মেনুই কি চিবিয়ে খাবে খলিফা?'

'ব্রীফকেসে কি ছিল তা তার জানার কথা নয়। তার হয়তো ধারণা ছিল দরকারী গোপন কাগজ-পত্র আছে ওতে।'

'তাহলে ওই একই প্রশ্ন একটু ঘুরিয়ে করতে হয় আমাকে,' বলল লে. কর্নেল। 'গোপন কাগজ-পত্র দিয়ে কি করবে খলিফা, চা গরম করবে?'

'আপনিই বলেছেন, ইনফরমেশন বিক্রি করে সে…'

'করে। কিন্তু মিলিটারি ইনফরমেশন বিক্রি করে তা তো বলিনি। তাছাড়া, এককালে আমরা তার কাছ থেকে ইনফরমেশন কিনতাম বটে, কিন্তু তার যে আরও ক্রেতা আছে, কই, সেরকম কিছু তো শুনিনি।'

'কেউ হয়তো টাকার বিনিময়ে এই কাজটা করিয়েছে তাকে দিয়ে,' বলল রানা।

'নির্দিষ্ট কারও কথা ভাবছ তুমি?'

'হ্যাঁ। আলেক বোগান।'

'কে?'

'এরই মধ্যে ভুলে গেছেন? আসিউতে একজন করপোরাল খুন হলো…'

'ভাল কথা, মনে পড়েছে,' তাচ্ছিল্যের হাসি দেখা গেল লে. কর্নেলের ঠোঁটে। 'খেয়েদেয়ে আর কাজ পাওনি, মেজর? আমি তো ভেবেছিলাম ওই লোকটার ভূত তোমার মাথা থেকে নেমে গেছে।'

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল রানার, কড়া সুরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এই সময় ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে গম্ভীর সুরে জানতে চাইল লে. কর্নেল, 'হু ইজ দেয়ার?'

অপর প্রান্তে কি শুনল কে জানে, শ্রদ্ধা আর বিনয়ে একেবারে বিগলিত হয়ে গেল মোসাদ্দেক হাসান। প্রতিটি বাক্যের আগে ও পরে একবার করে 'স্যার' বলছে।

এক মিনিট কথা বলল লে. কর্নেল। রানা গুনল, ত্রিশবার স্যার বলেছে সে। লোকটা সুপিরিয়র অফিসারদের সাথে কি রকম আচরণ করে তার একটা নমুনা পাওয়া গেল।

রিসিভার নামিয়ে রেখে জানতে চাইল লে. কর্নেল, 'হ্যাঁ, কি প্রসঙ্গে যেন কথা বলছিলাম আমরা?'

'কর্নেল,' বলল রানা, 'আপনার বোধহয় কিছুদিন ছুটি নেয়া দরকার।'

'দরকার তা আমিও বুঝি, কিন্তু দেখছ না কাজের কি চাপ…,' হঠাৎ থেমে রাজ্যের সন্দেহ নিয়ে রানার দিকে তাকাল লে. কর্নেল। 'কেন বলছ কথাটা?'

'আপনার স্মরণশক্তি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে,' শান্ত ভাবে বলল রানা। 'এক মিনিট আগে কি বিষয়ে কথা হচ্ছিল মনে রাখতে পারছেন না। অবশ্য শুধু ছুটিতে কাজ হবে না, আপনার ডাক্তারের পরামর্শও নেয়া দরকার। ব্রিগেডিয়ার নুরুদ্দীন হাফিজকে সব কথা খুলে বললে নিশ্চয়ই তিনি ছুটি দেবেন।'

চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল লে. কর্নেল, কিন্তু রানার মুখে ব্রিগেডিয়ার নুরুদ্দীন হাফিজের নাম শুনে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল সে। খুক খুক করে কাশল। 'ব্রিগেডিয়ার হাফিজকে চেনো তুমি?'

'পরিচয় আছে,' একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল রানা। 'আমি হয়তো কাউকে বলব না, কিন্তু আর কেউ যদি রিপোর্ট করে যে লে. কর্নেল মোসাদ্দেক হাসান কিছু মনে রাখতে পারছেন না, তখন? নিশ্চয়ই মেডিকেল বোর্ডের সামনে দাঁড় করানো হবে আপনাকে। আর খোদা না খাস্তা, সত্যি যদি প্রমাণ হয় যে আপনি স্মরণশক্তি খোয়াচ্ছেন, সাথে সাথে নট হয়ে যাবে চাকরিটা। এত আরামের চাকরি, কাজ বলতে কিছু করতে হয় না, শুধু গল্প করে সময় কাটানো...'

'তুমি একটু বেশি কথা বলছ, মেজর রানা,' অত্যন্ত সতর্ক সুরে বলল লে. কর্নেল। 'আমার স্মরণশক্তি ঠিকই আছে, কমেনি। কেউ যদি ব্রিগেডিয়ারের কাছে রিপোর্ট করে, আমি তাকে বোঝাতে পারব এটা আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে, আপনার ব্যাপার আপনি বুঝুন। হ্যাঁ, মনে আছে, কি প্রসঙ্গে যেন কথা বলছিলাম আমরা?'

'আলেক বোগানের ভূত,' দ্রুত বলল লে. কর্নেল। 'আমি বলছিলাম, লোকটার ভূত তোমার মাথা থেকে নেমে গেছে...'

'দুঃখিত, লে. কর্নেল। আসলে আপনি কিছুই ভোলেন না!'

'কাজের কথা হোক।' আবার খুক খুক কাশি দিল লে. কর্নেল।

হাসি চেপে বলল রানা, 'করপোরালের খুনী এখনও ধরা পড়েনি, কর্নেল। আমরা জানি, আলেক বোগান কায়রোয় এসেছে। সে কায়রোয় আসার সাথে সাথে আমাদের একটা ব্রীফকেস চুরি হলো, এর ভেতর চিন্তার খোরাক থাকতে পারে। আপনার কি ধারণা?'

'আমার ধারণা, ব্যাপারটা নিয়ে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। কারণ, ব্রীফকেসে গোপন কিছু ছিল না।'

'ইন্টেলিজেন্সে কাকতালীয় কিছু ঘটে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। নাকি করি, কর্নেল?' জানতে চাইল রানা।

'আমি শুধু সুপিরিয়র অফিসারদের মুখেই লেকচার শুনতে পছন্দ করি,' বলল মোসাদ্দেক হাসান। 'তোমার সন্দেহ যদি ঠিকও হয়, নতুন যে নির্দেশটা জারি করেছ সেটা ছাড়া আর কি করার আছে আমাদের?'

'খলিফার সাথে কথা বলেছি আমি,' প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল রানা। 'বলল, আলেক বোগানের নামও শোনেনি সে। আমার বিশ্বাস, খলিফা মিথ্যে কথা

বলছে।'

'লোকটার ওপর এতই যখন গোস্যা তোমার, ভাল কথা, পুলিসকে বলে ওকে গ্রেফতার করাচ্ছ না কেন?'

'এই কেন-র উত্তর আপনারও ভাল করে জানা আছে, কর্নেল,' বলল রানা। 'তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব নয়, কারণ অনেক সিনিয়র অফিসারকে মোটা টাকা ঘুষ দেয় সে। তবে, ইচ্ছে করলে আমরা তাকে এখানে ধরে নিয়ে এসে চাপ দিতে পারি, মোচড় দিয়ে আসল কথা আদায় করে নিতে পারি। এই লোকের মধ্যে কোন রকম সততা নেই, বাতাস উল্টো দিকে বইছে দেখলে দিক বদলাতে সময় নেবে না।'

'রাস্তা থেকে লোককে ধরে নিয়ে এসে ধোলাই দেয়া জেনারেল স্টাফ ইন্টেলিজেন্সের কাজ নয়, মেজর,' বলল লে. কর্নেল। 'এই লোকের বিরুদ্ধে আমাদের হাতে সলিড কোন প্রমাণ থাকলেও না হয় কথা ছিল।'

'কিন্তু ফিল্ড সিকিউরিটি, বা মিলিটারি পুলিস?'

'গিয়ে যদি বলি ক্যান্টিন মেনু চুরি করেছে এই সন্দেহে খলিফাকে আচ্ছা করে ধোলাই দেয়া হোক, ওরা আমাকে পাগল ঠাউরে বিদায় করে দেবে।'

রানা বুঝল, লে. কর্নেলের কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য পাওয়া যাবে না। ঠিক করল, ব্রিগেডিয়ার নুরুদ্দীনের সাহায্য চাইবে ও।

কিন্তু নিজের অফিসে ফিরে এসে টেলিফোনে ব্রিগেডিয়ারকে পেল না রানা। অপর প্রান্ত থেকে জানানো হলো, ব্রিগেডিয়ার আজ সকালে কায়রো ত্যাগ করেছেন। কবে ফিরবেন সে সম্পর্কে এখনই কিছু ধারণা করা যাচ্ছে না।

নয়

আবার সেই আগের জায়গায় ফিরে এসেছে আলেক বোগান—দরকারী কাগজ-পত্র কোথায় আছে জানে সে, কিন্তু নাগাল পাচ্ছে না।

একই পদ্ধতিতে আরও একটা ব্রীফকেস চুরি করতে পারে সে, কিন্তু তা করলে একটা প্যাটার্ন তৈরি করা হবে, ঈজিপশিয়ান ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা এটাকে একটা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বলে চিনে ফেলবে। ব্রীফকেস চুরির অন্য আরও অনেক উপায় আছে, কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। রোজ যদি একটা করে ব্রীফকেস চুরি যায়, ব্যাপারটা নিয়ে মহা হুলস্থুল পড়ে যাবে। অথচ কম করেও রোজ অন্তত একটা ব্রীফকেস দরকার আলেকের।

সেজন্যেই যা কোনদিন করার কথা ভাবেনি, আজ তাই করছে আলেক। রোপার সবচেয়ে বড় দুর্বলতার কথা জানে সে। এমন এক পর্যায়ে নিয়ে আসবে সে আজ ওকে, যে কোন কিছুতেই অমত করবার সাধ্য থাকবে না। যা খুশি তাই

করাতে পারে সে ওকে দিয়ে, শুধু এক বিশেষ প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিতে হবে আগে।

চিত হয়ে শুয়ে নিশ্চিন্তে আদর উপভোগ করছে রোপা, হঠাৎ আলেক বলল, 'আরও ব্রীফকেস পাবার একটা উপায় ভেবে বের করেছি আমি।'

'কি?'

সাথে সাথে আর কিছু বলল না আলেক। আদর করছে রোপাকে। বেশ কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল আলেক। বলল, 'ঠিক করেছি একজন মিলিটারি অফিসারের সাথে দোস্তি পাতাব।'

জবাবে কিছু বলল না রোপা। আলেকের কথা ভাল শুনতে পাচ্ছে না সে। আবেশে জড়িয়ে আসতে চাইছে দু'চোখ। আড়ষ্ট কণ্ঠে শুধু বলল, 'সত্যি!'

'তারপর অফিসার বন্ধুটিকে নিয়ে আসব এখানে।'

'কি? মাই গড! না!' হুঁশ ফিরে আসতে চাইছে রোপার।

'যেভাবে হোক, এখানে তাকে আমি ব্রীফকেস নিয়ে আসতে বাধ্য করব।'

কোন কথা বলতে পারছে না রোপা। আদরের চোটে গলা দিয়ে কেমন একটা ঘড়ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে।

'অফিসার তোমার সাথে বিছানায় থাকবে, এই সুযোগে সেই ব্রীফকেস খুলব আমি।'

'না!' দুর্বল রোপার কণ্ঠ।

মৃদু হাসল আলেক। বুঝল, শীঘ্রিই টোপ গিলবে রোপা।

পরে অবশ্য কথাটা ফিরিয়ে নিতে চাইল রোপা। 'আমাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে কথা আদায় করেছ, ওটার কোন দাম নেই।'

কোমরে বড় একটা তোয়ালে জড়িয়ে বাথরূম থেকে বেরিয়ে এল আলেক। দেখল, বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে রোপা, বাক্স থেকে নিয়ে চকলেট খাচ্ছে। মাঝেমধ্যে মেয়েটাকে সত্যি ভাল লাগে তার। বলল, 'প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই!'

'তুমিও তো প্রতিজ্ঞা করেছিলে, আমাকে আরেকটা ফিরোজা নিয়ে এসে দেবে। কই, দিয়েছ?'

'কেন, মাদাম হুসনার ওখানে যে মেয়েটাকে…'

'ওর সাথে ফিরোজার তুলনা কর তুমি! প্রতিবারের জন্যে একশো পাউন্ড চাওয়ার মেয়ে ছিল ফিরোজা? সকাল হলেই বাড়ি ফেরার জন্যে অস্থির হত?'

'ঠিক আছে, মানলাম। কথা যখন দিয়েছি, পাবে। খুঁজে বের করার জন্যে সময় দেবে তো!'

'তুমি খোঁজার প্রতিজ্ঞা করোনি, দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলে।'

পাশের কামরা থেকে এক বোতল শ্যাম্পেন আর দুটো গ্লাস নিয়ে এল আলেক। 'চলবে নাকি?'

'দাও।'

একটা গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে রোপার হাতে সেটা ধরিয়ে দিল আলেক।

'দেখতে খুব সুন্দর, ভাল স্বাস্থ্য, এই রকম এক অফিসার আনব তোমার জন্যে।'

গ্লাসে চুমুক দিয়ে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রোপা। 'আলেক, ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো। একজন মিলিটারির সাথে আমি শোব না। ওদের আমি ঘৃণা করি।'

'ঘৃণা কর বলেই তো কাজটা করতে হবে,' বলল আলেক। 'চোখ বুজে দৃশ্যটা একবার শুধু কল্পনা করো—তোমার বিছানায় উঠে লোকটা যখন ভাবছে দুনিয়ার সবচেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ সে, আমি তখন পাশের কামরায় বসে তার গোপন কাগজ-পত্র ঘাঁটছি।'

কাপড় পরতে শুরু করল আলেক। পুরানো শহরের এক দর্জিদোকান থেকে নতুন এই শার্টটা বানিয়েছে সে—ঈজিপশিয়ান ইউনিফর্ম শার্ট, কাঁধে ক্যাপ্টেনের ব্যাজ।

'এ কি। এটা কি পরছ তুমি?'

'ঈজিপশিয়ান অফিসার্স ইউনিফর্ম। জানোই তো, বিদেশীদের সাথে কথা বলে না ওরা।'.

'কিন্তু শুধু ইউনিফর্ম পরা থাকলেই কি ওরা তোমাকে স্বদেশী বলে ভুল করবে?'

'শুধু ইউনিফর্ম নয়,' বলল আলেক, 'মেকআপও নেব। আমার চেহারায় এদেশের ছাপ একেবারেই যে নেই তা তো নয়, সেটাকে আরেকটু বাড়িয়ে নিলেই হবে।'

'কিন্তু তবু যদি ওরা তোমাকে কোনভাবে ধরে ফেলে?'

কাঁধ ঝাঁকাল আলেক। 'তাহলে গুলি করে মারবে।'

মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল রোপা।

আলেক বলল, 'পছন্দসই কাউকে পেলে সোজা ডুম ডামে নিয়ে যাব তাকে।' কোমরে হাত দিয়ে খাপ থেকে লম্বা ফলার একটা ছুরি বের করল সে। দু'পা এগিয়ে এসে রোপার সামনে দাঁড়াল। ছুরির ডগা দিয়ে তার গলার পাশটা স্পর্শ করল সে। 'তুমি যদি আমাকে ডোবাও, তোমার নিচের ঠোঁটটা কেটে নেব আমি।'

আলেকের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল রোপা। মুখে কিছু বলল না বটে, কিন্তু মনে মনে বলল, তা তুমি পারো।

আলমিরা থেকে মেকআপ বাক্স বের করল আলেক, ড্রেসিং টেবিলের সামনে একটা টুলে বসল। আয়নায় চোখ রেখে দেখল, সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছে রোপা, চোখে বিষণ্ণ দৃষ্টি।

হোটেল শেরাটনকে অফিস-কাম-রেসিডেন্ট হিসেবে ব্যবহার করছে রাশিয়ান সামরিক অফিসাররা। ফলে মিসরীয় অফিসাররা নিয়মিত যাওয়া আসা করে এখানে, আড্ডা দেয়।

হোটেলের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল আলেক বোগান, ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে

হকার আর ফকির-মিসকিনদের ভিড় ঠেলে ফোয়ায়েতে ঢুকল। চারদিক লোকে লোকারণ্য, ধাক্কা না খেয়ে এক পা এগোনো মুশকিল। শহরের একদল ব্যবসায়ী আজ এখানে তাদের বাৎসরিক মীটিং করছে। রাশিয়ান আর্মি অফিসার আর বিদেশী জার্নালিস্টরা ভিড় করে আছে ব্যাংক আর পোস্ট-অফিসের সামনে। আধুনিক মিশরীয় মেয়েদের ঘিরে আরও এক জাতের ভিড় তৈরি হয়েছে, সেখানে রাশিয়ান ছাড়াও মিশরীয় অফিসাররা আঠার মত লেগে আছে পরস্পরের গায়ের সাথে। রাশিয়ানদের চোখে, এই হোটেল একটা উঁচুদরের ব্রোথেল বৈ কিছু নয়। মেয়েরা খাটো গাউন পরেছে, মুখে অনবরত খৈ ফুটছে। প্রকাণ্ড একজোড়া ব্রোঞ্জের তৈরি নারীমূর্তির মাঝখান দিয়ে লাউঞ্জে ঢুকল আলেক। বাদকদের ছোট একটা দল ইংলিশ মিউজিক বাজাচ্ছে। অফিসাররা গলা ছেড়ে ডাকাডাকি করছে ওয়েটারদের। মুসলমান সামরিক অফিসারদের মদ পান করার ব্যাপারে বিধি-নিষেধ থাকলেও, এখানে তা ঠিকমত মেনে চলা হয় না। ডিভান আর মার্বেল টপ টেবিলের মাঝখান দিয়ে পথ করে এগোল আলেক, শেষ মাথার একটা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল বার-এ।

ভিড় এখানে একটু কম। মেয়ে নিয়ে ঢোকা নিষেধ, কিন্তু যত খুশি কড়া মদ চাইলে কেউ বাধা দেবে না। নিঃসঙ্গ, একাকী বোধ করে এই রকম একজন অফিসারের এখানেই আসতে মন চাইবে।

কাউন্টারের সামনে একটা টুলে বসল আলেক। শ্যাম্পেনের অর্ডার দিতে যাবে, সিদ্ধান্ত পাল্টে হুইস্কি আর সোডা চাইল সে। ছদ্মবেশ সম্পর্কে তার মনে কোন দ্বিধা নেই, নিজেকে একজন মিশরীয় হিসেবে অনায়াসে চালাতে পারবে। আরবী ভাষাটাও ছোটবেলা থেকে রপ্ত করা আছে, ওদিক থেকেও কোন সমস্যা দেখা দেবে না। কেউ জিজ্ঞেস করলে কি বলতে হবে সে-গল্পও তৈরি রেখেছে।

অসুবিধে দেখা দিতে পারে মাত্র একটি বিষয়ে। আর্মি অফিসার, যাদের আলেকজান্দ্রিয়ায় পোস্টিং, তাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা নেই তার। অথচ নিজেকে ওদের একজন বলে পরিচয় দেবে বলে ঠিক করেছে সে। আলেকজান্দ্রিয়ায় বর্তমানে ঠিক কি ঘটছে, সে-সম্পর্কেও তার কোন পরিষ্কার ধারণা নেই। ওখানে আছে বা ছিল এমন একজন অফিসারেরও নাম জানে না। কারও সাথে আলাপ শুরু হলে কথাবার্তার ধরন কি হবে, কল্পনা করার চেষ্টা করল সে।

'গোলাম আলি আছে কেমন?'

'গোলাম আলি? আমার ডিপার্টমেন্টে বড় একটা দেখা যায় না তাকে।'

'তোমার ডিপার্টমেন্টে বড় একটা দেখা যায় না? কি বলছ! শুনেছি সে-ই তো তোমাদের ডিপার্টমেন্টকে মাতিয়ে রেখেছে। ডিপার্টমেন্টের পরিচয় দিতে তুমি ভুল করছ না তো?'

তারপর আবার—

'বাচাল মুস্তাফার খবর কি?'

'আরে, ওর কথা আর বোলো না, সেই আগের মতই!'

'দাঁড়াও, এক মিনিট—কে যেন বলছিল, মুস্তাফা ছুটি পেয়ে বাড়ি গেছে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে…হাসানের কাছে শুনেছি, সে নিজে তাকে তুলে দিয়েছে ট্রেনে। তুমি তাহলে ব্যাপারটা জানো না কেন?'

একবার দেখা দিলে সন্দেহ জিনিসটা বাড়তেই থাকে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। তর্ক-বিতর্ক শুনে ভিড় জমে যাবে। ডাকা হবে মিলিটারি পুলিস। তাকে গ্রেফতার করে পাঠানো হবে জেলখানায়।

হাতের তালু ঘামতে শুরু করল আলেকের। জেলখানার ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠলেই অসহায় শিশুর মত দুর্বল, অবুঝ হয়ে ওঠে সে। অনেক চেষ্টা করে আতঙ্ক ঝেড়ে ফেলল মন থেকে, দুই ঢোকে গ্লাস নিঃশেষ করে ওয়েটারকে ডাকল আবার।

ঘর্মাক্ত কলেবরে একজন কর্নেল ঢুকল বারে। আলেকের পাশের খালি টুলে বসল সে। অকারণ হাঁক ছেড়ে বলল, 'ওয়েটার!' তার পর ঘাড় ফিরিয়ে কটমট করে তাকাল আলেকের দিকে।

সবিনয় ভঙ্গিতে মাথা একটু নত করে মৃদু সুরে আলেক বলল, 'স্যার!'

'নিয়ম হলো, বারে ঢোকার সময় ক্যাপ খুলতে হবে,' গমগম করে উঠল কর্নেলের ভারী গলা। 'মগজটাকে বাড়িতে রেখে বেরিয়েছ নাকি?'

তাড়াতাড়ি ক্যাপ নামাল আলেক। বানচোত—ভুলের জন্যে নিঃশব্দে গাল দিল নিজেকে। ওয়েটার আসতে বিয়ারের অর্ডার দিল কর্নেল। ধীরে ধীরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল আলেক।

পনেরো থেকে বিশজন অফিসার রয়েছে বারে, কিন্তু একজনকেও চিনতে পারল না আলেক। জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে রোজ দুপুর বেলা মোট আটজন অফিসার বেরিয়ে আসে, তাদের একজনকে দরকার তার। প্রত্যেকের হাতে একটা করে ব্রীফকেস থাকে। চেহারাগুলো মনে গেঁথে রেখেছে সে, একবার দেখলেই চিনতে পারবে। এখানে আসার আগে হোটেল কসমো আর ম্যান'স ক্লাব হয়ে এসেছে, পায়নি কাউকে। শেরাটনে আধঘণ্টা দেখবে, কাউকে না পেলে অফিসার্স ক্লাব, সিটি স্পোর্টিং ক্লাব আর রাশিয়ান-ঈজিপশিয়ান ইউনিয়নের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়বে সে। বিড়ালের ভাগ্যে আজ রাতে শিকে না ছিঁড়লে কাল আবার চেষ্টা করতে হবে। আগে বা পরে, ওদের কারও না কারও সাথে দেখা হবেই।

তারপর গোটা ব্যাপারটা নির্ভর করবে তার ব্যক্তিগত নৈপুণ্য আর চাতুর্যের ওপর।

টোপ গেলাবার জন্যে আয়োজন কম করেনি সে। এই ইউনিফর্ম তাকে ওদের একজন করে তুলেছে। বিশ্বস্ত ও সহকর্মী। সৈনিক মাত্রই কিছুটা নিঃসঙ্গ হয়, কেউ

বেশি কেউ কম। এদের যৌন-তাড়নার কথাও কারও অজানা নেই। রোপা ইরিনার মত সুন্দরী মেয়ে হাজারেও একটা পাওয়া যাবে না। তার সাথে পরিচয় করার সুযোগ পেলে কে না বর্তে যাবে! আর এই রোপা যদি নিজেকে তার সামনে মেলে ধরে, লোকটার শুধু বোধহয় পাগল হতে বাকি থাকবে।

আর কপাল যদি মন্দ হয়, লোকটা যদি নপুংসক বা সন্ন্যাসীর মত সংযমী হয়, তাকে বাদ দিয়ে অন্য একজনকে বেছে নিতে হবে তার। সেক্ষেত্রে অবশ্য প্রচুর সময় নষ্ট হবে।

একজন মেজরকে বারে ঢুকতে দেখল আলেক। দেখেই চিনল সে। রোগা-পাতলা একহারা চেহারা, আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, চল্লিশ হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কপালে আর নাকের পাশে চামড়া ফুটে বেরিয়ে আছে সবুজ কয়েকটা শিরা, তার মানে প্রচুর মদ খায়। চোখ দুটো ঘষা কাঁচের মত। কোঁকড়া চুল।

রোজ দুপুর বেলা জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে শারি সুলায়মান পাশার একটা বাড়িতে যায় মেজর। ওই বাড়ির কোথাও কোন সাইনবোর্ড বা নেমপ্লেট নেই।

হার্টবিট বেড়ে গেল আলেকের। ভাবল, একে হলেও চলে।

কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল মেজর, ক্যাপ খুলল, ওয়েটারকে বলল, 'স্কচ। নো আইস। কুইক।' আলেকের দিকে ফিরল সে। 'শালার গরমে জানটা বেরিয়ে গেল!'

'আর বলবেন না, স্যার!' গরমে কাহিল হয়ে পড়েছে এই রকম একটা ভাব করে মাথা ঝাঁকাল আলেক।

'তারেক, জেনারেল হেডকোয়ার্টার,' বলল মেজর।

কথাবার্তা ইংরেজীতেই হচ্ছে। 'হাউ ডু ইউ ডু, স্যার,' বলল আলেক। তারেক রোজই জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে শহরের অন্য একটা বিল্ডিঙে যায়, কাজেই জেনারেল হেডকোয়ার্টারের স্টাফ হতে পারে না সে। লোকটা তাহলে মিথ্যে কথা বলছে কেন? নিজের দাম একটু বাড়াবার জন্যে? আপাতত চিন্তাটা বাদ দিয়ে আলেক বলল, 'আমি কাবিল, স্যার। ফ্রন্টিয়ার রেজিমেন্ট।'

'আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আসা হয়েছে!' এমন ভাব করল মেজর, যেন সব খবরই রাখে সে।

'ইয়েস, স্যার!'

'আরেকটু চালাও,' উৎসাহ দিয়ে বলল মেজর তারেক। 'এই গরমে আর তো কিছু করার নেই।'

আলেকের ভয় ছিল, একজন অফিসারের সাথে কথা শুরু করাটা সহজ হবে না। কিন্তু এখন দেখল, ব্যাপারটা পানির মত সহজ। আলাপটা তার কোন চেষ্টা

ছাড়াই নিজ থেকে এগিয়ে চলেছে। 'ভেরি কাইন্ড অভ ইউ, স্যার,' বলল সে।

'এত স্যার স্যার কোরো না তো। বারে যখন ঢুকি, তখন আমরা কেউ ছোট বড় নই, বুঝলে?'

সমীহের ভাব ফুটে উঠল আলেকের চেহারায়।

'কি চাই তোমার বলো।'

'হুইস্কি আর ওয়াটার, প্লীজ।'

'আমি হলে সাথে পানি চাইতাম না,' বলল তারেক। 'শুনেছি, সোজা নাইল থেকে তুলে এনে গ্লাসে ঢেলে দেয়া হয়।'

'আসলে অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমরা।'

আলেকের সামনে গ্লাস রাখল ওয়েটার। দুই চুমুকে সেটা খালি করে ফেলল আলেক।

'শাবাশ!' আলেকের পিঠ চাপড়ে দিল মেজর। ওয়েটারের দিকে তাকাল। 'আরও, আরও!'

'এবার কিন্তু, স্যার, আমার তরফ থেকে!' আবদারের সুরে বলল আলেক।

'বোঝাই যাচ্ছে কায়রোয় ছুটি কাটাতে এসেছ। কে কে আছে এখানে?' জানতে চাইল মেজর।

বানানো গল্পটা গড়গড় করে বলে গেল আলেক, কোথাও ঠেকল না। নেশার ঘোরে নিজের গল্প শুরু করল মেজর। তার জীবন এক কাহন দুঃখ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রথমে সে তার প্রথম স্ত্রীর রূপের বর্ণনা দিল, বউটার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সব কিছুরই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল সে। তারপর বলল, 'শালী আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল।'

'পালিয়ে গেল! বলেন কি, স্যার!' বলল আলেক। 'অত যখন সুন্দরী, তাকে আপনার খুব কড়া পাহারায় রাখা উচিত ছিল!'

'তা কি আর রাখিনি!' নেশার ঘোরে ঘন ঘন মাথা দোলাতে শুরু করল মেজর। 'কিন্তু তার ওপর এমন এক চোরের নজর পড়ল, শত পাহারাতেও ঠেকাবার উপায় ছিল না।'

খলিফার কথা মনে পড়ল আলেকের। বলল, 'আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না, স্যার।'

'প্রথম বউকে যে চুরি করেছে, সেই আবার চুরি করল আমার দ্বিতীয় বউকে,' ঢুলু ঢুলু চোখ মেলে বলল মেজর তারেক। 'সেই থেকে ঠিক করেছি, আর বিয়ে নয়। ঠিক করেছি, দুনিয়ার সব যুবতী মেয়েকে আমার বউ বলে মনে করব। কিন্তু মুশকিল হলো, বেশ্যাগুলোই শুধু আমার এই দাবি মানে, আর কেউ পাত্তা দেয় না...'

কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না আলেক, জানতে চাইল, 'সেই চোরটা কে, স্যার? তার নাম কি?'

'বহুত বড় চোর, ক্যাপ্টেন, বহুত বড় চোর!' ওয়েটারের দিকে ফিরল সে। 'আরও এক পেগ করে লাগাও তো হে!' ফিরল আলেকের দিকে। 'নাম? চোরের নাম? জনাবের নাম, আজরাইল।'

প্রথমে ব্যাপারটা বোধগম্য হলো না আলেকের, তারপর বুঝতে পেরে প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখে গম্ভীর সুরে বলল সে, 'হ্যাঁ, এই চোরের সাথে পারা মুশকিল।'

এই সময় বারে ঢুকল মিলিটারি পুলিসের একটা দল। দেখেই ধক করে উঠল আলেকের বুক, ছাই হয়ে গেল মুখের চেহারা। আড়চোখে তাকিয়ে দেখে, মেজরেরও নেশার ঘোর এক নিমেষে কেটে গেছে। চোখ ফিরিয়ে মিলিটারি পুলিসের দিকে তাকাতে যাবে আলেক, মেজর জানতে চাইল, 'তোমাকে হঠাৎ এমন অসুস্থ দেখাচ্ছে কেন, ক্যাপ্টেন? কি দেখেছ, ভূত?'

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে নিশ্চল পাথরের মত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে এম.পি.-র দল। মোট ছয়জন। প্রত্যেকের চোখ একদিক থেকে আরেক দিকে ঘুরছে। দ্রুত চিন্তা করল আলেক, কি বলবে সে ওদেরকে? কি জিজ্ঞেস করবে ওরা?

'আরে, কিছু না, মাতাল অফিসার আর ছদ্মবেশী ইসরায়েলি স্পাই আছে কিনা দেখতে এসেছে। রুটিন টহল, রোজই আসে।'

মেজর কি বলছে সেদিকে কোন খেয়াল নেই আলেকের। পালাতে হলে কোন্ দিক দিয়ে পালাবে ঠিক করতে পারছে না সে।

'এটা অফিসারদের বার, ওরা আমাদের বিরক্ত করবে না,' আবার বলল মেজর। 'তোমার এত ভয় পাবার কি আছে···ছুটি না পেয়ে পালিয়ে চলে আসোনি তো?'

'না, না!' তাড়াতাড়ি বলল আলেক। 'বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয় এম. পি, ওর সাথে আমার পরিচিত একজনের চেহারার মিল রয়েছে। আমি যাকে চিনি, গত মাসে একটা অনুপ্রবেশের ঘটনায় মারা গেছে সে। তাই একটু হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম আর কি!' মেজরের সাথে কথা বলছে, কিন্তু তাকিয়ে আছে মিলিটারি পুলিসদের দিকে। কঠোর, নিষ্ঠুর চেহারা ওদের। স্টীল হেলমেট আর হোলস্টারে ঢোকানো পিস্তল আরও ভয়াল দর্শন করে তুলেছে ওদেরকে। ঢোক গিলল আলেক। ওরা কি তার কাগজ-পত্র দেখতে চাইবে?

মিলিটারি পুলিসের কথা ভুলে যেতে চাইছে মেজর তারেক। বলল, 'তুমি বললে, কায়রোয় বড় হয়েছ, তা ভাল জিনিসের খবর-টবর রাখো নাকি হে?'

মিলিটারি পুলিসদের লীডার এগিয়ে আসতে শুরু করল। তালুর ঘাম মোছার জন্যে কোমরের কাছে হাত রাখল আলেক, ছুরির স্পর্শ নিল।

কর্নেলের সামনে এসে দাঁড়াল লীডার। স্যালুট করল এই কর্নেল হ্যাট খুলতে বলেছিল আলেককে।

'সব ঠিক আছে, স্যার?' জিজ্ঞেস করল লীডার।

দ্রুত একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে কর্নেল জানাল, 'হ্যাঁ।'

'তোমার হয়েছেটা কি বলো তো?' আলেককে জিজ্ঞেস করল মেজর। 'হঠাৎ বোবা হয়ে গেলে কেন?'

ভুরু থেকে এক ফোঁটা ঘাম পড়ল আলেকের চোখে। শার্টের আস্তিন দিয়ে চোখ মুছল সে।

'শুনেছি, এই শহরের দর্জিরা নাকি মিলিটারি ইউনিফর্ম বানিয়ে যে চায় তার কাছেই চড়া দামে বিক্রি করে,' বলল তারেক। 'কেনে কারা জানো? মদের পোকারা। ইউনিফর্ম পরে ঢুকলে এই হোটেলে মদ পাওয়া যায়...'

'আপনি কি আমাকে, স্যার...আপনার সন্দেহ হলে চেক করে দেখছেন না কেন!' আহত সুরে বলল আলেক।

'আরে, তোমাকে বলব কেন!' হেসে উঠল মেজর। 'তুমি আমাকে ভুল বুঝছ...'

'আসলে চেহারার এমন মিল আমি আর দেখিনি...'

মিলিটারি পুলিসের লীডার লোকটা আবার ঘরের চারদিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। আলেকের সাথে চোখাচোখি হলো তার। যেভাবে ঘামছি, ভাবল আলেক, মুখের রঙ ধুয়ে যেতে শুরু করেনি তো? আসিউত হত্যাকাণ্ডের কথা কি মনে আছে লীডারের? খুনীর চেহারার বর্ণনা?

এত ভয় পাবার কিছু নেই। করপোরালের খুনীকে ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় দেখতে পাবে বলে আশা করছে না কেউ। ওই তো, চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে লীডার।

এক মুহূর্ত পর আবার আলেকের দিকে তাকাল লীডার। ছ্যাঁৎ করে উঠল আলেকের বুক। কেন, আবার তাকাল কেন? কিছু সন্দেহ করেছে? অন্যমনস্কতার ভান করে চোখ ফিরিয়ে নিল আলেক, গ্লাস তুলে ঠোঁটে ঠেকাল। লীডার কি এখনও দেখছে ওকে?

বুটের আওয়াজ। একটা নয়, অনেকগুলো। ইচ্ছে হলো তাকায়, কিন্তু তাকাল না আলেক। বুঝল, দলটা চলে যাচ্ছে।

'যা বলছিলাম,' বকবক করে চলেছে মেজর তারেক, 'তুমি তো এই শহরের লোক, ভাল জিনিসের খোঁজ-খবর রাখো কিছু?'

প্রশ্নটা বিবেচনার ভান করল আলেক। 'ভাল জিনিস বলতে আপনি ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন, জানি না। আচ্ছা বেলি ড্যান্স দেখেছেন কখনও?'

চেহারা বিকৃত করল তারেক। 'একবার। এক ধুমসী, হস্তিনীর মত পাছ দোলায় শুধু...জঘন্য!'

'ও, আসল জিনিস তাহলে আপনি দেখেননি!'

আলেকের দিকে ঝুঁকে পড়ল মেজর। 'আসল জিনিস?'

'এর চেয়ে উত্তেজক নাচ আর হতে পারে না, স্যার।'

মেজরের ঘষা কাঁচের মত চোখে অদ্ভুত একটা আলো ফুটে উঠল। 'সত্যি?'

আলেক ভাবল, মেজর তারেক, আমি ঠিক তোমার মত একজনকেই চেয়েছিলাম। 'রোপার নাম শুনেছেন? রোপা ইরিনা? কায়রোর সেরা ও। ভুল হলো, মধ্য প্রাচ্যের সেরা। ওর নাচ জীবনে একবার হলেও দেখা উচিত আপনার।'

'অবশ্যই দেখা উচিত, তুমি যখন এত করে বলছ। কোথায় গেলে দেখতে পাব বলে দাও।'

হেসে ফেলল আলেক। 'সত্যি কথা বলতে কি, আপনার উৎসাহ দেখে আমারও আজ দেখতে ইচ্ছে করছে। কোথায়? ডুম ডাম ক্লাবে! ইচ্ছে করলে আপনি আমার সঙ্গী হতে পারেন।'

'তার আগে আমার তরফ থেকে আরেক দফা হয়ে যাক,' বলল তারেক। 'ওয়েটার!'

গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে মেজর, তার দিকে তাকিয়ে থেকে আলেক ভাবছে, লোকটা হয়তো অসৎ নয়, কিন্তু অসৎ করে তুলতে বিশেষ বেগ পেতে হবে বলে মনে হয় না। সংযম বা নীতিবোধ এই লোকের নিতান্তই কম। জীবনের ওপর বিরক্তি এসে গেছে, একঘেয়েমিতে ভুগছে, মদের দিকে প্রবল ঝোঁক, ইচ্ছেশক্তির নিদারুণ অভাব। এই লোক যদি রোপার মত সুন্দরী মেয়ের সঙ্গ পায়, মেঝেতে ফেলে নিজের থুথু চাটা থেকে শুরু করে দেশের সাথে বেঈমানী, সবকিছু করতে রাজি হবে।

আগে অবশ্য জেনে নিতে হবে মেজরের ব্রীফকেসে দরকারী কাগজ-পত্র আছে, নাকি ক্যান্টিন মেনুর মত আবর্জনা। হোটেল থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিল ওরা। ড্রাইভারকে আলেক বলল, 'ডুম ডাম।'

কে টিকেট কিনবে তাই নিয়ে এক মিনিট তর্ক হলো ওদের মধ্যে। আলেক বলল, 'আপনি আমার অতিথি, স্যার। আজকের খরচ সব আমার।' শেষ পর্যন্ত তার যুক্তিই মেনে নিতে হলো মেজরকে।

ক্লাবের ভেতর ঢুকল ওরা। রোজকার মত আজও তিল ধারণের জায়গা নেই। তবে ইউনিফর্ম দেখে ওয়েটাররা বিশেষ খাতির করল ওদেরকে। একেবারে সামনের সারিতে না হলেও, স্টেজের কাছাকাছি একটা টেবিলের ব্যবস্থা হয়ে গেল। ওরা আসন গ্রহণ করার এক মিনিট পরই শুরু হলো রোপার নাচ। রোপার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল মেজর তারেক, আর আলেক তাকিয়ে থাকল মেজরের দিকে। একটু পরই মুখ হাঁ হয়ে গেল মেজরের, হাঁপাতে শুরু করল সে। রোপার নাচ তাকে পাগল বানিয়ে ছাড়ছে।

হে হে করে হাসল আলেক। 'দারুণ, তাই না, স্যার?'

'ফ্যানটাসটিক,' রোপার দিকে চোখ রেখে জবাব দিল মেজর।

'আপনাকে তাহলে বলেই ফেলি, স্যার,' খুক করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল আলেক। 'রোপার সাথে আমার একটু-আধটু পরিচয় আছে। নাচের পর আমাদের টেবিলে আসতে বলব ওকে?'

'আসবে?' ঝট করে আলেকের দিকে ফিরল মেজর। 'আনতে পারবে?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি,' বলল আলেক।

'করছ না কেন!' ধমক দিল মেজর।

দশ

ছন্দ ও সুর দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠল। কয়েকশো দর্শক, তাদের ওপর চোখ বোলাল রোপা। সবাই তার শরীরটাকে গোগ্রাসে গিলছে। রোপা চোখ বুজল।

ব্যাপারটা আর চেষ্টাকৃত কসরতের পর্যায়ে থাকল না, স্বতস্ফূর্ত হয়ে উঠল। বিচিত্র সব বোধ আর অনুভূতি জাগল রোপার মনে, সে-সব থেকেই জন্ম নিল বিদ্যুৎগতি কম্পন আর শিহরণ। কল্পনায় কয়েকশো জোড়া চোখ দেখতে পেল সে, তাকে গিলছে। আরও দ্রুত হয়ে উঠল নাচ। রোপার এই মুহূর্তের নাচে আর কোন কৃত্রিমতা নেই, এখন শুধু নিজে থেকে নিজের জন্যে নাচছে সে। এখন এমন কি মিউজিকও অনুসরণ করছে না, মিউজিকই বরং তাকে অনুসরণ করছে। উত্তেজনার ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিল তাকে, সেই উত্তেজনার তুঙ্গে চড়ে নাচতে লাগল রোপা। তারপর একসময় বুঝতে পারল, আর সে পারবে না, এবার থামতে হবে, তা নাহলে গোটা অস্তিত্বে ঘটবে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ। রোপা উপলব্ধি করল, এখন শুধু ছোট্ট একটা লাফ দিলেই হয়, উড়তে শুরু করবে সে। কিনারায় পৌঁছে দ্বিধায় পড়ে গেল। তারপর মেলে দিল হাত দুটো। বিস্ফোরিত হলো ড্রাম। ক্ষোভ, বেদনা, আকুতি আর অতৃপ্তি মেশানো তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। পিছন দিকে পড়ে যেতে শুরু করল সে। ভাঁজ হয়ে গেল পা। উরু জোড়া উন্মুক্ত হলো দর্শকদের দিকে। ধীরে ধীরে স্টেজে ঠেকল তার মাথা। তারপর অন্ধকার।

প্রতিবার এইভাবেই শেষ হয়।

প্রচণ্ড উল্লাস আর করতালির মধ্যে অন্ধকার স্টেজ থেকে নেমে এল রোপা। কারও দিকে তাকাল না, হন হন করে এগোল ড্রেসিং রুমের দিকে, মাথাটা নিচু হয়ে আছে। কারও কোন কথা বা প্রশংসা শুনতে চায় না সে। ওরা কেউ বোঝে না। রোজ রাতে নাচার সময় কি ঘটে যায় তার মধ্যে, সে যে কি কষ্ট, কাউকে বোঝানো যাবে না।

কাপড় খুলে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নিল রোপা, মেকআপ তোলার জন্যে আয়নার সামনে বসল। এই কাজে সময় নষ্ট করে না সে, বেশিক্ষণ মেকআপ নিয়ে থাকলে চামড়ার ক্ষতি হয়। সম্পদ বলতে তো এই, চেহারা আর শরীর, এ-দুটোর

যত্ন নিতে হয় তাকে। মুখ আর গলায় ফোলা ফোলা একটা ভাব এসে গেছে, ক'দিন থেকে লক্ষ করছে সে। চকলেট খাওয়া বন্ধ করতে হবে। মেয়েরা যে বয়সে মোটা হতে শুরু করে, সেটা পেরিয়ে এসেছে সে। তার বয়স বিরাট এক রহস্য, দর্শকদের যা কোনদিন জানতে দেয়া চলবে না। বাবা যে বয়সে মারা গেল, তারচেয়ে বেশি বয়স হয়েছে তার। বাবা…

প্রকাণ্ড শরীর ছিল বাবার, স্বভাব ছিল রগচটা। যতটা আশা করত জীবনের অর্জন তার কাছাকাছিও পৌঁছায়নি, তাই চিরকাল অসন্তুষ্ট ছিল লোকটা। বোধহয় সেজন্যেই রুচি-বিকৃতি ঘটে তার।

ছোট্ট একটা ভাড়াটে ঘরে থাকত তারা। পেট ভরে রোজ খাবার জুটত না। তবু সেই জীবনটা ছিল নিরাপদ আর আনন্দের। বাবার চওড়া পিঠে মুখ গুঁজে ঘুমাত সে। বাবার গায়ের পরিচিত গন্ধটা আজও লেগে আছে তার নাকে।

তারপর, গভীর রাতে, যখন তার ঘুমাবার কথা, আরেক ধরনের একটা গন্ধ পেত সে। এই গন্ধটা ভীষণ ভাবে উত্তেজিত করে তুলত তাকে। অন্ধকার ঘরে বাবা আর মা নড়াচড়া করত, পাশাপাশি শুয়ে ওদের সাথে নড়াচড়া করত রোপাও। ব্যাপারটা কি ঘটছে, দু'একবার টের পেয়ে যায় মা। বাবা ওকে মারধর করে। তিন বার এই ঘটনা ঘটলে খাট থেকে নামিয়ে মেঝেতে শুতে দেয়া হয় তাকে। এরপর থেকে ওদের শব্দ শুনতে পেত সে, কিন্তু আনন্দের ভাগ পেত না। রোপার মনে হত, ওর সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হচ্ছে। এর জন্যে মাকেই সম্পূর্ণ দায়ী করত সে। বাবা যে মনে মনে চাইত, আনন্দের ভাগ দিতে অরাজি ছিল না, রোপা সেটা অনুমানে ধরতে পারত।—একেবারে সেই প্রথম থেকেই বাবা জানত, কি করছে মেয়ে। মেঝেতে শুয়ে ঠাণ্ডায় হি হি করত রোপা, তাকে সঙ্গে নেয়া হয়নি বলে চুপি চুপি কাঁদত। দূর থেকে ওদের আওয়াজ শুনে ব্যাপারটা উপভোগের চেষ্টা করেছিল সে, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। তারপর থেকে কোন কিছুই আর উপভোগ করতে পারেনি রোপা, যতদিন না তার জীবনে বোগান এল…

ছোট্ট ঘরের ভেতর সরু বিছানার কথা আলেককে কখনও বলেনি রোপা। কিন্তু কিভাবে যেন রোপার রুচি আর দুর্বলতা টের পেয়ে যায় সে। মুখে স্বীকার না করলে কি হবে, অন্তরের গভীরে কিছু গোপন চাহিদা থাকে মানুষের, সেগুলো উপলব্ধি করার আশ্চর্য একটা শক্তি আছে আলেকের। আলেক আর ফিরোজা নামের সেই মেয়েটা রোপার ছোটবেলার পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছিল, সেজন্যে আলেকের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ সে।

কাজটা যে আলেক দয়া পরবশ হয়ে করেনি, রোপা তা বোঝে। লোকের কাছ থেকে কাজ আদায়ের জন্যে রোপাকে ব্যবহার করত সে, তাই রোপাকে সন্তুষ্ট রাখার দরকার হত তার। এত বছর পর আবার সে ফিরে এসেছে সেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে—স্পাই হিসেবে মিশরীয়দের বিরুদ্ধে তাকে ব্যবহার করবে।

মিশরীয়দের ঘৃণা করে রোপা, তাদের ক্ষতি করার জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু করতে রাজি আছে সে। শুধু মিশরীয় কোন আর্মি অফিসারের সাথে শুতে পারবে না। তার বাবাকে এই মিশরীয় সৈনিকরা খুন করেছে, তাদের কারও সাথে শোবার

অভিনয় করাও তার দ্বারা সম্ভব নয়।

দরজায় নক হলো।

'কাম ইন।'

হাতে একটুকরো কাগজ নিয়ে ভেতরে ঢুকল একজন ওয়েটার। তাকে বিদায় করে দিয়ে কাগজটার ওপর চোখ বুলাল রোপা। ছোট্ট একটা মেসেজ—'বারো নম্বর টেবিল। আলেক'।

কাগজটা মুঠোর ভেতর মুচড়ে মেঝেতে ফেলে দিল রোপা। শিকার তাহলে একজন পেয়েছে আলেক। খুব তাড়াতাড়ি পেয়েছে বলতে হবে। মানুষের দুর্বলতা খুঁজে সেটাকে কাজে লাগাবার বুদ্ধিটা আবার তাহলে খুলছে।

আলেককে বোঝে সে, কারণ সে-ও আলেকের মতই। রোপাও লোককে ব্যবহার করে, যদিও আলেকের মত অত চাতুর্যের সাথে পেরে ওঠে না। রোপা এমন কি আলেককেও ব্যবহার করে। আলেকের মধ্যে একটা স্টাইল আছে, রুচি আছে, উঁচু মহলে বন্ধু-বান্ধব আছে, আর আছে টাকা। একদিন তাকে নিয়ে ইউরোপে বেড়াতে যাবে সে। তারপর তেলআবিব। মিশরে স্টার হওয়া এক কথা, তেলআবিবে হওয়া আরেক কথা। ইসরায়েলি কর্নেল, মেজর জেনারেল, অ্যাডমিরাল, আর স্কোয়াড্রন লীডারদের সামনে নাচতে চায় রোপা। নাচতে চায় ইউরোপের বড় বড় শহরে। প্রভাবশালী পুরুষ আর সুন্দরী মেয়েদের প্রশংসা আর ভক্তি চায় সে। তার অঙ্গুলি হেলনে ওরা সবাই নতজানু হবে, এই তার মনের আশা। ক্যাবারে জগতের রাণী হয়ে চায় সে। আলেক হবে তার পাসপোর্ট। হ্যাঁ, আলেক বোগানকে ব্যবহার করছে সে।

দু'জনের সম্পর্কটাকে ঠিক স্বাভাবিক বলা চলে না, জানে সে। এত কাছাকাছি রয়েছে ওরা, অথচ পরস্পরকে কত কম ভালবাসে।

বলেছে, ঠোঁট কেটে দেবে।

শিউরে উঠল রোপা। কথাটা ভুলে যাবার চেষ্টা করল। চওড়া আস্তিনের সাদা একটা টপ পরল সে, বুকের অর্ধেকটাই খোলা থেকে গেল। আঁটসাঁট স্কার্ট, সরু করে রাখল কোমর। হাইহিল লাগানো স্যান্ডেল জোড়াও সাদা। দুই কব্জিতে পরল একটা করে সোনার ব্রেসলেট, বেশ ভারী। গলায় পরল সরু চেন, বুকের মাঝখানে থাকল হীরে বসানো ছোট একটা লকেট। আয়নায় শেষ একবার নিজেকে দেখে নিয়ে ড্রেসিং রূম থেকে বেরিয়ে ফ্লোরে চলে এল সে।

তাকে দেখেই চুপ হয়ে গেল সবাই। রোপা পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলে পিছনের লোকজন তাকে নিয়ে আলাপ শুরু করল। সে যেন সবাইকে রেপ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, অন্তত রোপার নিজের অনুভূতিটা সেই রকমই হলো। স্টেজে থাকাটা আলাদা, দর্শক আর তার মাঝখানে অদৃশ্য একটা পাঁচিল থাকে। কিন্তু ফ্লোরে তারা ওকে ছুঁতে পারে, ছুঁতে চায়ও। কেউ ছুঁতে চেষ্টা করেছে, এমন ঘটনা আজও ঘটেনি, তবে আশঙ্কাটা সব সময় রোমাঞ্চিত করে রোপাকে।

বারো নম্বর টেবিলের সামনে থামল সে। ওরা দু'জনই উঠে দাঁড়াল।

'রোপা, মাই ডিয়ার,' বলল আলেক, 'তোমার তুলনা হয় না! কি যে অদ্ভুত

জিনিস শিখেছ...'

ছোট্ট করে মাথা দুলিয়ে প্রশংসাটুকু গ্রহণ করল রোপা।

'এসো, তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই,' আবার বলল আলেক। '...মেজর তারেক...'

মেজরের সাথে করমর্দন করল রোপা। দেখল, লোকটার গোঁফ জোড়া সুন্দর, কিন্তু হাত দুটো কুৎসিত। ভাবল, লোকটা এত রোগা কেন? মেজরের দৃষ্টির সামনে একটু অস্বস্তি বোধ করল সে। এমন ভাবে তাকিয়ে আছে, রোপা যেন তিরিশ সের ওজনের একটা আপেল।

তারেক বলল, 'তোমার ড্যান্স আমাকে পাগল করে তুলেছে। তুমি অপূর্ব! আবার এই নাচ দেখার বিনিময়ে কিছুদিন যদি নরকে থাকতে হয়, আপত্তি করব না।'

'সে-ব্যবস্থা করা হচ্ছে,' মনে মনে বলল আলেক।

'ধন্যবাদ,' মৃদু হেসে বলল রোপা, ওদের মাঝখানের খালি চেয়ারটায় বসল সে।

টেবিলের ওপর দিয়ে হাতটা লম্বা করে দিল মেজর। শিরা ফুটে থাকা হাতের ওপর লম্বা লম্বা কালো লোম, গা ঘিন ঘিন করে উঠল রোপার। তার একটা হাতের ওপর আঙুল রাখল লোকটা। ঘষা কাঁচের মত চোখে নির্লজ্জ লোভ। ভেজা ঠোঁট জোড়া ফাঁক হয়ে আছে। ভেতরে দেখা যাচ্ছে জিভের লাল ডগা। 'তুমি সুন্দর, মাদামোয়াজেল। রক্ত মাংস নও, যেন আগুন জ্বলছ।'

তুমি একটা গাধা, ভাবল রোপা।—আলেক তোমার বারোটা বাজাবে। রোপা দেখল, চোখ-ইশারায় তাকে সাবধান করার চেষ্টা করছে আলেক। মনে মনে হাসল রোপা। তার মনে কি হচ্ছে, টের পেয়ে গেছে আলেক। 'আপনি বাড়িয়ে বলছেন, মেজর,' বলল সে।

রোপা বুঝতে পারল, আলেক নার্ভাস হয়ে পড়েছে। রোপা তার কথা মত কাজ করবে কিনা সন্দেহ আছে তার মনে। আসলে, এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি রোপা।

'রোপার বাবাকে চিনতাম আমি,' মেজরকে বলল আলেক। 'ভদ্রলোক মারা গেছেন।'

মিথ্যে কথা। কথাটা কেন বলল আলেক, রোপা জানে। বলল তাকে ভয় দেখাবার জন্যে।

রোজগারের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে রোপার বাবা অভাবের তাড়নায় চুরি-টুরিও করত। সেটাই তার কাল হয়। না জেনে একজন আর্মি কর্নেলের বাড়িতে চুরি করতে যায় সে, ধরাও পড়ে। কর্নেলের বাড়িতে দু'জন সৈনিক পাহারায় ছিল, চোরকে বেঁধে বেদম মারধর করে তারা। চোর মারা যায়।

এই অন্যায়ের কোন বিচার হয়নি। থানা থেকে তার মাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল, কেস নেয়া হয়নি। কারণ? কারণ লোকটা একে ইহুদি, তার ওপর চোর।

রোপার তখন বারো বছর বয়স। সেই বয়সেই মুসলমানদের ঘৃণা করতে শেখে সে। মনে মনে কামনা করে মিশরের অস্তিত্ব ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিক ইসরায়েল। মিশরের ক্ষতি করার জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু করতে রাজি সে। ইসরায়েল যদি মিশর আক্রমণ করে, রোপা ইসরায়েলকে সাহায্য করবে।

হ্যাঁ, দরকার হলে এমন কি একজন মুসলমান সামরিক অফিসারের সাথেও শোবে রোপা।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে, বলল, 'মেজর তারেক, আপনার চেহারায় আশ্চর্য একটা আকর্ষণ আছে।'

আলেকের পেশীতে ঢিল পড়ল।

প্রথমে বিমূঢ় দেখাল মেজরকে। কোটর থেকে বেরিয়ে এসে চোখ দুটো টপটপ করে পড়ে যাবে বলে মনে হলো। 'খোদার কসম, এই প্রথম শুনলাম! তুমি সত্যি বলছ?'

'মিথ্যে কেন বলব,' কাধ ঝাঁকাল রোপা। 'সুন্দরকে সুন্দর বলতে দোষ কি, মেজর?'

'রোপা, সুইট রোপা,' জিভের ডগা বের করে ঠোঁট ভেজাল মেজর। 'প্লীজ, তুমি আমার নাম ধরে ডাকবে!'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আলেক। 'দুঃখিত, রোপা—জরুরী কাজ আছে, না গেলেই নয়। চলো, পৌঁছে দিই তোমাকে।'

তারেক তাড়াতাড়ি বলল, 'সে-ব্যাপারে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমি তো রয়েইছি।'

'ইয়েস, স্যার।'

'মানে…,' শুরু করল তারেক, '…রোপা যদি আপত্তি না করে আমিই তো ওকে পৌঁছে দিতে পারি।'

চোখ পিট পিট করল রোপা, বলল, 'বেশ তো, দেবেন।'

'যেতে খারাপ লাগছে, কিন্তু না গেলেও উপায় নেই,' ম্লান মুখে বলল আলেক।

'কাজ ফেলে রেখে আড্ডা দেওয়া ঠিক নয়,' উপদেশ ঝাড়ল মেজর। 'দেরি কোরো না, যাও।'

আলেক চলে যেতেই মেজর প্রস্তাব দিল, 'আমার ইচ্ছে, তুমি আমার সাথে আজ ডিনার খাও।'

'কিন্তু…'

'প্লীজ, রোপা!'

হেসে ফেলল রোপা। বলল, 'ঠিক আছে।'

'আমার আবার খাওয়ার অভ্যেস আছে,' ডিনারের অর্ডার দিয়ে বলল মেজর। 'তুমি কিছু মনে করবে নাকি?'

'কি খাওয়ার…' তারপর বুঝতে পারল রোপা। ঠোঁটে হাসি নিয়ে বলল, 'ওই দোষ এক-আধটু আমারও আছে।'

'ভেরি গুড!' বলে ওয়েটারকে ডেকে নিজের জন্যে হুইস্কি আর রোপার জন্যে শ্যাম্পেনের অর্ডার দিল মেজর।

ওদের গ্লাস খালি হয়েছে, এই সময় এসে পৌছুল ইউরোপিয়ান ডিনার, স্টেক আর পটেটো। খেতে খেতে অনেক কথাই বলে গেল মেজর, কিন্তু বিষয় একটাই। স্কুল ক্রিকেট টীমে খুব ভাল খেলত সে। রোপার ধারণা হলো, তারপর থেকে এই বয়স পর্যন্ত আর কোন বিষয়ে কোন রকম সাফল্য অর্জন করেনি লোকটা। অত্যন্ত বিরক্তিকর চরিত্র। সাংঘাতিক একঘেয়ে লাগল রোপার।

মিশরীয় সৈনিকরা তার বাবাকে ধরে মারছে, কল্পনায় দৃশ্যটা দেখার চেষ্টা করল সে।

ওয়েটারকে ডেকে নিজের গ্লাস দু'বার করে ভরে নিল মেজর। ক্লাব থেকে বেরুবার সময় রোপা লক্ষ করল, মেজর একটু একটু টলছে। উপায় নেই দেখে তাকে নিজের একটা হাত ধরতে দিল ও।

রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে গা জুড়িয়ে গেল। হাঁটতে হাঁটতে হাউজবোটের কাছে চলে এল ওরা। আকাশের দিকে মুখ তুলে সেদিকে রোপার দৃষ্টি আকর্ষণ করল মেজর, বলল, 'তারা ভরা আকাশ, কি সুন্দর, তাই না?'

'ওখানে থাকি আমি, এই হাউজবোটে,' বলল রোপা।

'বলো কি! ভারি রোমান্টিক তো!'

'ভেতরে আসবেন?' জানতে চাইল রোপা।

একগাল হাসল তারেক। 'এত করে যখন বলছ, তোমার কথা ফেলতে পারি?'

গ্যাংপ্ল্যাঙ্কের ওপর দিয়ে মেজরকে নিয়ে এল রোপা। ডেক হয়ে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে।

চোখ বড় বড় করে চারদিকে তাকাল মেজর। 'আরে, এ আমি স্বর্গে চলে এলাম নাকি!'

'কিছু খাবেন?'

'তার আগে তুমি আমাকে তারেক বলে ডাকো।'

মধুর হেসে আড়চোখে তাকাল রোপা। 'তারেক, কিছু খাবে?'

'যদি তরল কিছু দিতে পারো।'

'শ্যাম্পেন, নাকি আরও কড়া কিছু?' জানতে চাইল রোপা।

'তোমার মত আগুনের সামনে হুইস্কি ছাড়া আর কিছু চলে না।'

গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে ইঙ্গিতে একটা সোফা দেখাল রোপা। প্রভু-ভক্ত কুকুরের মত সাথে সাথে সোফায় বসে পড়ল মেজর। তার হাতে গ্লাসটা ধরিয়ে দিয়ে পাশেই বসল রোপা। গ্লাসটা নিচু টেবিলে রেখে দিয়ে রোপার কাঁধে হাত রাখল মেজর। মুখ সরিয়ে নিয়ে এসে রোপার গলার ঘ্রাণ নিল। রোপা বাধা দিল না দেখে সাহস বেড়ে গেল মেজরের। হঠাৎ যেন অস্থির উন্মাদ হয়ে উঠল সে। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল রোপাকে।

শিউরে উঠল রোপা। চোখ বন্ধ করে প্রাণপণে চেষ্টা করছে বাবার কাল্পনিক মৃত্যুর দৃশ্যটা ভুলে থাকতে।

সোফার ওপর গা এলিয়ে দিল রোপা, মেজরকে টেনে নিল গায়ের ওপর। লোকটা একেবারে আনাড়ী, সাধারণ ভদ্রতাবোধও নেই। তার কনুই আর হাঁটু রোপার শরীরে যেন গেঁথে যেতে লাগল।

তবু উৎসাহিত করার জন্যে রোপা বলল, 'তারেক, তোমার গায়ে এত জোর!'

তারেকের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল রোপা, সাথে সাথে দেখতে পেল আলেককে। ডেকে হাঁটু গেড়ে বসে ঝুঁকে রয়েছে নিচের দিকে, হ্যাচের ভেতর দিয়ে দেখছে ওদেরকে। নিঃশব্দ হাসিতে দুই কান পর্যন্ত লম্বা হয়ে আছে ঠোঁট।

এগারো

ওপর মহল থেকে রানাকে জানানো হয়েছে, চলতি সিস্টেম বাতিল করে আধুনিক একটা সিস্টেম চালু করে দিলেই সমস্যার সমাধান হবে না, বরং চলতি সিস্টেমের গলদ কোথায় তা চিহ্নিত করে সেগুলো সংশোধনের জন্যে সুপারিশ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সবার সন্তুষ্টির জন্যে এটা করা দরকার। তাছাড়া, হঠাৎ করে আনকোরা নতুন একটা সিস্টেম চালু করতে গেলে নানা ধরনের বিপত্তিও দেখা দিতে পারে। কথাগুলোর পিছনে যুক্তি আছে, স্বীকার করে রানা। তাই ঈজিপশিয়ান ইন্টেলিজেন্সের কোথায় কি গলদ আছে তার বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করছে ও।

কাজের চাপে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়েছে। গভীর রাত পর্যন্ত ফাইলের পাহাড়ে মুখ গুঁজে থাকতে হয়।

এত কাজ, তবু আলেক বোগানকে ভুলে যায়নি রানা। আসিউতে করপোরাল খুন হয়েছে তিন হপ্তা হতে চলল। অথচ খুনীর ধারে-কাছে পৌঁছুতে পারেনি ওরা। যত দিন যাচ্ছে, ঠাণ্ডা হয়ে আসছে কেসটা। মনে মনে আশা করছিল ও, ব্রীফকেস চুরির ঘটনা আরও একটা ঘটবে। তাহলে অন্তত বোঝা যেত ঠিক কিসের লোভে কায়রোয় এসেছে আলেক বোগান।

লোকটাকে ধরার ব্যাপারে বিশেষ এগোতে না পারলেও, কিছু কিছু তথ্য জোগাড় করছে রানা। এই তথ্যগুলো আলেক বোগান সম্পর্কে তার ধারণাটাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ভিলা লে অলিভিয়ার্সের মালিক ছিল রমজান আহমেদ নামে এক লোক। আহমেদরা কায়রোর ধনী একটি পরিবার। আলেক বোগান বাড়িটা তার বাবা ইসহাক আহমেদের কাছ থেকে পায়। ইসহাক আহমেদ একজন আইন ব্যবসায়ী ছিল। রানার একজন লেফটন্যান্ট সন্ধান চালাতে গিয়ে ইসহাক আহমেদ আর গার্সিয়া বোগানের বিয়ের ব্যাপারটাও জানতে পারে। প্রথমে গার্সিয়ার বিয়ে হয়েছিল একজন মিশরীয় ইহুদির সাথে, স্বামী মারা যাবার পর ইসহাক আহমেদকে বিয়ে করে সে। গার্সিয়ার প্রথম স্বামীর ঔরসজাত সন্তান আলেক বোগানকে পালিত পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে ইসহাক আহমেদ, ব্যাপারটাকে আইনসঙ্গত করার জন্যে একটা

চুক্তিপত্রও তৈরি করা হয়। আলেক বোগানের নতুন নামকরণ করা হয়, আলেক আব্বাস। যদিও, মনেপ্রাণে ইহুদিই রয়ে যায় আলেক বোগান।

আহমেদদের যারা বেঁচে আছে তাদের সাথে কথা বলে নতুন কোন তথ্যই পাওয়া যায়নি। বছর পাঁচেক আগে মিশর থেকে চলে যায় আলেক, তারপর থেকে ওরা আর তার কোন খবর জানে না। লেফটেন্যান্ট ফিরে এসে রানাকে ধারণা দেয়, আহমেদরা পালিত পুত্র আলেককে তেমন সুনজরে দেখে না।

পাঁচ বছর আগে গায়েব হয়ে গিয়েছিল আলেক। কোথায় গিয়েছিল সে? রানার ধারণা—নিশ্চয়ই ইসরায়েলে।

আহমেদ পরিবারের আরও একটা শাখা আছে, কিন্তু তাদের খোঁজ পাওয়া সম্ভব হয়নি। এই শাখাটি আসলে যাযাবর বেদুইন, কোন্ সময় কোথায় থাকে কেউ তা বলতে পারে না। রানার সন্দেহ, নতুন করে আবার মিশরে ঢোকার ব্যাপারে আলেককে এই বেদুইনরা সাহায্য করেছে।

লোকটা যে আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে মিশরে ঢুকতে পারে না, এটা পরিষ্কার। পোর্ট এলাকায় সিকিউরিটি ব্যবস্থা অত্যন্ত কড়া, ওদিক দিয়ে আসতে চেষ্টা করলে ধরা পড়ে যেত আলেক। কারও চোখে ধরা না পড়ার জন্যেই দক্ষিণ দিক থেকে মিশরে ঢুকেছিল সে, সেই সাথে উদ্দেশ্য ছিল, সে যে জন্মগতভাবে মিশরীয় এই সত্যটাকে ঝালাই করে নেয়া। মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সের ভাগ্য বলতে হবে, ক্যাপ্টেন আহসানের সাথে আলেকের দেখা হয়ে গিয়েছিল।

কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছে রানা, সিগারেট ধরিয়ে একটু বিশ্রাম নেবার সময় এইসব ভাবছিল। আলেক লোকটাকে তার সস্তাদরের ইনফর্মার বলে মনে হয়নি। গুজব বা রটনা শোনার জন্যে মিশরে ফিরে আসেনি সে। রাস্তায় ক'জন সৈনিককে দেখেছে, মটর পার্টসের অভাব আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে রিপোর্ট পাঠানো তার কাজ হতে পারে না। ব্রীফকেস চুরির ঘটনাটাই প্রমাণ করে, টপ-লেভেল সিক্রেট ইনফরমেশনের পিছনে লেগে আছে সে। শুধু তাই নয়, গোপন তথ্য হাতে পাওয়ার জন্যে বিচিত্র পন্থা উদ্ভাবনেও পারঙ্গম। এই লোক যদি খুব বেশি দিন স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে, তার সফল না হবার কোন কারণ নেই।

নতুন একটা সিগারেট ধরাল রানা। লোকটার পিছনে আরও সময় ও মনোযোগ দেয়া দরকার। কায়রোর থাকবে, অথচ তাকে ধরা যাবে না, এটা কোন কথাই নয়।

খুব যে আরামে আছে লোকটা, বিশ্বাস হয় না। তারও সমস্যা আছে। কৌতূহলী প্রতিবেশীদের নিজের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করতে হবে তাকে, নিরাপদ কোন একটা জায়গায় লুকিয়ে রাখতে হবে রেডিও, শহর চষে খুঁজে বের করতে হবে ইনফর্মার। খরচের টাকা শেষ হয়ে যেতে পারে। নষ্ট হয়ে যেতে পারে রেডিও। ইনফর্মার তার সাথে বেঈমানী করতে পারে। কিংবা, কেউ হয়তো দৈবাৎ জেনে ফেলতে পারে তার আসল পরিচয় বা উদ্দেশ্য। সে যে স্পাই, কোন না কোন ভাবে তার আচরণে সেটা প্রকাশ পাবেই।

যত বেশি চালাক হবে লোকটা, প্রকাশ পেতে তত বেশি সময় লাগবে।

আলেকের সাথে যে খলিফার যোগসাজশ আছে সে-ব্যাপারে রানার মনে কোন সন্দেহ নেই। লে. কর্নেল মোসাদ্দেক হাসান খলিফাকে গ্রেফতার করতে রাজি না হওয়ায় সর্দারের কাছে গিয়ে মোটা টাকা সেধেছে রানা। আবারও ওকে জানিয়েছে খলিফা, আলেকের ঠিকানা জানা নেই তার। কিন্তু লোকটার চোখে লোভ ফুটে উঠেছিল, লক্ষ করেছে রানা।

কোথায় আছে আলেক তা হয়তো সত্যি জানা নেই খলিফার। তার মত কুখ্যাত একজন লোককে নিজের ঠিকানা আলেক বলবে না। কিন্তু ইচ্ছে করলে খলিফা সেটা জেনে নিতে পারে। তাই বিদায় নেবার আগে খলিফাকে আভাস দিয়ে এসেছে সে, টাকার অফার দেয়াই থাকল।

খলিফা আলেকের ঠিকানা পেলেই যে রানাকে জানাবে, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। ঠিকানা জোগাড় করে খলিফা হয়তো প্রথমে আলেকের কাছে যাবে, সব কথা খুলে বলে রানা যত টাকা দিতে চেয়েছে তারচেয়ে বেশি টাকা দাবি করবে। আলেক তার দাবি না মেটালে তখন হয়তো রানার কাছে আসতে পারে।

ফাইল খুলে কাজে মন দিতে যাবে রানা, ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল ফোন। রিসিভার তুলে বলল ও, 'মেজর রানা।'

'হ্যালো! সেন্ট্রাল ব্যাংক, সিকিউরিটি। আমি চীফ অফিসার সুবহান বলছি।'

'ইয়েস?'

'হপ্তা দুয়েক আগে আপনি আমাদের এখানে একটা নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন, মেজর রানা,' বলল সিকিউরিটি চীফ। 'জাল টাকা সম্পর্কে যেন বিশেষ নজর রাখার ব্যবস্থা করা হয়।'

'হ্যাঁ।'

'আমরা কিছু জাল পাউন্ড পেয়েছি।'

এই তো, পাওয়া যাচ্ছে সূত্র! উত্তেজনা বোধ করল রানা। 'ভেরি গুড!'

'ভুল হলো, কিছু না—প্রচুর…'

'আমি দেখতে চাই,' দ্রুত বলল রানা।

'একজন লোককে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি,' বলল চীফ অফিসার। 'দু'চার মিনিটের মধ্যে আপনার ওখানে পৌঁছে যাবে।'

'ধন্যবাদ। আপনি জানেন, কোত্থেকে উদ্ধার হয়েছে টাকাগুলো? কে কাকে দিয়েছিল?'

'অনেকগুলো জায়গা থেকে উদ্ধার হয়েছে,' বলল চীফ অফিসার। 'টাকার সাথে কিছু নাম-ঠিকানাও পাঠিয়েছি আমরা।'

'চমৎকার! দেখা শেষ হলে আপনাকে আমি ফোন করব।'

জাল নোট! ব্যাপারটা মেলে। রেকর্ডে দেখা যায়, এর আগে ইসরায়েলের যে-কজন স্পাই ধরা পড়েছে তাদের প্রত্যেকের কাছেই জাল নোট পাওয়া গিয়েছিল। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল রানা। দরজা খুলে ডাক দিল, 'ফরহাদ!'

ফরহাদ জবাব দিল, 'স্যার!'
'জাল নোটের ফাইল, জলদি!'
'ইয়েস, স্যার!'
চৌকাঠ পেরিয়ে পাশের কামরায় ঢুকল রানা, সেক্রেটারিকে বলল, 'সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে একটা প্যাকেজ আসছে। পৌঁছুলেই আমার কাছে নিয়ে আসবে।'
'ইয়েস, স্যার।'
নিজের অফিসে ফিরে এল রানা। এক মিনিট পর ফাইল নিয়ে ভেতরে ঢুকল ফরহাদ। রানার টীমে সবচেয়ে সিনিয়র লোক ফরহাদ, অত্যন্ত দক্ষ ও বিশ্বস্ত, অক্ষরে অক্ষরে নির্দেশ পালন তো করেই, প্রয়োজন দেখা দিলে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে আরও খানিক এগিয়ে যেতে গড়িমসি করে না। মেজর এটা পছন্দ করে জানার পর থেকেই এই অধিকার কাজে লাগায় সে। রানার মতই লম্বা, তবে রোগা। ঢেউ খেলানো কালো চুল মাথায়, চোখ দুটো শান্ত কিন্তু সতর্ক। ফরহাদ সম্পর্কে রানার ধারণা, সামরিক বাহিনীতে ছেলেটা উন্নতি করবে। গুণ তো আছেই, তাছাড়া কমান্ডিং অফিসাররা অনেকেই তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।
বোতাম টিপে ডেস্ক লাইট জ্বেলে দিল রানা। 'ইসরায়েলি স্টাইলের কিছু জাল নোট দেখাও দেখি।'
ফাইল খুলে পাতা ওল্টাতে শুরু করল ফরহাদ। একগাদা ফটোগ্রাফ বের করে ডেস্কের ওপর ছড়িয়ে দিল সে। প্রতিটি ছবিতে এক একটা ব্যাঙ্ক নোটের সামনের এবং পিছনের দিক রয়েছে, আসল নোটের চেয়ে আকারে একটু বড়। পাউন্ড নোটগুলোকে চার ভাগে ভাগ করল ফরহাদ। এক, পাঁচ, দশ আর বিশ। প্রতিটি ছবিতে কালো তীর চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে, কোন্ নোটে কি ক্রটি আছে। ইসরায়েলি গুপ্তচরদের কাছ থেকে পাওয়া টাকার ছবি এগুলো।
'সাথে জাল টাকা না থাকলে এদের অনেকেই ধরা পড়ত না,' বলল ফরহাদ। 'বুঝি না, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স এই একই ভুল বার বার কেন করে।'
ফটোগুলো থেকে মুখ না তুলেই জবাব দিল রানা, 'এসপিওনাজ বিস্তর খরচের ব্যাপার। এর বেশির ভাগ খরচই বাজে খরচ। নিজেরাই যখন তৈরি করতে পারে, সুইজারল্যান্ড থেকে মিশরীয় পাউন্ড কিনতে যাবে কোন্ দুঃখে?'
'কিন্তু এই জাল নোটের জন্যেই তো ধরা পড়ছে ওরা!'
'ওরা যে ধরা পড়ছে, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স সেটা জানলে তো!'
নক করে ভেতরে ঢুকল রানার সেক্রেটারি। বিশ বছরের এক করপোরাল, চোখে চশমা। 'প্যাকেজ, স্যার।'
'কই দেখি!'
'এই স্লিপটায় সই করতে হবে, স্যার।'
স্লিপে সই করে এনভেলাপটা খুলল রানা। ভেতর থেকে বেরুল এক পাউন্ডের অনেকগুলো নোট।
'মাশাল্লা! এত!'
'ম্যাগনিফাইং গ্লাস, করপোরাল!' নির্দেশ দিল রানা।

'ইয়েস, স্যার।'

এনভেলাপের একটা নোট ফটোগ্রাফের পাশে রাখল রানা, চিহ্নিত ভুলগুলো নতুন নোটেও আছে কিনা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করল।

ম্যাগনিফাইং গ্লাসের দরকার হলো না। 'এই দেখো, ফরহাদ!'

ফরহাদ দেখল, ফটোগ্রাফের নোটে যে ত্রুটি রয়েছে সেই একই ত্রুটি রয়েছে পাউন্ড নোটেও। 'কোন সন্দেহই নেই, স্যার।'

'মিশরের পাউন্ড, ইসরায়েলে তৈরি,' বলল রানা। 'আলেক বোগান, এই লাগলাম তোমার পিছনে!'

লে. কর্নেল মোসাদ্দেক হাসান জানে, মাসুদ রানা অত্যন্ত বুদ্ধিমান। ছাই দেখে সেখানে যদি হাত দেয় এ-লোক অমূল্য রতন তুলে আনতে পারে। যদি আনে, কৃতিত্বটা কার হওয়া উচিত?

আলেক বোগানের পিছনে খুব খাটছে মেজর রানা, ভাল কথা, কোন আপত্তি নেই। আলেক বোগান ইসরায়েলি স্পাই, তা সে বিশ্বাস করে না। আর যদি স্পাই হয়ও, এত লোকের ভিড়ে তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কেউ যদি গাধার খাটনি খাটতে চায়, আদাজল খেয়ে লেগে থাকে, আরব সাগরে হারিয়ে যাওয়া খুদে একটা আঙটিও তার পক্ষে খুঁজে বের করে ফেলা অসম্ভব কিছু নয়। আর তা যদি ঘটে, প্রশংসাটুকু নিজেকে পেতে হবে তার।

সেজন্যে আগে থেকে কিছু ব্যবস্থা করে রাখা দরকার।

সেদিন ব্রিগেডিয়ার নজিবের সাথে স্নুকার খেলছিল লে. কর্নেল। ব্রিগেডিয়ার নজিব ঈজিপশিয়ান ইন্টেলিজেন্সের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। সদালাপী, হাসিখুশি ভদ্রলোক। সিটি স্পোর্টিং ক্লাবে নিয়মিত আসেন। লে. কর্নেল মোসাদ্দেক হাসানকে বা তার মুদ্রাদোষ তিনি যে খুব একটা পছন্দ করেন, তা নয়। কিন্তু মোসাদ্দেক হাসানের ধারণা, ব্রিগেডিয়ারকে হাত করা তার জন্যে কোন সমস্যাই নয়।

প্রতিটি পয়েন্টে এক শিলিং, এই রেটে খেলছিল ওরা। খেলার এক পর্যায়ে লে. কর্নেল খুক খুক করে কেশে নিয়ে বলল, 'ভাবছি, ক্লাবে কাজের কথা হতে পারে কিনা, স্যার।'

'জরুরী?'

'আমার তো তাই ধারণা,' বলল লে. কর্নেল। 'আসলে, স্যার, সারাদিন এত ব্যস্ত থাকি, টেবিল ছেড়ে ওঠার সময় পাই না।'

'বিষয়টা কি?' কিউ-এ চক ঘষলেন ব্রিগেডিয়ার।

পটে লাল একটা বল ফেলল লে. কর্নেল, তারপর একটা গোলাপীর ওপর বেজ দিয়ে লক্ষ্য স্থির করল। 'আমার বিশ্বাস করার কারণ ঘটেছে, ইসরায়েল তার অত্যন্ত সিরিয়াস একজন এজেন্টকে কায়রোয় পাঠিয়েছে।' নিশানা ব্যর্থ হলো তার।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন ব্রিগেডিয়ার। 'বলে যাও।'

'হপ্তা দুয়েক আগে আসিউতে একজন করপোরাল খুন হয়, আপনার মনে আছে, স্যার?'

'আবছা ভাবে।'

'ভাল কথা, খুনের ধরনটা আমার ভাল ঠেকেনি। সেই প্রথম থেকে কেসটার পেছনে লেগে আছি। গত হপ্তায় রাস্তার এক হাঙ্গামার শিকার হয়ে জেনারেল স্টাফের একজন এইড তার ব্রীফকেস হারায়। এমনিতে ব্যাপারটা তেমন কিছু না, কিন্তু দুটো ঘটনার মধ্যে আমি একটা যোগসূত্র দেখতে পেয়েছি।'

পটে একটা সাদা বল ফেলে দিলেন ব্রিগেডিয়ার। 'ধেত্তেরি! তোমার পালা।'

'সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সিকিউরিটিকে জাল নোটের ব্যাপারে চোখ কান খোলা রাখতে বলেছিলাম। ভাগ্যই বলতে হবে, জাল কিছু টাকা পাওয়াও গেছে। আমার লোকেরা পরীক্ষা করে দেখেছে, ইসরায়েলে ছাপা হয়েছে ওগুলো।'

'তাই!'

একটা লাল, একটা নীল তারপর আরও একটা বল পটে ফেলল লে. কর্নেল। কিন্তু গোলাপীটাকে ফেলতে গিয়ে আবার ব্যর্থ হলো সে।

ভুরু কুঁচকে টেবিলের পরিস্থিতি মাপজোক করলেন ব্রিগেডিয়ার। 'জাল টাকার সূত্র ধরে লোকটাকে ধরার কোন আশা আছে বলে মনে করো?'

'এখুনি কিছু বলা যাচ্ছে না, স্যার। আমার লোকজন লেগে আছে।'

'ব্রিজটা দাও দেখি।' ব্রিগেডিয়ার লক্ষ্য স্থির করলেন।

'অনেক পরামর্শের মধ্যে একটি ছিল, পেমাস্টারকে নির্দেশ দেয়া হোক, আরও যদি জাল টাকা আসে তা যেন গ্রহণ করা হয়, তাহলে আমাদের হাতে নতুন সূত্র আসবে,' বলল লে. কর্নেল। আসলে পরামর্শটা ছিল রানার, কিন্তু সেটা বাতিল করে দিয়েছে সে। পরে যদি গোটা ব্যাপারটা জটিল হয়ে ওঠে, নিজের দোষ কাটাবার জন্যে তখন সে বলতে পারবে, প্রস্তাবটা আমি আমার সুপিরিয়র অফিসারের সাথে আলোচনা করেই বাতিল করেছিলাম। সেজন্যেই আজ এখানে আসা তার।

টেবিলের ওপর চোখ রেখে সিধে হলেন ব্রিগেডিয়ার। বললেন, 'ব্যাপারটা নির্ভর করে টাকার পরিমাণের ওপর।'

'এরই মধ্যে কয়েক হাজার পাউন্ড আমাদের হাতে এসেছে।'

'কয়েক হাজার!'

'আমি বলি কি, জাল টাকা আর গ্রহণ না করাই উচিত, স্যার।'

'রাইট।' শেষ লাল বলটা পটে ফেলে হাসলেন ব্রিগেডিয়ার। আবার রঙের ওপর হামলা চালালেন তিনি।

পয়েন্ট গুনল লে. কর্নেল। ব্রিগেডিয়ার এগিয়ে আছেন। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, এখানে আসার উদ্দেশ্য তার পূরণ হয়েছে।

'এই স্পাইয়ের পিছনে কাকে লাগিয়েছ তুমি, হাসান?' জানতে চাইলেন ব্রিগেডিয়ার।

'আসলে আমি নিজেই ব্যাপারটা দেখাশোনা করছি, স্যার।'

'বুঝলাম, কিন্তু তোমার মেজরদের মধ্যে থেকে কাকে ব্যবহার করছ?'

'ভাল কথা, এই, মানে··· মেজর রানাকে, স্যার।'

'মেজর মাসুদ রানা?' মুখ তুলে লে. কর্নেলের দিকে তাকালেন ব্রিগেডিয়ার। 'ও তাহলে তোমার সেকশনে?' মাথা দুলিয়ে প্রশংসা করলেন তিনি। 'খুব কিন্তু কাজের ছেলে।'

আলাপটা এমন একদিকে মোড় নিচ্ছে, লে. কর্নেলের ভাল লাগার কথা নয়। একবার খুক করে বলল, 'হলেও, স্যার, বিদেশী তো, আমাদের সমস্যা ঠিকমত আঁচ করতে সময় লাগবে। আপনার কথাই হয়তো ঠিক, কাজের ছেলে, কিন্তু একটু বেশি ব্যস্ততা দেখাতে চায়।'

'নিশ্চয়ই বুঝতে ভুল করেছ তুমি,' হেসে উঠে বললেন ব্রিগেডিয়ার। 'কারণ ছাড়া ব্যস্ততা দেখাবার ছেলে নয় রানা। ওর সম্পর্কে তুমি কিছু জানো না। তোমার সেকশনে ওকে পেয়েছ, সেটাকে ভাগ্য বলে মনে করবে।' একটু থেমে ব্রিগেডিয়ার আবার বললেন, 'ইংল্যান্ডে আমি যে স্কুলে পড়েছি, রানাও সেই স্কুলের ছাত্র ছিল—বিশ বছর পর।'

'খুব বুঝি ভাল ছাত্র ছিল, স্যার?'

'সেরা,' বলল ব্রিগেডিয়ার। 'আমিও তাই ছিলাম।' পটে কালো একটা বল ফেললেন তিনি।

চেহারা কালো করে লে. কর্নেল বলল, 'আপনি, স্যার জিতেছেন।'

বারো

ডুম ডাম ক্লাবের ম্যানেজার জানাল, তার ক্লাবের নিয়মিত খদ্দেরদের অর্ধেক ব্যাঙ্ক চেক লিখে বিল পরিশোধ করে। বাকি অর্ধেক ক্যাশ পেমেন্ট করে। যারা ক্যাশ পেমেন্ট করে তাদের সংখ্যাও প্রতিদিন কয়েকশো, কাজেই এদের মধ্যে কে এক পাউন্ডের নোট দিয়েছে তা জানার কোন উপায় নেই। তাছাড়া, অনিয়মিত খদ্দেরও আছে। সংখ্যায় এরাও কয়েকশো হবে, সবাই নগদ পেমেন্ট করে।

শেরাটন হোটেলের চীফ ক্যাশিয়ারও একই ধরনের কথা বলল।

এরপর দু'জন ট্যাক্সি ড্রাইভার, সুপারমার্কেটের তিনজন দোকানদার, আর ব্রোথেলের একজন কর্ত্রী মাদাম হুসনার সাথে কথা বলল রানা। নকল টাকা কে তাদের দিয়েছে, কেউ তা বলতে পারল না।

তালিকায় এরপর রয়েছে একজন গ্রীক, মিকিস পসাইডোন। একটা মনিহারী দোকানের মালিক সে। সবার মত এই লোকও কোন সাহায্যে আসবে না বলে ধারণা করল রানা।

পৌঁছে রানা দেখল, দোকানটা বিরাট কিছু নয়। অথচ সবচেয়ে বেশি জাল নোট এই লোকের কাছ থেকেই জমা নিয়েছে ব্যাংক। গুঁড়ো মশলা, টিনজাত

খাবার, স্টেশনারি জিনিস-পত্র, টুকিটাকি আরও অনেক কিছু বিক্রি হয় এখান থেকে। বছর ত্রিশ বয়স হবে পসাইডোনের, একটু বেঁটে, সদা হাস্যময়। সুতী ট্রাউজার আর শার্টের ওপর একটা অ্যাপ্রন পরে আছে। রানাকে খদ্দের মনে করে টুল থেকে লাফ দিতে গিয়ে আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিল।

'গুডমর্নিং, স্যার,' ইংরেজীতে বলল সে। 'কি চাই বলুন।'

দোকানের ভেতরটা আরেকবার দেখে নিয়ে রানা বলল, 'আমি আশা করেছিলাম, খুব বড় হবে দোকানটা।'

একগাল হাসল পসাইডোন। 'নির্দিষ্ট কোন জিনিস খুঁজছেন আপনি, স্যার? নাম বলুন, হয়তো স্টক-রুমে আছে।'

ব্যাপারটা বুঝল রানা। নিয়মিত খদ্দেরদের জন্যে দুর্লভ মনিহারী জিনিস স্টক-রুমে লুকিয়ে রাখা হয়। চোরা পথে বিদেশী জিনিস যেগুলো আসে, সবাইকে দেখানো চলে না। কয়েকশো পাউন্ড জাল টাকা নিয়ে জিনিস-পত্র বিক্রি করেছে, নিশ্চয়ই বড় ধরনের অর্ডার ছিল সেটা। ক্রেতাকে চিনে রাখা সম্ভব।

'কিছু কিনতে আসিনি,' বলল রানা। 'দু'দিন আগে ব্যাঙ্কে তুমি আটশো সত্তর পাউন্ড জমা দিয়েছ, সবগুলো জাল নোট।'

রানা আশা করেছিল কথাটা শুনে পসাইডোনের মুখের হাসি মিলিয়ে যাবে। তা নয়, হাসিটা আরও প্রসারিত করে কাঁধ ঝাঁকাল সে, বলল, 'কথাটা যদি সত্যি হয়, স্যার, দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আর কি করতে পারি আমি? আমরা লেম্যান, জাল টাকা ধরার যোগ্যতাও রাখি না, সে-চাকরিও করি না।'

'ও, তুমি তাহলে বলতে চাইছ, আইন সম্পর্কে কিছুই তোমার জানা নেই? ব্যাঙ্কে জাল টাকা জমা দেয়ার জন্যে তোমার জেল হতে পারে, সত্যি তুমি জানো না?'

পসাইডোনের মুখে হাসি থাকল, তবে আকারে ছোট হলো সেটা। 'প্লীজ, স্যার! এই যদি বিচার হয়, আমি বলব অন্যায় বিচার! জাল কি আসল, আমি কিভাবে বুঝব?'

'সব টাকা তুমি কি একজনের কাছ থেকেই পেয়েছ?'

'কি জানি…'

'চিন্তা করে জবাব দাও,' গলার আওয়াজ একটু চড়াল রানা। 'ভেবে দেখো কেউ তোমাকে আটশো সত্তর পাউন্ড দিয়ে কিছু কিনেছিল কিনা?'

'না…হ্যাঁ, মনে পড়েছে!' হঠাৎ করেই, পসাইডোনকে আহত দেখাল। 'কিন্তু স্যার, তিনি… তিনি অত্যন্ত সম্মানী ভদ্রলোক। তিনি কেন…উহুঁ, অসম্ভব।'

'ভদ্রলোকের নাম?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল রানা।

'মি. আলেক বোগান…'

'আচ্ছা!'

'কিন্তু এ যে অবিশ্বাস্য, স্যার! তিনি আমার অনেক দিনের পুরানো কাস্টমার। টাকা পয়সার ব্যাপারে কখনও কোন গোলমাল করেননি!'

'জিনিস-পত্র নিজেই নিয়ে গেছে, নাকি তুমি ডেলিভারি দিয়ে এসেছ?'

'নিজেই নিয়ে গেছেন।'

'যাশ্ শালা!' বিড়বিড় করে বলল রানা।

'পৌঁছে দিতে চেয়েছিলাম, বরাবর তাই দিয়েছি, কিন্তু উনি বললেন তার কোন দরকার নেই...'

'বরাবর তাই দিয়েছ? কোথায় ডেলিভারি নিত?'

'নিজের বাড়িতে,' বলল পসাইডোন।

'ঠিকানা?'

'দাঁড়ান, মনে করি...হ্যাঁ, ভিলা লে অলিভিয়ার্স, গার্ডেন সিটি।'

কাউন্টারের ওপর দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল রানা। চমকে উঠে এক পা পিছিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকাল পসাইডোন। রানা বলল, 'ইদানীং তার বাড়িতে ডেলিভারি দাওনি তুমি, তাই না?'

'না,' বলল পসাইডোন। 'বেশ ক'বছর দেশে ছিলেন না মি. আলেক। স্যার, এ-ব্যাপারে আমার কোন দোষ নেই। আমি একজন গরীব ব্যবসায়ী, আমাকে মেরে আপনার কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে, আসুন ব্যাপারটা আমরা নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে ফেলি। আসুন না, ভেতরে আসুন! একটু কফি চলবে?'

পসাইডোনের পিছু পিছু পিছনের একটা ঘরে চলে এল রানা। দেয়াল জুড়ে শেলফ দেখে বোঝা গেল এটাই স্টক-রুম। কোন শেলফেই তিল ধরনের জায়গা নেই। বোতল আর টিনের লেবেল দেখে বোঝা গেল, বেশির ভাগই বিদেশী জিনিস। রাশিয়ান ক্যাভিয়ার, আমেরিকান হ্যাম আর ইংলিশ জ্যাম রয়েছে প্রচুর। খুদে দুটো কাপে কড়া কফি ঢালল পসাইডোন। আবার তার মুখে অম্লান হাসি ফিরে এসেছে। বলল, 'বন্ধুত্ব দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করা যায়। আপনি আর আমি যদি রাজি থাকি, কাউকে পরোয়া করার দরকার করে না।'

কফির কাপে চুমুক দিয়ে হাসি চাপল রানা।

'বন্ধুত্বের নমুনা হিসেবে আমি হয়তো আপনাকে কিছু দিতে চাইলাম, আপনি কি সেটা না নিয়ে পারবেন? আমার কাছে ভাল ফ্রেঞ্চ ওয়াইন আছে...'

'আরে না!'

'কিংবা স্কচ হুইস্কি? তার সাথে ক্যাভিয়ারের একজোড়া জার?'

'তুমি ভুল করছ,' গম্ভীর মুখে বলল রানা, এ-ধরনের সমাধানে রাজি নই আমি।'

'স্যার?' মনে হলো রানার কথা বোধগম্য হয়নি পসাইডোনের।

'আলেক বোগানকে দরকার আমার,' বলল রানা। 'ভিলা লে অলিভিয়ার্সে নেই সে।'

দ্রুত মাথা নাড়ল পসাইডোন। 'কই, তিনি আমাকে তার নতুন ঠিকানা জানাননি, স্যার!'

'কি ধরনের জিনিস কেনে সে?'

'শ্যাম্পেনই বেশি। ক্যাভিয়ারও। প্রচুর কফি। বিদেশী ওয়াইন। গারলিক

সসেজ, এপ্রিকট···এই রকম আরও অনেক কিছু।'

'হুঁ।' উপরি পাওয়া এই তথ্য গোগ্রাসে গিলল রানা। কি ধরনের স্পাই সে, আমদানী করা বিদেশী জিনিস কিনে টাকা ওড়ায়? কারও চোখে লাগতে পারে, এই ভয় নেই? এই লোককে সিরিয়াস বলে মনে হয় না। অথচ আলেক বোগান সিরিয়াস। হয়তো প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী, আচরণে সংযমী হবার দরকার আছে বলে মনে করে না। এই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই তাকে ডোবাবে। রানা জানতে চাইল, 'ক'দিন পরপর আসে সে?'

'শ্যাম্পেন শেষ হয়ে গেলেই আসেন।'

'আবার যেদিন আসবে, তার ঠিকানাটা জানা চাই।'

'কিন্তু স্যার, তিনি যদি বাড়িতে ডেলিভারি না চান···?'

'চাইবে না, জানি,' বলল রানা। 'সেজন্যেই তোমার এখানে একজন লোক রাখা হবে। সবাই জানবে তুমি একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট রেখেছ।'

ধারণাটা পছন্দ করল না পসাইডোন। 'আপনাকে, স্যার আমি সাহায্য করতে চাই, কিন্তু আমার ব্যবসার মধ্যে যদি নাক গলানো হয়···'

'চুপ,' বলল রানা। 'হয় আমি যা বলি তাই হবে, তা না হলে জেলে যেতে হবে তোমাকে।'

বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল পসাইডোন, পরাজয় মেনে নিয়েছে।

'তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে যাকে দেব,' মৃদু হেসে বলল রানা, 'সময়টা তার সাথে তোমার ভালই কাটবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় নাদিয়ার অ্যাপার্টমেন্টে এল রানা। হাতে বিরাট একটা ফুলের তোড়া। মুখে আড়ষ্ট হাসি।

'প্লেস দে এল' অপেরা এলাকায়, রাজবাড়ির মত দেখতে প্রশস্ত একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউজে থাকে নাদিয়া। একজন কাফ্রী কেয়ারটেকার পথ দেখিয়ে চারতলায় নিয়ে চলল রানাকে। কয়েকবার বাঁক নিয়ে উঠে গেছে মার্বেল পাথরের সিঁড়ি। কেয়ারটেকারকে বিদায় করে দিয়ে থ্রী এ লেখা দরজায় নক করল ও।

নাদিয়া ওকে আশা করছে না, ভাবল রানা। যদি এমন হয়, কোন পুরুষ তাকে সঙ্গ দিচ্ছে?

অপেক্ষা করতে হচ্ছে বলে একটু অস্থিরতা অনুভব করল রানা। ঘরোয়া পরিবেশে কেমন লাগবে মেয়েটাকে? কে জানে, হয়তো বাড়িতেই নেই নাদিয়া। সুন্দরী মেয়েরা কি আর সন্ধের সময় বাড়িতে বসে থাকে!

দরজা খুলে গেল। হলুদ সুতী স্কার্ট পরেছে নাদিয়া, কোমর আর উরুর ওপর সেঁটে আছে। লাইট ব্রাউন চামড়ার সাথে স্কার্টের রঙটা দারুণ ফুটেছে। প্রথম কয়েক সেকেন্ড শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল নাদিয়া, তারপর রানাকে চিনতে পেরে ঝিক করে উঠল তার চোখ। ঝরঝর করে হেসে নিয়ে বলল, 'হ্যালো?'

'গুড ইভনিং।'

সামনে এগিয়ে এসে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো নাদিয়া। মনে মনে আঁতকে উঠে রানা ভাবল, সর্বনাশ! মেয়েটা চুমু খেতে যাচ্ছে!

'না, থাক, আমরা ইংরেজ নই,' রানার কানের কাছে মুখ নেড়ে ফিসফিস করে বলল নাদিয়া, 'ওদের অনুকরণ না করলেও চলবে।' রানার একটা হাত ধরে ঘরের ভেতর ঢুকল সে।

দরজা বন্ধ করে নাদিয়ার দিকে ফিরল রানা। 'এই রকম খাতির পাব জানলে আরও আগে থেকেই আসা শুরু করতাম।'

'সবটাই লোক দেখানো। দেখি, দিন, ছদ্মবেশ থেকে আপনাকে রেহাই দিই।' রানার হাত থেকে ফুলের তোড়াটা নিল নাদিয়া।

রানার মনে হলো, ওকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হলো।

'আপনি ভেতরে যান,' বলল নাদিয়া। 'ফুলের জন্যে পানির ব্যবস্থা করে আমি আসছি।'

প্যাসেজ থেকে লিভিং রুমে ঢুকল রানা। প্রাচীন রাজবাড়ির সাথে এই ঘরের পরিবেশ মেলে না। অত্যন্ত রুচিসম্মত ও আধুনিক ধাঁচে সাজানো হয়েছে ঘরটাকে। ম্লান রঙের ওক কাঠের টেবিল। গোলাপী মখমলের কাভারে মোড়া সোফা। ঘরটা এক কোণে, ফলে দু'দিকে জানালা রাখা গেছে। দিগন্তরেখার খানিকটা নিচে নেমে ইতস্তত করছে সূর্য, ঠাণ্ডা রোদে ঘরের দেয়াল আর আসবাব উদ্ভাসিত হয়ে আছে। ব্রাউন রঙের ফার দিয়ে তৈরি মোটা একটা কার্পেট পাতা রয়েছে মেঝেতে, দেখে মনে হলো ভালুকের চামড়া। ঝুঁকে পড়ে হাত দিয়ে ছুঁলো রানা, আসল জিনিস। হঠাৎ করেই বেয়াড়া হয়ে উঠল মন; কল্পনায় পরিষ্কার দেখতে পেল ও, কার্পেটের ওপর শুয়ে আছে নাদিয়া—বিবস্ত্র। চোখ পিট পিট করে অন্য দিকে তাকাল রানা। ওর পাশের সোফায় পড়ে রয়েছে খোলা একটা বই। হাতে নিয়ে অনুভব করল, নাদিয়ার গায়ের তাপ এখনও লেগে রয়েছে। বইটার নাম, ইস্তাম্বুল ট্রেন। কাভার দেখে মনে হলো, ডিটেকটিভ বা স্পাই থ্রিলার।

ওর সামনের দেয়ালে একটা মস্ত পেইন্টিং ঝুলছে। একটা বলরুমের দৃশ্য। আঁকার ধরন দেখে বোঝা যায়, কোন আধুনিক শিল্পীর কাজ। ছবির প্রতিটি মেয়ে পুরোদস্তুর গাউন পরে আছে, কিন্তু পুরুষেরা সবাই উলঙ্গ। সোফা ছেড়ে উঠে পেইন্টিঙের নিচে একটা কাউচে বসল রানা, ছবিটা যাতে দেখতে না হয়।

একটা ভেসে ফুলের তোড়া নিয়ে ভেতরে ঢুকল নাদিয়া। রজনীগন্ধা আর গোলাপের ঘ্রাণে ভরে উঠল বাতাস। 'ঘরে বরফ আছে,সরবত, চলবে? নাকি কফি?'

'কফি চলতে পারে,' বলল রানা।

'ইচ্ছে হলে সিগারেট খেতে পারেন…'

'ব্যাপারটা যখন অভিনয়ই,' আড়ষ্ট ভাবটা একটু কাটিয়ে উঠে বলল রানা, 'সেটা নিখুঁত হওয়া দরকার। লাভারকে কেউ আপনি বলে?'

'এখানে কেউ আমাদের কথা শুনছে না,' বলল নাদিয়া। পরমুহূর্তে হাত নেড়ে সবিনয় একটা ভঙ্গি করল, 'তবে, আপনি আমার মেহমান, আপনার ইচ্ছাই আমার

ইচ্ছা, আপনি যদি তাই চান…'

বলার ভঙ্গিটা অপূর্ব, কিন্তু কথাগুলোর মধ্যে কেমন যেন খোঁচা দেয়ার ভাব আছে। ওর পেশাই পুরুষের মনোরঞ্জন করা, চর্চা করে শিখেছে ভঙ্গিটা, ভাবল রানা। প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল ও। 'আমি ভেবেছিলাম তোমাকে পাব না।'

মুচকি একটু হাসল নাদিয়া। 'বাইরে যাই কিভাবে! আমার মন বলছিল, আজ আপনি আসবেন।'

আড়ষ্ট ভাবটা আবার ফিরে এল রানার মধ্যে। মেয়েটা তাকে ভেবেছে কি?

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ফ্যানের স্পীড আরও একটু বাড়িয়ে দিল নাদিয়া। দরজার কাছে পৌঁছে বলল, 'যা ঘামছেন, আমি আপনাকে ঠাণ্ডা সরবত খাওয়াতে চেয়েছিলাম।' কিন্তু রানার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল না সে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে কফির ট্রে নিয়ে ফিরে এল নাদিয়া।

'এসব বই তোমার ভাল লাগে?' জানতে চাইল রানা।

'তা কোনদিন ভেবে দেখিনি,' তেপয়ের ওপর ট্রে নামিয়ে বলল নাদিয়া। 'আগে পড়তামও না, এখন ঠেকায় পড়ে পড়তে হচ্ছে।'

'কেন?'

'একজন স্পাই কি রকম আচরণ করে, শিখতে হবে না আমাকে?'

'কিন্তু আমার মনে হয়…' নাদিয়াকে হাসতে দেখে থেমে গেল রানা, বুঝল, আবার ওর সাথে ঠাট্টা করছিল মেয়েটা। 'তুমি বোধহয় সিরিয়াস হতে জানো না, না?'

মুক্তোর মত সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল, মিষ্টি একটু হাসি উপহার দিয়ে বলল নাদিয়া, 'জানি, কিন্তু সবার সাথে হই না।' রানার হাতে কফির কাপ ধরিয়ে দিয়ে কাউচের উল্টোদিকের কিনারায় বসল সে। 'আচ্ছা, আপনি তো স্পাই—এই জীবনটা কেমন লাগে আপনার?'

'তুমি জানতে চাইছ পেশাটা আমার কেমন লাগে, তাই না?'

'আচ্ছা, না হয় তাই বলুন, পেশাটা আপনার কেমন লাগে?'

'ভাল।'

'এটা কি কোন উত্তর হলো? কেমন ভাল? কতটুকু ভাল?'

রানা ভাবল, ব্যঙ্গ, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, নিষ্পাপ চেহারা আর নিপুণ ভঙ্গি দিয়ে মেয়েটা আমাকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে। বলল, 'নিজের জীবনের মতই এই পেশাটাকে ভালবাসি আমি।'

'কেন? কি আছে এতে?'

'সঠিক উত্তর দিতে গেলে অনেক সময় লাগবে,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'সংক্ষেপে, দেশের কাজ করছি, এটা একটা আনন্দ। তাছাড়া, এর মধ্যে থ্রিল আছে।'

'আপনার হাতে একজন স্পাই ধরা পড়লে তার পরিণতি কি হয়?'

'অনেক সময় মরতে হয় তাকে।'

'গুড!'

তৃপ্তি বোধ করল রানা। অন্তত একবার হলেও মেয়েটাকে ঘাবড়ে দিতে পেরেছে সে।

'আপনি তাহলে একজন সুখী মানুষ?' আবার প্রশ্ন করল নাদিয়া।

'না, তা বলতে পারি না।'

'কেন, সুখী নন কেন?' জানতে চাইল নাদিয়া। 'আপনার হাতে ধরা পড়া স্পাইরা মারা যায় বলে?'

'না। আমি সুখী নই, কারণ, সব সময় ওদেরকে ধরতে পারি না।'

'আপনি নিষ্ঠুর, সেজন্যে কি গর্ব অনুভব করেন?'

গম্ভীর হলো রানা, বলল, 'আমি নিষ্ঠুর নই। আমরা ওদের যে ক'টাকে মারছি, ওরা তারচেয়ে বেশি আমাদের লোককে মারছে।' ভাবল, এই সামান্য একটা মেয়ের কাছে কেন আমি জবাবদিহি দিচ্ছি!

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, দেখল, ওর দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নাদিয়া। 'কি দেখছ?'

'ভাবছি, কেন এসেছেন আপনি।'

'কাজে,' বলল রানা। তারপর ঠোঁট বাঁকা করে হাসল একটু। 'আর কোন প্রশ্ন করবে না? কৌতূহল মিটেছে?'

'দেখেই বোঝা যায়, মেয়েদের ব্যাপারে আপনি আনাড়ী,' বলল নাদিয়া। 'আপনার সম্পর্কে আমার কৌতূহল থাকতে পারে না।'

'তাহলে জেরা করা হচ্ছিল কেন?'

কি যেন ভেবে খিলখিল করে হেসে উঠল নাদিয়া। তারপর বলল, 'ভাবছিলাম, আপনাকে সাবালক করার দায়িত্বটা যদি নিজের হাতে তুলে নিই, মন্দ হয় না সেটা।'

রানা ভাবল, মেয়েটাকে আমি আসলে চিনতে পারিনি। অনেক কথা বলিয়েছে, এখন ওর কথা শোনা উচিত। জানে, তবু জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মা-বাবা কি বেঁচে আছেন?'

'না,' দ্রুত বলল নাদিয়া, একটু কঠোর দেখাল তাকে।

'দুঃখিত,' বলল রানা।

'জানতে চাইলেন কেন?'

'এমনি। প্লীজ কিছু মনে কোরো না।'

কাউচের ওপর ঝুঁকে, প্রায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল নাদিয়া, একটা হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে রানার হাত ছুঁলো, মৃদু বাতাসের মত আলতোভাবে। 'আপনি বড় বেশি ক্ষমা চান।' চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকাল সে, যেন দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। তারপর হঠাৎ করেই বলতে শুরু করল। মিথ্যে কথা বলেছে নাদিয়া, তার বাবা এখনও বেঁচে আছেন।

অবিশ্বাস্য গরীব পরিবারে পাঁচ সন্তানের সবচেয়ে বড় নাদিয়া। গরীব হলেও, মা-বাবা দু'জনেই ছিলেন সংস্কৃতি-মনা। মা তাকে নাচ শিখিয়েছে, বাবা

শিখিয়েছেন ইংরেজী। স্কুলের মাস্টার ছিলেন বাবা। সারা জীবন আদর্শ আঁকড়ে ছিলেন। নাদিয়ার পনেরো বছর বয়স, বাবা অন্ধ হতে শুরু করেন। বাপ আর মেয়ে দু'জনকেই স্কুল ছাড়তে হয়। পাশা আর শেখেদের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসতে শুরু করল। তারা সবাই বৃদ্ধ পাত্র। বাবা বললেন, ওদের কারও সাথে বিয়ে দেয়ার চেয়ে মেয়েকে আমি নিজের হাতে বিষ খাওয়াব। কিন্তু অভাবের তাড়না বড় কঠিন, নাদিয়াকে এক শেখের বাড়িতে ঝি-গিরির চাকরি নিতে হলো। এখানেই জীবনে প্রথম প্রেমে পড়ল সে।

শেখের ছেলে শেখেরই মত চরিত্রহীন, কিন্তু সেটা টের পেতে অনেক দেরি করে ফেলল নাদিয়া। যখন বুঝল, তিন মাসের অন্তসত্ত্বা সে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় শেখের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হলো তাকে। শেখের ছেলে কায়রো ইউনিভার্সিটিতে পড়ত, তাকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়া হলো। তাড়িয়ে দেবার সময় শেখ সাহেব তার হাতে তিন হাজার পাউন্ড গুঁজে দিয়েছিলেন, সেটা নিয়ে কায়রোয় চলে এল নাদিয়া। কলঙ্কের চিহ্ন নিয়ে অন্ধ বাবার সামনে দাঁড়াবার সাহস তার ছিল না।

কায়রোয় এসে অনেক আঘাত খেয়েছে নাদিয়া। হাতে টাকা ছিল, তাই বিপদ কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল সে। পেটের বাচ্চা নষ্ট করতে এক হাজার পাউন্ড বেরিয়ে যায়। তবু প্রতি মাসে আগের মতই বাড়িতে টাকা পাঠাত সে। কিন্তু একদিন সব টাকা শেষ হয়ে গেল।

ইতোমধ্যে একটা হোটেলে নাচতে শুরু করেছে নাদিয়া। কিন্তু নতুন মেয়ে, ধরাকরার লোক নেই, শহুরে দর্শকদের সামনে আড়ষ্ট ভাব কাটিয়ে নাচতেও পারত না সে। কোথাও দু'একদিনের বেশি প্রোগ্রাম হয় না। এই সময় আবার প্রেমে পড়ল নাদিয়া। গ্রীক দেবতার মত চেহারা ছেলেটার, একটা রেস্তোরাঁয় গিটার বাজাত। প্রথমে ছেলেটাই মজল, তারপর নাদিয়া। ওদের প্রেম যখন তুঙ্গে, বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে, এই সময় নাদিয়া জানল, ছেলেটি শুধু বিবাহিতই নয়, দুটো বাচ্চাও আছে তার।

সেই থেকে পুরুষ মানুষের ওপর একটা ঘৃণা জন্মে গেছে তার মনে।

মেয়ে কিভাবে জীবন ধারণ করছে, কোত্থেকে কিভাবে টাকা রোজগার করে, সব কথাই গেল বাবার কানে। নাদিয়ার পাঠানো মানি অর্ডারের টাকা নাদিয়ার কাছেই ফিরে এল একদিন। সাথে ছোট একটা চিরকুট। বাবা লিখেছেন: তুমি আমার মেয়ে নও। আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না। আর কখনো টাকা পাঠাবে না, একজন বেশ্যার টাকা আমি ছুঁয়ে দেখতেও রাজি নই।

সেই থেকে, আজ তিন বছরের বেশি হলো, ওদের সাথে আর কোন যোগাযোগ নেই নাদিয়ার। এক বান্ধবীর মুখে শুধু শুনেছে, গত বছর মারা গেছে মা। কথায় কথায় রানা নাদিয়াদের গ্রামের বাড়ির ঠিকানাটা জেনে নিল। তারপর জানতে চাইল, 'তোমার বাবাকে তুমি ঘৃণা করো?'

জোর করে হাসল নাদিয়া, ঘরের চারদিকটা দেখিয়ে বলল, 'আমি তো বেশ আরামেই আছি, তাই না? বাবার কথামত চললে এসব পেতাম? না, বাবাকে আমি

ঘৃণা করি না।'

'আরামে আছ, কিন্তু তার মানে কি তুমি সুখী?'

রানার দিকে তাকাল নাদিয়া। দু'বার কথা বলতে গিয়েও বলল না। চোখ ফিরিয়ে নিল আবার। রানার মনে হলো, ঝোঁকের মাথায় নিজের জীবন বৃত্তান্ত শুনিয়ে এখন নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে নাদিয়ার।

অন্য প্রসঙ্গ টানল নাদিয়া, জানতে চাইল, 'কাজটা কি, মেজর?'

কাজের কথাগুলো গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করল রানা। নাদিয়া যখন নিজের কথা বলছিল, তার চোখ, ঠোঁট, কপাল আর হাতের দিকে এমন গভীর মনোযোগ দিয়েছিল ও, ভুলেই গিয়েছিল এখানে একটা কাজ নিয়ে এসেছে। 'এখনো আমি আলেক বোগানকে খুঁজছি,' শুরু করল ও। 'তাকে পাইনি, কিন্তু যে দোকান থেকে জিনিস-পত্র কেনে সেটার খোঁজ পেয়েছি।'

'কিভাবে তা সম্ভব হলো?'

নাদিয়াকে কথাটা বলা চলে না, ভাবল রানা। জাল নোটগুলো ইসরায়েলি স্পাইকে ধরিয়ে দিচ্ছে, এই তথ্য ইন্টেলিজেন্সের বাইরে আর কারও না জানাই ভাল। 'সে অনেক কথা,' বলল ও। 'ওই দোকানে একজনকে পাহারায় রাখতে চাই আমি, আবার যদি ফিরে আসে এই আশায়।'

'আমাকে?'

'সহজ কাজ,' বলল রানা। 'না পারার কিছু নেই।'

'তারপর, সে যখন দোকানে আসবে, চিনির একটা বস্তা দিয়ে তার মাথায় দুম করে এক ঘা বসিয়ে দেব? তারপর খবর পেয়ে আপনি না পৌঁছানো পর্যন্ত পাহারা দেব অজ্ঞান লোকটাকে?'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল রানা। 'তা তুমি পারো!' চোখ বন্ধ করল ও। 'লাফ দিয়ে কাউন্টার টপকাচ্ছ, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।' চোখ খুলল ও। অনুভব করল, আড়ষ্ট ভাবটা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠেছে সে।

'সিরিয়াসলি, ঠিক কি করতে হবে আমাকে?'

'জানতে হবে কোথায় থাকে।'

'কিভাবে?'

'পরিস্থিতি কি হয় তার ওপর নির্ভর করে,' বলল রানা। 'তুমি হয়তো তার সাথে বন্ধুত্ব পাতাবার সুযোগ পেয়ে যাবে। দেখতে তুমি অত্যন্ত ভাল…অনায়াসে ফাঁদে ফেলতে পারবে।'

'বন্ধুত্ব পাতানো মানে, কি বোঝাতে চাইছেন আপনি?'

'বন্ধুত্বটা কি ধরনের হবে তা নির্ভর করে তোমার ওপর,' বলল রানা। 'তা ঠিকানা জানা নিয়ে কথা, সেটা পাবার জন্যে যতটা ঘনিষ্ঠ হতে হয়, হবে।'

'আচ্ছা!' হঠাৎ করেই মুড বদলে গেল নাদিয়ার। গলার আওয়াজে পরিষ্কার তিক্ততা ফুটে উঠল। তার এই পরিবর্তনে বিস্মিত হলো রানা। মেয়েটার মেজাজ এত ঘন ঘন বদলায়, তাল পাওয়া মুশকিল। ওর মত একটা মেয়ে, যে কিনা পুরুষের সঙ্গ পেতে অভ্যস্ত, সাজেশনটা তার কাছে অপমানকর লাগতে পারে?

'তারচেয়ে, আপনার ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মীকে লাগাচ্ছেন না কেন?' জানতে চাইল নাদিয়া। 'সে-ই তো লোকটার পিছু নিয়ে কোথায় থাকে দেখে আসতে পারে।'

'তুমি ব্যর্থ হলে আমাকে হয়তো সে-ব্যবস্থাই করতে হবে,' বলল রানা। 'এখুনি তা করছি না, কারণ, পিছু নিলে সেটা টের পেয়ে যেতে পারে লোকটা। আর একবার টের পেলে, ফেউ খসাতে তার সময় লাগবে না। মনে রাখতে হবে, লোকটা প্রফেশনাল। ওই দোকানেও আর সে ফিরে আসবে না।'

'শুধু কি ঠিকানা জানলেই চলবে?' শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল নাদিয়া।

'ভাল হয় যদি কোনভাবে ওর বাড়িতে ডিনারের একটা দাওয়াত আদায় করতে পারো। তাহলে যা জানতে চাই তা জানাও হবে, নিজেদের উপস্থিতিও প্রকাশ পাবে না। জানি, এতে কাজ নাও হতে পারে। দুটো বিকল্পেই ঝুঁকি আছে। কিন্তু পিছু নেয়ার মধ্যে ঝুঁকি একটু বেশি।'

'হ্যাঁ, বুঝেছি।'

বুঝবে না কেন? ভাবল রানা। পানির মত সহজ ব্যাপার, না বোঝার কি আছে? বড় অদ্ভুত মেয়ে, এই তাকে আড়ষ্ট করে তুলছে, পরমুহূর্তে রাগিয়ে দিচ্ছে। এই প্রথম একটা আশঙ্কা জাগল রানার মনে, তার যে কোন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানও করে বসতে পারে নাদিয়া। মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল ও, 'কি, সাহায্য করবে আমাকে?'

কাউচ থেকে নেমে খোলা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল নাদিয়া। শরীরের পেশী টান টান হয়ে আছে, কিন্তু বোঝা গেল কারণটা রানাকে বলতে চায় না সে।

এই রকম মেজাজী মেয়েকে নিয়ে কাজ করা মুশকিল, ভাবল রানা। ফ্যাসাদেই পড়া গেল দেখছি—এখন যদি সহযোগিতা করতে রাজি না হয়!

বিশ সেকেন্ড পর জানালার দিকে পিছন ফিরল নাদিয়া। 'সারা জীবন ধরে যা করছি, এটা তারচেয়ে খারাপ কিছু নয়, কি বলেন?'

'আমিও তা ভেবেছি,' স্বস্তি পেয়ে বলল রানা।

ঠাণ্ডা সাপের দৃষ্টি ফুটে উঠল নাদিয়ার চোখে।

'কাল থেকে কাজে লেগে যাও,' আবার বলল রানা। দোকানের ঠিকানা লেখা এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিল ও, এগিয়ে এসে সেটা নিল নাদিয়া। কিন্তু কি লেখা আছে দেখল না। 'দোকানের মালিকের নাম মিকিস পসাইডোন।'

'পসাইডোন?' অদ্ভুত এক অস্থির হাসি হাসল নাদিয়া। 'গ্রীক দেবতা। ইনি আবার ভোগ চাইবেন না তো?'

'আমরা কাজের কথা বলছি, নাদিয়া,' একটু কঠোর হলো রানা।

সাথে সাথে প্রসঙ্গে ফিরে এল নাদিয়া। 'ক'দিনের কাজ এটা?'

'ঠিক নেই,' উঠে দাঁড়াল রানা। 'কয়েকদিন পর পর যোগাযোগ করব আমি, সব ঠিক আছে কিনা জানার জন্যে। কিন্তু বোগানকে তুমি দেখলেই খবর দেবে আমাকে। বুঝেছ তো?'

'হ্যাঁ।'

একটা কথা মনে পড়ে গেল রানার। 'পসাইডোন জানে, জাল নোটের জন্যে আলেকের পিছনে লেগেছি আমরা। সে যে স্পাই ওকে বলবে না।'

'বলব না।'

বিষণ্ণ আর ম্লান ভাবটা স্থায়ী হয়ে গেছে নাদিয়ার চেহারায়। পরস্পরের সঙ্গ ওরা এখন আর উপভোগ করছে না। রানা বলল, 'তুমি পড়ো, আমি গেলাম।'

দরজার দিকে এগোল নাদিয়া, 'চলুন, দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিই।'

সদর দরজা খুলে একপাশে দাঁড়াল নাদিয়া। চৌকাঠ পেরিয়ে বেরিয়ে এল রানা। ঘুরে নাদিয়ার দিকে তাকাতে যাবে, দড়াম করে শব্দ তুলে মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

বন্ধ দরজার গায়ে পিঠ রেখে হাঁপাতে লাগল নাদিয়া। বন্ধ চোখের কোণে টলমল করছে দু'ফোঁটা পানি।

তার জীবনে আশ্চর্য এক ভদ্রতা আর সুরুচি নিয়ে হঠাৎ কোত্থেকে যেন উদয় হলো ও। নতুন এক ধরনের কাজের কথা বলল, বলল দেশের জন্যে এই কাজ তোমার করা দরকার। তারপর কাজ দিতে গিয়ে তাকে আবার সেই পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্যে যেতে বলছে।

কেন মনে হয়েছিল জানে না নাদিয়া, কিন্তু সত্যি মনে হয়েছিল, তার জীবনে একটা পরিবর্তন এনে দেবে ও। তাকে আর কামুক বুড়োরা টাকার লোভ দেখিয়ে বিরক্ত করবে না, বিছানায় তোলার ষড়যন্ত্র করবে না, তাকে আর লম্পট, কুৎসিত দর্শকদের সামনে নাচতে হবে না। তাকে আর এমন গান গাইতে হবে না যা শুনে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। ভেবেছিল, ভাল একটা কাজ পেয়েছি, জীবনটাকে আবার নতুন করে গড়ব। কিন্তু শুরুতেই দেখা গেল, সব ভুয়া, আসলে সেই পুরানো কাজই করতে হবে তাকে। সারা জীবন পুরুষের মনোরঞ্জন করাই যেন তার নিয়তি।

একটানা তিন বছর শরীর আর চেহারা দেখিয়ে বেঁচে আছে সে। এবার সে থামতে চেয়েছিল।

কিচেনে ঢুকে আলমিরা থেকে লুকানো একটা হুইস্কির বোতল বের করল সে। গ্লাসে ঢালার ধৈর্য নেই, বোতল থেকেই ঢক ঢক করে খানিকটা খেয়ে ফেলল।

প্রথম দিকে রানাকে তার পছন্দ হয়নি। শুধু আনাড়ী নয়, আড়ষ্ট নয়, কেমন যেন দাম্ভিক বলে মনে হয়েছিল ওকে। কিন্তু এক সময় ওর ভেতরের আলাদা একটা সত্তাকে আবিষ্কার করে ফেলে সে। বাইরের খোলসের নিচে ওর ভেতর লুকিয়ে আছে অন্য এক মানুষ। ও যখন মন খুলে হাসে, সেই অন্য মানুষটাকে দেখতে পায় নাদিয়া। অন্তত বার কয়েক দেখার সৌভাগ্য হয়েছে তার। আজ রাতেও একবার দেখেছে—সে যখন বোগানের মাথায় চিনির বস্তা দিয়ে বাড়ি মারার কথা বলল। রানার ওই হাসি, ওর সমস্ত কৃত্রিমতাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়—মুহূর্তের মধ্যে পবিত্র, অনাবিল, উদার আর সাধু-পুরুষ হয়ে ওঠে ও। না, এসব তার কল্পনা নয়। অন্তরের অন্তস্তল থেকে দেখেছে সে, উপলব্ধি করেছে। এই রহস্য আবিষ্কারের পর থেকেই ওর ভেতরটা গোপনে উঁকি দিয়ে দেখার সাধ জাগে তার মধ্যে। ইচ্ছে হয়,

লোকটার বুকের ভেতর ঢুকে গিয়ে ওকে অনুভব করে।

ওর এই হাসি দেখার জন্যেই ওকে ব্যঙ্গ করেছে নাদিয়া। একই কারণে দরজা খুলে ওকে দেখেই চুমু খেতে গিয়েছিল।

রানা তার ঘরে এসে কাউচে বসেছে, তার হাত থেকে নিয়ে চুমুক দিচ্ছে কফির কাপে, তার সাথে তর্ক করছে, তার কথায় রাগছে, বিরক্ত হচ্ছে—এটা যে তার জন্যে কতটুকু আনন্দের, বোঝাতে পারবে না নাদিয়া। মনে হচ্ছিল, এতদিন ধরে ঘর সাজিয়েছে, সমস্ত খাটা-খাটনি আজ আমার সার্থক হলো। এই ঘরে কি আশ্চর্য মানাচ্ছিল ওকে! দু'চোখ ভরে শুধু দেখতেই ইচ্ছে করেছে।

ওকে ভাল লাগার হাজারটা কারণ আছে, তার মধ্যে অনেকগুলো নিজের কাছেও পরিষ্কার নয়। হয়তো ওকে সাধারণ একজন নাচিয়ে মেয়ে বলে গ্রহণ করেনি ও ভাল লাগার সেটাই কারণ। তার সাথে মানুষ হিসেবে আচরণ করেছে ও, আর কারও কাছ থেকে এই আচরণ পায়নি সে।

নাদিয়া জানে, রানা কখনো ওর নিতম্বে চাপড় দিয়ে বলবে না, 'তুমি একটা খাসা মাল!'

হয়তো এই ভদ্রতার জন্যে, এই সুরুচির জন্যেই ভাল লেগে গিয়েছিল।

তবু সান্ত্বনা, ব্যাপারটা বেশি দূর গড়াবার আগেই ভুল ভেঙেছে তার। আচ্ছা, আলেক বোগান নামে একজন লোকের সাথে বন্ধুত্ব পাতাতে তারই বা এত আপত্তি কিসের? ছল-চাতুরীর সাহায্যে এত লোকের মন ভুলিয়েছে, আরও একজনের মন ভুলালে কি এমন ক্ষতি হবে তার? রানাও তাকে প্রায় এই রকম একটা কথা বলেছে। কথাটা বলে তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, তাকে একটা বাজে মেয়ে বলেই ধরে নিয়েছে ও।

নাদিয়া, তুমি একটা বাজে মেয়ে। তুমি একটা বেশ্যা!

নাহয় তাই, কিন্তু তাই বলে রানার মত একজন লোক স্পষ্ট উচ্চরণে কথাটা তাকে বলতে পারল! সেজন্যেই রাগ হয়েছে তার। অপমান বোধ করেছে।

ভেবেছিল, আর সবার চেয়ে মাসুদ রানা আলাদা। কিন্তু ভুল!

কিন্তু আলাদা হোক বা না হোক, তাতে আমার কি এসে যায়? এত কেন মাথাব্যথা আমার?

মাঝরাতে খোলা জানালার সামনে বসে আছে রানা। পিঠে চকমকে চাঁদের আলো মেখে বয়ে যাচ্ছে নীল নদ, ফুরফুরে হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে মাথার চুল, আকাশ ভরা লক্ষ-কোটি তারা আলোর সঙ্কেত দিয়ে কি যেন বলতে চাইছে। নাম না জানা বাঁশি না কি থেকে যেন মন উদাস করা বিষণ্ন সুর ভেসে আসছে—উতলা হয়ে ওঠে মন, বুকের ভেতরে গুমরে ওঠে একটা অদম্য কান্না। সুরটাও অচেনা, তবু বোঝা যায়, বিরহ জ্বালা সহ্য করতে না পেরে যন্ত্রণা-নীল অনুভূতির কথা প্রকাশ করতে চাইছে ব্যর্থ প্রেমিক। সমবেদনায় আপ্লুত হয়ে ওঠে অন্তর।

কত কি ভাবতে লাগল রানা। মানুষ কত অসহায়। তবু তার জীবনে প্রেম আছে। আছে সুখ। আর আছে দুঃখ। আছে যুদ্ধ। কেন, কে জানে হঠাৎ বিদ্যুৎ

চমকের মত ছোটবেলার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল রানার।

তখন ওর বয়স হবে নয় কি দশ। যৌন বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ, শারীরিক দিক থেকে তখনও অপরিণত। ওদের বাড়িটা ছিল লাল ইঁট দিয়ে তৈরি, তাই সবাই ওটাকে লালবাড়ি বলত। লালবাড়িতে বাথরূম ছিল একটাই। পেশাব করতে গিয়ে একদিন খুব বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল সে।

বাথরূমের দরজা ভেজানো ছিল, জানত না ওখানে তার দূর সম্পর্কের চাচাতো বোন ইতি গোসল করছে। ভেতরে ঢুকে দেখে, বাথটাবে শুয়ে রয়েছে ইতি। ওর মাকেও দেখল রানা। হাতে তোয়ালে নিয়ে অপেক্ষা করছেন, বাথটাব থেকে ইতি উঠে এলে তার গা মুছিয়ে দেবেন।

ইতির দিকে তাকাল রানা। তার পরনে কিছু ছিল না। এই প্রথম নগ্ন একটা মেয়েকে দেখল রানা। ইতির শরীরটা ওই আট বছর বয়সেই ফোলা ফোলা দেখাত। গরম পানিতে গোসল করছিল, লালচে একটা রঙ ফুটে উঠেছিল ইতির গায়ে। এমন সুন্দর দৃশ্য জীবনে খুব কমই দেখেছে রানা। ইতিকে দেখার মধ্যে কোন জড়তা ছিল না, প্রশংসার দৃষ্টিতেই দেখছিল ও।

চড়টা আসছে দেখতে পায়নি রানা। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত চাচীর হাতটা ছুটে এসে সজোরে আঘাত করল ওর গালে।

ব্যথায় প্রায় জ্ঞান হারাবার অবস্থা হয়েছিল রানার। কিন্তু ব্যথার চেয়ে বেশি ছিল শকটা। সবচেয়ে খারাপ হয়েছিল, ইতিকে দেখতে দেখতে আনন্দের যে অনুভূতিটা জন্ম নিয়েছিল, এক নিমেষে কাঁচের মত ভেঙে চুরমার হয়ে যায় সেটা।

'বেরিয়ে যাও!' চেঁচিয়ে উঠেছিল চাচী।

মাথা নিচু করে বেরিয়ে এসেছিল রানা। লজ্জায়, অপমানে, অভিমানে মরে যেতে ইচ্ছে করেছিল তার।

রাতের তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে সব কথা মনে পড়ে গেল রানার। ঘটনাটা যখন ঘটেছিল তখন যে প্রশ্নটা জেগেছিল ওর মনে, সেই প্রশ্নটাই আবার ফিরে এল—কিন্তু চাচী তাকে মারলেন কেন?

তেরো

প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে বিপদে পড়ে গেল আলেক বোগান।

সূর্য ওঠার অনেক আগেই হাউজবোট থেকে রওনা হয়ে পুরানো শহরে চলে এসেছে, হঠাৎ খেয়াল হলো আর আধমাইলটাক এগোলেই তার বাবার মসজিদ, একবার দেখে গেলে হয়।

নির্জন রাস্তা, শহর এখনও জেগে ওঠেনি। তবু সাবধানের মার নেই ভেবে পিছন দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখল আলেক। না, কেউ তাকে অনুসরণ করছে না।

মোয়াজ্জিন আজান দিচ্ছে, এই সময় মসজিদের সামনে পৌঁছুল আলেক। মুসল্লীরা অনেকেই রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে ঠাণ্ডা হাওয়া খাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি করে

ভেতরে ঢুকল সবাই।

আলেকের সৎ বাবার টাকায় তৈরি হয়েছে এই মসজিদ, জায়গাটাও আহমেদ পরিবারের। বেশ বড় একটা জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মসজিদটা। সামনে মস্ত এক উঠান, একধারে অযু করার জন্যে গোলাকার উঁচু বেদী, মাঝখানে বিরাট ফোয়ারা। মসজিদের ভেতর মোটা পিলার আছে অনেকগুলো, মোজাইক করা ঠাণ্ডা মেঝে। এই মসজিদকে ঘিরে কিশোর বয়সের অনেক স্মৃতি আছে আলেকের। ভেতরটা একবার ঘুরে দেখার ইচ্ছে হলো তার। মুসল্লীদের পিছু পিছু সে-ও ঢুকে পড়ল।

উঠান পেরিয়ে ফোয়ারার দিকে এগোচ্ছে আলেক, হঠাৎ মনটা খুঁতখুঁত করে ওঠায় ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে। অমনি ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। খলিফা!

খলিফা এখানে কি করছে! লোকটা নামাজ পড়ে এ-কথা বিশ্বাস করা যায় না। নিশ্চয়ই কোন মতলবে এসেছে ব্যাটা।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দু'জন লোকের সাথে কথা বলছে খলিফা, তাকিয়ে আছে অন্য দিকে। আলেককে এখনও দেখতে পায়নি সে, কিন্তু এদিকে একবার তাকালেই দেখতে পাবে।

এদিক ওদিক তাকাল আলেক। কোথায় গা ঢাকা দেয়া যায় এখন! নামাজীরা অযু করছে, তাঁদের মাঝখানে ঢুকে পড়ে সে-ও অযু করতে বসে গেল। এতগুলো লোকের মধ্যে তাকে আলাদা করে চিনতে পারবে না খলিফা।

নামাজের সমস্ত নিয়ম শেখা আছে আলেকের, কিছুই ভোলেনি। নিয়ম মাফিক অযু করতে লাগল সে। ভাবল, খলিফা হয়তো নামাজ পড়তে আসেনি, এসেছে কোন নামাজী লেকের সাথে দরকারী কোন বিষয়ে আলাপ করতে। একটু পরই হয়তো চলে যাবে।

অযু শেষ করে গেটের দিকে আবার তাকাল আলেক। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে খলিফা, সেই দু'জন লোকের সাথে কথা বলছে এখনও।

অযু করা শেষ, কাজেই এখানে আর বসে থাকতে পারে না আলেক। কারও মনে প্রশ্ন উঠতে পারে। অগত্যা নামাজ পড়ার জন্যে মসজিদের ভেতর ঢুকতে হলো তাকে।

ভেতরে অনেক ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে, কিন্তু সেদিকে না গিয়ে নামাজীদের ছোটখাট একটা ভিড়ের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল আলেক। খলিফা যদি ভেতরে ঢোকেও, তাকে যেন দেখতে না পায়।

নামাজে দাঁড়িয়ে প্রথমে দুই রাকাত সুন্নত নামাজের নিয়ত পড়ল আলেক। 'নাওয়াইতো আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহে তা-আলা রাকআতায় সালাতিল ফাজরে সুন্নাতু রাসুলিল্লাহে তা-আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জেহাতিল কাআবাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আকবর।'

দুই রাকাত সুন্নত, তারপর দুই রাকাত ফরজ নামাজ পড়া শেষ করল আলেক, কোথাও একটু ভুল হলো না তার। আরাম করে বসে এদিক ওদিক তাকাল ও, অমনি চোখাচোখি হয়ে গেল খলিফার সাথে। পাঁচ হাত দূরে বসে সে-ও

নামাজ পড়ছে। নামাজ শেষ না করেই হাসল সে, ভোরের ম্লান আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল স্টীলের দাঁত।

মসজিদের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে স্যান্ডেল পরছে আলেক, তার পাশে এসে দাঁড়াল খলিফা। মনে মনে অসন্তুষ্ট ও উদ্বিগ্ন হলেও চেহারায় হাসি ফুটিয়ে করমর্দন করল আলেক।

'তুমি আমার মতই পরহেজগার, দোস্ত,' বলল খলিফা। 'আমি জানতাম, নিজের বাবার তৈরি মসজিদে একদিন না একদিন আসবেই তুমি।'

'তুমি আমাকে খুঁজছ?'

'অনেকেই তোমাকে খুঁজছে, দোস্ত!'

মসজিদ থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

'মানে?' কিছু না বোঝার ভান করল আলেক।

'তুমি নামাজী জানার পর,' বলল খলিফা, 'তোমার সাথে আমি বেঈমানী করতে পারি না, তা সে ওরা যত টাকার লোভই আমাকে দেখাক। দুশ্চিন্তার কিছু নেই, দোস্ত, মেজর রানাকে আমি বলে দিয়েছি, আলেক বোগান বা আলেক আব্বাস নামে কাউকে আমি চিনি না।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আলেক। এখন আর ভান করার কোন মানে হয় না। ওরা তাহলে এখনও তাকে খুঁজছে? অথচ তার ধারণা ছিল, বিপদ কেটে গেছে। খলিফার একটা হাত ধরল সে, সস্তাদরের নোংরা একটা রেস্তোরাঁর দিকে টেনে নিয়ে চলল তাকে। রেস্তোরাঁয় ঢুকে একটা টেবিল দখল করে বসল ওরা।

'ওরা তাহলে আমার মুসলিম নামও জানে?'

'তোমার সম্পর্কে সব কথাই জানে ওরা, জানে না শুধু তুমি কোথায় থাকো।'

উদ্বেগে গলা শুকিয়ে এল আলেকের। জানতে চাইল, 'মেজর লোকটা সম্পর্কে কি জানো বলো আমাকে।'

'বিদেশ থেকে ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে মেজর রানাকে,' বলল খলিফা। 'ইসরায়েলি স্পাইদেরকে ধরার কাজ দেয়া হয়েছে। দেখে মনে হয় ভালমানুষের গাছ, ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না, আসলে হারামীর হাড়। এই লোক তোমার পেছনে লাগল কেন, বুঝি না!'

মিথ্যে কথা বলছে খলিফা। আলেকের পরিচয় এবং উদ্দেশ্য, দুটোই জানে সে—অন্তত আন্দাজ করতে পারে।

'আর কিছু জানো না?'

'লোকটার ধৈর্য আছে, আর সাংঘাতিক জেদি। কোন কাজে হাত দিলে সেটার শেষ দেখে তবে ছাড়ে। তোমার জায়গায় আমি হলে এই লোককে ভয় পেতাম।'

হঠাৎ সত্যি সত্যি ভয় পেল আলেক। 'আমার ব্যাপারে কি করছে সে, জানো?'

'তোমার পরিবার সম্পর্কে সব জেনেছে। তোমার সবক'টা ভাইয়ের সাথে কথা হয়েছে তার।'

'কি বলেছে তারা?'

'বলেছে তোমার সম্পর্কে কিছু জানে না।'

হলুদ রঙের দু'প্লেট হালুয়া আর দু'জোড়া কালি মাখা রুটি দিয়ে গেল রেস্তোরাঁর মালিক। এক টুকরো রুটি ছিঁড়ে একটু হালুয়া নিল আলেক, মুখে পুরে ধীরে ধীরে চিবাতে শুরু করল। টেবিলের ওপরটা কালো হয়ে আছে মাছির ভিড়ে। দু'জনের কেউই সেগুলোকে তাড়াল না।

মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে খলিফা বলল, 'মেজর রানা আমাকে দু'হাজার পাউন্ড দিতে চায়। হুঁহ্। ভেবেছে তাতেই আমি তোমার সাথে বেঈমানী করব।'

ঢোক গিলল আলেক। 'তুমি কিন্তু আমার ঠিকানা জানো না।'

কাঁধ ঝাঁকাল খলিফা। 'সেটা কোন সমস্যাই নয়। যে-কোন মুহূর্তে জেনে নিতে পারি।'

'মানি,' বলল আলেক। 'তাই, তোমাকে বিশ্বাস করি তার প্রমাণ হিসেবে, কোথায় থাকি বলছি।' এদিক ওদিক তাকিয়ে কেউ ওদের কথা শুনেছে কিনা দেখে নেবার ভান করল সে, তারপর খলিফার দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, 'হোটেল শেরাটনে উঠেছি।'

মুখ নাড়া বন্ধ করে আহত দৃষ্টিতে আলেকের দিকে তাকিয়ে থাকল খলিফা। বলল, 'দোস্ত, আমাকে তোমার মিথ্যে কথা বলা উচিত নয়। তোমার মত একজন আধা বিদেশী লোককে ওখানেই খুঁজবে ওরা।'

'তুমি আমাকে ভুল বুঝছ, খলিফা,' বলল আলেক। মুচকি হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে। 'ওখানে আমি গেস্ট হিসেবে নেই। কিচেনে কাজ করি। বাসনকোসন ধুই, ঘর মুছি, তারপর রাত হলে দশ-বারো জনের সাথে মেঝেতে বিছানা করে গাদাগাদি করে শুয়ে ঘুমাই।'

'ইয়া আল্লা! ইয়া পরোয়ারদেগার! আমার দোস্তের মাথায় এত বুদ্ধি দিয়েছ তুমি!' গলা ছেড়ে হেসে উঠল খলিফা। আলেকের কাঁধ চাপড়ে দিল সে। দামী একটা তথ্য পেয়েছে, খুশি তো হবেই। 'না, দোস্ত, তোমাকে আমার গুরু মানতেই হয়। একেবারে ঠিক ওদের নাকের সামনে ঘুমিয়ে আছ, অ্যাঁ!'

'আমি জানি, এ-কথা কাউকে তুমি বলবে না,' বলল আলেক। 'শোনো, খলিফা, আমি তোমার বন্ধু এটা প্রমাণ করার জন্যে...' পকেট থেকে মানি ব্যাগ বের করে বিশটা একশো পাউন্ডের নোট গুনল সে, সেগুলো টেবিলের ওপর রেখে কথাটা শেষ করল, '...এই টাকাটা তোমাকে দিলাম। না নিলে কিন্তু আমি মাইন্ড করব।'

'ঠিক আছে,' টাকার ওপর হাত চাপা দিয়ে বলল খলিফা, 'এত করে যখন বলছ, না নিই কি করে! কিন্তু, দোস্ত, এসবের সত্যি কোন দরকার ছিল না।'

'মেজর রানা তোমাকে দু'হাজার দিতে চেয়েছে, কাজেই আমার আরও কিছু বেশি দেয়া দরকার—বুঝি। কিন্তু এই মুহূর্তে নেই আর। ঠিক আছে, তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করব আমি।'

আঙুল দিয়ে পিরিচের হালুয়াটুকুর শেষ পর্যন্ত খেল খলিফা, তারপর বলল,

'এবার তাহলে যেতে হয় আমাকে। দোস্ত, বিলটা কিন্তু আমি দেব।'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ।'

পকেটে হাত দিল খলিফা, বলল, 'আয় হায়! আমার কাছে যে ভাঙতি টাকা নেই!'

'ঠিক আছে, তাতে কি, আমিই দিয়ে দিই।'

'আবার তাহলে দেখা হবে,' বলল খলিফা। গদাইলশকরী চলে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গেল সে।

কফির অর্ডার দিয়ে খলিফার কথা ভাবতে লাগল আলেক। বিচ্ছু লোক, এক পাউন্ডের জন্যেও হাসতে হাসতে বেঈমানী করতে পারে। তার ঠিকানা জানে না, জানলে মেজর রানাকে বলে দিত। ঠিকানা জানে না, কিন্তু জানার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে, মসজিদে তার উপস্থিতিই সেটা প্রমাণ করে। খলিফা কি করবে এখন? অবশ্যই হোটেল শেরাটনে খবর নেবে, সত্যি সে কিচেনে থাকে কিনা জানতে চেষ্টা করবে। চেষ্টা করলেই যে খবর পাবে, অত সহজ নয়। হোটেল কর্তৃপক্ষ স্বীকারই করবে না কিচেনের মেঝেতে কাউকে শুতে দেয়া হয়। সত্যি কিচেনের মেঝেতে কেউ শোয় কিনা, আলেক নিজেও তা জানে না। তবে আগে বা পরে মিথ্যেটা ধরে ফেলবে খলিফা। ঘুষটাও দেয়া হয়েছে কিছুটা সময় পাবার জন্যেই। ও জানে, শেষ পর্যন্ত খলিফা যখন জানবে রোপার হাউজবোটে আছে সে, মেজরকে খবরটা দেবার আগে আরও টাকার জন্যে তার কাছে আসবে।

এইভাবে চিন্তা করলে পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই আছে, অন্তত আপাতত।

বিল মিটিয়ে দিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল আলেক। সকাল হয়ে গেছে, জেগে উঠেছে শহর, এরই মধ্যে যানবাহনের ভিড়ে রাস্তা পেরোনো কঠিন হয়ে পড়েছে। হকাররা এখনও বেরোয়নি, কিন্তু ফকির-মিসকিনরা দল বেঁধে বসে পড়েছে ফুটপাথে। হন হন করে সেন্ট্রাল পোস্ট অফিসের দিকে চলেছে আলেক। একটা টেলিফোন করতে হবে।

জেনারেল হেডকোয়ার্টারের নাম্বারে ডায়াল করে মেজর তারেককে চাইল সে।

'ওই নামে চারজন মেজর আছেন এখানে,' বলল অপারেটর। 'পুরো নামটা বলুন, প্লীজ।'

'তারেক আবদুল্লা।'

খোঁজ নিয়ে অপারেটর জানাল, 'মেজর তারেক এই মুহূর্তে হেডকোয়ার্টারের বাইরে আছেন। কোন মেসেজ থাকলে আমরা রাখতে পারি।'

তারেক যে হেডকোয়ার্টারে নেই, জানে আলেক। এই তো মাত্র সকাল হলো। 'তাহলে লিখে নিন,' বলল সে। তারপর ধীরে ধীরে বলে গেল মেসেজটা— "আজ দুপুর বারোটায় জামালেকে যেতে হবে"। নিচে সই করুন, আই. ই.।'

'আপনার পুরো নামটা যদি বলতেন, প্লীজ…'

রিসিভার নামিয়ে রাখল আলেক। পোস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে জামালেকের

দিকে হাঁটা ধরল।

রোপার সাথে বিছানায় ওই একবারই শুতে পেরেছে তারেক। তারপর বহু চেষ্টা করেও রোপার দেখা পায়নি সে। ইতোমধ্যে বারো জোড়া গোলাপ ফুলের তোড়া,. দু'বাক্স চকলেট, এক ডজন রুমাল আর দুটো প্রেম পত্র পেয়েছে রোপা। দেখা করতে অসমর্থ হয়ে লোক মারফত ডুম ডাম ক্লাবে চিঠি দুটো পাঠিয়েছিল তারেক। আলেকের নির্দেশেই তার সাথে দেখা করেনি রোপা। আলেক জানে, রোপার মত সুন্দরী মেয়ের সাথে বিছানায় ওঠার সুযোগ জীবনে এই একবারই পেয়েছে মেজর। ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই সে ভাবতে শুরু করেছে, আর বোধহয় রোপার সাথে তার দেখা হবে না। এই অবস্থায় দেখা করার সুযোগ পেলে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসবে সে।

হাউজবোটে ফেরার পথে একটা খবরের কাগজ কিনল আলেক, কিন্তু অনেক খুঁজেও তার বিষয়ে কোন খবর দেখল না। হাউজবোটে ফিরে দেখল, এখনও ঘুম ভাঙেনি রোপার। হাতের ভাঁজ করা কাগজটা তার গায়ের ওপর ছুঁড়ে মারল সে।

ঘুমের ঘোরে গুঙিয়ে উঠে পাশ ফিরল রোপা। তাকে ছেড়ে পর্দা সরিয়ে লিভিংরুমে চলে এল আলেক। শেষ মাথায়, বোটের প্রাউ-এ ছোট্ট একটা কিচেন। কিচেনের একধারে বিরাট একটা কাঠের আলমিরা। ঝাঁটা, অতিরিক্ত তৈজসপত্র ইত্যাদি রাখা হয় ওতে।

আলমিরার দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করল আলেক। হাঁটু ভাঁজ করে, মাথা নুইয়ে ঢোকা গেল। দরজায় তালা লাগাবার ব্যবস্থা শুধু বাইরের দিক থেকে। টেবিলের দেরাজ থেকে একটা ছুরি বের করল সে, তারপর আবার ঢুকল আলমিরার ভেতর। ছুরির সরু ফলাটা তালার উল্টোদিক দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে মোচড় দিতেই ক্লিক করে একটা শব্দ হলো। তার মানে ভেতর থেকেও তালাটা বন্ধ করা সম্ভব।

আলমিরার ভেতর থেকে সরু ফাটলে চোখ রাখল আলেক। কিচেনের অনেকটাই দেখতে পাওয়া যায়। ভেতর থেকে তালা খুলে আলমিরা থেকে বেরিয়ে আসতে যাবে সে, ফাটলে চোখ পড়তে দেখল, পর্দা সরিয়ে লিভিং রুমে ঢুকছে রোপা।

চারদিকে তাকাল রোপা। আলেককে কোথাও দেখতে না পেয়ে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল চেহারায়। কি ভাবল কে জানে, কাঁধ ঝাঁকাল সে। তারপর স্কার্ট তুলে তলপেট চুলকাল। কোনমতে হাসি ঠেকাল আলেক। ওখানে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল রোপা, তারপর এগিয়ে আসতে শুরু করল। কিচেনে ঢুকে কেটলিটা তুলে নিল সে, নব ঘুরিয়ে পানির কল ছাড়ল।

আলমিরার দরজা খুলে কিচেনে বেরিয়ে এল আলেক। বলল, 'গুড মর্নিং।'

তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল রোপার গলা থেকে।

গলা ছেড়ে হাসতে লাগল আলেক।

হাতের কেটলিটা আলেকের দিকে ছুঁড়ে মারল রোপা। মাথা নিচু করে নিয়ে হামলাটা এড়াল আলেক। বলল, 'লুকাবার জন্যে ভাল জায়গা, তাই না?'

'ইউ, বাস্টার্ড!' চিৎকার করে বলল রোপা। 'তুমি আমাকে ভয় দেখালে

কেন?'

মেঝে থেকে কেটলি তুলে রোপার হাতে ধরিয়ে দিল আলেক। 'কফি বানাও, সুন্দরী।' আলমিরার ভেতর ছুরিটা রেখে দরজা বন্ধ করল সে। একটা টুলে বসল।

'হঠাৎ লুকাবার জায়গা দরকার হলো কেন?' জানতে চাইল রোপা।

'তোমাকে আর তারেককে দেখার জন্যে। দেখার মত একটা দৃশ্য হবে, হলপ করে বলতে পারি। শালা মেজর একেবারে রাক্ষস হয়ে আছে।'

'আসছে?'

'আজ দুপুর বারোটায়।'

'কি? না! দুপুর বেলা কেন!'

'শোনো। মেজরের ব্রীফকেসে যদি দামী কিছু থাকে, সারাদিন সেটা বয়ে বেড়াবে না। সে অনুমতিও তাকে দেয়া হবে না। জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে সোজা অফিসে গিয়ে তালা চাবির ভেতর রেখে দেবে ব্রীফকেস। কিন্তু তা করার সময় তাকে আমরা দেব না। সেজন্যেই বারোটার সময় আসতে বলা হয়েছে। হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে প্রথমে যদি অফিসে যায়, এখানে আসতে দেরি হয়ে যাবে। ধৈর্যে কুলাবে না, অফিসে না গিয়ে এখানেই আসবে সে।'

'কিন্তু ধরো, অফিস থেকে যদি হয়েই আসে?'

'যদি দেখি সাথে ব্রীফকেস নেই, ওর ডাকে হাউজবোট থেকে সাড়া দেবে না তুমি। পরের বার আবার যখন এখানে তাকে আসতে বলা হবে, অফিসে না গিয়ে সরাসরি চলে আসবে, পৌঁছুতে যাতে দেরি না হয়।'

'এতদিক ভেবে রেখেছ!'

মুচকি হাসল আলেক। 'আরও কত কি ভেবে রেখেছি, শুনলে তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে। এখন তাড়াতাড়ি কফি বানাও দেখি। অন্তত দু'ঘণ্টা সময় নিয়ে সাজতে হবে তোমাকে। দেখে যেন মাথা ঘুরে যায় বানচোতের।'

'না সাজলেও আমাকে দেখে মাথা ঘুরে যায় লোকের।' স্টোভে কফির পানি চড়িয়ে দিয়ে বেডরুমের দিকে পা বাড়াল রোপা।

পিছন থেকে হাঁক ছাড়ল আলেক, 'চুলে শ্যাম্পু দিতে ভুলো না।'

কোন মন্তব্য করল না রোপা। হাতঘড়ি দেখল আলেক। আশ্চর্য, কেমন লাফ দিয়ে দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে সময়। হাউজবোটের প্রতিটা ইঞ্চি খুঁজে যা কিছু আছে সব এক জায়গায় জড়ো করতে শুরু করল সে। কাপড়চোপড়, জুতো, টুপি, টুথব্রাশ, সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার, রুমাল—সব মিলিয়ে পাহাড় তৈরি হলো। ওকে কফি খাইয়ে গোসল সেরে নিয়েছে রোপা। গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে ডেকে বসে চুল শুকাচ্ছে।

কিচেনে ঢুকে শুধু নিজের কফির কাপটা ধুয়ে রাখল আলেক। কাবার্ড থেকে শ্যাম্পেনের বোতল বের করল, বরফের বালতিতে বোতলটা ভরে রেখে দিল বিছানার ধারে। পাশের তেপয়ে থাকল দুটো গ্লাস। বিছানার চাদর বদল করার কথা ভাবল একবার, কিন্তু ঠিক করল তারেক চলে যাবার পর বদলানো যাবে। ডেক থেকে নিচে নেমে এল রোপা। গায়ে সেন্ট স্প্রে করল।

চারদিকে শেষ একবার চোখ বুলাল আলেক। সব ঠিক আছে। ডিভানে বসে পোর্টহোলে চোখ রাখল সে, এখান থেকে টোপাথটা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়।

বারোটার কয়েক মিনিট পর টোপাথে উদয় হলো মেজর তারেক। খুব জোরে হেঁটে আসছে, যেন দেরি হয়ে যাবে মনে করে ভয় পেয়েছে। পরনে ইউনিফর্ম শার্ট, খাকী শর্টস, মোজা আর বুট। আগুন ঝরা দুপুরে দর দর করে ঘামছে সে।

ব্রীফকেসটা হাতেই রয়েছে তার।

নিঃশব্দ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আলেকের চেহারা।

'আসছে তোমার নাগর,' বলল আলেক। 'তুমি তৈরি তো?'

ভ্রূকুটি করল রোপা।

সংকেত-২

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৮৪

এক

একই প্রশ্ন করল আলেক বোগান, এবার আরও নিচু গলায়, 'রোপা, তুমি তৈরি তো?'

রোপার উত্তর, 'না।'

রোপা আসলে আলেককে ঘাবড়ে দিয়ে মজা পেতে চাইছে। আলেকের গলা শুনেই বুঝে নিয়েছে সে, টোপাথে পৌঁছে গেছে মেজর তারেক, গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক হয়ে এখুনি উঠে আসবে হাউজবোটে। সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে আছে রোপা, ব্যাপারটা এখন তার কাছে শুধু অনুরোধে ঢেঁকি গেলা বা নিছক অভিনয় নয়, এর মধ্যে আনন্দময় রোমাঞ্চের খোরাক দেখছে সে। বিছানার সঙ্গী হিসেবে মেজর তারেক কি রকম সে-অভিজ্ঞতা তার আগেই হয়েছে, কিন্তু সেবার তার অভিজ্ঞতায় ভাগ বসায়নি কেউ। আজকের কথা আলাদা। আজ ওদের দু'জনের সমস্ত আচরণ আড়াল থেকে খুঁটিয়ে দেখবে আলেক।

রোপা যে তার সাথে কৌতুক করছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না আলেকের। সময় নেই, তাড়াতাড়ি কিচেনে চলে এসে আলমারির ভেতর ঢুকে পড়ল সে। ভেতর থেকে কবাট বন্ধ করে তালা লাগাল, চোখ রাখল ফাটলে।

গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কে মেজর তারেকের পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। হাউজবোটের ডেকে উঠে এল সে। ডাকল, 'হ্যালো?'

রোপা সাড়া দিল না।

ফাটলে চোখ রেখে আলেক দেখল, সিঁড়ি বেয়ে বোটের ভেতর নেমে এল মেজর।

'কেউ আছেন?'

মখমলের পর্দার দিকে তাকাল আলেক, বেডরুমটাকে দু'ভাগে ভাগ করেছে ওটা। কামরার এদিকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে রোপা।

'রোপা?' আবার ডাকল মেজর।

পর্দা ফাঁক করল রোপা। হাত দুটো নামাল না, পর্দা ধরে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। মাথার ওপর চুলের জটিল এক পিরামিড তৈরি করেছে সে। অন্তর্বাস নেই, পরেছে স্বচ্ছ নাইলনের একটা ঘাগরা, এতদূর থেকেও তার সুঠাম ঊরুর পিছনটা দেখতে পেল আলেক। কোমরের ওপর কিছু পরেনি, শুধু একটা পাথর বসানো নেকলেস।

আলেক ভাবল, লক্ষ্মী মেয়ে!

মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল মেজর তারেক। বাক-শক্তি ফিরে পেতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল তার। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'শোকর আলহামদু-লিল্লাহ! আল্লাহ দয়াময়! তোমাকে পাইয়ে দিয়ে তিনি আমার জন্ম সার্থক করেছেন। খোদার কসম, তুমি আমার সাত রাজার ধন, রোপা ইরিনা!'

হাসি চেপে রাখতে গিয়ে ঘেমে উঠল আলেক।

দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল মেজর। হাত থেকে ব্রীফকেস ছেড়ে দিয়ে রোপার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে আলিঙ্গনের মধ্যে নিয়ে বুকের সাথে পিষতে লাগল। পিছিয়ে এল রোপা, হাত দুটো পিছনে নিয়ে এসে টেনে দিল মখমলের পর্দা।

আলমিরার দরজা খুলে বেরিয়ে এল আলেক।

পর্দার ঠিক এদিকে মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে ব্রীফকেস। ঢোলা, মেঝেতে লুটিয়ে থাকা গালাবাইয়া সামলে হাঁটু গেড়ে বসল আলেক, ব্রীফকেসটা তুলে দুই হাঁটুর মাঝখানে নিয়ে ক্যাচ খোলার চেষ্টা করল।

দমে গেল মন। তালা দেয়া রয়েছে। চারদিকে তাকাল, তালার ভেতর ঢোকাবার জন্যে সরু কিছু একটা দরকার। পিন, পেপার ক্লিপ বা সুচ হলেও চলে। নিঃশব্দ পায়ে কিচেনে ফিরে এল সে। আস্তে করে টেনে একটা দেরাজ খুলল। মীট স্কিউয়ার পাওয়া গেল, কিন্তু চলরে না, বেশি মোটা। তার দিয়ে তৈরি ব্রাশের রোঁয়া, উঁহুঁ, বেশি সরু হয়ে যায়। ভেজিটেবল নাইফ, বেশি চওড়া। বেসিনের পাশে ছোট একটা চীনা মাটির গামলা, তাতে রোপার চুলের একটা কাঁটা পাওয়া গেল। সেটা নিয়ে ব্রীফকেসের কাছে ফিরে এল আলেক। দুটো তালার একটার ভেতর চুলের কাঁটার উল্টো দিক ঢুকিয়ে ঘোরাল সে। খানিকটা ঘুরে ভেতরে কিসের সাথে ঠেকে আটকে গেল কাঁটা।

ধীরে ধীরে চাপ বাড়াল আলেক। মুট করে ভেঙে গেল কাঁটা।

'শালার কপাল!' বিড়বিড় করে বলল সে। চট করে একবার হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল। গতবার কাজ সারতে পাঁচ মিনিট লেগেছিল তারেকের। ভাবল, রোপাকে তার বলে রাখা উচিত ছিল মেজরের কাছ থেকে আজ যেন আরও বেশি সময় আদায় করে সে।

আলমিরার ভেতর থেকে সরু মুখের ছোট একটা ছুরি বের করল আলেক। আলতো ভাবে একটা তালার ভেতর সরু ডগাটা ঢুকিয়ে দিল। আস্তে আস্তে চাপ বাড়াল সে, সেই সাথে ছুরির ফলা বেঁকে যেতে শুরু করল।

বুঝল, আরও জোর-জবরদস্তি করা হলে তালাটাই ভেঙে যেতে পারে। সেটা কোন ভাবেই হতে দেয়া যায় না, মেজর তাহলে জানবে, তার ব্রীফকেস খোলা হয়েছিল। একবার সন্দেহ হলে, হাউজবোটে আর জীবনে আসবে না লোকটা। ব্রীফকেসে মূল্যবান তথ্য থাকলে রোজ সেটা একবার করে খুলতে চায় আলেক।

কিন্তু ব্রীফকেস খুলতে না পারলে তারেক রোজ তিনবার এলেও কোন লাভ নেই।

সে যদি এখন তালা ভেঙে ফেলে, কি ঘটতে পারে? কাজ সেরে প্যান্ট পরবে মেজর, পর্দা সরিয়ে এদিকে এসে ব্রীফকেস নেবার সময় আবিষ্কার করবে, সেটা

খোলা হয়েছিল। এর জন্যে রোপাকে দায়ী করবে সে। তখন আলেক যদি তারেককে খুন না করে, তাদের গোটা প্ল্যানটাই ফাঁস হয়ে যাবে।

মেজর তারেক খুন হলে তার পরিণতি কি হতে পারে? একজন সামরিক অফিসার খুন হয়ে যাওয়া, কায়রো শহরে, ছেলেখেলা কথা নয়। সন্দেহ নেই, মৌমাছির চাকে ঢিল পড়বে। খুনীর সন্ধানে শহরের প্রতিটি ইঁট খুলে ফেলা হবে। কিন্তু ওরা কি এই খুনের সাথে আলেক বোগানের সম্পর্ক দেখতে পাবে? মেজর তারেক কি তার বন্ধু-বান্ধবদের কারও কাছে রোপার কথা বলেছে? ডুম-ডাম ক্লাবে ওদের দু'জনকে একসাথে দেখেছে কেউ? ঈজিপশিয়ান ইন্টেলিজেন্স কি কোন সূত্র ধরে এই হাউজবোটে পৌঁছতে পারবে?

উঁহুঁ, তারেককে খুন করা সাংঘাতিক ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে যাবে। সবচেয়ে খারাপ দিক হলো, তথ্য পাবার সবেধন নীলমণি এই উৎসটা হারাতে হবে আলেককে। ওদিকে তার তথ্যের অপেক্ষায় গালে হাত দিয়ে বসে আছেন ইসরায়েলি সমরবিদরা। প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে মিশর আক্রমণের প্ল্যান তাঁরা সম্পূর্ণ করতে পারছেন না।

লিভিং রুমের মাঝখানে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল আলেক। মাথার ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত আগে কি একটা জিনিসের কথা ভেবেছে সে, তালা খোলার সমাধান নিহিত আছে তাতে, কিন্তু জিনিসটা কি এই মুহূর্তে তা আর মনে করতে পারছে না। নিজের ওপর রাগে মস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠল তার। ইচ্ছে হলো নিজের চুল নিজেই ছেঁড়ে।

পর্দার ওদিকে গোঙাচ্ছে মেজর তারেক। আলেক ভাবল, লোকটা কি প্যান্ট খুলে এরই মধ্যে বিছানায় উঠে পড়ল?

প্যান্ট! এই প্যান্টের কথাই মনে করার চেষ্টা করছিল সে। ব্রীফকেসের চাবি নিশ্চয়ই শালার পকেটে আছে।

নিঃশব্দে শ্বাস টেনে পর্দার সামনে দাঁড়াল আলেক। দুই প্রস্থ পর্দার মাঝখানটা একটু ফাঁক করল সে। তারেক আর রোপা শুয়ে রয়েছে বিছানায়। রোপা চিৎ হয়ে, চোখ দুটো বন্ধ। তার পাশে তারেক, একটা কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু করে রেখেছে মাথা, ঠোঁট বুলাচ্ছে রোপার গালে।

চোখ বুজে নড়াচড়া করছে রোপা, অনবরত শরীর মোচড় দিয়ে বোঝাতে চাইছে-তারেকের আদর উপভোগ করছে সে। যেন এত আদর সহ্য করতে পারছে না। খানিকটা গড়িয়ে রোপাকে ঢেকে ফেলল মেজর, মুখ রাখল ওর মুখে।

এখনও প্যান্ট পরে রয়েছে মেজর। পর্দার ফাঁক দিয়ে ভেতরে মাথা গলিয়ে দিল আলেক, একটা হাত তুলে নাড়ল। কিন্তু রোপা দেখতে পাবে কিভাবে, চোখ খোলা থাকলে তো! আলেক ভাবল, এই মাগী, চোখ মেল্। এদিকে তাকা! দীর্ঘ চুম্বনের পর রোপার ঠোঁট ছেড়ে শরীরের আরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ আক্রমণ করল মেজর।

চোখ খুলল রোপা। তার চোখে নেশার ঘোর দেখে আলেক বুঝল, অভিনয় নয়, সত্যিই ব্যাপারটা উপভোগ করছে রোপা। আবার হাত নাড়ল সে। তারেকের

মাথার ওপর দিয়ে তার দিকে তাকাল রোপা।

শব্দ না করে শুধু ঠোঁট নাড়ল আলেক, 'ওর প্যান্ট খুলে দাও।'

ভুরু কোঁচকাল রোপা, বুঝতে পারছে না।

পর্দা সরিয়ে বেডরুমের ভেতর ঢুকে পড়ল আলেক। মূকাভিনয় করে দেখাল, ও চাইছে রোপা মেজরের প্যান্ট খুলে দিক।

বুঝতে পেরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রোপার চেহারা।

পিছিয়ে এসে পর্দাটা আবার টেনে জোড়া লাগিয়ে দিল আলেক, শুধু সরু একচুল ফাঁক দিয়ে বিছানার দিকে তাকিয়ে থাকল। দেখল, তারেকের প্যান্ট ধরে টানাটানি শুরু করেছে রোপা। কিন্তু বোতামের ঘরগুলো বোধহয় ছোট, একটা বোতামও বের করে আনতে পারছে না। রোপা তার প্যান্ট খোলার চেষ্টা করছে, এই ঘটনাটা সাংঘাতিক উত্তেজিত করে তুলল তারেককে, আনন্দের আতিশয্যে গোঙাতে শুরু করল সে।

অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করার পর একটা বোতাম খুলতে পারল রোপা। আলেক ভাবল, বুদ্ধি করে প্যান্টটা এদিকে যদি ছুঁড়ে দেয় রোপা, তবেই!

রোপার দেরি দেখে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল তারেক, বিছানায় উঠে বসল সে। তাড়াতাড়ি বোতাম খুলে কোমর থেকে খসিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল প্যান্ট। তারপর আবার রোপার পাশে লম্বা হয়ে শুলো।

পর্দার কাছ থেকে বিছানার কিনারা প্রায় পাঁচ ফিট।

পর্দার এদিকে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল আলেক, হাত দিয়ে ফাঁক করল পর্দা, তারপর ক্রল করে এগোল। তারেকের গলা শুনতে পেল সে, 'আমার গোলাপ ফুল! আমার জানের জান! সোনার টুকরা!'

ক্রল করে প্যান্টের কাছে পৌঁছে গেল আলেক। মাথা নিচু করে আছে সে। এখন যদি এদিকে তাকায়ও, বিছানার ওপর থেকে তাকে দেখতে পাবে না তারেক। শুধু কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে নিচের দিকে না তাকালেই হয়। এক হাত দিয়ে প্যান্টটা ওলট-পালট করে পকেট খুঁজল সে। একটা পকেট পেল বটে, কিন্তু সেটা ফুলে নেই দেখে দমে গেল মনটা। তবু ভেতরে হাত গলিয়ে ভাল করে হাতড়াল। কিছু নেই, খালি।

প্রলাপের মত বিড়বিড় করে আদরের বুলি আওড়াচ্ছে তারেক।

হঠাৎ ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল বিছানা। আরেকটা পকেট খুঁজছিল আলেক, স্থির হয়ে গেল হাত। রোপার আদুরে গলা শুনল সে, 'লক্ষ্মী, উঠো না, আরেকটু আদর করো এখানে।'

'ধন্যবাদ, রোপা,' ভাবল আলেক।

প্যান্টের দ্বিতীয় পকেটটা খুঁজে পেল আলেক। ভেতরে হাত গলিয়ে অনুভব করল, এটাও খালি।

তাহলে! হঠাৎ মনে হলো, প্যান্টে আরও পকেট থাকতে পারে। অস্থির, বেপরোয়া হয়ে উঠল সে। প্যান্টের এখানে সেখানে খামচি দিয়ে অনুভব করতে চাইল, শক্ত ধাতব কিছু হাতে ঠেকে কিনা। কিছু না! এবার প্যান্টটা মেঝে থেকে

তুলে ফেলল সে, সাথে সাথে দেখল, নিচে পড়ে রয়েছে এক গোছা চাবি। স্বস্তির নিঃশব্দ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তার নাক দিয়ে। তারেক যখন প্যান্টটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলেছিল তখনই বোধহয় পকেট থেকে বেরিয়ে এসেছিল চাবির গোছা।

চাবি আর প্যান্ট, দুটো দু'হাতে নিয়ে ক্রল করে পিছিয়ে আসতে শুরু করল আলেক।

'অ্যাই, আস্তে,' বলেই খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল তারেক। 'সুড়সুড়ি লাগে!'

পর্দার এদিকে চলে এল আলেক। উঠে দাঁড়িয়ে আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছল সে। তারপর কোন শব্দ না করে টেনে দিল পর্দাটা। হাঁটু গেড়ে বসে ব্রীফকেসটা ধরতে যাবে, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল ডেকে।

প্রায় ককিয়ে ওঠার মত সুরে তারেক বলল, 'হায় খোদা, কে যেন আসছে!'

'চুপ!' চাপা গলায় ধমক লাগাল রোপা। 'কেউ না, ডাক পিয়ন। বলো, তোমাকে আমি সুখ দিতে পারছি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ,' তাড়াতাড়ি বলল তারেক। 'কিন্তু লোকটা··· রোপা, আমার ব্রীফকেস?'

ছ্যাঁৎ করে উঠল আলেকের বুক।

'আছে,' বলল রোপা। 'ডাক পিয়ন নিচে নামবে না, কাজেই ব্রীফকেস নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে।'

ঘাড় ফিরিয়ে উপর দিকে তাকাল আলেক। দেখল, সিঁড়ির মাথায়, হ্যাচের পাশে একটা চিঠি রাখছে ডাক পিয়ন। রাজ্যের উদ্বেগ নিয়ে লক্ষ করল, পিয়ন তাকে দেখতে পেয়েছে।

'গুড মর্নিং!' একগাল হেসে বলল পিয়ন।

ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে লোকটাকে চুপ থাকতে অনুরোধ করল আলেক। তারপর মূকাভিনয়ের সাহায্যে, হাতের ওপর গালের একটা পাশ রেখে ঘুমের ভঙ্গি করল, আঙুল দিয়ে ইঙ্গিতে দেখাল পাশের বেডরূম।

'কি হয়েছে? কথা বলছেন না কেন?' ফিসফিস করে জানতে চাইল ডাক পিয়ন।

কুত্তার বাচ্চা! শুয়োরের ছাও! বানচোত! গেলি এখান থেকে! কিন্তু মনে মনে যত গালিগালাজই করুক আলেক, ডাক পিয়নের তা শুনতে পাবার কথা নয়। চেহারায় কৌতূহল আর বিস্ময় নিয়ে সিঁড়ির মাথায় বসে থাকল সে।

নিঃশব্দ ভঙ্গি করে আবার আলেক তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল, পাশের ঘরে লোক ঘুমাচ্ছে। তারপর হাত নেড়ে চলে যেতে বলল।

বেডরূম থেকে কোন শব্দ আসছে না।

ডাক পিয়নের কথা শুনে তারেক কিছু সন্দেহ করেছে? মনে হয় না। কাউকে দেখতে না পেলেও ডাক পিয়ন গুড মর্নিং বলতে পারে। হ্যাচ খোলা দেখে তার পক্ষে ধরে নেয়া স্বাভাবিক, বোটে লোক আছে।

খিল খিল করে হেসে উঠল রোপা। 'তুমি এত ভীতু আমার জানা ছিল না! দিলে তো সব ঠাণ্ডা করে! নাও, আবার শুরু করো!'

আবার ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল বিছানা।

চাবির গোছা থেকে সবচেয়ে ছোট একটা বেছে নিল আলেক, ব্রীফকেসের তালায় অনায়াসে ঢুকে গেল সেটা। 'আল্লা মেহেরবান!' সৎ-বাপের কাছে শেখা বুলিটা মনে মনে আওড়াল সে। ক্যাচ খুলে বুক ভরে শ্বাস নিল, তারপর তুলে ফেলল ডালা।

শক্ত একটা কার্ডবোর্ডের ফোল্ডার দেখা গেল, ভেতরে কয়েক শীট কাগজ। আলেক ভাবল, খোদার দোহাই, ক্যান্টিন মেন্যু যেন না হয়!

ফোল্ডার খুলে ওপরের কাগজটার ওপর চোখ রাখল সে। হেডিংটা পড়ে সারা শরীরের রক্ত ছলকে উঠল যেন আনন্দে।

<u>সিনাই এলাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা</u>

১। ৬৯৬ক১০, সংখ্যায় তিনশো। পয়েন্ট তিন-দুই-এক, তিন-দুই-দুই, দুই-চার-এক, দুই-চার-দুই, দুই-চার-তিন এবং দুই-চার-সাতে মোতায়েন করার কাজ গত হপ্তায় শেষ হয়ে গেছে।

২। গ০১৫ অটোমেটিক, সংখ্যায় দুশো দশটা। ওপরের ছয়টা পয়েন্টে মোতায়েন করার কাজ গত হপ্তায় শেষ করা হয়েছে।

কাগজ থেকে মুখ তুলে সিলিঙের দিকে তাকাল আলেক, বিড়বিড় করে বলল, দয়াল মুসা, এতটা আমি আশা করিনি! এ যে হীরের খনি!

চোখ নামিয়ে কাগজ ধরতে গিয়ে আলেক দেখল, তার হাত কাঁপছে। ৬৯৬ক১০! এটা অত্যাধুনিক ফ্রেঞ্চ ট্যাংকের মিশরীয় কোড নেম। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বা জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স, কেউই জানে না এ-জিনিস মিশরের হাতে আছে। গ০১৫-এর বেলাও একই ব্যাপার। এটা ফ্রান্সের তৈরি অত্যাধুনিক অ্যান্টিএয়ারক্র্যাফট গানের কোড নেম। বাজারে গুজব ছিল বটে যে ফ্রান্স মিশরের কাছে এগুলো বিক্রি করেছে, কিন্তু ইসরায়েল সরকার প্রতিবাদ জানালে ফ্রান্স সরকার লিখিত বক্তব্যে জানায়, এ-ধরনের কোন অস্ত্র তারা মিশরকে দেয়নি।

আলেকের মেসেজ পেয়ে ইসরায়েলি জেনারেলদের ঘুম হারাম হয়ে যাবে। এই ভয়ঙ্কর তথ্য পাবার পর ইসরায়েল হয়তো মিশর আক্রমণের বর্তমান প্ল্যান বাতিল করে দিতে বাধ্য হবে। এখুনি আক্রমণের কথা চিন্তাও করা যায় না। কে জানত তলে তলে মিশরীয় সেনাবাহিনীকে এই সব আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়ে রাখা হয়েছে!

বেডরুমের দিকে মনোযোগ দিল আলেক। কথাবার্তা বন্ধ। শুধু দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ।

নিজেকে তাড়া দিল আলেক, হাতে বেশি সময় নেই।

রিপোর্টটা সংক্ষিপ্ত নয়, বিশদ। কাগজগুলো গুণল আলেক, ছয়টা। এত অল্প সময়ে ছয়টা কাগজের লেখা মুখস্থ করা সম্ভব নয়। আগে একবার পড়ে নেয়া দরকার।

রিপোর্টটা পড়তে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল আলেক। সিনাই এলাকার ছয়টা পয়েন্টে এই রকম ব্যাপক রণসজ্জার পিছনে মিশরের উদ্দেশ্য কি শুধু প্রতিরক্ষা, না আক্রমণ? সিনাই এলাকায় সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশের ঘটনা দু'দেশের তরফ থেকে হর হামেশাই ঘটছে, কিন্তু তাই বলে এর আগে কখনও এত সৈন্য সমাবেশ হয়নি। শুধু অস্ত্রশস্ত্র আর গোলা-বারুদ নয়, সেই সাথে সিনাইয়ে প্রতি হপ্তায় খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ দেখে হতভম্ব হয়ে গেল আলেক। প্রতি হপ্তায় এত খাবার সাবাড় করতে যে অনেক সৈনিক দরকার!

রিপোর্টের প্রতিটি পাতায় নতুন নতুন চমকপ্রদ তথ্য পেল আলেক। কখনও ভয় পেল সে, কখনও উত্তেজিত হয়ে উঠল, আবার এই রকম একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে আসায় আনন্দও কম হলো না। ছয়টা কাগজ পড়া শেষ করে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল সে। ব্যাপারটা হজম করতে সময় লাগছে তার।

রোপার কথায় হুঁশ ফিরল আলেকের। এখুনি নেমে পড়তে বারণ করছে ও মেজরকে। তার মানে এখন জড়িয়ে ধরে আরও কিছুক্ষণ কাছাকাছি থাকার পর্যায় চলছে। রোপার কথা ঠেলে এখুনি হয়তো ব্যাটা লাফিয়ে উঠে পড়বে না, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই যে কাজের তাগিদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই। বুকের ধুকপুকানিটা ঠাণ্ডা হলেই উসখুস শুরু করবে ওঠার জন্যে।

রোপার প্রস্তাবে রাজি হলো তারেক, বলল, 'ঠিক আছে।'

'সোনা-মানিক!' বলল রোপা। 'সেজন্যেই তো এত ভাল লাগে তোমাকে আমার!'

রোপা, তোমার তুলনা হয় না, ভাবল আলেক। দেরাজ থেকে কাগজ কলম বের করে রিপোর্টটার বিশেষ বিশেষ অংশ কপি করতে শুরু করল সে। জানে, খুব বেশি সময় পাবে না।

ঝড়ের গতিতে লিখছে আলেক। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে লেখা, এই সময় ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হলো খাটে। নেমে পড়েছে ব্যাটা!

শক্ত কাঠ হয়ে গেল আলেক।

'ডার্লিং,' বলল রোপা, 'আমাকে একটু শ্যাম্পেন ঢেলে দেবে?'

'দাঁড়াও, আগে প্যান্টটা পরে নিই,' বলল তারেক।

'না, এখুনি!' তাগাদা দিল রোপা।

হেসে উঠল তারেক। বলল, 'আসলে কি জানো, মেয়েদের সামনে ন্যাংটো থাকতে লজ্জা লাগে আমার।'

সর্বনাশ, ভাবল আলেক।—এখন কি হবে!

'প্যান্ট পরলে তোমার সাথে আমার সব সম্পর্ক শেষ,' কৃত্রিম রাগের সাথে বলল রোপা। 'তোমাকে আমি এই অবস্থায় আরও কিছুক্ষণ দেখতে চাই।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমার হুকুমই মাথা পেতে নিলাম!'

আলেকের মাথা ঠাণ্ডা হলো। ভাবল, রোপা শুধু শিল্পী নয়, একটা প্রতিভা!

রিপোর্টের বাকি অংশটুকু দ্রুত লিখতে শুরু করল সে। সিনাই এলাকায় মোট চারশো ট্যাংক মোতায়েন করা হয়েছে। প্রতিটি পয়েন্টে রয়েছে একটা করে

আর্টিলারি রেজিমেন্ট। প্রতিটি পয়েন্টের পিছনে থাকছে আরও দুশো করে ট্যাংক, এবং তিনটে আর্টিলারি রেজিমেন্ট। প্রয়োজনে এদের মাথার ওপর থাকবে চার স্কোয়াড্রন ফাইটার প্লেন আর বোম্বার।

পাঁচ নম্বর কাগজের হেডিংটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

পোর্ট সাঈদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

১। ০০১খ৫৫,০০৩গ১২ এই দুটোয় গ০১৫ অটোমেটিক ফিট করা হয়েছে।

২। ঙ১, ঙ৭, চ৫, চ১১ এবং চ১৯, এগুলোতেও গ০১৫ অটোমেটিক ফিট করার কাজ দু'একদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

আলেক জানে, ০০১খ৫৫ আর ০০৩গ১২ আসলে মিশরীয় একজোড়া ডেস্ট্রয়ারের কোড নেম। বাকি পাঁচটা এক একটা গান বোট। সিরিয়াল নম্বর ৩-এ রয়েছে পোর্ট সাঈদ এলাকায় এয়ারফোর্সের শক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ।

ফটাস করে একটা আওয়াজ হলো, কাগজের ওপর পিছলে গেল আলেকের কলম ধরা হাত। রোপার প্রস্তাব মেনে নিয়ে আবার বিছানায় উঠেছিল তারেক, তাকে একটু আদর করে আবার মেঝেতে নেমেছে সে। এইমাত্র শ্যাম্পেনের একটা বোতল খুলল। আলেক ভাবল, আমারও এক ঢোক দরকার!

শ্যাম্পেন খেতে কতক্ষণ লাগবে তারেকের? লেখাটা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু কোথাও ভুল হলো কিনা মিলিয়ে দেখতে পারলে ভাল হত। কিন্তু না, এরচেয়ে বেশি ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না।

ফোল্ডারে কাগজগুলো ভরে রাখল সে, তারপর ফোল্ডারটা ঢুকিয়ে দিল ব্রীফকেসে। ডালা নামিয়ে চাবি ঘোরাল, বন্ধ হয়ে গেল তালা। চাবির গোছাটা প্যান্টের পকেটে ভরে উঠে দাঁড়াল সে। পর্দাটা আট ইঞ্চি সরিয়ে উঁকি দিয়ে তাকাল বেডরূমে।

আর্মি ইস্যু আন্ডারঅয়্যার পরে বিছানার ওপর বসে আছে মেজর তারেক। এক হাতে গ্লাস, আরেক হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। তার চেহারায় তৃপ্তি মাখা আনন্দের উদ্ভাস। সিগারেট পেল কোত্থেকে···নিশ্চয়ই শার্টের পকেটে ছিল। প্যান্টের পকেটে থাকলে ঘোলাটে হয়ে উঠত পরিস্থিতি।

এই মুহূর্তে পর্দা সরিয়ে বেডরূমে ঢোকা সম্ভব নয়, কারণ অনেকটা এদিকেই মুখ করে রয়েছে মেজর তারেক। সরু ফাঁকটা থেকে চোখ সরিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল আলেক।

শুনতে পেল, রোপা বলছে, 'আরও একটু কষ্ট করো, প্লীজ, তারেক। কিপটেমি কোরো না, গ্লাসটা ভরে দাও।'

পর্দার সরু ফাঁকে আবার চোখ রাখল আলেক। রোপার হাত থেকে খালি গ্লাস নিয়ে বোতলের দিকে ফিরল মেজর। এই মুহূর্তে আলেকের দিকে পিছন ফিরে আছে সে। পর্দাটা ফাঁক করে মেজরের প্যান্টটা পা দিয়ে ঠেলে দিল আলেক। তাকে দেখতে পেয়ে নিঃশব্দে আঁতকে উঠল রোপা। দ্রুত পর্দার এদিকে চলে এল আলেক। পর্দার সরু ফাঁকে চোখ রেখে দেখল, রোপার হাতে গ্লাস ধরিয়ে দিচ্ছে

তারেক।

কয়েক পা পিছিয়ে কিচেনে চলে এল আলেক। আলমিরার দরজা খোলাই ছিল, ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল কবাট। কতক্ষণ থাকবে তারেক তার ঠিক নেই, দাঁড়িয়ে না থেকে আলমিরার মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল সে। খুব বেশি দেরি করবে বলে মনে হয় না। ব্রীফকেসটা অফিসে নিয়ে গিয়ে তালা চাবির ভেতর রাখার তাগাদা আছে। আর দেরি হলেই বা কি, এই গরমে আলমিরার ভেতর বসে থাকতে একটু না হয় কষ্ট হবে, কিন্তু তথ্য যা পেয়েছে সে, তার তুলনায় এ-কষ্ট কিছুই না। আক্ষরিক অর্থেই হীরের খনি চলে এসেছে তার হাতে।

আরও প্রায় আধঘণ্টা পর কবাটের ফাটলে চোখ রেখে আলেক দেখল, বেডরুম থেকে লিভিং রুমে বেরিয়ে এল তারেক। পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরে আছে সে। 'যা ব্যাটা, ভাগ! কাল আবার নতুন কাগজপত্র নিয়ে আসিস!' মনে মনে ভাবল আলেক। ইতোমধ্যে হাত আর পায়ে খিল ধরে গেছে তার, সারা শরীরে ঘামের স্রোত বইতে শুরু করেছে।

তারেকের পিছু পিছু রোপাও বেরিয়ে এল বেডরুম থেকে। 'এত তাড়াতাড়ি কি তোমার না গেলেই নয়, তারেক?' জিজ্ঞেস করল সে। 'বিকেল পর্যন্ত যদি থাকতে পারতে, নাহয় আরও…' খিলখিল করে হেসে উঠল রোপা।

হাত বাড়িয়ে রোপার গাল টিপে দিল মেজর। 'তোমাকে আমার মুহূর্তের জন্যেও কাছ ছাড়া করতে ইচ্ছে করে না, রোপা! কিন্তু, আমার জন্যে এই দুপুরবেলাটা খুব অসুবিধের।' ঝুঁকে পড়ে মেঝে থেকে ব্রীফকেস তুলে নিল সে।

'কেন?'

একমুহূর্ত চুপ করে থাকার পর মেজর বলল, 'তোমাকে বলতে আপত্তি নেই, আমার এই ব্রীফকেসে টপ সিক্রেট ইনফরমেশন আছে।'

'তাতে কি?' না বোঝার ভান করল রোপা।

'বুঝতে পারছ না? এই ব্রীফকেস নিয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো সম্পূর্ণ নিষেধ। জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে সোজা অফিসে ফেরার কথা আমার।'

'ও।'

'অফিসকে জানিয়েছি, আমি লাঞ্চ সারব জেনারেল হেডকোয়ার্টারে। আর জেনারেল হেডকোয়ার্টারকে জানিয়েছি, লাঞ্চ করব অফিসে।'

'এদিকে দুপুরের খাবার না খেয়ে তুমি আমাকে…' আবার খিল খিল করে হেসে উঠল রোপা।

'ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস, রোপা,' চিন্তিত সুরে বলল মেজর। 'এর জন্যে আমার কোর্ট-মার্শালও হতে পারে। যা হবার হয়েছে, আবার যখন এখানে আসব, দুপুরে নয়, অফিসে ব্রীফকেস রেখে বিকেলের দিকে, কেমন?'

আলেক ভাবল, সর্বনাশ, বলে কি! রোপা, কিছু একটা বলো!

'তাহলে তো দেখছি সমস্যাই হয়ে গেল!' চিন্তিত সুরে বলল রোপা।

'কেন?' জানতে চাইল মেজর।

'আজ অবশ্য আমার ঝি আসবে না বলে গেছে, কিন্তু রোজ ওই বিকেলেই

আসে সে। তার সামনে তো আর এসব চলতে পারে না! ঝি-রা কেমন হয় জানোই তো, দুনিয়াময় রাষ্ট্র করে বেড়াবে...'

ভুরু কুঁচকে উঠল মেজরের। 'ধেত্তেরি, সমস্যাই দেখছি!' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'উপায় কি, আমাকে তাহলে সন্ধের দিকেই আসতে হবে।'

'তাই বা কিভাবে সম্ভব?' অসহায় একটা ভঙ্গি করে জানতে চাইল রোপা। 'সন্ধের সময় আমাকে বেরুতে হবে না? আর প্রোগ্রামের পরও সম্ভব নয়। নাচ শেষ করে গেস্টদের সাথে বসতে হয়, গল্প-গুজব করতে হয়, চাকরির ওটাও একটা অংশ। যদিও তোমার টেবিলে রোজ রোজ বসতে পারব না...নানান কথা উঠবে।'

গরমে দম আটকে আসার অবস্থা হয়েছে আলেকের।

হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মেজরের চেহারা। বলল, 'সমাধান পাওয়া গেছে!'

'কি?'

'তোমার ঝিকে আসতে নিষেধ করে দিয়ো, তাহলেই হবে।'

'দূর, এটা একটা সমাধান হলো!' বিরক্তির সাথে বলল রোপা। 'ঘর পরিষ্কার করা, কাপড় ধোয়া, রান্না-বান্না, কে করবে এসব? আমি? তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে। না বাবা, এসব আমি করতে পারব না।'

জটিল সমস্যা, মাথা নিচু করে থাকল তারেক। কোন সমাধান দেখতে পাচ্ছে না সে।

আলমিরার ভেতর থেকে রোপার হাসি দেখতে পেল আলেক। তারেকের একটা হাত ধরে নিজের বুকের ওপর রাখল রোপা, মেজরের গায়ের ওপর সরে এল। বলল, 'প্লীজ, ডার্লিং, বলো রোজ দুপুর বেলা আসবে তুমি!'

'কিন্তু...'

'তুমি না এলে বিছানায় একা একা ছটফট করব আমি,' যেন এই খ্যাংরা কাঠিকে ছাড়া বাঁচবে না, এমনি ভঙ্গিতে বলল, 'বলো, আসবে?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, আর যখন কোন উপায় নেই, তাই আসব...খুশি তো?'

পরস্পরকে দীর্ঘক্ষণ চুমো খেলো ওরা, অবশেষে বিদায় নিয়ে চলে গেল মেজর তারেক। ডেক, তারপর গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক থেকে তার পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। আরও কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর আলমিরা থেকে বেরিয়ে এল আলেক।

আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গিতে হাত-পা টান টান করছে আলেক, তির্যক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল রোপা। জানতে চাইল, 'রেজাল্ট?'

'পাস করে গেছ তুমি।'

'বলো, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছি,' বলল রোপা। 'কিন্তু সেটা আমি জানতে চাইছি না। জানতে চাইছি, কোন ফায়দা হলো?'

'একেবারে কিছুই হয়নি তা নয়,' বলল আলেক। সব কথা রোপাকে জানতে দিতে চায় না সে।

'তেলআবিবে রিপোর্ট করার মত তথ্য পেয়েছ?'

'তা পেয়েছি,' বলল আলেক। 'কিন্তু শুধু এতেই চলবে না। আরও অনেক তথ্য পেতে হবে আমাদের।' এক সেকেন্ড পর জানতে চাইল, 'তোমার কি মনে

হয়, আবার আসবে ও? মানে, জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে সরাসরি?'

'আসবে না মানে! এমন ডোজ দিয়েছি, আসতে বাধ্য!'

রুটি আর সসেজ কাটতে বসল আলেক, রোপা ঢুকল বাথরূমে গোসল সারতে।

লাঞ্চ শেষ করে বেডরূমে বিশ্রাম নিচ্ছে আলেক, লিভিং রূম থেকে ভেতরে ঢুকে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসল রোপা।

'ফিরোজার অভাব পূরণ হয়েছে তোমার;' বলল আলেক। 'মনে আর কোন খেদ নেই তো?'

ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল রোপা। 'আমার সাথে বেঈমানী করলে ফল কিন্তু ভাল হবে না, আলেক!'

'মানে? বেঈমানী করলাম কখন?'

'দুধের সাধ যে ঘোলে মেটে না সে তুমিও জানো,' ঝাঁঝের সাথে বলল রোপা। 'ফিরোজাকে নিয়ে আমরা তিনজন ছিলাম, কিন্তু তারেক আর আমি দু'জন। তুমিও যোগ দাও, তাহলে তিনজন হই!'

হা হা করে হেসে উঠল আলেক। 'তা কোনদিন সম্ভব নয়।'

'তাহলে ফিরোজার দাবি আমিও ছাড়ছি না।'

'ঠিক আছে, বলেছি যখন তখন ঠিকই যোগাড় করে আনব...'

সাজগোজ করে রেস খেলতে চলে গেল রোপা। যাবার আগে পাঁচশো পাউন্ড চেয়ে নিয়ে গেল সে। একটু ইতস্তত করলেও, টাকাটা দেবার সময় কিছু বলল না আলেক। কোন অবস্থাতেই রোপাকে চটাতে চায় না।

রোপা চলে যাবার পর ইংরেজী উপন্যাস রেবেকা আর কোডের কী বের করল আলেক। মেসেজটা কোড করতে প্রচুর সময় লেগে গেল তার।

সন্ধের দিকে রোপা একবার ফিরল বটে, কিন্তু সাজগোজ করে আবার বেরিয়ে গেল। ডুম-ডাম থেকে ফিরতে রাত হবে তার। হাউজবোটে একা বসে হুইস্কি খেলো আলেক, আর আরবী কবিতা পড়ল। রাত এগারোটার দিকে রেডিও অন করল সে।

ঠিক চব্বিশ ঘণ্টায় নিজের কল সাইন পাঠাল আলেক—পিরামিড। কয়েক সেকেন্ড পর সীমান্ত এলাকার একটা ইসরায়েলি লিস্নিং পোস্ট থেকে সাড়া মিলল। ঠিকমত যাতে ওরা টিউন করতে পারে, সেজন্যে ভি-এর একটা সিরিজ পাঠাল সে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমার সিগন্যাল স্ট্রেংথ কি রকম, জানাও।' বাক্যটির মাঝখানে একটা ভুল করে ফেলল সে, কাজেই একটাই সিরিজ পাঠাতে হলো ওকে—ই মানে এরার-এর প্রথম অক্ষর।

অপর প্রান্ত থেকে জবাব এল, আলেকের সিগন্যাল স্ট্রেংথ ম্যাক্সিমাম। তারপর জি এবং এ পাঠানো হলো। মানে, গো অ্যাহেড। মেসেজ শুরু হতে যাচ্ছে এটা বোঝাবার জন্যে কে এবং এ ব্যবহার করল আলেক। তারপর কোড করা মেসেজ পাঠাতে শুরু করল সে, 'সিনাই এলাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। ১। ৬৯৬ক-১০...'

সবশেষে এ এবং ডি যোগ করল সে, মেসেজ ফিনিশড বোঝাবার জন্যে, আর

কে ব্যবহার করল ওভার বোঝাবার জন্যে। ওদিক থেকে এল আর-এর একটা সিরিজ, যার মানে, তোমার মেসেজ রিসিভ করেছি এবং বুঝেছি।

প্যাক করে রেডিওটা তুলে রাখল আলেক, রেডিওর সাথেই কোড বুক আর কী থাকল। দুই হাত এক করে একবার তালি বাজাল সে, সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল তৃপ্তির হাসি।

সব মিলিয়ে, আজকের দিনটাকে সার্থকই বলা যায়।

দুই

সকাল সাড়ে দশটা। রানার অফিসের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল লে. কর্নেল মোসাদ্দেক হাসান। জলদগম্ভীর সুরে বলল, 'ভাল কথা, খবর শুনেছ, মেজর?'

খোলা ফাইল থেকে মুখ তুলল রানা। 'কি খবর?'

'সিনাই সীমান্তের ভেতর ইসরায়েলিরা ঢুকে পড়েছে—দু'জায়গায়!'

ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। প্রথমেই যে চিন্তাটা মাথায় এল—নিশ্চয়ই আলেক বোগানের পাঠানো তথ্য থেকে মিশরীয়দের দুর্বলতা কোথায়, ইসরায়েলিরা সেটা টের পেয়ে তারপর এই হামলা চালিয়েছে!

লে. কর্নেল চলে যাচ্ছিল, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকল রানা, 'এক মিনিট। সিনাইয়ের কোন্ কোন্ পয়েন্টে, জানেন?'

'জানব না কেন! তিন-দুই সাত আর চার-নয়-নয় পয়েন্টে।'

বন্ করে মাথা ঘুরে গেল রানার। দরজার সামনে থেকে চলে গেছে লে. কর্নেল। ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল ও। বুঝল, যা ভেবেছিল তাই। সন্দেহ নেই, আলেক বোগানের পাঠানো তথ্য হাতে পেয়েই এই আক্রমণের প্ল্যান তৈরি করেছে ইসরায়েলিরা। এর জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী করল রানা নিজেকে।

ব্রীফকেস ছিনতাই ঘটনার পর একটা নির্দেশ জারি করেছিল রানা, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কাগজ-পত্র নিয়ে কোন অফিসার জেনারেল হেড-কোয়ার্টারের বাইরে যেতে পারবে না। কিন্তু দু'দিন পরই মিশরীয় অফিসারদের আচরণ দেখে বুঝে নিয়েছিল ও, এই নির্দেশ পালন করার ব্যাপারে কারও তেমন কোন গরজ নেই। প্রয়োজনে তো যাচ্ছেই, স্রেফ গাফলতি আর অবহেলার কারণেও টপ সিক্রেট কাগজ-পত্র প্রতিদিনই বাইরে থেকে হাওয়া খেয়ে আসছে। চিন্তা ভাবনা করে একটা সিদ্ধান্ত নেয় রানা, অফিসারদের ব্রীফকেসে ভুল তথ্য ভরে দেয়া হবে। অন্তত কিছুদিন এই ব্যবস্থা চালু থাক। আলেক বোগান যে টপ সিক্রেট সামরিক তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে সে-ব্যাপারে ওর মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

মিলিটারি সিকিউরিটি অফিসার ব্রিগেডিয়ার নুরুদ্দীন হাফিজ জরুরী কাজে দেশের বাইরে গিয়েছিলেন, দু'দিন পর তিনি ফিরতেই তাঁর সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করে রানা। রানার পরামর্শ নিয়ে জেনারেলদের সাথে ব্রিগেডিয়ারের

বৈঠক হয়, তাঁরা দু'দিন পর সিদ্ধান্ত দেন, পরীক্ষামূলক ভাবে এই ব্যবস্থা কিছুদিনের জন্যে চালানো যেতে পারে। ঠিক হয়, ব্যাপারটা নিয়ে যদি নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, তাহলে এই ব্যবস্থা বাতিল করা হবে। সেই সাথে আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, অফিসারদের সবাইকে ব্যাপারটা জানতে দেয়া হবে না। জানবেন শুধু কমান্ডিং অফিসাররা, তাও শুধু এই মুহূর্তে যারা ফিল্ডে এবং প্ল্যানিঙে রয়েছেন।

ভুল তথ্যগুলো কি কি হবে, তাও রানা নিজে তৈরি করেছে। কিছুদিন থেকে ইসরায়েলিদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে আছে, ফ্রান্সের কাছ থেকে মিশরীয় সেনাবাহিনী নাকি অত্যাধুনিক ট্যাংক আর অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট গান কিনেছে। গুজবটাকে ইন্ধন যুগিয়ে ইসরায়েলিদের কাছে সত্যে পরিণত করার জন্যে কিছু কাগজ-পত্র তৈরি করল রানা।

ওর দৃঢ় বিশ্বাস, ওই মিথ্যে তথ্যগুলো আলেক বোগানের হাতে পড়েছে। সাথে সাথে ইসরায়েলিদের কাছে পাঠিয়েও দিয়েছে সে। এই তথ্য থেকে মিশরীয় অবস্থানগুলোর দুর্বল পয়েন্ট বেছে বের করতে তাদের কোন অসুবিধেই হয়নি।

ডেস্কের ওপর মাথা রেখে মনমরা হয়ে বসে থাকল রানা। ওর তৈরি ভুল তথ্যের মধ্যে সিনাই এলাকার কয়েকটা পয়েন্টকে শক্তিশালী দেখানো হয়েছে, ইসরায়েলিরা হামলা চালিয়েছে সেগুলোকে বাদ দিয়ে। মিশরীয় সৈন্যরা পিছু হটেছে, খবরটা পাবার পর এখনও কেন ওকে ফোন করছেন না ব্রিগেডিয়ার হাফিজ? ওর পরামর্শে হিতে বিপরীত হয়েছে, সেজন্যে ওর ওপর তো রাগ হবারই কথা।

এই পরিস্থিতিতে কাজে মন বসার প্রশ্ন ওঠে না, ফাইল বন্ধ করে সিগারেট ধরাল রানা। ব্রিগেডিয়ারের ফোন আসবে, সেই অপেক্ষায় রয়েছে ও।

ফোন এল আরও আধঘণ্টা পর। অপরপ্রান্ত থেকে ব্রিগেডিয়ার নিজের পরিচয় দিতেই রানা বলল, 'আমি দুঃখিত, ব্রিগেডিয়ার।'

'দুঃখিত? বাট হোয়াই?'

'শুনলাম, ইসরায়েলিরা সিনাইয়ের তিন-দুই-সাত আর চার-নয়-নয় পয়েন্ট ছাড়িয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে...'

'তাতে কি!' বললেন ব্রিগেডিয়ার। 'এই পিছু হটা তো একটা কৌশল মাত্র। দুর্বল পয়েন্টগুলোয় হামলা আসতে পারে, তোমার এই কথা জেনারেলরা ভোলেননি। সেজন্যে বিশেষ ধরনের প্রস্তুতি নেয়া ছিল। আমরা পিছু হটেছি, ওদেরকে দু'পাশ থেকে ঘিরে ফেলব বলে। সন্ধে, বড়জোর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করো, রানা। ততক্ষণে সুখবর তৈরি হয়ে যাবে।'

মন কিছুটা হালকা হলো রানার, কিন্তু সাফল্যের সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত নিজেকে খুশি হয়ে উঠতে দিল না ও।

সারাদিন অফিসেই থাকল, কিন্তু কোন কাজ করল না। সন্ধের দিকেও যখন কোন ভাল খবর এল না, থমথমে চেহারা নিয়ে ফিরে এল নিজের ফ্ল্যাটে।

ফিরে দেখে ওর অপেক্ষায় বসে আছে ডন। 'গুড ইভনিং, ফ্রেন্ড।'

'ইভনিং।'

'তোমার কিছু হয়েছে, ফ্রেন্ড?' রানার দিকে অবাক চোখে তাকাল ডন। 'অসুখ-বিসুখ? আমাদের হাউজ ফিজিশিয়ানকে ফোন করলে এখুনি···'

'না, আমার অসুখ-বিসুখ করেনি। স্কুলে আজ পড়া পেরেছ?'

'সবচেয়ে ভাল করে শিখে গেছি ভূগোল, সেটারই আজ ক্লাস হয়নি।'

ডাইনিং টেবিলে বসল ওরা। রানা জানতে চাইল, 'কেন?'

'ভূগোল স্যার, রোগা-পাতলা, কিন্তু বয়স বেশি না,' শুরু করল ডন। 'স্যারের ফুসফুসে কি যেন একটা অসুখ আছে, তাই আর্মিতে নাম লেখাতে পারছেন না। এই নিয়ে তাঁর অনেক দুঃখ। সেই দুঃখের কথাই ইনিয়ে বিনিয়ে শোনালেন আজ আমাদের। তিনি নাকি অপরাধ বোধ করেন।' অবিশ্বাসের সাথে ঠোঁট ওল্টাল ডন। 'সবটাই লোক দেখানো। স্যারের কথা আমি একটুও বিশ্বাস করি না। অসুস্থ, তাই আর্মিতে যেতে পারছেন না। সেজন্যে একজন মানুষ অপরাধীবোধ করতে পারে? তুমিই বলো, ফ্রেন্ড? পারে?'

'তিনি তোমার স্যার, তাঁর সম্পর্কে এভাবে কথা বলা উচিত নয় তোমার,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'তাছাড়া, তিনি মিথ্যে কথাও বলেননি। তাঁর অপরাধ বোধ করা অস্বাভাবিক কিছু না।'

ডন তর্ক জুড়ে দিল। 'কিন্তু কেন তিনি অপরাধ বোধ করবেন? যেতে পারছেন না, সেটা তো তাঁর নিজের তৈরি কোন দোষ নয়।'

'তা নয়, তবু অবচেতন ভাবে তিনি নিজেকে অপরাধী ভাবতে পারেন।'

'কেন?'

ফাঁদে আটকে গেল রানা! একমুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'তুমি যখন অন্যায় কিছু করো, এবং বুঝতে পারো কাজটা অন্যায় হয়ে গেছে, আর সেজন্যে তোমার খারাপ লাগে, কেন খারাপ লাগছে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না—এই অবস্থাটা সচেতন অপরাধবোধের পর্যায়ে পড়ে। তোমার স্যার অন্যায় কিছু করেননি, তবু তাঁর খারাপ লাগছে, মনে হচ্ছে আর্মিতে যেতে পারলে ভাল হত, এটাকে আমরা অবচেতন অপরাধবোধ বলতে পারি। সৈনিক হবার কত ইচ্ছে, এটা কাউকে জানাতে পারলে স্যারের মন একটু ভাল হয়।'

'ও।'

ওর কথা ডন বুঝল কিনা, বলতে পারবে না রানা। ডিনার শেষ করে ওর লাইব্রেরী থেকে একটা বই নিয়ে বিদায় নিল সে।

বাটলার কুরবান আলি পাশের ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে এল তাকে। যাবার আগে রানা জানতে চেয়েছিল, 'তোমার হাতে ওটা কি বই?'

'টেক।' ডন বোঝাতে চাইল, ডিটেকটিভ বই। প্রচ্ছদে লেখা নামটাও দেখল রানা, ডেথ অন দ্য নাইল।

কুরবান আলি কফি দিয়ে গেল। কফি শেষ করে আবার বেরিয়ে পড়ল রানা। অফিসে এসে দেখল, নাইট ডিউটির দু'একজন লোক ছাড়া সবাই চলে গেছে। ওকে দেখে অবাক হলো সবাই, জরুরী একটা কাজ সারতে হবে বলে নিজের

অফিস কামরায় ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল ও। ডেস্কের পিছনে চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরাল, তারপর রিসিভার তুলে ফোন করল কন্ট্রোল রুমে। নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইল, সিনাইয়ের খবর কি?

খবর সেই আগের মতই, ভাল নয়। দুটো পয়েন্টে নিজেদের চৌকি হারিয়ে পিছিয়ে এসেছে মিশরীয় সৈনিকরা, চৌকি ফিরে পাবার জন্যে প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছে তারা।

কামরা থেকে বেরিয়ে অফিসার্স মেসে এল রানা। কফি নিয়ে বসল একটা টেবিলে। ভাল খবরের জন্যে দরকার হলে সকাল পর্যন্ত থাকবে ও এখানে।

সীমান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতি ঘণ্টায় খবর নিল ও। কোন পরিবর্তন নেই। ভোর চারটের দিকে তন্দ্রা মত এল ওর। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে তন্দ্রা ভাবটা ছুটে গেল। দেখল, সীমান্তের দুর্বল জায়গাগুলো দিয়ে হুড়মুড় করে ইসরায়েলি ট্যাংক ঢুকে পড়ছে। দেখতে দেখতে গোটা মিশর বেদখল হয়ে গেল। পরের দৃশ্য একটা আদালত। কাঠ-গড়ায় দাঁড়িয়ে আছে ও। বিবেক নামে একজন বিচারপতি ওর বিচার করছেন। অভিযোগ শোনার পর গিল্টি বলে রায় দেয়া হলো ওকে। রানা তখন বলল আমি ভুল করে থাকতে পারি, কোন অন্যায় বা অপরাধ করিনি। তবু মাননীয় বিচারপতির রায় আমি মেনে নিচ্ছি। তবে, আমার একটা ছোট্ট আবেদন আছে। তিনদিনের সময় দেয়া হোক আমাকে, চেষ্টা করে দেখি আমার ভুলের জন্যে মিশরের যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করা যায় কিনা।

রানার আবেদন শুনে বিচারপতি সহ সবাই দারুণ মজা পেয়ে হেসে উঠল। রানা কি তিনদিনের মধ্যে একা নিজের চেষ্টায় ইসরায়েলিদের মিশর থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা ভাবছে? হ্যাঁ, দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা, আমি একাই ওদেরকে মিশর থেকে তাড়িয়ে দিতে পারব।

আবার হাসির ফোয়ারা ছুটল। কিন্তু সবাই হাসলেও, এবার কিন্তু বিচারপতি হাসলেন না। তিনি গম্ভীর সুরে বললেন, 'শোনো হে তরুণ, তোমার সাহস আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি তোমার আবেদন মঞ্জুর করলাম।'

তন্দ্রার ভাবটুকু কেটে যেতে দ্রুত কয়েকবার মাথা ঝাঁকাল রানা, ভাবল, কই, আমি গাঁজা খেয়ে ঘুমিয়েছিলাম বলে তো মনে পড়ে না!

ভোর সাড়ে পাঁচটায় খবর এল, সীমান্তের অবস্থা সেই আগের মতই। মাথা নিচু করে জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এল রানা। রাত জেগে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল কুরবান আলি। ভুল করে তাকে কিছু বলে যায়নি, তাই দুঃখ প্রকাশ করল ও। ব্রেকফাস্ট খেলো না, শুধু এক কাপ কফি খেয়ে বেডরুমে ঢুকল।

বিছানায় শুয়ে চোখ বুজল রানা। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

যাকে বলে ভদ্রবেশী ছোট লোক, গ্রীক লোকটা তাই।

এ-ধরনের লোককে দু'চোখে দেখতে পারে না নাদিয়া। চোখে লালসা নিয়ে কেউ যদি সরাসরি তাকায়, তার ওপর অত চটে না সে। কিন্তু কেউ যদি আড়াল থেকে তাকে দেখে জিভ চাটে বা না জেনে ধাক্কা লেগে গেছে এই মিথ্যে অজুহাতে

তাকে ছুঁয়ে মজা পেতে চায়, সেই লোককে ঘৃণা করে।

মনিহারী দোকানে দু'ঘণ্টাও হয়নি এসেছে, তারই মধ্যে পসাইডোনের ওপর ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল নাদিয়ার। দু'হপ্তা পর লোকটাকে গলা টিপে খুন করতে ইচ্ছে করল তার।

দোকানটা ছিমছাম, পরিষ্কার। মশলার সুগন্ধ ভালই লাগে নাদিয়ার। রঙচঙে বাক্স আর ক্যান, খুব সুন্দর লাগে দেখতে। পিছনের স্টোর রুমটাও আশ্চর্য ঠাণ্ডা। খদ্দেরদের ভিঁড় না থাকলে ওখানে বসে একটু বিশ্রাম নেয়া চলে। পসাইডোনকে সাহায্য করতে এসে খুব যে একটা খাটতে হয় তাকে, তা নয়। অঙ্কে চিরকালই ভাল সে, যোগ করার সময় কাগজ কলম খুঁজতে হয় না, মুখে মুখে করতে পারে। খদ্দেররা অবাক হয়, প্রশংসা করে তার। টিনে ভরা বিদেশী অচেনা খাবার মাঝে মধ্যে বাড়িতেও নিয়ে যায় সে, রান্না করে খেয়ে দেখে কেমন লাগে। কাজটা একঘেয়ে হলেও, নিজ গুণে পরিবেশে একটা বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছে সে। সাথে বই থাকে, থাকে দাবার বোর্ড। পসাইডোন দাবা বোঝে না, বই দেখে খেলে নাদিয়া।

কিন্তু দোকানদার লোকটা আক্ষরিক অর্থেই পচা একটা ঘা। সুযোগ পেলেই ওর হাত ধরবে, নয়তো কাঁধে হাত রাখবে, অথবা নিতম্বে কজি ঘষে দেবে। ওকে পাশ কাটিয়ে পাশের ঘরে যাবার সময় ওর বুকে কাঁধ ছোঁয়াতে একবারও ভুল করে না লোকটা। প্রথম প্রথম নাদিয়া ভেবেছিল, লোকটা অন্যমনস্ক, এসব না জেনেই করছে। তার এরকম মনে করার কারণ ছিল, চেহারাসুরৎ দেখে লোকটাকে নিরীহ গোবেচারা বলেই মনে হয়। দেখতে ভাল, পরিষ্কার কাপড় পরে, হাসিটি লেগেই আছে মুখে। এই লোকের পেটে এত কুবুদ্ধি, ধারণা করা যায় না।

কোন প্রতিবাদ করেনি নাদিয়া, সেটাই হয়ে গেছে মারাত্মক অসুবিধে। ওর মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ির মাত্রা বাড়িয়েই চলেছে সে।

আজ একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে নাদিয়া। ঠিক করেছে, খদ্দেররা চলে যাক, লোকটাকে আজ অপমানের একশেষ করবে সে।

এমনিতেই নিজের মনের অবস্থা ভাল নেই নাদিয়ার। নিজের জীবনে কি থেকে কি ঘটে গেল, ভাবতে বসলে ঠিক মত হিসেব মেলাতে পারে না সে। মেজর মাসুদ রানা আশ্চর্য এক আদর্শ পুরুষ হয়ে উদয় হলো তার জীবনে। এই প্রথম একজন পুরুষ তার সাথে ভদ্র আচরণ করল, তার দিকে নোংরা হাত বাড়াল না। এই প্রথম একজন পুরুষ তাকে নিজের সমান বলে গ্রহণ করল। অথচ তারপরই সেই লোক তার সাথে এমন আচরণ করল, সে যেন রাস্তার মেয়ে। বলল, যাও, আলেক বোগান নামের ইসরায়েলি স্পাইয়ের সাথে প্রেম করো। আলেক বোগান কে জানে না সে, জীবনে কোনদিন দেখেনি পর্যন্ত। সেই কাজ করতে এসে নতুন আরেক ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়ল—পসাইডোন, গায়ে হাত দিয়ে মজা পেতে চায়।

আমি কি তাহলে এভাবে শুধু ব্যবহারই হয়ে আসব? এই কি নিয়তি আমার?

মনে মনে বোঝে, মেজর রানার কোন দোষ নেই। মেজর তাকে শুধু একটা কর্তব্য সারতে বলেছে, তার বেশি কিছু না। জানে, মেজর সম্পর্কে তার ধারণা অনেক উঁচু হলেও, তার সম্পর্কে মেজরের ধারণা নিচু হওয়াই স্বাভাবিক। মেজরের

যে-সব গুণ আছে, তার এক আনাও নেই ওর। যে-মেয়ে হোটেলে নাচে তাকে অচেনা একজন লোকের সাথে প্রেমের অভিনয় করতে বলার মধ্যে আশ্চর্যের কি আছে!

কিন্তু এত বুঝেও মন মানে না। রানাকে এমন উঁচু আসনে বসিয়েছে ও, তার কাছ থেকে এই রকম একটা প্রস্তাব পাবে বলে কল্পনাও করতে পারেনি। দুঃখটা ওর সেখানেই।

এই দুঃখ প্রকাশ করবে, তারও কোন উপায় নেই। লোকে শুনলে হাসবে। আর রানা শুনলে ওকে পাগল ভাববে।

রানাকে নিয়ে অনেক কথা ভাবে ও। সেই ভাবনার কোন হাতামাথা নেই। নিজেকে অমন কোটিবার প্রশ্ন করেছে সে, আমি কি মেজরকে ভালবাসি? ভেতর থেকে উত্তর এসেছে, অবশ্যই ভালবাসি, কিন্তু সেটা ঠিক প্রেমিকের প্রতি প্রেমিকার ভালবাসা নয়। মেজরকে নিয়ে ঘরবাঁধার স্বপ্ন কখনও দেখেনি সে, দেখতে ইচ্ছেও জাগেনি। আবার, তার জীবন থেকে একসময় দূরে সরে যাবে রানা, এই ভাবনা মাথায় এলেই অসহায়, অস্থির বোধ করে সে। ওকে কি আমি বন্ধু হিসেবে পেতে চাই? অনেক চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে সে, না, তাও নয়। বন্ধুত্ব সম্পর্কটার মধ্যে কিসের যেন একটা অভাব আছে বলে মনে হয় তার। বন্ধুর প্রতি অধিকারের একটা সীমা আছে, বন্ধুর অনেক ব্যাপার থাকে যেখানে নাক গলানো চলে না। তাই বন্ধু হিসেবে রানাকে পেতে চায় না সে।

তাহলে?

এই তাহলের উত্তর এখনও খুঁজে পায়নি নাদিয়া। তবে কেন যেন মনে হয় তার, উত্তর একটা আছে, এবং আছে ওর অন্তরের গভীরে। একদিন ঠিকই আত্মপ্রকাশ করবে সেটা।

আলেক বোগান লোকটা কেমন হবে, ভাবতে চেষ্টা করল নাদিয়া। মেজরের পক্ষে বলা সহজ, যাও, লোকটার সাথে প্রেম করো। যেন একটা বোতাম আছে, টিপলেই কাজটা হয়ে যাবে। এমন কিছু আহামরি দেখতে নয় সে যে প্রথম দর্শনেই যে-কোন পুরুষ ওর প্রেমে পড়ে অন্ধ বনে যাবে। প্রেমের অভিনয় করে সফল হতে হলে আগে জানতে হবে লোকটা কেমন। নাদিয়ার সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করবে লোকটার ব্যক্তিগত চরিত্র, স্বভাব, রুচি ইত্যাদির ওপরও। কেউ কেউ ওকে দেখা মাত্র পছন্দ করে। আবার এমন লোকও আছে, সঙ্কোচ বা হীনম্মন্যতার কারণে ওর ধারে কাছ ঘেঁষতেও ভয় পায়। ওকে বাজে মেয়ে বলে মনে করে এমন পুরুষের সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

যেমন মাসুদ রানা নিজেই তাদের মধ্যে একজন।

নাদিয়ার ধারণা, শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা, আলেক বোগানকে প্রেমের ফাঁদে ফেলা সম্ভব নয়। যত কথাই বলা হোক, সে একজন স্পাই। কেউ তার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলেই তাকে সন্দেহের চোখে দেখবে লোকটা।

লিভার পেস্টের একটা জার নিয়ে স্টোর রুম থেকে শো রুমে বেরিয়ে এল পসাইডোন। হাত তুলে কব্জিতে বাঁধা ছোট্ট রিস্টওয়াচে চোখ বুলাল নাদিয়া। ছুটি

হতে আর বেশি দেরি নেই। জারটা শেলফে রেখে আবার স্টোর রুমে ফিরছে পসাইডোন। নাদিয়াকে পাশ কাটাবার সময় ওর বগলের নিচে আর পাঁজরে আঙুল ছোঁয়াল সে। গা ঘিন ঘিন করে উঠল নাদিয়ার, দ্রুত সরে এল। পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝল, দোকানে ঢুকছে কেউ। কিন্তু মাথায় রক্ত চড়ে গেছে ওর, নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। আরবীতে চেঁচিয়ে বলল, 'ফের যদি আমার গায়ে হাত দাও তুমি, তোমার মুখে জুতো মারব আমি!'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল খদ্দের লোকটা। ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল নাদিয়া। দেখেই বুঝল, লোকটা ইউরোপিয়ান, তবে নিশ্চয়ই আরবী বোঝে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল নাদিয়া, 'গুড আফটারনুন।'

স্টোর রুমে ঢোকার দরজাটা খোলা, সেদিকে চোখ রেখে দশাসই খদ্দের হাঁক ছাড়ল, 'ওহে পসাইডোন, ব্যাপারটা কি? ভদ্রমহিলাকে বিরক্ত না করলেই তো পারো!'

দরজা দিয়ে উঁকি দিল পসাইডোন। 'গুড ডে, স্যার,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে একটু হাসল সে। 'ও আমার ভাগ্নি, স্যার। নাদিয়া। একটু সেন্টিমেন্টাল, এই আর কি! যেতে আসতে একটু যে ধাক্কা লাগতেই পারে, এটা ও বুঝতে চায় না।'

একজন খদ্দেরের সামনে নিজের আসল চেহারা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় লজ্জা পেয়েছে পসাইডোন, কিন্তু তার চেহারায় আরও কি যেন একটা ফুটে উঠল, যার কোন অর্থ করতে পারল না নাদিয়া।

'ভাগ্নি?' সকৌতুকে জানতে চাইল খদ্দের। 'বলো কি হে! তুমি দেখছি নতুন ধরনের একটা গল্প তৈরি করবে!'

খদ্দেরের দিকে আরও ভাল করে তাকাল নাদিয়া। কেন যেন মনে হলো, এই লোক যে-সে নয়, এই লোকের কি যেন একটা গুরুত্ব আছে। প্রকাণ্ড শরীর লোকটার, কিন্তু মনে হলো সবটাই হাড়, মাংস আর পেশী, মেদের ছিটেফোঁটাও নেই। চেহারাতেই লেখা রয়েছে, দানবীয় শক্তি রাখে শরীরে, সমবয়েসী দশ বারো জনকে একাই অনায়াসে সামলাতে পারবে। ইউরোপিয়ান তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সাথে চেহারায় এ-দেশী ধাঁচও এক-আধটু আছে। পোশাক-আশাক দেখে বোঝা যায়, বেশ ধনী। সিল্ক শার্টটা বিদেশী, গোল্ড রিস্টওয়াচটাও তাই। কোমরে গুই সাপের চামড়া দিয়ে তৈরি বেল্ট।

নাদিয়া জানতে চাইল, 'বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি?'

নিঃশব্দে নাদিয়ার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল খদ্দের, যেন মাথার ভেতর গজানো কয়েকটার মধ্যে থেকে একটা উত্তর বেছে নিতে চেষ্টা করছে। তারপর বলল, 'প্রথমে তুমি আমাকে কিছু ইংলিশ মারমালেড দিতে পারো।'

'অবশ্যই।' মারমালেড আছে স্টোর রুমে। একটা জার নিয়ে আসার জন্যে ভেতরে ঢুকল নাদিয়া।

চাপা গলায় হিস হিস করে উঠল পসাইডোন, 'এই লোকই!'

রাগ এখনও ঠাণ্ডা হয়নি নাদিয়ার, পসাইডোন আবার ওর সাথে কথা বলার সাহস পেল দেখে ফোঁস করে উঠল ও। 'ছোটলোক! তোমাকে আমি এমন শিক্ষা

দিতে পারি…'

'দূর!' ফিসফিস করে বলল পসাইডোন। 'আপনি ম্যাডাম আমার কথা বুঝতে পারছেন না! আমি বলছি,' আঙুল দিয়ে দোকান ঘরের দিকটা দেখাল সে, 'ওই খদ্দের ভদ্রলোক, উনিই আমাকে জাল টাকা দিয়েছিলেন। মি. বোগান!'

'আল্লা!' আতকে উঠল নাদিয়া। এই দোকানে কেন কাজ করছে, সেটাই এতক্ষণ মনে ছিল না তার। পসাইডোন সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে, সেই ভয় তার মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। এই মুহূর্তে কি করা উচিত, ঢুকল না মাথায়। 'কি বলব ওকে? কি করব আমি!'

'জানি না…' ঢোক গিলে শুকনো গলায় বলল পসাইডোন। 'মারমালেড দিন…তারপর…জানি না!'

'ঠিক আছে, আগে মারমালেড দিই,' যেন নিজেকেই শোনাল নাদিয়া। শেলফ থেকে মারমালেডের একটা জার নামিয়ে দোকানে ফিরে এল সে। আলেকের সামনে কাউন্টারের ওপর জারটা নামাল সে, মুখ তুলে জোর করে হাসল। 'আর কিছু?'

'দু'পাউন্ড কালো কফি।'

কফি ওজন করছে নাদিয়া, তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আলেক। হঠাৎ লোকটার উপস্থিতি আতঙ্কিত করে তুলল নাদিয়াকে। কেন যেন তার মনে হলো, এই লোকের মধ্যে নোংরা আর অশুভ কি যেন একটা আছে। এইটুকু জীবনে অনেক পুরুষের সাথে মেলামেশা করেছে সে, তারা সবাই লোভী আর চরিত্রহীন হলেও, তারা সহজভাবে হাসতে পারত, তাদের সামনে নিজেকে এমন আড়ষ্ট লাগত না। কিন্তু আলেক বোগানকে দেখে মনে হলো, এই লোক একটা পাষাণ। এই লোক অসম্ভব আত্মবিশ্বাসী, যা করবে বলে ভাবে তা করে তবে ছাড়ে।

নাদিয়া বুঝল, আলেক বোগানকে প্রেমের ফাঁদে ফেলা সম্ভব নয়।

'আর কিছু?'

দোকানের এদিক থেকে ওদিকে ঘুরেফিরে আলেকের ফরমাশ মত জিনিস-পত্র নিয়ে এসে কাউন্টারে রাখছে নাদিয়া। নাদিয়া যেদিকেই যায়, আলেকের চোখ দুটো অনুসরণ করে তাকে। নাদিয়া ভাবল, সুযোগ একবার হারালে আর হয়তো পাওয়া যাবে না, কাজেই আজই ওকে পটিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। ওর সাথে কথা বলা দরকার আমার। আর কিছু লাগবে?—শুধু এই কথা জিজ্ঞেস করলে কাজ হবে না। 'আর কিছু?' জিজ্ঞেস করল সে।

'এক টিন হ্যাম।'

শুয়োরের বাচ্চা! মনে মনে গাল দিল নাদিয়া।

'আর?'

'হাফ কেস শ্যাম্পেন।'

একটা বাক্সে ছ'টা বোতল, বেশ ভারী। পিছু হটে সেটাকে স্টোর রূম থেকে টেনে নিয়ে এল নাদিয়া। 'এত জিনিস, আপনাকে আর কষ্ট করে নিয়ে যেতে হবে না,' বলল সে। 'আমাদের লোক ডেলিভারি দিয়ে আসবে।' গলার স্বর শান্ত রাখার

চেষ্টা করল সে। বাক্সটা টেনে নিয়ে আসায় একটু হাঁপিয়ে উঠেছে, তাতে ও যে নার্ভাস হয়ে পড়েছে সেটা চাপা পড়ে যাবে বলে আশা করল সে।

দৃষ্টি দেখে মনে হলো, নাদিয়ার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে আলেক। 'ডেলিভারি দিয়ে আসবে?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'উহুঁ, দরকার নেই। ধন্যবাদ।'

ভারী বাক্সটার দিকে চোখ রেখে মৃদু সুরে জানতে চাইল নাদিয়া; 'আপনি তো বোধহয় কাছাকাছি কোথাও থাকেন?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারো।'

দোকানের বাইরে তাকাল নাদিয়া। 'কই, গাড়ি দেখছি না—এত জিনিস নিয়ে যেতে পারবেন?'

'গাড়ি নেই, ডাকতে কতক্ষণ? তাছাড়া, এত কোথায়, এই তো সামান্য ক'টা জিনিস, আমার কোন অসুবিধে হবে না।'

'তা হবার কথা নয়,' মৃদু হাসল নাদিয়া। 'দেখেই বোঝা যায়, অনেক জোর আপনার গায়ে।'

'হ্যাঁ,' ফিক ফিক করে একটু হাসল আলেক।

'তবু, খামোকা কষ্ট করার কোন মানে হয় না,' বলল নাদিয়া। 'আমাদের ডেলিভারি ম্যান অত্যন্ত বিশ্বস্ত...'

'না।'

আলেকের বলার মধ্যে কাঠিন্য লক্ষ করে এ প্রসঙ্গে আর কথা বলল না নাদিয়া। সামান্য একটু কাঁধ ঝাঁকাল শুধু। ভেবেছিল, রাজি করাতে পারবে, কিন্তু হতাশ হতে হলো। জানতে চাইল, 'আর কিছু লাগবে না তো?'

'মনে পড়ছে না।'

কত হয়েছে হিসেব কষতে শুরু করল নাদিয়া।

আলেক বলল, 'পসাইডোন নিশ্চয়ই ভাল ব্যবসা করছে, তা না হলে কি অ্যাসিস্ট্যান্ট রাখে!'

'ত্রিশ পাউন্ড আর এগারো পাউন্ড, একচল্লিশ—কত দেয় জানলে আর এ-কথা বলতেন না—একচল্লিশ আর সাঁইত্রিশ, আটাত্তর...'

'কেন, কাজটা তোমার পছন্দ নয়?'

মুখ তুলে সরাসরি তাকাল নাদিয়া। চেহারায় কাঠিন্য আর অসন্তোষ। 'এখান থেকে বেরিয়ে যদি নর্দমা পরিষ্কার করতে হয়, তাও ভাল।'

'এখনও তাহলে পড়ে আছ কেন?'

অসহায় দেখাল নাদিয়াকে। ছোট্ট করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'নর্দমা পরিষ্কার করার কাজই-বা আমি পাচ্ছি কোথায়!'

'ওটা তো একটা কথার কথা,' বলল আলেক, 'এখান থেকে চলে গিয়ে কি করবে বলে ভাবছ তুমি?'

উত্তর না দিয়ে হিসেবে মন দিল নাদিয়া। এক সময় বলল, 'দুশো সত্তর পাউন্ড হয়েছে আপনার।'

পকেট থেকে মানি ব্যাগ নয়, টাকার বান্ডিল বের করল আলেক। সব এক পাউন্ডের নোট। একশো টাকার দুটো বান্ডিল, আর সত্তরটা পাউন্ড গুণে দিল সে।

'এত এক পাউন্ডের নোট?'—প্রশ্নটা করতে গিয়েও করল না ন্যাদিয়া। টাকার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করলে সন্দেহ জাগতে পারে লোকটার মনে। তাহলে? আর কি জিজ্ঞেস করা যায়? ব্রাউন রঙের একটা পেপার শপিং ব্যাগে জিনিসগুলো ভরছে সে। বলল, 'আপনি বোধহয় পার্টি দিচ্ছেন? পার্টি খুব ভাল লাগে আমার।'

'কেন মনে হলো পার্টি দিচ্ছি?'

'তা না হলে এত শ্যাম্পেন কেনে কেউ?'

দরাজ গলায় হাসল আলেক। তারপর বলল, 'জীবনটাই তো একটা পার্টি—উৎসব। তুমি কি বলো?'

'অনেকের জন্যে হয়তো তাই,' ম্লান মুখে বলল নাদিয়া। 'কিন্তু আমার জন্যে নয়।'

ভাবল, মেজর রানাকে মুখ দেখাব কিভাবে? বোঝাই যাচ্ছে, আমি হেরে গেছি। লোকটাকে আমি আকৃষ্ট করতে পারিনি। এই যে চলে যাচ্ছে, আবার হয়তো এক মাস পরে আসবে, আর কখনও নাও আসতে পারে।

হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠল নাদিয়া। সিদ্ধান্ত নিল, লোকটাকে কোনমতেই চলে যেতে দেবে না সে। দরকার হলে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করবে, কিছু একটা দিয়ে মাথার পিছনে বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে ফেলে দেবে···

বাঁ হাতে শ্যাম্পেনের বাক্স নিল আলেক, ডান হাতে ধরল শপিং ব্যাগ। 'গুড বাই,' বলল সে।

নাদিয়ার দিকে পিছন ফিরল আলেক। কাউন্টারের এদিকে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল নাদিয়া। ইচ্ছে হলো লাফ দিয়ে কাউন্টার টপকায়, কিন্তু পা সরল না। চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করবে, কিন্তু গলায় জোর পেল না।

দরজার কাছে পৌঁছে পিছন ফিরে নাদিয়ার দিকে তাকাল আলেক। একটা চোখ টিপল। 'বুজম রেস্তোরাঁয় ডিনার। বুধবার সন্ধে সাড়ে সাতটায়। এসো কিন্তু!'

থ হয়ে গেল নাদিয়া। যখন বুঝল মুখে হাসি টেনে কিছু বলা দরকার, ততক্ষণে চলে গেছে আলেক বোগান।

তিন

এয়ারফোর্সের হেলিকপ্টার করে সিনাইয়ে পৌঁছতে বেলা এগারোটা বেজে গেল ওদের। রানা বসেছে পাইলটের পাশে, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোসাদ্দেক হাসান আর ফরহাদ বসেছে পিছনের সীটে।

ঘণ্টাদুয়েক আগে টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙে রানার। অপর প্রান্ত থেকে

ব্রিগেডিয়ার হাফিজ ওকে জানান, সিনাইয়ে যুদ্ধের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে গেছে, মিশরীয় সেনাবাহিনী নিজেদের চৌকিগুলো ফিরে তো পেয়েইছে, ইসরায়েলের ভেতর ঢুকে পড়ে তারা ওদের একটা শক্ত ঘাঁটিও দখল করে নিয়েছে। এই ঘাঁটি একটা পাহাড়ের ওপর। এই মুহূর্তে যুদ্ধ হচ্ছে পাহাড় ছাড়িয়ে ইসরায়েলের আরও অনেক ভেতরে।

সবশেষে ব্রিগেডিয়ার বললেন, 'আমাদের জোয়ানরা পাহাড়ের ওপর একটা অয়্যারলেস লিস্নিং পোস্ট দখল করেছে, প্রায় অক্ষতই বলা যায়। ওখানে তোমার একবার যাওয়া দরকার। আমাদের এদিক থেকে ওরা কি ধরনের মেসেজ পাচ্ছিল, ভাগ্য ভাল হলে তার কিছু নমুনা তুমি পেয়েও যেতে পারো। সেকশন চীফকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। এয়ারফোর্সকে আমি একটা 'কপ্টারের কথা বলে রেখেছি।'

সোজা একেবারে পাহাড়ের মাথায় এসে নামল 'কপ্টার। একজন লে. কর্নেল ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল। টেলিফোন পেয়েই চলে এসেছে রানা, চা আর গরম স্যান্ডউইচের প্রস্তাবে আপত্তি করল না। তারপর ওরা তাঁবু থেকে বেরিয়ে সদ্য সমাপ্ত যুদ্ধের চিহ্ন দেখতে দেখতে এগোল লিস্নিং পোস্টের দিকে।

এখনও চলছে যুদ্ধ, কামানের আওয়াজ পেল ওরা। একদিকের আকাশ ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে আছে। ট্যাংক, অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট গান, মর্টার আর লাশ, সব ফেলে পালিয়ে গেছে ইসরায়েলিরা। বোঝাই যায়, পালাবার জন্যে তৈরি ছিল না তারা।

কমান্ড ভেহিকেলে নিজেদের উপস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করল ওরা। ওখান থেকেই ওদেরকে আটক করা রেডিও ট্রাকের হদিস জানিয়ে দেয়া হলো।

ফিল্ড ইন্টেলিজেন্সের লোকজন এরই মধ্যে শুরু করে দিয়েছে কাজ। ছোট একটা তাঁবুর ভেতর বন্দী সৈনিকদের জেরা করা হচ্ছে, বাকিরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রোদের মধ্যে। এনিমি অর্ডন্যান্স এক্সপার্টরা অস্ত্রশস্ত্র আর যানবাহন পরীক্ষা করছে, ম্যানুফ্যাকচারারের সিরিয়াল নম্বর নোট করছে তারা। ওয়াই সার্ভিসের লোকজন ওয়েভলেন্থ আর কোডের সন্ধান চালাচ্ছে।

রানা আর লে. কর্নেল চেক করার জন্যে দুটো ট্রাক বেছে নিল। শ'দুয়েক হিব্রু শব্দ জানে রানা, দৌড় ওই পর্যন্তই। তাও, ওগুলো সব মিলিটারি টার্মস। তাতে করে দলিল-দস্তাবেজ আর প্রেমপত্রের মধ্যে পার্থক্য কি বুঝতে না পারলেও, আর্মি রিপোর্ট আর অর্ডার দেখলেই চিনতে পারবে।

ট্রাকে উঠে একবার চোখ বুলিয়েই বুঝল রানা, কাজটা ছোট নয়। দখল করা লিস্নিং পোস্ট মিশরীয়দের জন্যে দামী একটা উপহারই বলা চলে। ট্রাকের ওপর যে-সব জিনিস রয়েছে তার বেশিরভাগই বাক্সে ভরে কায়রোয় নিয়ে যেতে হবে। এসব চেক করে দেখার জন্যে বড় একটা টীমের মাসখানেক লাগবে। আজ ওকে শুধু ওপর ওপর চোখ বুলাতে হবে।

ট্রাকের ভেতরটা একেবারে লেজেগোবরে হয়ে আছে। ঘাঁটি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ইসরায়েলিরা তাদের কাগজপত্র সব পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল। বাক্স খালি করে কাগজে আগুন ধরালেও, সেই আগুন নিভে যেতে বেশি

সময় লাগেনি। কার্ডবোর্ডের একটা ফোল্ডারে রক্ত দেখল রানা। গোপন কিছু সামলে রাখতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে কেউ।

কাজ শুরু করল রানা। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজগুলোই প্রথমে পোড়াতে চেষ্টা করেছিল ইসরায়েলিরা, তাই আধপোড়া কাগজ নিয়েই কাজ শুরু করল ও। মিশরীয়দের রেডিও সিগন্যাল অনেকগুলোই পাওয়া গেল। এগুলো আড়িপেতে শুনেছে ইসরায়েলিরা, তার মধ্যে কিছু কিছু ডিকোড-ও করেছে। এসবের বেশির ভাগই রুটিন।

আধপোড়া একটা স্তূপের নিচ থেকে ইংরেজী একটা উপন্যাস পাওয়া গেল। ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। বইটা খুলে প্রথম লাইনটা পড়ল ও—লাস্ট নাইট আই ড্রেমট আই ওয়েন্ট টু ম্যানডারলি এগেন। বইটার নাম রেবেকা। লেখক, দু মরিয়ে। বইয়ের নামটা চেনা চেনা ঠেকল, কাউকে হয়তো পড়তে দেখেছে।

মাথার পিছনটা চুলকাতে শুরু করল রানা। হিব্রু নয়, ইংরেজী একটা উপন্যাস—ইসরায়েলি লিস্নিং পোস্টে এটা এল কেন? বইয়ের ভূমিকার ওপর চোখ বুলিয়ে মনে হলো, ইংরেজ এক গ্রাম্য যুবতীকে নিয়ে লেখা। একজন ইসরায়েলি টেকনিশিয়ান এর মধ্যে কি মজা পেতে পারে? তাছাড়া, সৈনিকরা সাধারণত পর্ণোগ্রাফী বা রোমাঞ্চ উপন্যাস পড়ে, কাউকে কাউকে ধর্মগ্রন্থ পড়তেও দেখা যায়। কিন্তু এ-ধরনের মেয়েলী উপন্যাস পড়ে বলে তো মনে হয় না। তবে কি অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই বই এখানে নিয়ে আশা হয়েছিল?

অন্য কোন উদ্দেশ্য? একটাই সম্ভাবনা উঁকি দিল রানার মনে—বইটা একটা কোডের ভিত হতে পারে।

ওয়ান-টাইম প্যাড পদ্ধতিরই আলাদা একটা সংস্করণ হলো বুক কোড। পাঁচটা করে অক্ষর নিয়ে তৈরি শব্দের গ্রুপগুলোকে এলোমেলোভাবে ওয়ান-টাইম প্যাডে ছাপা হয়। প্রতিটি প্যাড মাত্র দু'কপি করে ছাপা হয়। একটা প্রেরকের জন্যে, অপরটি সিগন্যাল প্রাপকের জন্যে। প্যাডের প্রতিটি শীট মেসেজ পাঠাবার জন্যে মাত্র একবারই ব্যবহার করা হয়, তারপর পুড়িয়ে ফেলা হয়। প্রতিটি শীট মাত্র একবার ব্যবহার করা হয় বলে কোডটা কোনদিনই ভাঙা সম্ভব নয়। এই একই পদ্ধতিতে বুক কোডেও বইয়ের ছাপা পাতা ব্যবহার করা হয়, পার্থক্য শুধু এই যে ব্যবহারের পর বইয়ের পাতা ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলতে হয় না।

প্যাডের চেয়ে বইতে সুবিধে আছে। অক্ষত একটা প্যাড দেখলেই শত্রুপক্ষ সেটাকে ডিকোড করার কথা ভাববে। কিন্তু বই অত্যন্ত নিরীহদর্শন, তাকে দেখে কারও মনে কোন সন্দেহ জাগার কথা নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটার অত গুরুত্ব নেই, কিন্তু শত্রুরেখার ওপারে যে গুপ্তচরটি রয়েছে তার জন্যে এর গুরুত্ব অনেক।

বইটা ইংরেজী কেন, এটা থেকে তারও একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ইসরায়েলি সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে সিগন্যাল বিনিময় করার সময় নিজেদের ভাষায় লেখা বই ব্যবহার করে থাকে, কিন্তু মিশরীয় এলাকায় নিজেদের স্পাইয়ের সাথে মেসেজ লেনদেন করতে হলে ইংরেজী বই ব্যবহার করাই সব দিক থেকে ভাল।

একজন লোকের কাছে হিব্রুভাষায় লেখা বই দেখলে যে কোন মিশরীয় একটু সন্দেহের চোখে তাকাবে তার দিকে।

বইটাকে আরও ভালভাবে নেড়েচেড়ে দেখল রানা। শেষপৃষ্ঠায় পেন্সিল দিয়ে দামটা লেখা আছে, রাবার দিয়ে ঘষে লেখাটা তুলে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। এর একটা অর্থ হতে পারে, বইটা সেকেন্ডহ্যান্ড কেনা হয়েছে। আলোর সামনে ধরে পেন্সিলের দাগগুলো আন্দাজ করার চেষ্টা করল ও। ৫০ পরিষ্কার পড়া যায়, কিন্তু তারপর কি লেখা আছে বোঝা কঠিন। অনেকক্ষণ ধরে দেখার পর মনে হলো, ইংরেজী তিনটে অক্ষর রয়েছে—ই, এস, সি। পঞ্চাশ এসকুডো (ESCUDOS)। হ্যাঁ, তাই। বইটা তাহলে পর্তুগাল থেকে কেনা হয়েছে।

কায়রোয় ফিরে মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সের লিসবন ব্রাঞ্চে একটা মেসেজ পাঠাতে হবে, নিজেকে মনে করিয়ে রাখল রানা। ইংরেজী উপন্যাস বিক্রি করে এমন সব দোকানে খোঁজ নিতে বলবে ও। জানতে হবে, কোত্থেকে কেনা হয়েছে বইটা, কে কিনেছে।

অন্তত দুই কপি বই কেনা হয়েছে। এই ধরনের একটা বিক্রি দোকানদার মনেও রাখতে পারে। কিন্তু আসল প্রশ্ন হলো, এই বইয়ের আরেকটা কপি, সেটা কোথায়? রানার মনে কোন সন্দেহ নেই, সেটা এই মুহূর্তে কায়রোয় আছে। বইটা হাতে নিয়ে ট্রাক থেকে নেমে পড়ল ও।

ওর খোঁজে হন হন করে এগিয়ে আসছে লে. কর্নেল মোসাদ্দেক হাসান। থমকে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। রাগে টকটকে লাল হয়ে আছে লে. কর্নেলের চেহারা, যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটবে। ব্যাপারটা কি!

'ভাল কথা, মেজর! জিজ্ঞেস করতে পারি, সারাটা দিন কি ছাই করো তুমি?'

রানা কোন উত্তর করল না দেখে লে. কর্নেল ওর হাতে একটা কাগজ গুঁজে দিল। 'এই সর্বনাশ করার কোন অধিকার নেই তোমার!'

কাগজটার ভাঁজ খুলে চোখ বুলাল রানা।

কোড করা একটা রেডিও সিগন্যাল, দুই লাইন কোডের মাঝখানে ডিকোড করা অর্থ লেখা হয়েছে। কল সাইন দেয়া হয়েছে—পিরামিড। সিগন্যাল স্ট্রেংথের প্রাথমিক তথ্যাদির পর হেডিং—'সিনাই এলাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা'।

স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে যেসব অফিসার ব্রীফকেস নিয়ে বাইরে বেরিয়েছে তাদের এই ভুল তথ্য লেখা কাগজ দেয়া হয়েছিল জুন মাসের তিন তারিখে, পাঁচ তারিখের মধ্যেই সেটা কায়রো থেকে ট্র্যান্সমিট হয়ে চলে এসেছে ইসরায়েলি লিস্নিং পোস্টে! কাজটা কার তা আর বলে দিতে হয় না।

কিন্তু কোন্ অফিসারের ব্রীফকেস থেকে তথ্যগুলো চুরি করল আলেক? কয়েকশো অফিসার ব্রীফকেস নিয়ে বেরোয়…

'এই কি তোমার কাজের নমুনা, মেজর রানা?' আবার তড়পে উঠল লে. কর্নেল। 'কারও ওপর একটা দায়িত্ব দিয়ে যদি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়! টপসিক্রেট সামরিক তথ্য সব পাচার হয়ে যাচ্ছে, আর উনি ক্রিকেট খেলায় ভাল রেজাল্ট করে

হাততালি কুড়াচ্ছেন! বাহ্, চমৎকার!'

মেসেজের সবটুকু পড়ার দরকার বোধ করল না রানা, লে. কর্নেলের গা জ্বালানো কথা শুনে রাগল তো নাই-ই, উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। বলল, 'এটা আমাকে দেবার আগে নিজে একবার ভাল করে পড়ে দেখলে পারতেন, কর্নেল।'

'হোয়াট ডু ইউ মীন?'

'পড়েই দেখুন।'

রানার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে দ্রুত পড়তে শুরু করল লে. কর্নেল। তারচেয়েও দ্রুত তার চেহারা বদলে যেতে লাগল। পড়া শেষ করে ঝট্ করে মুখ তুলল লে. কর্নেল। কয়েক সেকেন্ড রানার মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকার পর খুক খুক করে কাশল সে, তারপর জানতে চাইল, 'এসবের মানে?'

'আপনি কি বুঝলেন সেটা বলুন,' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'এখানে যে-সব অত্যাধুনিক ফ্রেঞ্চ ট্যাংক আর অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট গানের কথা বলা হয়েছে সেগুলো আমাদের নেই।'

'হ্যাঁ, নেই,' বলল রানা। 'তাহলে আপনি স্বীকার করেন, এই তথ্য ইসরায়েলিদের হাতে পড়ায় আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি?'

'হ্যাঁ...মানে, না...মানে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, স্বীকার করি।'

'তাহলে বেশ পরিষ্কার করে উচ্চারণ করুন: মেজর রানা, আপনার বিরুদ্ধে এইমাত্র যে অভিযোগ করেছি সেটা মিথ্যে, আমারই ভুল, আমি দুঃখিত।' গলা খাদে নামিয়ে আবার বলল রানা, 'ঠিক এই কথাগুলো না আওড়ালে যা যা ঘটেছে সব জানিয়ে আমি ব্রিগেডিয়ার হাফিজের কাছে কমপ্লেন করব।'

খুক করে একবার কাশল লে. কর্নেল। এই সময় একটা ট্রাকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানার সহকারী, ফরহাদ।

'স্যার...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'এদিকে এসো, ফরহাদ। তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। একজন সাক্ষী থাকুক।'

'কি ব্যাপার, স্যার?' আকাশ থেকে পড়ল ফরহাদ।

সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে খুলে বলল রানা। সবশেষে লে. কর্নেলের দিকে ফিরল ও, বলল, 'আপনি ইচ্ছে করলে দুঃখ নাও প্রকাশ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ব্রিগেডিয়ারকে সব কথা বলতে আমি বাধ্য হব। এই মেসেজটা আপনি পড়ে না দেখেই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন, আমি নাকি মিশরীয় সেনাবাহিনীর সর্বনাশ করেছি!'

'দুঃখিত, মেজর,' অন্য দিকে ফিরে বলল লে. কর্নেল।

'ওতেই হবে,' সন্তুষ্ট হলো রানা। 'এখন আপনি নিজের কাজে যেতে পারেন। আমি একটু একা থাকতে চাই।'

রানার কথা শুনে লে. কর্নেলের সাথে ফরহাদও চলে গেল।

ট্রাকের একটা ধাপে বসল রানা। সিগারেট ধরাবার সময় লক্ষ করল, একটু

একটু কাঁপছে হাত। আলেক বোগান শুধু যে কায়রোয় ঢুকতে পেরেছে তাই নয়, ওর পাতা জালের বাইরে থেকে টপ সিক্রেট ইনফরমেশন হাতে পাবার আয়োজনও সম্পন্ন করতে পেরেছে।

ভাবল, কে এই লোক? এতই কি বুদ্ধি রাখে যে আমি তাকে ধরতে পারব না! অল্প ক'দিন আগে কায়রোয় এসেছে সে, এরই মধ্যে প্ল্যান তৈরি করে সেটাকে সফল করে তুলল লোকটা। অফিসারদের কাউকে নিশ্চয়ই ঘুষ দিয়েছে সে, অথবা ব্ল্যাকমেইল করেছে।

কে সেই অফিসার? গোপন তথ্য কেন সে যোগান দিচ্ছে আলেককে?

যে-কোন ইনফরমেশন, তা সে যত গোপনই হোক, কয়েকশো লোকের হাতে পড়ে। জেনারেল, এইড, সেক্রেটারি, তারপর যারা মেসেজ টাইপ করে, যারা মেসেজ কোড করে, এমন সব অফিসার যারা মৌখিক মেসেজ বয়ে নিয়ে যায়, ইন্টেলিজেন্স স্টাফ, ইন্টারসার্ভিস লিয়াজোঁ অফিসার—সব মিলিয়ে একশো ছাড়িয়ে যাবে। এদের মধ্যে থেকে কাউকে বেছে নিয়েছে আলেক। বেশিরভাগ সম্ভাবনা মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে তাকে বশ করেছে সে। তবে ব্ল্যাকমেইল করাও বিচিত্র কিছু না। মিশরীয় সেনাবাহিনীতে অপরাধ প্রবণতা অন্য অনেক সেনাবাহিনীর তুলনায় বেশিই। কোন মেজর জেনারেল হয়তো ইহুদি কোন সুন্দরীর প্রেমে পাগল। আলেক হয়তো কোন ভাবে সেটা জানতে পেরেছে।

এমনও হতে পারে, ভাবল রানা, এসবের সাথে আলেকের হয়তো কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু না, তা হতে পারে না। একজন মিশরীয় বেঈমানকে দায়ী করা হলে প্রশ্ন উঠবে, শত্রুদের সাথে যোগাযোগ করার জন্যে কোথায় পাবে সে কমিউনিকেশন চ্যানেল? আর, আলেক বোগানের মত আরও একজন ইসরায়েলি গুপ্তচর কায়রোয় আছে, এ-কথাও বিশ্বাস্য নয়।

ধীরে ধীরে ফিরে এসে রানার সামনে দাঁড়াল ফরহাদ। 'একটা মেসেজ ছিল, স্যার।'

'বলো।'

'ফিল্ড টেলিফোন অপারেটর আপনাকে খুঁজছে।'

'আমার ফোন?'

'জ্বী, স্যার,' বলল ফরহাদ। 'জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে। একটা মেয়ে, স্যার। আপনার সাথে কথা না বলে হেডকোয়ার্টার থেকে বেরুতে চাইছে না। বলছে, অত্যন্ত জরুরী একটা মেসেজ আছে, আপনাকে ছাড়া আর কাউকে দেবে না।'

রানা ভাবল, নাদিয়া!

হয়তো আলেকের সাথে যোগাযোগ করেছে সে। নিশ্চয়ই তাই, তা না হলে তার সাথে কথা বলার জন্যে এমন জেদ ধরবে কেন। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কমান্ড ভেহিকেলের দিকে ছুটল রানা। হতভম্ব ফরহাদ কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকার পর পিছু নিল।

কমিউনিকেশনের চার্জে রয়েছে একজন মেজর, তার হাত থেকে ছোঁ দিয়ে

রিসিভার নিল রানা।

'তাড়াতাড়ি শেষ করুন, মেজর,' বলল মেজর। 'আমরা এটা জরুরী কাজে ব্যবহার করছি।'

কটমট করে তাকাল রানা, চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আমার যতক্ষণ খুশি ততক্ষণ কথা বলব, তোমার যা খুশি করতে পারো!' রিসিভার মুখের সামনে তুলে বলল, 'ইয়েস?'

'মেজর রানা?'

'নাদিয়া?' রানার বলতে ইচ্ছে করল, আবার তোমার গলা শোনার সুযোগ পেয়ে আমার ভাল লাগছে। কিন্তু তা না বলে জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার, নাদিয়া?'

'দোকানে এসেছিল ও।'

'তোমার সাথে দেখা হয়েছে! ঠিকানা জেনে নিয়েছ?'

'না,' বলল নাদিয়া। 'তবে ওর সাথে একটা ডেট হয়েছে আমার।'

'ওয়েল ডান!' হিংস্র একটা উল্লাস ফুটে উঠল রানার চেহারায়। ভাবল, বেজন্মাটাকে এবার ধরা যাবে। 'কবে, কোথায়?'

'কাল রাতে, সাড়ে সাতটায়। বুজম রেস্তোরাঁয়।'

টেবিল থেকে কাগজ আর পেন্সিল তুলে নিয়ে লিখতে শুরু করল রানা। 'বুজম রেস্তোরাঁ, সাড়ে সাতটা। ঠিক আছে ওখানে আমি থাকব।'

'ঠিক আছে।'

'নাদিয়া...'

'বলুন, মেজর।'

'আমি কৃতজ্ঞ, নাদিয়া। ধন্যবাদ।'

'কথায় কথায় এত ধন্যবাদ না দিলেও চলে, মেজর,' বলল নাদিয়া। 'আমি তো শুধু আমার কর্তব্য পালন করেছি।'

এক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর রানা বলল, 'গুড বাই।' রিসিভার রেখে দিল ও।

পিছন থেকে লে. কর্নেল মোসাদ্দেক হাসানের গলা পেল ও। এইমাত্র ভেতরে ঢুকেছে সে। বলল, 'গার্ল ফ্রেন্ডের সাথে প্রেমালাপ করার জন্যে বাড়ির টেলিফোনই ব্যবহার করা উচিত, মেজর।'

'গার্ল ফ্রেন্ড নয়,' বলল রানা। 'আমার সেই ইনফরমার।' কোমর দুলিয়ে নাচের ভঙ্গি করল ও। 'নাচে। আলেক বোগানের সাথে যোগাযোগ করেছে সে। আশা করছি তাকে আমি কাল রাতে গ্রেফতার করতে পারব।'

হাঁ হয়ে গেল লে. কর্নেলের মুখ।

চার

খয়েরী রঙের আধ-কাঁচা কলজে, নরম, ঠিক যেমন পছন্দ করে রোপা। একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে তার খাওয়া দেখছে আলেক। চেখে, চুষে, মজা করে খাওয়া রোপার চিরকেলে অভ্যেস। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত আবিষ্কার করল আলেক, এ-ব্যাপারে তাদের দু'জনের আশ্চর্য মিল রয়েছে। তারপর ভাবল, মিল কি শুধু এই একটাই! যার যার নিজের পেশায় দু'জনেই তারা দক্ষ, প্রফেশন্যাল এবং আশ্চর্য রকম সফল। ফেলে আসা ছেলেবেলা তাদের দু'জনের কাছেই দুঃস্বপ্নের মত লাগে। রোপার বাবার মৃত্যু, অজাত-কুজাতের সাথে তার মায়ের একাধিক বিয়ে। এত দিক থেকে এত মিল, পরস্পরের প্রতি অন্য রকম একটা টান আর সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও, ওদের সম্পর্কটা কখনোই বিয়ের কাছাকাছি আসেনি। এর সহজ সরল একটি মাত্র কারণ হলো, এক পুরুষে সন্তুষ্ট থাকার মেয়ে রোপা নয়। আলেকও তাই, মাত্র একটি মেয়েকে নিয়ে ঘর করার মানসিকতা তারও নেই। প্রেমে পড়ে পরস্পরের কাছে এসেছে ওরা, ব্যাপারটা তা নয়। ওদের সম্পর্কের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসার ব্যাপারস্যাপারও নিতান্ত কম। কাছে এসেছে ওরা স্রেফ লোভ আর লালসার কারণে। দু'জনেই যৌন-তাড়িত, ভোগী।

দু'জনেই জানে, রেস্তোরাঁয় খেতে বসে ছোট হলেও খামোকা একটা ঝুঁকি নিচ্ছে আলেক। কিন্তু সেই সাথে দু'জনেই উপলব্ধি করে, ভাল একটা রেস্তোরাঁয় খেতে বসার যে আনন্দ আর মজা, ঝুঁকিটা সে-তুলনায় কিছুই নয়। ভাল ভাল খাবারদাবারের সুবিধে না পেলে জীবনের মূল্যই বা কি থাকল।

কলজে খাওয়া শেষ হলো রোপার। সাথে সাথে আইসক্রীম ডেজার্ট পরিবেশন করল ওয়েটার। ডুম ড্রামে নাচার পর রোজই এই রকম প্রচণ্ড খিদে অনুভব করে সে। অবাক হবার কিছুই নেই, নাচতে গিয়ে প্রচুর শক্তি খোয়াতে হয় তাকে। কিন্তু, আলেক জানে, নাচ ছেড়ে দিলেই মোটা ধুমসী হতে শুরু করবে রোপা। আরও বিশ বছর পর কি রকম দেখতে হবে রোপা তার একটা ছবি কল্পনা করার চেষ্টা করল আলেক। তিনটে থুতনি থাকবে রোপার, নিতম্ব হয়ে উঠবে বিশাল দুই আলুর বস্তা, চুলের ডগা ফেটে যাবে, হাঁটার সময় তখন মাটির ওপর পায়ের সবটুকু তলা একই সময় পড়বে, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার পর হাঁপাবে ঘন ঘন।

'এত হাসির কি কারণ ঘটল?' জানতে চাইল রোপা।

'বুড়ি রোপা ইরিনার ছবিটা কল্পনা করছিলাম,' সহাস্যে বলল আলেক। 'কালো একটা বোরখা পরে আছ, চলন্ত একটা বস্তা যেন।'

খেপল না রোপা, মুচকি হেসে বলল, 'ভুল করছ। বুড়ো বয়সে কেমন হব আমি, বলছি শোনো। অঢেল টাকা থাকবে আমার। দু'হাতে উড়িয়েও শেষ করা যাবে না, এত টাকা। একটা প্রাসাদে থাকব আমি। আমাকে ঘিরে থাকবে সুন্দরী

যুবতী আর স্বাস্থ্যবান যুবকের দল—আমি ছাড়া আর কারও পরনে কোন কাপড় থাকবে না। আমার যে-কোন নির্দেশ পালন করার জন্যে এক পায়ে খাড়া থাকবে সবাই।' হাসির কথা, কিন্তু রোপা হাসল না, রীতিমত সিরিয়াস দেখাল তাকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আর তুমি?'

'আমার বিশ্বাস, মোশে দায়ানের একান্ত সচিব অথবা জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের চীফ হব আমি। তুমি কি আমাকে তোমার প্রাসাদে ডাকবে?'

'না ডাকলেও এসো,' বলল রোপা। 'তুমি যেদিন আসবে, সবাইকে বিদায় করে দেব আমি। প্রাসাদের ছাদের ওপর সারারাত তোমাকে আমি নাচ দেখাব।'

হাসতে লাগল আলেক। রোপার খোশ-মেজাজ অতি দুর্লভ বস্তু, আজ অনেক দিন পর আবার চাক্ষুষ করা গেল। ওয়েটারকে ডেকে কফি, ব্র্যান্ডি আর বিল দিতে বলল আলেক। তারপর রোপার দিকে ফিরল। 'ভাল একটা খবর আছে।'

'কি?'

'আরেকজন ফিরোজার সন্ধান পেয়েছি আমি।'

হঠাৎ পাথর হয়ে গেল রোপা, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল আলেকের দিকে। 'কে মেয়েটা?'

'কাল মনিহারী দোকানে গিয়েছিলাম,' বলল আলেক। 'পসাইডোন তার ভাগ্নিকে দোকানে রেখেছে…'

'ও, সেল্স্ গার্ল।' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল রোপা, হতাশা আর রাগে কালচে হয়ে উঠল চেহারা।

'রূপ যৌবন একেবারে উপচে পড়ছে, খোদার কসম,' তাড়াতাড়ি বলল আলেক। 'চেহারাটা নিরীহ, শিশুর মত, কিন্তু হাসলে দুষ্টামির একটা ভাব ফুটে ওঠে। বিশ্বাস করো, প্রথম দর্শনেই মজে গেছি আমি।'

চেহারা দেখে মনে হলো একটু যেন আগ্রহ হয়েছে রোপার। 'বয়স কত?'

'বলা কঠিন। আঠারো, কুড়ি,… কুড়ির বেশি নয়। যা একখানা শরীর না, কি বলব তোমাকে!'

জিভের ডগা দিয়ে নিচের ঠোঁট চাটল রোপা। 'তোমার ধারণা আমাদের প্রস্তাবে রাজি হবে ও?'

'রাজি কি আর এমনি এমনি হবে!' রহস্যময় এক টুকরো হাসি দেখা গেল আলেকের মুখে। 'কৌশলে রাজি করাতে হবে আর কি। তবে, লক্ষণ খুবই ভাল, রোপা।'

'কি রকম?'

'সে-ও বোধহয় আমাকে দেখে মজেছে। বলল, পসাইডোনের কাছে কাজ করতে চায় না। হাবভাব দেখে বুঝেছি, এই মেয়েকে নিজেদের খুশি মত ওঠ-বস্ করানো যাবে।'

'কবে?'

'কাল রাতে,' বলল আলেক। 'ওকে আমি ডিনার খাবার জন্যে ডেকেছি।'

'ডিনারের পর? তুমি ওকে হাউজবোটে নিয়ে আসবে?'

'যদি সম্ভব হয়। আগে ওকে আমার প্রেমে মজাতে হবে ভাল করে। এক-আধটু আভাস দিয়ে বুঝতে দিতে হবে আমি কি ধরনের লোক, কি চাই ইত্যাদি। হাবুডুবু খাওয়াতে পারলে আর কোন সমস্যা থাকবে না। এমন একটা সোনার হরিণ, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হারিয়ে ফেলতে চাই না।'

'তোমার এত কথার অর্থ, ওকে তুমি আগে নেবে, এই তো?'

'যদি দরকার হয়।'

'তোমার কি মনে হয়, ও ভার্জিন?'

'আমার তো তাই ধারণা।'

'তা যদি হয়…'

'সেক্ষেত্রে প্রথম সুযোগ তুমিই পাবে,' বলল আলেক। 'মেজর তারেককে খুশি করার জন্যে অনেক খেটেছ তুমি, তাই এটা তোমার পাওনা।'

'কসম।'

'কসম,' বলল আলেক। তাকিয়ে থেকে দেখল, সুন্দরী এবং নিরীহ একটি যুবতী মেয়েকে নিয়ে বদ-ইচ্ছা চরিতার্থ করার কল্পনায় বিভোর হয়ে আছে রোপা। ব্র্যান্ডির গ্লাসে চুমুক দিল আলেক। পেটে আরামদায়ক, উষ্ণ একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে। গোটা অস্তিত্বে একটা ভাল লাগার অনুভূতি। ভাল খাবার আর মদে পেট টইটম্বুর, সাথে সুন্দরী নারী, তার মিশন চমৎকার সাফল্য অর্জন করতে শুরু করেছে। এবং সামনেই রয়েছে রোমাঞ্চকর রাত।

বিল এল। পকেট থেকে মানিব্যাগ নয়, এক পাউন্ডের বান্ডিল বের করল আলেক।

রেস্তোরাঁটা ছোট, কিন্তু দারুণ ব্যবসা করে। দুই ভাই মিলে চালায়। বড় ভাই ইয়াসিন কেনাকাটা করে আর ক্যাশবাক্সে বসে, ছোট ভাই মোহসীন কিচেনে বাবুর্চিদের কাজ তদারক করে। তিউনিশিয়ায় ভাগ্য ফেরাতে গিয়ে এই কাজটা শিখে এসেছে ওরা। বড় ভাই ইয়াসিনের মাথা ভাল, নতুন কিছু করার ব্যাপারে আশ্চর্য খুলে যায় তার বুদ্ধি। দেশে ফিরে তার ধারণা হয়, কায়রোয় এমন একটা রেস্তোরাঁ খুব ভাল চলবে যেখানে দেশী খাবারের সমান দামে বিদেশী খাবার পাওয়া যায়। চীনা, ফ্রেঞ্চ আর ইংলিশ খাবার পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু করে ওরা। এখন ওদের রেস্তোরাঁয় দেশী খাবারও পাওয়া যায়, কিন্তু তার দাম অস্বাভাবিক বেশি। তার এই দেশীয় খাবারের খদ্দের প্রায় সবাই বিদেশী, মুখ বদলের জন্যে মাঝেমধ্যে খায়। এছাড়া, রাশিয়ান, জাপানী আর ইতালিয়ান খাবারও পরিবেশন করে ওরা।

সাধারণ শ্রমিক থেকে আজ এত বড় হয়েছে, কিন্তু অনেকগুলো অভ্যাস আজও তাদের বদলায়নি। যেমন, কোন কাজ করার আগে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করা। এই অভ্যাস, বিশেষ করে বড় ভাই ইয়াসিনের মধ্যে, আগের চেয়ে আরও বরং বেড়েছে। ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না, এই নীতির একনিষ্ঠ অনুসারী সে। সাবধানী, কিছুতেই ঠকতে রাজি নয়।

দু'দিন আগে আমজাদিয়া হোটেলের ম্যানেজারের সাথে আলাপ হলো। কথায় কথায় জানাল সে, কোথাও কিছু নেই, তার ব্যাংক এক পাউন্ডের ছয়শো নোট জমা নিতে অস্বীকার করে বসেছে। কারণ জানতে চাইলে ব্যাংক থেকে বলা হয়েছে, ওগুলো নাকি জাল নোট, ব্যাংক কর্মচারীদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, কে বা কারা যেন এক পাউন্ডের জাল নোট বাজারে ছাড়ছে।

কথাটা শোনার পর থেকে সাবধান হয়ে গেছে ইয়াসিন। ভরপেট খেয়েদেয়ে জাল নোট দিয়ে কেটে পড়বে কেউ, ইয়াসিন রেস্তোরাঁয় উপস্থিত থাকতে সেটি সম্ভব নয়। প্রতিটি এক পাউন্ডের নোট হাতে পড়লেই প্রচুর সময় নিয়ে পরীক্ষা করছে সে। জাল নোট কিভাবে চিনতে হবে, আমজাদিয়ার ম্যানেজারের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে সে।

হাতের জাল নোটগুলো নাড়াচাড়া করার সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপর রাগ হলো ইয়াসিনের। খবরের কাগজ বা রেডিওতে একটা ঘোষণা দিলে ব্যবসায়ীরা ব্যাপারটা জানতে পারত, তাদের ঠকার সম্ভাবনা কিছুটা হলেও কমত বৈকি। তার কথা আলাদা, অত্যন্ত সতর্ক লোক সে। কিন্তু সবাই তো আর একরকম নয়!

এখন কি করা! চুলে আঙুল চালাল ইয়াসিন। একটা দুটো টাকা নয়, তিনশো নব্বই পাউন্ড। টাকা তো নয়, অকেজো কাগজ। মুশকিল হলো, এগুলো সাধারণ একজন খদ্দেরের কাছ থেকে আসেনি। ভদ্রলোক বিদেশী বলেই মনে হয়, সম্ভবত ইউরোপিয়ান। বিশাল শরীর, অভিজাত চেহারা। আরও মুশকিল হলো, ভদ্রলোকের সাথে রয়েছেন কায়রোর সবচেয়ে নামকরা বেলি ড্যান্সার মাদাম রোপা ইরিনা। এই অবস্থায় কি করা উচিত কোনমতেই ভেবে স্থির করতে পারছে না ইয়াসিন।

নোটগুলো নতুন আর কড়কড়ে, কিন্তু প্রত্যেকটিতে জাল নোটের ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। ক্যাশবাক্স থেকে একটা আসল এক পাউন্ডের নোটের সাথে ওগুলো মিলিয়ে দেখেছে সে, সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। খদ্দেরকে ব্যাখ্যা করে ব্যাপারটা বলাই কি উচিত হবে তার? কিন্তু ভদ্রলোক যদি অপমান বোধ করে, কিংবা অপমান বোধ করার ভান করে? যদি বলে, না, এই টাকা আমি দিইনি। যদি টাকা না দিয়ে চলে যেতে চায়? দামী দামী খাবার খেয়েছে, আমদানী করা সবচেয়ে ভাল ব্র্যান্ডি দিয়ে গলা ভিজিয়েছে, এতবড় একটা লোকসান দেবার ঝুঁকি কেন নিতে যাবে ইয়াসিন? উঁহুঁ, বেলি ড্যান্সার যত বিখ্যাতই হোক, তার সম্মান বাঁচাবার জন্যে ঠকতে রাজি নয় সে।

তবে, পুলিসকে ডাকলে কোন ফায়দা হবে বলে মনে হয় না। কায়রোর পুলিস, ঘুষ খাবার পোকা। তাছাড়া, টেলিফোন করলে এখানে পৌঁছতে সময় নেবে কমপক্ষে ঘণ্টা দেড়েক। ততক্ষণে কোন্ অজুহাতে খদ্দেরকে আটকে রাখবে সে? আর যদি ভাগ্যগুণে সাথে সাথে আসেও, প্রথমেই তারা ঘুষ চাইবে। ইয়াসিন ঘুষ দিলে তারা খদ্দেরের কাছ থেকে ঘুষ খাবে না, এরও কোন নিশ্চয়তা নেই। খদ্দের যদি বেশি ঘুষ দেয়, রাস্তায় নিয়ে গিয়ে তাকে ছেড়ে দেবে ওরা। মাঝখান থেকে বিল তো আদায় হবেই না, উল্টে আরও কিছু টাকা বেরিয়ে যাবে ক্যাশ থেকে।

না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ইয়াসিন। পুলিস ডাকা চলবে না। ডাকতে হলে মিলিটারিকে ডাকবে সে। দূর সম্পর্কের এক ভাই আছে আর্মিতে, ক্যাপ্টেন, খবরটা তাকে একবার শুধু পৌঁছে দিতে পারলেই হয়। সে-ই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেবে। আর খবর পেলে সাথে সাথে চলে আসবে মিলিটারি।

মুখে সগর্ব হাসি নিয়ে ওদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল ইয়াসিন, হাতে আস্ত একটা শ্যাম্পেনের বোতল। বেলি ড্যান্সার রোপা ইরিনা মুখ তুলে তাকাল। ইয়াসিন বিনয়ে বিগলিত ভঙ্গি করে বলল, 'আপনার মত একজন শিল্পী এই গরীবের রেস্তোরাঁয় পায়ের ধুলো দিয়েছেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ, ম্যাডাম। আশা করি আমাদের খাবার আপনি উপভোগ করেছেন?'

মিষ্টি একটু হেসে মাথা ঝাঁকাল রোপা।

'এটা আমার তরফ থেকে, আপনার সম্মানে,' বলে শ্যাম্পেনের বোতলটা টেবিলে নামিয়ে রাখল ইয়াসিন। 'দুনিয়ার সেরা বেলি ড্যান্স শিল্পী দীর্ঘজীবী হোন।'

আলেকের চোখেমুখে প্রশংসার ভাব ফুটে উঠল। বোতল খুলে নিজের হাতে ওদের গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালল ইয়াসিন। তারপর বাউ করে পিছু হটল এক পা, ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে চলল কাউন্টারের দিকে। ভাবল, বোতলটা খালি করতে বেশ একটু সময় নেবে ওরা। আশা করা যায় ততক্ষণে পৌঁছে যাবে মিলিটারি পুলিস।

ক্যাশবাক্সে এসে বসল ইয়াসিন, তারপর এমন একটা ভাব করল, যেন জরুরী কি একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেছে। ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়াল সে, হন হন করে এগিয়ে গিয়ে দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল অফিস কামরায়।

এই অফিস কামরাতেও একটা ফোন আছে।

ইয়াসিন শ্যাম্পেনের বোতল উপহার দিল দেখে আলেক ভাবল, লোকটার ব্যবসা বুদ্ধি দারুণ। আমার যদি রেস্তোরাঁ থাকত, আমিও ঠিক তাই করতাম। ওদের যা বিল হয়েছে, তার তুলনায় এক বোতল শ্যাম্পেন তেমন কিছু না, হয়তো লাভ একটু কম করল মালিক, কিন্তু বিনিময়ে শহরের সেরা একজন নাগরিককে বুঝিয়ে দিল এই রেস্তোরাঁয় তার আলাদা একটা সম্মান আছে। রেস্তোরাঁ খোলার ব্যাপারে এককালে বেশ একটু ঝোঁক ছিল আলেকের, কিন্তু রেস্তোরাঁ চালানো গাধার খাটনি বলে ও-পথে আর পা বাড়ায়নি।

রেস্তোরাঁ মালিকের আচরণ রোপাকেও মুগ্ধ করেছে। বলল, 'আজকাল মুসলমানরাও ব্যবসার কলা-কৌশল কিছু কিছু শিখছে, কি বলো?'

মাথা ঝাঁকাল আলেক, বলল, 'মনটা কিন্তু ওদের চিরকালই বড়।'

'হ্যাঁ, তা স্বীকার করতে হবে।'

রান্নাটা ভাল, তাই খেতে খেতে বেশি খেয়ে ফেলেছে রোপা। তারপর শ্যাম্পেন খেয়ে সারা শরীরে একটা অদ্ভুত সুখ-সুখ আমেজ এসে গেছে। ভাবল, আজ যা ঘুমাব না!

কাউন্টার থেকে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল ইয়াসিন, তাকে ফিরে আসতে দেখল আলেক। একজন ওয়েটারের সাথে নিচু গলায় কথা বলছে। গোপন কথা?

কোন কারণ নেই, তবু প্রশ্নটা জাগল আলেকের মনে।

ওদের দিকে একবার তাকাল ওয়েটার। ও, ভাবল আলেক, আমাদের বিষয়েই কথা বলছে রেস্তোরাঁ-মালিক। নিশ্চয়ই বলছে, দেখো, কে এসেছেন আমাদের এখানে—উনি মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে দামী বেলি ড্যান্সার মিস রোপা ইরিনা।

একটু পর আবার তাকাল আলেক, এবার চোরা চোখে। একটু অস্বস্তিই বোধ করছে সে। শহর থেকে অনেকটা দূরের এই রেস্তোরাঁয় তার আসার কারণ ছিল, কেউ ওদেরকে চিনতে পারবে না। পুলিস আর ইন্টেলিজেন্সের লোকজন ওকে খুঁজছে, কাজেই সাবধানে থাকা দরকার। কিন্তু এখানেও সেই একই সমস্যা, রোপাকে চিনে ফেলেছে। আর রোপাকে চিনতে পারলে লোকজন তার সঙ্গীটিকেও বিশেষ ভাবে লক্ষ করে। নিরাপত্তার জন্যে সেটা খারাপ। দেখল, আবার কাউন্টারে গিয়ে বসেছে মালিক। কিন্তু কেমন যেন অস্থির দেখাচ্ছে লোকটাকে।

হাত তুলে মুখ ঢাকল রোপা, ছোট্ট একটা হাই তুলল। ওকে এবার বিছানায় তুলে দেয়া দরকার, ভাবল আলেক। হাতছানি দিয়ে একজন ওয়েটারকে ডাকল সে। অলস ভঙ্গিতে হেঁটে এল ওয়েটার। 'মাদামের শালটা নিয়ে এসো, প্লীজ।'

নির্দেশ পেয়ে ক্লোকরুমের দিকে এগোল ওয়েটার। কিন্তু মাঝপথে একটু থামল কাউন্টারের সামনে, ঝুঁকে পড়ে কি যেন বলল ইয়াসিনকে। আড়চোখে ব্যাপারটা লক্ষ করল আলেক।

আলেকের মাথার ভেতর কিন্তু অনেক দূরে, অস্পষ্ট ভাবে, বেজে উঠল একটা অ্যালার্ম বেল।

রোপার শালের জন্যে অপেক্ষা করছে ও, হাতে একটা চামচ নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। গ্লাস থেকে আরও এক চুমুক শ্যাম্পেন খেলো রোপা। আলেক লক্ষ করল, কাউন্টার থেকে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে মালিক, ধীর পায়ে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের দরজা পর্যন্ত হেঁটে গেল সে। উঁকি দিয়ে কি যেন দেখল বাইরে, তারপর আবার ফিরে আসতে শুরু করল কাউন্টারের দিকে। কাউন্টারের কাছে পৌঁছে কি মনে করে ঘুরল সে, এগিয়ে এল ওদের দিকে। কাছে এসে জানতে চাইল, 'মাদাম, যাবার সময় হলে আমাকে বলবেন, ট্যাক্সি আনিয়ে দেব।'

রোপার দিকে ফিরল আলেক।

'ঠিক আছে, ট্যাক্সি করেই ফিরব আমরা,' বলল রোপা।

ইয়াসিনের দিকে তাকাল আলেক। 'না, তার দরকার হবে না,' বলল সে। পেটে একবার হাত বুলাল। 'খোলা বাতাসে একটু হাঁটাহাঁটি করলে এটা একটু হালকা লাগবে। চলো, রোপা। খানিক হেঁটে তারপর না হয় ট্যাক্সি নেয়া যাবে।'

'ঠিক আছে।'

মুখ তুলে ইয়াসিনের চোখে চোখ রাখল আলেক, মৃদু হাসল, 'ট্যাক্সির দরকার নেই।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে!'

রোপার শাল নিয়ে ফিরে এল ওয়েটার। দরজার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে

ইয়াসিন। আরও একবার অ্যালার্ম বেল শুনতে পেল আলেক, এবার বেশ জোরে। ইয়াসিনকে জিজ্ঞেস করল, 'কোথাও কোন অসুবিধা দেখা দিয়েছে নাকি?'

ভারি উদ্বিগ্ন দেখাল ইয়াসিনকে। 'হ্যাঁ, স্যার! খুব জটিল একটা ব্যাপার···এই রকম নাজুক পরিস্থিতিতে ঠিক কি করা উচিত···'

বিপদের গন্ধ পেল আলেক। 'কি ব্যাপার? আমরা বাড়ি যেতে চাই···'

রেস্তোরাঁর বাইরে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে গাড়ি থামল। আওয়াজটা শুনে চমকে উঠল আলেক। হাত বাড়িয়ে ইয়াসিনের শার্টের কিনারা ধরে ফেলল সে। 'কি ঘটছে এখানে?'

'এক পাউন্ডের নোট, স্যার!' হড়বড় করে শুরু করল ইয়াসিন, 'যেগুলো আপনি দিয়েছেন, সব জাল!'

মুহূর্তের জন্যে পাথর হয়ে গেল আলেক। পরমুহূর্তে ঝট করে উঠে দাঁড়াল সে। 'কি বললে!'

'ওগুলো সব জাল টাকা, স্যার! আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি···'

দড়াম করে খুলে গেল রেস্তোরাঁর দরজা, বুট জুতোর ভারী আওয়াজ তুলে ভিতরে ঢুকল তিনজন ভয়াল দর্শন মিলিটারি পুলিস।

হাঁ করে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকল আলেক। এত দ্রুত ঘটে যাচ্ছে সবকিছু, দম নিয়ে কূল পাচ্ছে না সে। মিলিটারি পুলিস! জাল টাকা! হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল আলেক। তাকে হয়তো জেলে যেতে হবে। তেলআবিবের কুত্তাগুলো তাকে নকল টাকা দিয়ে পাঠিয়েছে! কোনমতে বেঁচে গিয়ে আবার যদি তেলআবিবে পৌঁছতে পারে ও, বেজন্মা বসের টুঁটি ধরে ছিঁড়ে আনবে···

মাথা ঝাঁকিয়ে ঠাণ্ডা হবার চেষ্টা করল আলেক। রাগে অন্ধ হবার সময় নয় এটা। শান্ত থাকতে হবে তাকে, কৌশলে চেষ্টা করে দেখতে হবে কোনভাবে বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া যায় কিনা। মরতে হলে তাতেও রাজি আছে সে, কিন্তু জেলে যেতে পারবে না।

সরাসরি এগিয়ে এসে ওদের টেবিলের সামনে দাঁড়াল মিলিটারি পুলিসের ছোট দলটা। তিনজনেরই কালো মোষ চেহারা, পায়ে ভারী বুট, মাথায় স্টীল হেলমেট, কোমরে বাঁধা হোলস্টারে রিভলভার। মাঝখানে দাঁড়ানো লোকটা সবার চেয়ে লম্বা, সে-ই লীডার। রোপার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে আলেকের দিকে তাকাল সে। তার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে লক্ষ করল। তারপর ইয়াসিনের দিকে ফিরে কঠোর স্বরে জানতে চাইল, 'এই সেই লোক?'

'এক সেকেন্ড, প্লীজ,' বলল আলেক। নিজের শান্ত ভাব লক্ষ করে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল সে। গলার আওয়াজ কাঁপল না দেখে আত্মবিশ্বাস আরও একটু বাড়ল তার। 'মালিক ভদ্রলোক এইমাত্র আমাকে জানালেন, আমি যে টাকা দিয়েছি সেগুলো নাকি জাল। কথাটা আমি বিশ্বাস করি না। টাকাগুলো যে আমিই দিয়েছি, তার কোন প্রমাণ নেই।' ইয়াসিন এদিক ওদিক তাকাচ্ছে দেখে বুঝল, যে-ওয়েটার তার বিল নিয়ে গেছে তাকে খুঁজছে লোকটা। 'ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করলে কোন লাভ হবে না, তার কথাও বিশ্বাস করতে আমি রাজি নই। টাকাগুলো হয়তো অন্য

কেউ দিয়েছে, আমি দিয়েছি বলে ভুল করছেন উনি। তবু, ব্যাপারটা নিয়ে আমি বাড়াবাড়ি করতে চাই না।'

'কি চান আপনি?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল লীডার।

'আমাকে দেখে মনে হয়, জাল টাকা তৈরি করি আমি?' জানতে চাইল আলেক। 'এমনও হতে পারে, কেউ আমাকে বোকা বানিয়েছে। আমি একজন ধনী মানুষ, বড় নোটগুলো চাকর-বাকরদেরই ভাঙাতে দিই। নিশ্চয়ই তারা কোথাও থেকে…'

'এত কথা শুনতে চাই না…'

লীডারকে থামিয়ে দিয়ে আলেক বলল, 'আগেই বলেছি, ব্যাপারটা নিয়ে আমি বাড়াবাড়ি করতে চাই না। মালিক ভদ্রলোকের সাথে আমি একটা আপস করতে রাজি আছি। তিনি যদি ক্ষমা চান, আমি তাঁকে চেক লিখে বিল মিটিয়ে দিতে পারি।' দৃষ্টিতে তিরস্কার নিয়ে ইয়াসিনের দিকে তাকাল সে। 'পুলিস না ডাকলেও ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে ফেলা যেত।'

মিলিটারি পুলিসের লীডার বলল, 'জাল নোট চালাবার চেষ্টা করা একটা অপরাধ, আপনি জানেন না?'

'সজ্ঞানে,' বলল আলেক। 'কেউ যদি সজ্ঞানে জাল নোট চালাবার চেষ্টা করে, সেটা অপরাধ।' তার আত্মবিশ্বাস এখন তুঙ্গে। 'এখন পরিস্থিতিটা আপনারা দু'পক্ষই বিবেচনা করে দেখুন। এই জাল টাকা আমি দিয়েছি, তার কোন প্রমাণ নেই। আপনারা যদি বাড়াবাড়ি করেন, স্বভাবতই পাল্টা কেস করব আমি। কোর্টকে বলব, এটা আমার বিরুদ্ধে একটা মিথ্যে ষড়যন্ত্র। তারপর বিবেচনা করুন, আমি একটা আপস রফার প্রস্তাব দিয়েছি। তাতে আমার সম্মান বাঁচবে, মালিক ভদ্রলোককে লোকসান দিতে হবে না, এবং আপনারা অহেতুক ঝামেলা থেকে রেহাই পাবেন। এখন চিন্তা করে বলুন, কোন্টা ভাল।'

ইয়াসিন বলল, 'আপস রফায় আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু চেক আমি নেব না। আমাকে ক্যাশ টাকা দিতে হবে—পাঁচ আর দশ টাকার নোটে।'

অত টাকা আলেকের পকেটে নেই। ইচ্ছে হলো, লোকটার নাকে দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দেয়।

'দেখি, আমার কাছে থাকতে পারে,' বলল রোপা।

আলেক ভাবল, ঈসা, মুসা, এবং দুনিয়ার তাবৎ পয়গম্বর, তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ!

নিজের হাতব্যাগ খুলল রোপা।

মিলিটারি পুলিসের লীডার বলল, 'তবু, আপনাকে আমাদের সাথে হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে।'

বুকের ভেতর আবার ধড়াস করে উঠল আলেকের। 'কেন?'

'আপনাকে আমরা কিছু প্রশ্ন করব।'

'বেশ তো!' মুখে জোর করা হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল আলেক। 'কাল সকালে টেলিফোনে আমাকে ডেকে পাঠাবেন। আমার ঠিকানা…'

'আপনাকে আমাদের সাথে এখুনি যেতে হবে,' ঠাণ্ডা সুরে বলল লীডার। নির্লিপ্ত চেহারা তার, কোন ভাব নেই। 'আপনাকে সাথে করে নিয়ে যাবার নির্দেশ আছে আমার ওপর।'

'কার নির্দেশ?'

'ইন্টেলিজেন্সের মেজর মাসুদ রানার।'

পরাজয় মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল আলেক। 'বেশ, তাহলে চলুন,' বলে উঠে দাঁড়াল সে। ভরাডুবি আর জেল এড়াবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে মনে মনে, সারা শরীরে আসুরিক শক্তি অনুভব করছে। 'কিন্তু হয় আপনাকে নয়তো মেজর রানাকে এর জন্যে পস্তাতে হবে।' পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে। টেবিলটা শূন্যে তুলে ছুঁড়ে দিল সে।

কিছু বুঝতে না দিয়ে হঠাৎ হামলা চালাবার এই প্ল্যানটা তৈরি করতে দু'সেকেন্ড লেগেছে আলেকের। টেবিলটা ছোট, কিন্তু অত্যন্ত শক্ত কাঠ, খুব ভারীও। মিলিটারি পুলিসের লীডার ঝট্ করে মাথা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলেও, টেবিলের কিনারা তার নাকের ওপর গিয়ে বাড়ি খেলো। ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেল সে, টেবিলটা পড়ল তার পায়ের ওপর।

টেবিল আর লীডার রয়েছে আলেকের বাঁদিকে। ডান দিকে ইয়াসিন। আলেকের উল্টোদিকে রোপা, বসে আছে এখনও। বাকি দু'জন মিলিটারি পুলিস রোপার দু'পাশে, একটু পিছনে দাঁড়িয়ে।

লোহার মত শক্ত দুই হাত দিয়ে রোগা-পাতলা ইয়াসিনকে ধরল আলেক, চোখের পলকে তুলে ফেলল শূন্যে। বল থ্রো করার ভঙ্গিতে ছুঁড়ে দিল একজন মিলিটারি পুলিসের দিকে। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে অপর পুলিসের বুকের ওপর নিজের কপাল ঠুকে দিল। শুরু থেকে দু'সেকেন্ড হয়েছে মাত্র, একাই চারজনকে ধরাশায়ী করে ফেলেছে সে।

পালাবার এটাই শেষ আর মোক্ষম সুযোগ। কিন্তু আলেকের কপাল মন্দ। মিলিটারি পুলিস দু'জন আলেকের মত প্রকাণ্ড দেহী না হলেও, আকারে-প্রকারে খুব একটা কমও যায় না। দীর্ঘ দিন মরুভূমিতে ডিউটি করে নিজেদের পেশী ইস্পাতের মত শক্ত করে নিয়েছে ওরা। বুকে কপালের গুঁতো খেয়ে ধরাশায়ী হলেও, পরমুহূর্তে স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। তার অপর সঙ্গীও ইয়াসিনকে গায়ের ওপর থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে খাড়া হয়ে গেল চোখের পলকে।

রেস্তোরাঁর ভেতরে আর যারা রয়েছে, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সবাই। চোখে অবিশ্বাস আর আতঙ্ক নিয়ে ঘটনাটা নিঃশব্দে ঘটে যেতে দেখছে।

ওরা গুলি করবে না, ধরেই নিল আলেক। এত ভিড়ের মধ্যে গুলি করলে নিরীহ লোকজন মারা যেতে পারে। প্রথম এম-পি উঠে দাঁড়াতেই তার হাঁটু লক্ষ্য করে পা চালাল সে, সেই সাথে নাকের ওপর বসিয়ে দিল প্রচণ্ড এক ঘুসি। হাড় ভাঙার আর মাংস থেঁতলানোর স্পষ্ট আওয়াজ পেল সবাই। সেই একই সময় অপর এম-পি ঝেড়ে একটা লাথি কষল আলেকের পায়ে।

এর জন্যে তৈরি ছিল না আলেক, দড়াম করে মেঝেতে পড়ে গেল সে। শক্ত

মেঝেতে ঠুকে গেল বুক আর চোয়াল। বেকায়দায় পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছে সে, সাথে সাথে উঠতে পারল না। প্রতিশোধ নেবার এই সুযোগ মিলিটারি পুলিস দু'জন হাতছাড়া করল না।

দু'জন দু'দিক থেকে অন্ধ আক্রোশে আলেকের ওপর এলোপাতাড়ি লাথি চালাতে শুরু করল। দেখতে দেখতে রক্তাক্ত হয়ে উঠল আলেকের চেহারা। প্রতিটি আঘাতের সাথে শিউরে শিউরে উঠছে তার শরীর, তীক্ষ্ণ ব্যথায় মোচড় খাচ্ছে।

ভাঙা নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে একজন মিলিটারি পুলিসের, সবার আগে সে-ই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আলেকের ঘাড়ের ওপর উঠে দাঁড়াল সে। অপর পুলিস আরও কিছুক্ষণ চালিয়ে গেল, তারপর সে-ও একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে আলেকের পায়ের ওপর দাঁড়াল।

এলোপাতাড়ি লাথি খেয়ে রক্তাক্ত হলেও, এসব গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে চাইল না আলেক।

ঝিম ঝিম করছিল মাথাটা, তাই এতক্ষণ নড়াচড়া করেনি সে। ঝিম ঝিম ভাবটা দূর হয়ে যেতে মাথা তুলল। দেখল, আগের মতই বসে আছে রোপা চেয়ারে, চোখ দুটো ঘৃণায় ধিকি ধিকি জ্বলছে। আলেক বুঝল, মিশরীয় সৈনিকরা বাপকে ধরে মারপিট করছে, এই দৃশ্যটা কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে রোপা। মেঝেতে কনুই রেখে হঠাৎ পিঠ উঁচু করল আলেক, তাল হারিয়ে তার ঘাড় থেকে পড়ে যাবার উপক্রম করল একজন পুলিস। ঠিক এই সময় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রোপা।

আলেককে নড়তে দেখে তার পায়ের ওপর থেকে অপর লোকটাও নেমে পড়ল। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে আলেককে উঠে দাঁড়াতে দেখল সে। আলেকের চেহারা শুধু বীভৎস হয়ে ওঠেনি, চোখে তার খুনের নেশা। তাই দেখে নাক ভাঙা পুলিসের হাত চলে গেল হোলস্টারে। এত মার খাবার পরও আলেকের এই মূর্তি দেখে অপর লোকটা স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

চেয়ার ছেড়েই সেটা দু'হাতে ধরে মাথার ওপর তুলে ফেলল রোপা। কাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেবে, ঠিক করতে পারছে না।

'সরে যাও!' রোপাকে সাবধান করেই নাক ভাঙা পুলিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আলেক। এক হাত দিয়ে তার একটা কব্জি চেপে ধরল সে, সদ্য বের করা রিভলভারটা খসে গেল আঙুল থেকে। অপর হাতের কিনারা দিয়ে লোকটার গলায় ধাঁই করে একটা কোপ বসাল। কণ্ঠনালী মারাত্মকভাবে থেঁতলে যাওয়ায় দম আটকে এল লোকটার, সাথে সাথে নিস্তেজ হয়ে গেল সে। তাকে ছেড়ে দিতেই ঢলে পড়ে গেল। অপর লোকটার দিকে ফিরল আলেক।

ইতোমধ্যে দ্বিতীয় পুলিস তৈরি হয়ে গেছে। আলেক ঘুরে দাঁড়ানো সম্পূর্ণ করতে পারেনি, তাকে লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে লোকটা। তলপেটে লাথি আর চোয়ালে ঘুসি, দুটো একসাথে খেলো আলেক। শরীরটা ঝাঁকি খাওয়া ছাড়া আর কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। খুব একটা ব্যস্ততা না দেখিয়ে প্রায় অলস ভঙ্গিতে লোকটার গলায় হাত দিল আলেক। তার ধীর, নিশ্চিত ভাব দেখে লোকটার

দু'চোখে নগ্ন আতঙ্ক ফুটে উঠল। নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি খেলে গেল আলেকের ঠোঁটের কোণে। মৃত্যু ভয়ে মরিয়া হয়ে উঠল মিলিটারি পুলিস, দু'হাত দিয়ে আলেকের পাঁজরে আর মুখে একের পর এক ঘুসি মেরে চলেছে সে। ঘুসি থেকে বাঁচার জন্যে বার বার শুধু এদিক ওদিক মাথা সরিয়ে নিচ্ছে আলেক, কিন্তু নিজের জায়গায় স্থির পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। লোকটার গলা ছাড়ারও কোন লক্ষণ তার মধ্যে দেখা গেল না।

দম বন্ধ হয়ে আসছে লোকটার। বুঝতে পারছে, আর বেশিক্ষণ বাধা দিতে পারবে না সে। পাগলা কুকুরের মত হয়ে উঠল লোকটা। মুখ হাঁ করে আলেকের নাক কামড়ে ধরার চেষ্টা করল। মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকাল আলেক।

মাথার ওপর চেয়ার নিয়ে মিলিটারি পুলিসের পিছনে চলে এসেছে রোপা। তার পিছনে রয়েছে লীডার, এতক্ষণে জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে সে। মিলিটারি পুলিসের মাথায় চেয়ার নামাল রোপা, তার মাথার সাথে বাড়ি খেয়ে চেয়ারের একটা পা ভেঙে গেল।

মাথায় রক্ত চড়ে যাওয়ায় লোকটাকে খুনই করে ফেলত আলেক, কিন্তু তার মাথার ওপর রোপা চেয়ার ভাঙাতে হুঁশ ফিরে পেল সে। 'রোপা, পালাও!' বলেই দরজার দিকে ছুটল। পালাবার এটাই তার শেষ সুযোগ।

ঘুরে দাঁড়াতে যাবে রোপা, পিছন থেকে দু'হাতে জাপটে ধরল লীডার। তারপর তার খেয়াল হলো, আলেক পালাচ্ছে। রোপাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ছুটতে যাবে, দেখল, দরজার কাছে পৌঁছে শার্টের তলা থেকে ছুরি বের করেছে আলেক। মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল লীডার। তারপর হোলস্টারে হাত দিল।

দরজার দিকে ফিরল আলেক। তার একটা চোখ বুজে আসছে, কিছুই ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না। দরজাটা বন্ধ। হাতল ধরার জন্যে হাত বাড়াল, কিন্তু পেল না। ইচ্ছে হলো চিৎকার করে কাউকে অভিশাপ দেয়। তারপর হাতে হাতল ঠেকতেই মোচড় আর টান দিয়ে খুলে ফেলল কবাট।

রেস্তোরাঁর ভেতর বোমা বিস্ফোরণের মত আওয়াজ করে রিভলভারের গুলি ছুটল। দরজার পাশে দেয়ালের প্লাস্টার গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। রেস্তোরাঁ থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল আলেক। ভাবল, আর ধরতে হচ্ছে না!

পাঁচ

যে-কোন মুহূর্তে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না রানা। মোটরসাইকেলের হেডলাইট থেকে ব্ল্যাকআউট মাস্ক খুলে নিয়েছে ও, হর্নের বোতামটা একটা আঙুল দিয়ে চেপে রেখেছে। অফিস আওয়ার শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই, তবু রাস্তায় যানবাহনের ব্যস্ততা মোটেও কমেনি। ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার, আর্মি ট্রাক, ঘোড়া আর গাধায় টানা গাড়ি বিপরীতমুখী দুটো

স্রোতের মত পাশাপাশি বয়ে চলেছে। ফুটপাথগুলো লোকে লোকারণ্য, উজ্জ্বল দোকানগুলোর ভেতরে কেনাকাটার ধুম লেগে আছে। এরই মধ্যে তিন তিন বার আইল্যান্ডে দাঁড়ানো ট্রাফিক পুলিসের নির্দেশ অমান্য করেছে ও। ওর মোটরসাইকেল ঘাড়ে এসে চড়তে যাচ্ছে দেখে একজোড়া ঘোড়া লাফ দিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করায় কোচোয়ানকে নিয়ে গাড়িটাই উল্টে পড়ল। আঁতকে উঠল চারদিকের লোকজন। একই সাথে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল অনেকগুলো গাড়ি। মোটরসাইকেলের স্পীড কমাল না রানা, একবার শুধু পিছন ফিরে তাকাল। কোচোয়ান রাস্তা থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে দেখে স্বস্তি বোধ করল ও। একটু পরই ফাঁকা রাস্তা পাবে, তার আগে স্পীড আর না বাড়ানোই ভাল। হর্নটা সাইরেনের কাজ করছে, তা না হলে ভিড়ের মধ্যে ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পীডে মোটরসাইকেল চালালে এতক্ষণে হয় নিজে লাশ হয়ে যেত, নয়তো দু'চারটে লোককে খুন করে ফেলত ও।

অফিসে আজ সন্ধের পরও কাজ করেছে রানা। ডিনার খাবার জন্যে ফ্ল্যাটে ফেরার আগে ফরহাদকে বলে এসেছিল, 'ফাইল-পত্র সব সিরিয়াল নম্বর ধরে সাজিয়ে রেখো।' ফ্ল্যাটে ফিরে ডিনার শেষ করেছে, এই সময় ফোন এল ফরহাদের। 'স্যার, জাল নোট চালাতে গিয়ে একজন ইউরোপিয়ান ধরা পড়েছে…'

'কোথায়?'

'একটা রেস্তোরাঁয়, স্যার।' ঠিকানাটা দিল ফরহাদ, তারপর বলল, 'মিলিটারি পুলিস রওনা হয়ে গেছে…'

'আমিও…' বলে আর একটা সেকেন্ড দেরি করেনি রানা, মোটরসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে।

একটা বাঁক নিতে গিয়ে স্কিড করল চাকা, ধুলো জমে থাকা রাস্তায় পায়ের গোড়ালি ঠেকিয়ে তাল সামলাবার চেষ্টা করল রানা। ভাবল, ধরা পড়া লোকটা আলেক বোগান নাও হতে পারে। জাল টাকা বাজারে প্রচুর ছাড়া হয়েছে, তারই কিছু কোন ইউরোপিয়ানের হাতে পড়ে থাকবে। কিন্তু প্রার্থনা করল, তা যেন না হয়। আলেক বোগানকে চাই তার। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ওর সামনে পড়ে থাকবে, জেরা করবে ও। জানতে চেষ্টা করবে, লোকটা সত্যি অসাধারণ বুদ্ধি রাখে, নাকি স্রেফ ভাগ্য তাকে সহায়তা করছে। বুঝতে চেষ্টা করবে, লোকটা কি আসলেই সাহসী, জেনেশুনে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, নাকি বিপদের গুরুত্ব বোঝে না বলে ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করে না। লোকটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নাকি গোঁয়ার প্রকৃতির। সে কি দেখতে সুন্দর, তাকে কি সুপুরুষ বলা চলে? হাসিতে কি তার আন্তরিকতার ছোঁয়া থাকে? নাকি চোখে থাকে ভেজা ভেজা, ঢুলু ঢুলু দৃষ্টি। লোকটা ধস্তাধস্তি করবে, নাকি শান্ত ভাবে আসবে তার সাথে। এসব জানতে চায় রানা। সব জানা শেষ হলে লোকটার যাতে চিরস্থায়ী কারাবাস হয়, তার ব্যবস্থা করবে ও।

একটা গর্ত এড়াবার জন্যে মোটরসাইকেলের হ্যান্ডেল ঘোরাল ও, একদিকে কাত হয়ে গেল গাড়ি। ফরহাদ যে ঠিকানা দিয়েছে, শহর থেকে বেশ একটু দূরে

জায়গাটা। প্রায় পৌঁছে গেছে ও। এদিকের রাস্তা এরই মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেছে। এলাকাটা পরিচিত কিন্তু রেস্তোরাঁটা চেনা নেই। আরও দুটো মোড় নিল মোটরসাইকেল, নির্দিষ্ট রাস্তায় ঢুকল রানা।

রাস্তাটা সরু, আর অন্ধকার। দু'পাশে গায়ে গা ঠেকিয়ে আছে মাথা-উঁচু বাড়ি। বেশির ভাগ বাড়ির সামনে দোকান-ঘর, কিন্তু এখন সেগুলো বন্ধ। একটা লাইটপোস্টের নিচে দুটো বাচ্চা ছেলে মার্বেল খেলছে, তাদের পাশে গাড়ি থামাল রানা। জিজ্ঞেস করতে হাত তুলে রেস্তোরাঁটা কোনদিকে দেখিয়ে দিল একজন। মোটরসাইকেল নিয়ে সেদিকে এগোল ও। শ'খানেক গজ এগিয়েছে, গুলির আওয়াজ হলো। শুনেই বুঝল, রিভলভারের গুলি। পরমুহূর্তে ওর সামনের একটা দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল একজন লোক। বেরিয়েই ঝেড়ে দৌড় দিল সে। তার পিঠে হেডলাইটের আলো পড়ল।

নিশ্চয়ই আলেক বোগান! ভাবল রানা। মোটরসাইকেলের স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে লোকটাকে ধাওয়া করল ও। রেস্তোরাঁর পাশ ঘেঁষে আসার সময় দেখল, ভেতর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল একজন মিলিটারি পুলিস, পলায়নরত লোকটার পিঠ লক্ষ্য করে পর পর কয়েকটা গুলি করল সে। কিন্তু লোকটা যেমন ছুটছিল তেমনি ছুটতে থাকল, থামল না।

মোটরসাইকেল তাকে ধাওয়া করছে বুঝতে পেরে ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল আলেক। হেডলাইটের পিছনে অন্ধকার, রানাকে দেখতে পেল না সে। ভাবল, এ আবার কি বিপদে পড়া গেল! নিশ্চয়ই পাড়ার কোন রংবাজ ছোকরা, বীরত্ব দেখাবার এমন একটা সুযোগ পেয়ে হাতছাড়া করতে চাইছে না।

আরও জোরে ছুটতে শুরু করল আলেক। ভয় পায়নি সে। মোটরসাইকেল আরোহীর কাছে নিশ্চয়ই কোন অস্ত্র নেই। একান্তই যদি ব্যাটাকে এড়ানো সম্ভব না হয়, রুখে দাঁড়াবে আলেক, ছুরি চালিয়ে দু'ফাঁক করে দেবে পেট।

জেনারেল হোডকোয়ার্টারের স্টাফরা কেউ সাথে রিভলভার রাখতে পারে না, আর রিভলভার থাকলেও লোকটাকে গুলি করত না রানা। লোকটা আলেক বোগান না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে গুলি করাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যেত। আর লোকটা যদি আলেক হয়, ওকে গুলি করে মেরে ফেলতে রাজি নয় রানা। তাকে জ্যান্ত ধরতে চায় ও।

আলেকের একেবারে পিঠের কাছে পৌঁছে গেল মোটরসাইকেল, এই সময় হঠাৎ করেই ডান দিকে বাঁক নেবার ভান করে বাঁ দিকে ঘুরে গেল আলেক। দ্রুত ব্রেক করল রানা, পিছনের চাকা পিছলে গেল রাস্তার গায়ে। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মোটরসাইকেল। একটু পিছিয়ে এসে বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে আবার ধাওয়া করল রানা।

সরু একটা গলির মুখে দেখা গেল আলেককে, পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। স্পীড না কমিয়ে বাঁক ঘুরল রানা, ঢুকে পড়ল অন্ধকারে। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। চাকার নিচে রাস্তা নেই, শূন্যে লাফ দিল মোটরসাইকেল। মনে হলো, গভীর পাতালে নেমে যাচ্ছে ও। নিজের অজান্তেই গলা দিয়ে একটা দুর্বোধ্য আওয়াজ

বেরিয়ে এল। পিছনের চাকা কিসের সাথে যেন বাড়ি খেলো। সামনের চাকা নিচের দিকে নামছে তো নামছেই, তারপর সেটাও কিসের সাথে যেন ধাক্কা খেলো। এতক্ষণে নিচের দিকে মুখ করল হেডলাইটের আলো। এক প্রস্থ সিঁড়ি দেখতে পেল ও। সিঁড়ির ধাপের ওপর বার বার ড্রপ খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে গাড়ি। সামনের চাকা সোজা রাখতে রীতিমত হিমশিম খেয়ে গেল রানা। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা হলো, এই বুঝি সীট থেকে ছিটকে পড়ল সে। দেখল, সিঁড়ি থেকে নেমে গিয়ে আবার ছুটতে শুরু করছে লোকটা।

মোটরসাইকেলে বসা অবস্থায় সিঁড়ি থেকে নেমে আসতে পারায় নিজেকে ভাগ্যবান মনে হলো রানার। আরেকটা বাঁক নিতে দেখল লোকটাকে। পাদানির ওপর পায়ের ভর দিয়ে সীট থেকে উঠে একটু উঁচু হলো ও, স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে পিছু নিল আবার। বুঝল, পরিস্থিতি কঠিন হয়ে উঠছে। গলি, আর তস্য গলির একটা গোলক ধাঁধার ভেতর ঢুকে পড়েছে ওরা। চারবারের বার বাঁক নিয়ে সামনে তাকাতেই আঁতকে উঠল ও। সামনে সিঁড়ি, ওপর দিকে উঠে গেছে।

ধাপ বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে যাচ্ছে লোকটা, এরই মধ্যে মাথার কাছে পৌঁছে গেছে।

সর্বনাশ! ভাবল রানা। বিকল্প কোন উপায় নেই, সীটের ওপর চেপে বসে হ্যান্ডেলটা দু'হাতে শক্ত করে ধরে থাকল। সিঁড়ির প্রথম ধাপের সাথে সামনের চাকা ধাক্কা খাওয়ার আগের মুহূর্তে হ্যান্ডেল বারটা ঝাঁকি দিয়ে ওপর দিকে তোলার চেষ্টা করল ও। পরমুহূর্তে ক্যাঙ্গারুর মত লাফ দিতে দিতে সিঁড়ি বেয়ে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল মোটরসাইকেল। রানাকে সীট থেকে খসিয়ে ফেলার সম্ভাব্য সবরকম চেষ্টা করে গেল সেটা, কিন্তু রানাও নাছোড়বান্দা, গ্যাট হয়ে বসে থাকল। পনেরো বিশটা ধাপ, খুব একটা খাড়া ভাবেও উঠে যায়নি, কয়েক লাফেই মাথায় উঠে এল মোটরসাইকেল।

সামনে লম্বা একটা প্যাসেজ। দু'পাশে উঁচু পাঁচিল। প্যাসেজের অর্ধেক পেরিয়ে গেছে লোকটা, এখনও ছুটছে। রানা ধারণা করল, প্যাসেজের শেষ মাথায় লোকটা পৌঁছবার আগেই তাকে ধরে ফেলবে ও।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল আলেক। ছুটতে লাগল। আবার তাকাল। রানা বুঝল, লোকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

মোটরসাইকেল কাছে চলে আসছে বুঝতে পেরে ছোটার গতি আরও বাড়িয়ে দিল আলেক। এতে কাজ হবে না, জানে সে। তবু প্যাসেজের শেষ মাথায় পৌঁছবার জন্যে শেষ চেষ্টা করল সে। কিন্তু ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনে যখন বুঝল, মোটরসাইকেল আর মাত্র দশ গজ পিছনে, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে, ঘুরল রানার দিকে।

ব্রেক কষেই লাফ দিল রানা। বেঁকে গিয়ে দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেলো মোটরসাইকেল, কাত হয়ে পড়ে গেল প্যাসেজের ওপর। ইঞ্জিন চলছে, হেডলাইট জ্বলছে।

দু'জনের মাঝখানে হেডলাইট, পরস্পরের দিকে মুখে করে আধো অন্ধকারে

দাঁড়িয়ে আছে ওরা। রানার কোমরের ওপরের অংশ অন্ধকারে ঢাকা, আলেকেরও তাই।

ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে আলেক। রানা বুঝল, ওর দম ফুরিয়ে গেছে। এখন যদি দৌড়াতে শুরু করে আবার, ধরে ফেলতে অসুবিধে হবে না।

'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও,' আরবীতে বলল আলেক। 'এর মধ্যে তোমার কিছু করার নেই। অকারণ বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে খামোকা কেন প্রাণটা হারাবে?'

রানা ভাবল, এ লোক আলেক বোগান তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি কে, ব্যাটা এখনও তা জানে না। জবাব দিল না ও। লাফ দিয়ে মোটরসাইকেল টপকে চলে এল এপারে। এখনও পাঁচ হাত দূরে আলেক।

এত কাছ থেকে আলেকের মুখ কিছুটা আবছাভাবে দেখতে পেল রানা। সতর্ক হয়ে গেল ও। রক্তাক্ত চেহারা, কিন্তু চোখে খুনের নেশা।

'আমার কথা কানে যায়নি তোমার?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল আলেক।

'এসো না লাগি,' বলল রানা। প্রতিপক্ষ যত শক্তিশালী আর নিষ্ঠুরই হোক, নিজের সম্পর্কে আস্থার কোন অভাব নেই ওর। নিজের শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানে এই রকম ষণ্ডামার্কা পাঁচ সাতজনকে ও একাই সামলাতে পারবে। 'দেখা যাবে কে জেতে কে হারে!'

'তখন আবার বোলো না, আমি তোমাকে সাবধান করে দিইনি!'

কোনরকম নোটিশ না দিয়ে হঠাৎ বাঘের মত আলেককে লক্ষ্য করে লাফ দিল রানা। নিশ্চল দাঁড়িয়ে ছিল আলেক, তাই থাকল, একচুল নড়ল না । তার সামনে চলে এসে নাক লক্ষ্য করে ঘুসি চালাল রানা। পেশীবহুল একটা হাত তুলে রানার কব্জি ধরল আলেক, অপর হাতের পাঁচটা আঙুল দিয়ে চেপে ধরল গলাটা। কব্জি ছাড়াবার জন্যে হ্যাঁচকা টান দিল রানা, কিন্তু আলেকের হাতটাকে একচুল কাঁপাতেও পারল না। মুহূর্তের জন্যে বোকা হয়ে গেল রানা। এই লোক মানুষ না আর কিছু!

গলার ওপর আঙুলগুলো ডেবে যাচ্ছে অনুভব করে আতঙ্কের একটা শিরশিরে ভাব জাগল শরীরে, মুক্ত হাতটা দিয়ে আলেকের চোয়ালে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল ও। যতটা জোরে মারল, আঘাতটা লাগলও তত জোরে, কিন্তু তাতে আলেকের কোন ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হলো না। মুখটা শুধু একদিকে একটু সরিয়ে নিল সে।

এই প্রথম ভয় পেল রানা। বুঝল, প্রাণে বাঁচতে হলে শক্তি দিয়ে নয়, কৌশলে লড়তে হবে এর সাথে। জুতো সহ পা তুলল ও, পরমুহূর্তে বিদ্যুৎবেগে নামাল আলেকের পায়ের আঙুলে। জুতোর ভেতর আলেকের কয়েকটা আঙুল থেঁতলে গেল। উফ্ করে উঠল সে।

গলায় একটু ঢিল পড়তেই আলেকের পাঁজরে দমাদম কয়েকটা ঘুসি চালাল রানা। মনে হলো, মাংস নয়, শক্ত রাবারের ওপর মারছে। ওর ডান হাতটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো আলেক। দু'জনের মাঝখানে আরও একটু ফাঁকা জায়গা দরকার, তা না হলে মারতে সুবিধে হচ্ছে না। এক পা পিছিয়ে এল রানা। পরমুহূর্তে পা

চালাল আলেকের তলপেট লক্ষ্য করে।

রানার পা ধরে মোচড় দিল আলেক, এক পায়ের ওপর নাচতে লাগল রানা। কোমরে আলেকের লাথি খেয়ে ছিটকে গিয়ে পড়ল মোটরসাইকেলের ওপর।

ঘুরে দাঁড়াল আলেক, প্যাসেজ ধরে ছুটল। ঝামেলা যতটা সম্ভব এড়াতে চাইছে।

প্রায় সাথে সাথেই উঠে দাঁড়াল রানা, ধাওয়া করল।

পিছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে আবার দাঁড়াল আলেক, ঘুরল, বলল, 'ভারি মুশকিলে পড়া গেল দেখছি!'

দাঁড়িয়ে পড়ল রানাও। কাঁধ দুটো সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, দু'হাত আক্রমণের ভঙ্গিতে সামনের দিকে বাড়ানো, একটু ফাঁক হয়ে আছে পা। আলোর দিকে পিছন ফিরে আছে ও, মুখটা পরিষ্কার দেখতে পেল না আলেক।

কিন্তু রুখে দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে বুঝল, একজন প্রফেশন্যাল! ভাবল, কে লোকটা···মেজর রানা নয়তো?

ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। অনেকটা আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল আলেক। শুরু হলো ধস্তাধস্তি।

আলেকের হাত দুটোকে বন্দী করার প্রাণপণ চেষ্টা করল রানা, কিন্তু বার বার ধরেও দুটো হাতের একটাকেও আটকাতে পারল না কায়দামত। হঠাৎ করেই আলেককে ছেড়ে দিয়ে একটা পাঞ্চ কষল ও। নরম কোথাও লাগল সেটা, আবার উফ্ করে উঠল আলেক। আবার একটা ঘুসি মারল রানা, মারল মুখ লক্ষ্য করে। কিন্তু মাথা সরিয়ে নিল আলেক, কোথাও বাধা পেল না হাত। আচমকা আলেকের হাতে কি যেন ঝিক্ করে উঠতে দেখল ও।

বুঝল, ছুরি।

একটা হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে আছে আলেক, নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রানা। ছুরির ফলাটা ঝিলিক তুলে এগিয়ে এল ওর গলার দিকে, ঝাঁকি দিয়ে মাথা সরাবার চেষ্টা করল ও। পরমুহূর্তে চোয়ালে তীব্র জ্বালা অনুভব করল। একটা হাত উড়ে চলে এল মুখের ওপর। গরম রক্ত অনুভব করল আঙুলের ডগায়। তারপর হঠাৎ করে ব্যথাটা অসহ্য হয়ে উঠল। ক্ষতটার ওপর আঙুলের চাপ বাড়াল ও, শক্তমত কি যেন ঠেকল। বুঝতে অসুবিধে হলো না, এগুলো ওর দাঁত। ছুরির ফলা চোয়ালের মাংস ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। কনুই দিয়ে ওর পাঁজরে গুঁতো দিল আলেক। ছিটকে পড়ে গেল রানা।

'শখ মিটেছে?' হিস হিস করে উঠল আলেকের গলা।

মাথাটা তুলে তাকাবার চেষ্টা করল রানা। দেখল, এগিয়ে এসে ওর বুকের ওপর একটা পা তুলছে আলেক। সরে যাবে, তার সময় পেল না ও। পাঁজরে এসে লাগল লাথিটা। অসহ্য যন্ত্রণায় জ্ঞান হারাল ও।

ছয়

ট্রাউজারের পকেট থেকে রুমাল বের করে ছুরির ফলাটা ভাল করে মুছল আলেক। সাদা রুমাল লাল হয়ে উঠল কয়েক জায়গায়। রাস্তায় আলো নেই, একটা আলোকিত জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ফলাটা পরীক্ষা করল সে, তারপর আবার ঘষে ঘষে মুছল।

ছুরি আর রুমাল হাতে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল সে। খানিক পর, নিজের অজান্তেই একটা দোতলা বাড়ির জানালা থেকে নেমে আসা আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল, খুব জোর দিয়ে দ্রুত মুছতে শুরু করল ফলাটা। তারপর চমকে উঠে ভাবল, আমার হয়েছেটা কি! এটা তো অনেক আগেই পরিষ্কার হয়ে গেছে!

শার্টের তলায়, কোমরে গুঁজে রাখল ছুরি। রুমালটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। হন হন করে হাঁটা ধরল সে। গলি থেকে বেরিয়ে একটা চওড়া রোডে এসে এলাকাটা চিনতে পারল। পুরানো শহর এখান থেকে বেশি দূরে নয়। সেদিকেই এগোল সে।

ঠিক ভয় পায়নি আলেক, কিন্তু অসহায় বোধ করছে। এটা তার একটা বোধহয় জন্মগত দুর্বলতা। মারাত্মক কিছু একটা ঘটে গেলে সেটার ধাক্কা সামলাতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে তার। তারপর আবার সব ঠিক হয়ে যায়, খুলে যায় মাথা।

কল্পনায় একটা জেলখানার খোপ দেখতে পেল আলেক। ছ'ফিট লম্বা, চার ফিট চওড়া। প্রস্রাব-পায়খানা, খাওয়া-দাওয়া সব ওইখানেই। ভিজে দেয়ালে শ্যাওলা জমেছে! দুর্গন্ধে মাথার মগজ পর্যন্ত নাক দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। দাঁড়ালে মাথায় ঠেকে নগ্ন বালবটা। খোপে একটাই দরজা, বাইরে থেকে বন্ধ। জানালাটা অনেক উঁচুতে, মোটা লোহার রড দিয়ে আটকানো। এক চিলতে আকাশ ছাড়া জানালা পথে আর কিছু দেখা যায় না। কল্পনা করল, একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এই খোপের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করল সে, সেই সাথে মনে পড়ল, কারাবাসের আজ তার প্রথম দিন, আরও তেরো বছর তিনশো চৌষট্টি দিন এখানে থাকতে হবে তাকে। খোপের কোণে বসে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিল সে। আরেক কোণে এসে দেখল, বালতিতে পানি একটু আছে বটে, কিন্তু সাবান নেই। একটা পেয়ালায় করে কয়েক মুঠো ভাজা গম দরজার নিচের ফাঁক দিয়ে খোপের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া হলো। তাই মুখে দিয়ে সেই বালতি থেকেই দু'ঢোক পানি খেলো সে। বিছানা বলতে ছেঁড়া একটা কম্বল, তার ওপর হাঁটু গেড়ে বসল, তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে বাস্তব জগতে ফিরে এল আলেক। ভাবল, জেলে যাবার কথা ভাবছি কেন! আমি তো পালিয়ে চলে এসেছি! হঠাৎ খেয়াল হলো, পথিকরা অনেকেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে তাকে। একটা দোকানের জানালায় আয়না দেখে

থামল সে, চেহারাটা পরীক্ষা করল। এলোমেলো হয়ে আছে চুল, মুখের একটা পাশ ক্ষত-বিক্ষত, ফুলে ছোট একটা আলুর মত হয়ে আছে বাঁ চোখের ওপরটা। শার্টের আস্তিন ছিঁড়ে গেছে, কলারে রক্তের দাগ। মারপিট আর ছোটাছুটির পর এখনও দম ফিরে পায়নি সে, একটু একটু হাঁপাচ্ছে। ভাবল, আমাকে বিপজ্জনক দেখাচ্ছে। চট করে নিজের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল কেউ ওকে বিশেষ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে কিনা। দ্রুতপায়ে আবার হাঁটা ধরে মেইন রোড থেকে সরু, আধো অন্ধকার একটা গলিতে ঢুকে পড়ল সে।

'তেলআবিবের ওই কুত্তার বাচ্চাদের আমি দেখে নেব,' বিড়বিড় করে বলল আলেক। 'জাল টাকা দিয়েছে, শালারা আমাকে জানাল না কেন!' সুটকেস ভরে টাকা দেবার মত উদারতা কেন দেখানো হয়েছিল, এখন বুঝতে পারছে সে। নিজেদের ছাপা মিশরীয় টাকা, গায়ে লাগার কথা নয়। এমনই অবিশ্বাস্য বোকামি, এর মধ্যে বোকামি ছাড়া অন্য কিছু আছে কিনা ভাববার বিষয়। জিওনিস্ট-ইন্টেলিজেন্সে মিশরের কোন ধুরন্ধর স্পাই কাজ করছে না তো? তার সুটকেসে জাল টাকা ভরে দেবার বুদ্ধিটা এই স্পাইয়ের মাথা থেকে বেরোয়নি তো?

তেলআবিবে ফিরে নিক, তখন এ ব্যাপারে ভালমত খোঁজ-খবর করবে সে।

এখানে, কায়রোয় ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল কিভাবে? উত্তরটা পানির মত সহজ। দু'হাতে টাকা খরচ করছে সে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে জাল নোট। ব্যাংকের চোখে ধরা পড়েছে সেগুলো। তারা তদন্ত করেছে। ফলে গোটা শহরে রটে গেছে। কথাটা মিলিটারি এবং ব্যবসায়ীদের কানেও যায়। ইন্টেলিজেন্সের তরফ থেকে হয়তো গোপন সার্কুলার বিলি করা হয়েছে—কেউ জাল টাকা দিলে সাথে সাথে টেলিফোনে খবর পাঠাতে হবে। ঠিক সেই নির্দেশই পালন করেছে রেস্তোরাঁর মালিক।

রেস্তোরাঁ মালিক ওদেরকে শ্যাম্পেন উপহার দেয়ায় খুশি হয়েছিল আলেক, কথাটা মনে পড়ে যেতে হাসি পেল। সম্মান দেখাবার জন্যে নয়, মিলিটারি পুলিস না আসা পর্যন্ত ওদেরকে আটকে রাখার জন্যে এই উদারতা দেখিয়েছিল লোকটা।

মোটরসাইকেল আরোহীর কথা ভাবল আলেক। শালা খুব জেদী লোক, সন্দেহ নেই। গাড়ি নিয়ে সিঁড়ির ওপর দিয়ে নামা, ওঠা—নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করেনি। ভাগ্যিস পিস্তল বা ছুরি-টুরি ছিল না সাথে, থাকলে এই লোক ব্যবহার করতে পিছপা হত না। ছোকরার পরনে ইউনিফর্ম বা হেলমেট কিছুই ছিল না, তার মানে মিলিটারি পুলিস নয়। ইন্টেলিজেন্সের কেউ? মেজর রানা, সম্ভবত?

শালা যেন মেজর রানাই হয়, আশা করল আলেক। ভাবল, ছুরি চালালাম ঠিক, কিন্তু জখম কোথায় করলাম দেখা হলো না। তবে জখম যে গুরুতর, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বোধহয় গলার কোথাও চিরে দিয়েছি।

এখনকার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল আলেক। রোপাকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে। মিলিটারি পুলিসকে কি বলবে রোপা? বলবে, আলেক বোগান লোকটার সাথে আজই তার ডুম-ডামে পরিচয় হয়েছে, লোকটা তাকে তার একজন ভক্ত বলে পরিচয় দিয়ে ডিনার খাওয়াতে চাইলে রাজি হয়ে যায় সে। এই

ধরনের ঘটনা হর-হামেশা ঘটছে, এর মধ্যে অবিশ্বাস করার কিছু নেই। কিংবা অন্য কোন গল্প বানিয়ে বলবে রোপা। চালাক-চতুর মেয়ে, কিভাবে কি করলে নিজেকে বিপদ থেকে মুক্ত করা যাবে, বুঝে নেবে। আলেককে চিনি না, এই কথা তাকে বলতেই হবে। তা না হলে আলেকের সহযোগী হিসেবে অভিযুক্ত করা হবে তাকে।

রোপার একটা খ্যাতি আছে, মিলিটারি পুলিস ওকে আটকে রাখতে পারবে না। রোপা ইহুদি, তাতে সুবিধেই হবে। নামকরা একজন ইহুদিকে গ্রেফতার করলে মিশরীয়দের বিরুদ্ধে যে অভিযোগটা বরাবর করা হয়, তারা ইহুদিদের ওপর অত্যাচার করছে, সেটায় ইন্ধন যোগানো হবে, অসন্তোষ আর কুৎসায় মুখর হয়ে উঠবে ইহুদি মহল। ইহুদিদের ওপর সহানুভূতি আছে, প্রভাবশালী এমন লোকের সংখ্যা কম নয়। মিশরে যে-সব ইহুদি রয়েছে তাদের স্বার্থের দিকে নজর রাখার জন্যে নিয়মিত মোটা টাকা উপহার পায় এরা। এদের মধ্যে সেনাবাহিনীর জেনারেল থেকে শুরু করে সরকারী আর বিরোধী দলের রাজনীতিকরাও আছেন। তারপর আছে রোপার ভক্তরা। সংখ্যায় এরা কত, বলা কঠিন। রোপার নাচ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে মাত্র কয়েক লাখ দর্শকের, কিন্তু রোপা সম্পর্কে জানে বা শুনেছে এমন লোকের সংখ্যা কয়েক কোটির কম নয়। রোপাকে গ্রেফতার করা হলে এরাও চুপ করে সহ্য করবে না। ওকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠাবার আগে কর্তৃপক্ষকে এসব কথা ভেবে দেখতে হবে বৈকি। উহুঁ, রোপাকে ওরা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।

ছেড়ে দেবে ঠিকই, কিন্তু এখন থেকে কড়া নজর রাখা হবে রোপার ওপর। ঠিকানাটা রোপার কাছ থেকেই আদায় করবে ওরা। তার মানে, রোপার হাউজবোটে এখন আর ফিরে যাবার উপায় নেই তার। অন্তত এখুনি নয়।

তাহলে? এই ক্লান্ত, রক্তাক্ত শরীর নিয়ে কোথায় যায় সে? ক্ষতগুলো ধোয়াধুয়ি করা দরকার, কাপড় বদলানো দরকার, ঘণ্টা কয়েক বিশ্রামও চাই। খলিফার কথা মনে পড়ল তার। ইচ্ছে করলে এই বিপদে খলিফা তাকে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু চিন্তাটা সাথে সাথে বাতিল করে দিল সে। লোকটা দু'মুখো সাপ, বিশ্বাস করা যায় না।

এক মিনিট পর আলেক আবিষ্কার করল, আবার সে খলিফার কথা ভাবছে। বুঝল, আর কোথাও যাবার জায়গা নেই তার, তাই বারবার খলিফার কথা ঘুরে ফিরে আসছে মনে। তারপর হঠাৎ করেই উপলব্ধি করল, নিজের অজান্তে কখন যেন খলিফার বাড়ির সামনে চলে এসেছে সে।

একটা খিলানের নিচে আড়াল নিল সে। কাজটা কি উচিত হচ্ছে? এখনও সময় আছে, ফিরে যেতে পারে সে। ঠিক করল, প্রথমেই কিছু বলবে না খলিফাকে। আগে মন-গতিক বুঝবে। যদি মনে হয় খলিফার আশ্রয় নিলে ঝুঁকি নেই, তখন প্রস্তাব দেয়া যাবে।

অন্ধকার প্যাসেজে ঢুকল আলেক। পাথরের তৈরি প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওপরে।

বড় হলঘরে একজন লোককে নিয়ে বসে আছে খলিফা। ঘরের ভেতর ধোঁয়া আর গাঁজার গন্ধ। লোকটার হাত থেকে আধপোড়া একটা সিগারেট নিচ্ছিল খলিফা, পায়ের আওয়াজ শুনে মুখ তুলে তাকিয়ে আলেককে দেখতে পেল।

আলেকের চেহারা দেখে এক সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকল খলিফা, তারপর দরাজ গলায় হেসে উঠে অভ্যর্থনা জানাল তাকে। 'আরে, দোস্ত যে! এসো! ভাবতেই পারিনি আবার তুমি আমার এই গরীবখানায় পায়ের ধুলো দেবে। কি হলো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এসো, বসো!' আলেকের করুণ চেহারা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা থেকে সযত্নে বিরত থাকল সে। সাথের লোকটাকে বলল, 'আমার দোস্ত, আলেক আব্বাস। কেউ কেউ আলেক বোগান বলেও ডাকে। আমরা ওকে বোগান-আব্বাস বলে ডাকতে পারি।' সিগারেটে কষে একটা টান দিল খলিফা, সবটুকু ধোঁয়া গিলে চালান করে দিল পেটে। তারপর চোখ দুটো বুজে সিগারেট সহ হাতটা বাড়িয়ে দিল সঙ্গীর দিকে।

এগিয়ে এসে ওদের সাথে কার্পেটের ওপর পদ্মাসনে বসল আলেক। ধীরে ধীরে চোখ মেলল খালিফা। চোখ দুটো টকটকে লাল। নেশা ভালই ধরেছে তার। চেহারায় ঘুম ঘুম ভাবের সাথে হাসি লেগে রয়েছে। 'তা, খবর কি, দোস্ত?' জানতে চাইল সে।

মৃদু একটু হাসল আলেক।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আলেকের কাঁধে অসম্ভব ভারী একটা হাত রাখল খলিফা, ইশারায় সঙ্গীকে দেখাল, বলল, 'ও আমার জ্ঞাতি ভাই, সেলিম। ওর সামনে কোন রকম সঙ্কোচ কোরো না, দোস্ত।'

মাথা ঝাঁকাল আলেক। 'ঠিক আছে।'

'আচ্ছা, ভাই বোগান-আব্বাস,' জিজ্ঞেস করল সেলিম, 'একটা ব্যাপারে আমাদেরকে একটু সাহায্য করতে পারেন? একটা রহস্য নিয়ে সেই সন্ধে থেকে মাথা ঘামাচ্ছি আমরা, কিন্তু কোন সুরাহা করতে পারছি না। রহস্যটা হলো, বলতে পারেন, রাশিয়ানরা আমাদের উওগস বলে কেন?'

প্রকাণ্ড শরীর দুলিয়ে হো হো করে হেসে উঠল খলিফা।

আলেক বুঝল, এসবই নেশার প্রতিক্রিয়া। বলল, 'মজার ব্যাপার হলো, রহস্যটা কি তা আমি জানি। মিশরীয়রা যারা সরকারী কাজ করে তাদেরকে উওগস বলা হয়। ওয়ার্কিং অন গভর্নমেন্ট সার্ভিস, এই চারটে ইংরেজী শব্দের প্রথম অক্ষর নিয়ে তৈরি হয়েছে উওগস।'

গলা ছেড়ে আরেকবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল খলিফা, এবার তার সাথে সেলিমও যোগ দিল। হাসি থামিয়ে খলিফা বলল, 'দেখলে তো, সেলিম, আমার দোস্ত কি রকম বুদ্ধি রাখে! প্রায় আরবদের মতই চালাক ও। হবে না! ও যে প্রায় অর্ধেকই আরব! জানো, ও-ই একমাত্র ইউরোপিয়ান, যে আমাকে ঠকিয়েও পার পেয়ে গেছে?'

'আমার ওপর কিন্তু অন্যায় করা হলো,' মৃদু হেসে বলল আলেক। 'আমি যাকে একবার বন্ধু বলে গ্রহণ করি, তাকে কখনও ঠকাই না। তাছাড়া, আপনিই

বলুন,' সেলিমকে জিজ্ঞেস করল সে, 'খোদ শয়তানের সাথে কে লাগালাগি করতে যায়?'

আলেকের রসিকতা পছন্দ করল সেলিম, হেসে গড়িয়ে পড়ল সে।

তাকে থামিয়ে দিয়ে খলিফা বলল, 'তাহলে, ভাই, আমার কথাটাও শোনো, তুমি নিজেই পরিষ্কার সব বুঝতে পারবে।' ভুরু কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল সে, কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে শুরু করল, 'বোগান-আব্বাস প্রস্তাব দিল আমি যেন তাকে একটা জিনিস চুরি করে নিয়ে এসে দিই। এই পদ্ধতিতে আমি নেব ঝুঁকি আর সে হবে লাভবান। এত সহজে কেউ আমাকে ঠকাবে, তা সম্ভব নয়। তার কথামত জিনিসটা আমি ঝুঁকি নিয়ে চুরি করলাম। ওটা একটা ব্রীফকেস ছিল। ঠিক করলাম ব্রীফকেসে যা পাওয়া যাবে সব রেখে দেব। ভেবেছিলাম, তাহলেই বোগান-আব্বাসকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে।'

'হ্যাঁ, সেটাই বিধেয়,' মাথা নেড়ে বলল সেলিম। 'বোগান-আব্বাস, আপনি যদি আমার ভাইকে প্রস্তাব দিতেন যে ব্রীফকেসে যা পাওয়া যাবে সেটা অর্ধেক অর্ধেক বখরা হবে, তাহলে আমার ভাইয়ের মনে কোন দুঃখ থাকত না।'

নিজের প্রকাণ্ড মুখে হাত বুলাল খলিফা। 'কি যেন বলছিলাম?'

আলেক বলল, 'এসব কোন যুক্তির কথা নয়। বখরা দিতে চাইনি ঠিক, কিন্তু এই কাজের জন্যে তোমাকে আমি ফি দিয়েছি। কিন্তু তারপরও তুমি আমার ব্রীফকেস খুলে দেখেছ।'

হেসে উঠল খলিফা। 'অবশ্যই! কিন্তু এখানেও, আবার, তুমি আমাকে ঠকালে!'

'সেটা কি রকম?' জানতে চাইল সেলিম।

'ব্রীফকেসে আজেবাজে কিছু কাগজ ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি।'

মাতালের মত হাসতে শুরু করল ওরা দু'জন। তারপর খলিফা বলল, 'কিন্তু তারপর কি দাঁড়াল ব্যাপারটা? আমি মোটা টাকা ফি পেলাম, কিন্তু দোস্ত বোগান-আব্বাস কিছুই পেল না। তার মানে, এবার আমি জিতলাম, ও হারল।'

ভুরু কুঁচকে সেলিম বলল, 'তাহলে তো তোমার অভিযোগ সত্যি নয়, ভাই। ও তোমাকে ঠকাল কোথায়? তুমিই তো ওকে ঠকালে!'

'বসো, আরও আছে!' চেহারাটাকে হাসির একটা বিস্ফোরণোন্মুখ বোমা বানিয়ে বলল খালিফা। 'ফি তো দিল, কিন্তু টাকাগুলো সব নকল, জাল!'

বোকা বোকা চোখে সেলিম তাকিয়ে থাকল খলিফার দিকে। খলিফাও ঠিক সেভাবেই তাকিয়ে থাকল। তারপর দু'জনের মুখ থেকেই বেরিয়ে এল হাসির ফোয়ারা। পরস্পরের কাঁধে চাপড় মারল ওরা। হাঁটু ভাঁজ করে মেঝেতে পা ঠুকল।

ওদের সাথে মেতে না উঠলেও, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ধরে রাখল আলেক। স্থূল আরব ব্যবসায়ীরা এধরনের কৌতুক করতে অভ্যস্ত, খুব মজা পায়, তাতে কেউ কিছু মনেও করে না। এই গল্পটা অনেক দিন ধরে লোককে বলে হাসাবার চেষ্টা করবে খলিফা। কিন্তু গল্পের একটা কথা আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে আলেকের মনে।

খলিফা তাহলে জাল নোটের কথা জানে! নিশ্চয়ই আরও অনেক লোক জানে, সংখ্যায় তারা কত? আলেকের মনে হলো, একদল হিংস্র নেকড়ে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরছে তাকে, পালাবার কোন পথ খোলা নেই। বৃত্তটা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে।

এতক্ষণে যেন আলেকের চেহারা লক্ষ করল খলিফা। চোখে-মুখে উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল সে, 'দোস্ত! এ কি চেহারা হয়েছে তোমার! ইয়া আল্লা! কে তোমার এই দশা করল! পথে কি ডাকাতে ধরেছিল?' রূপোর ছোট্ট ঘন্টাটা হাতে তুলে নিল সে, বোতামে চাপ দিয়ে বাজাল সেটা।

কিশোর বয়সী দু'জন চাকর ঢুকল ঘরে।

'গরম পানি দিয়ে মেহমানের মুখ-হাত ভাল করে ধুয়ে দে!' হুকুম করল খলিফা। 'ওষুধ দিবি। আমার একটা শার্ট পরতে দিবি। চিরুনি দিবি। তারপর এখানে কফি পাঠাবি। যা।'

প্রতিবাদ না করে চাকরদের সাথে বাথরূমে গিয়ে ঢুকল আলেক। বিশ মিনিট পর বাথরূম থেকে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে এল সে। ক্ষতগুলোয় অ্যান্টিসেপটিক মলম লাগিয়েছে। গোসল করে মাথা আঁচড়াচ্ছে। খলিফার সবচেয়ে ছোট শার্টটা দেয়া হয়েছে তাকে, তবে এখনও সেটা পরেনি আলেক।

নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসল আলেক। ইতোমধ্যে কফি পরিবেশন করা হয়েছে। ছোট একটা চুমুক দিয়ে বলল সে, 'ব্যাপারটা তাহলে বলি তোমাকে, খলিফা। ওরা আমাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করেছিল, তাই মারামারি করে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। আমার ধারণা, ওরা আমার ঠিকানা জেনে ফেলেছে। এটাই এখন আমার বড় সমস্যা।' ওরা কারা, তা আর ব্যাখ্যা করল না আলেক।

'তাই তো! সমস্যাই বটে!' গাঁজা ভরা আস্ত একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিল খলিফা, তারপর সেটা বাড়িয়ে দিল আলেকের দিকে। প্রত্যাখ্যান করলে খলিফা ভাববে তাকে অসম্মান করা হয়েছে, তাই হাত বাড়িয়ে সিগারেটটা নিয়ে ছোট্ট করে দুটো টান দিয়ে ফিরিয়ে দিল আবার। যা বলার বলেছে সে, কিছু যদি বলার থাকে, এবার খলিফাই বলবে। সেটা কি, শোনার অপেক্ষায় থাকল আলেক। কিন্তু খলিফা সমস্যাটার স্বীকৃতি দিয়ে সেই যে চুপ করে গেল, তার আর মুখ খোলার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ইতোমধ্যে সিগারেটটা আবার আলেকের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে সে। বার কয়েক টান দিয়ে একটু ঝিমুনি ভাব অনুভব করল আলেক। তার মনে হলো, সময় যেন অস্বাভাবিক দ্রুত তালে বয়ে যাচ্ছে।

চোখ বুজে ঝিমুচ্ছিল খলিফা, হঠাৎ তাকাল আলেকের দিকে। বলল, 'তাতে কি! তোমার থাকার জায়গা নেই তো কি হয়েছে? আমি কি মরে গেছি? তুমি আমার এখানে থাকবে, দোস্ত! আমার বাড়ি, তোমার বাড়ি। তোমাকে আমি লুকিয়ে রাখব। যতদিন না বিপদ কেটে যায়, তুমি আমার কাছে থাকবে।'

কেন যেন মনে হলো আলেকের, খলিফার ঝিমুনি ভাব সবটুকু খাঁটি নয়, কিছুটা অভিনয়ের ভেজাল দেয়া হয়েছে। তার কথাগুলোও কেমন যেন অদ্ভুত শোনাল কানে। এখানে আসার সময় ভেবেছিল, টাকার বিনিময়ে খলিফার আশ্রয় চাইবে

সে। কিন্তু এসে শুনল, তার টাকা যে জাল খলিফা তা জানে। খলিফার মুখের কথাটা শোনার পর ধরেই নিয়েছিল সে, এখানে আশ্রয় মিলবে না। অথচ খলিফা তাকে বিনা পয়সায় আশ্রয় দিতে চাইছে। ব্যাপারটা রহস্যময় নয়? নিশ্চয়ই অন্য কোন মতলব আছে লোকটার। কথা শুনে মনে হচ্ছে বটে, বন্ধুর উপকার করতে চাইছে সে। কিন্তু খলিফা তার পরিবারের বাইরে কাউকে বন্ধু বলে কখনও গ্রহণ করে না।

গাঁজা টানার পর থেকে মাথাটা পরিষ্কার থাকছে না। একবারে একটা করে বিষয় নিয়ে চিন্তা করা যাক। খলিফা তাকে আশ্রয় দিতে চাইছে। কেন? কারণ সে বিপদে পড়েছে। কারণ সে তার বন্ধু। কারণ সে তাকে ঠকিয়েছে।

কারণ সে তাকে ঠকিয়েছে। সেই গল্পটা কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি, অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। আরেকবার ডাবল-ক্রস করার চেষ্টা করবে খলিফা। কিভাবে? কিভাবে আবার, মিলিটারি পুলিসকে খবর দিয়ে! সে ঘুমিয়ে পড়লেই টেলিফোনে মিলিটারি পুলিস অথবা মেজর রানাকে খবর দেবে খলিফা। ঘুম থেকে তোলা হবে আলেককে, দেখবে, মেজর রানা দলবল নিয়ে ঘিরে ফেলেছে তাকে। এর বিনিময়ে মেজর রানার কাছ থেকে মোটা টাকা নেবে খলিফা। আসল টাকা।

শার্টটা পরতে শুরু করল আলেক।

'কি হলো, দোস্ত?' জানতে চাইল খলিফা। 'ওটা আবার গায়ে চড়াচ্ছ কেন?'

আলেক কোন জবাব দিল না।

'তাহলে হয়তো একজন আরবের বাড়িতে রাত কাটাতে খারাপ লাগবে তোমার? অসম্মানজনক বলে মনে করছ?'

'প্রবাদ আছে,' মুচকি একটু হেসে বলল আলেক, 'শয়তানের সাথে এক পাত্রে খেতে হলে তোমার হাতে থাকা চাই অনেক লম্বা একটা চামচ।'

দেঁতো হাসি হাসল খলিফা, ইস্পাতের দাঁত বেরিয়ে পড়ল। বুঝল, আলেক তার পরিকল্পনা ধরে ফেলেছে। সেলিমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলিনি, প্রায় একজন আরব?'

'গুডবাই, খলিফা,' বলল আলেক।

'গুডবাই, আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত।'

ঠাণ্ডা রাতে বাইরে বেরিয়ে এল আলেক। ভাবল, এখন যাই কোথায়?

রেডিওতে পাওয়া মেসেজটার কথা মনে পড়ে গেল আলেকের। জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স দু'জন লোকের কথা জানিয়েছে তাকে। একজন মিশরীয় এয়ারফোর্সের ফাইটার পাইলট, ঈমান সাফারী, অপরজন কায়রোর একজন পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট, খাদিম সারওয়ার। কায়রোর একটা সরকার বিরোধী গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছে এরা দু'জন। এদের দলে যারা রয়েছে তারা প্রত্যেকেই কোন না কোন কারণে বর্তমান মিশর সরকার, প্রশাসন ব্যবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ, সেই সাথে নিজেদের লক্ষ্য হাসিলের কৌশলগত কারণে ইসরায়েলের প্রতি সহানুভূতিশীল। ইসরায়েলি এজেন্টরা সময় এবং সুযোগ মত দু'একবার এদের সাথে যোগাযোগ করেছে, মাঝেমধ্যে এদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ

এবং আর্থিক সাহায্যও দেয়া হয়েছে। নিজেদের সামর্থ্য মত সরকারী ইমেজ ধ্বংস করে যাচ্ছে এই গ্রুপ! কিন্তু যোগাযোগের অভাবে এদেরকে ঠিকমত কাজে লাগানো যাচ্ছে না। গ্রুপের নেতারা আবেদন জানিয়েছে, তাদেরকে একটা রেডিও দেয়া হোক। নির্দেশ পাবার জন্যে তারা এজেন্টদের ওপর নির্ভর করতে চাইছে না, সরাসরি জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের সাথে কথা বলতে চায়। আলেককে বলা হয়েছে, সে যদি সম্ভব এবং নিরাপদ বলে মনে করে, ওদেরকে যেন তার রেডিওটা ব্যবহার করতে দেয়।

এদের কাছে আশ্রয় পাবে কিনা ভাবতে লাগল আলেক। এয়ারফোর্স বেসে ঢোকা একটু কঠিন। কড়া পাহারা এড়ানো সম্ভব না-ও হতে পারে। কিন্তু পুলিস সুপার খাদিম সারওয়ারের সাথে যোগাযোগ করা পানির মত সহজ। তাই করবে নাকি?

কিন্তু এর একটা অসুবিধেও আছে। টপ সিক্রেট ইনফরমেশন ছাড়া অন্য কোন কাজে নিজের রেডিও ব্যবহার করতে দিতে রাজি নয় আলেক। সেটা তার নিরাপত্তার জন্যে একটা হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। পুলিস সুপার খাদিম সারওয়ারের কাছে গেলে আশ্রয় হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু বিনিময়ে তার রেডিওটা ব্যবহার করার সুযোগ আদায় করে নেবে সে।

রেডিও। সেটা রোপার হাউজবোটে। কাজেই বিপদ মাথায় করে হলেও ওখানেই ফিরতে হবে তাকে। আলেক জানে, হাউজবোটের ওপর নজর রাখা হবে। তবু ওখানে ফেরা ছাড়া তার কোন উপায় নেই আর।

সাত

কম্বাইন্ড মিলিটারি হাসপাতালে লোকাল অ্যানেসথেশিয়ার সাহায্যে রানার মুখের অর্ধেকটা অসাড় করা হলো। তারপর একজন মহিলা সার্জেন, ডা. কুলসুম, ওর দু'ফাঁক চোয়াল সেলাই করে জুড়ে দিল। ব্যান্ডেজটা হলো মুখের চেয়েও বড়, মাথার অর্ধেকটাই ঢাকা পড়ে গেল তাতে। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত রসিক, বলল, 'ওষুধের প্রভাব কেটে গেলে আপনার প্রাণচাঞ্চল্য কিঞ্চিৎ বাড়বে। তখন দুটো পেইন-কিলার ট্যাবলেট খেয়ে নিলে…'

'ধন্যবাদ, দরকার হবে না।'

'আমি পুরুষ মানুষ নই, মেজর,' বলল সার্জেন, 'কাজেই আমার সামনে টাফনেস দেখাবার কোন দরকার নেই।'

সার্জেনের বয়স বেশি নয়, দেখতেও সুন্দরী। কিন্তু হাসপাতালের সাদা কোট আর হিল-ছাড়া জুতো পরে থাকায় বিশেষ আকৃষ্ট হলো না রানা। ওর চেয়ে বয়সে একটু বড় হলেও, প্রেম করার বয়স এখনও পেরিয়ে যায়নি। কিন্তু ভদ্রমহিলাকে ঠাণ্ডা, প্রফেশনাল আর সুপিরিয়র বলে মনে হলো, কাজেই চিন্তাটা মাথায় এলেও

সাথে সাথে সেটাকে বাতিল করে দিল ও। দূর, ভাবল ও, তারচেয়ে নাদিয়ার সাথে প্রেম করা সহজ।

'টাফনেস নয়,' বলল রানা। 'পেইন-কিলার খেলে আমি ঘুমিয়ে পড়ব, সেটা চাই না।'

'চান না? কিন্তু ঘুমই তো দরকার আপনার! আপনি ঘুমালে আমরা বুঝতাম, সেলাইটাকে ঘণ্টাকয়েক বিরক্ত করা হবে না।'

রানার মুখে ক্ষীণ আড়ষ্ট হাসি ফুটে উঠছে দেখে তাড়াতাড়ি সাবধান করে দিল সার্জেন। 'সাবধান, হাসবেন না।'

'জরুরী একটা কাজ আছে আমার,' বলল রানা। 'ঘুমালে চলবে না।'

'কাজ? আপনার কি মাথা খারাপ, মেজর রানা?' প্রথমে বিস্মিত, তারপর বিরক্ত হলো সার্জেন। 'কাজ তো দূরের কথা, এই বেড থেকে নামতেও পারবেন না আপনি। কথা বলাও নিষেধ। এত রক্ত পড়ার পর আপনি এখন সাংঘাতিক দুর্বল। এই ধরনের জখম কয়েক ঘণ্টা পর রিয়্যাক্ট করে।'

'কি হতে পারে?'

'বমি বমি ভাব, অবশ, অস্থির, দিশেহারা।'

'দিশেহারা?'

'হ্যাঁ,' বলল সার্জেন। 'এই ধরনের জখমে মানসিক প্রতিক্রিয়াও হয়।'

'হুঁ,' বলল রানা। জানতে চাইল, 'আমার খিদে পেয়েছে, মনে হচ্ছে যা সামনে পাই তাই খাই। কি খাব?'

'কিছু খাওয়াও নিষেধ। গরম পানিতে গ্লুকোজ মিশিয়ে...'

'সে তো শুধু পানি!' অভিযোগের সুরে বলল রানা। 'শক্ত কিছু, নিরেট কিছু...'

'না।'

হাত বাড়িয়ে দিল রানা। ওর মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর হাতটা ধরল ডাক্তার, হ্যান্ডশেক করল। রানা অনুভব করল, ভদ্রমহিলার হাত ঠাণ্ডা আর শুকনো।

সার্জেন বিদায় নিয়ে চলে যেতেই কেবিন থেকে চুপিসারে বেরিয়ে পড়ল রানা। একটা গাড়ি নিয়ে হাসপাতালের বাইরে অপেক্ষা করছিল ফরহাদ। মুখে সেলাই পড়ার আগেই টেলিফোনে খবর দিয়েছিল ও।

'আমি জানতাম, স্যার, ওরা আপনাকে ধরে রাখতে পারবে না,' একগাল হেসে বলল ফরহাদ। দরজা খুলে দিতে গাড়িতে চড়ল রানা। 'আপনাকে ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেব, স্যার?'

'না।' হাতঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। 'ক'টা বাজে বলো তো?'

'দুটো পাঁচ।'

'আলেক নিশ্চয়ই একা ডিনার খাচ্ছিল না?' জানতে চাইল রানা।

'জ্বী, না। ওর সঙ্গিনীকে গ্রেফতার করে পুলিস হেডকায়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

একজন সিভিলিয়ানকে জেনারেল হেডকোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে ইন্টারোগেট

করাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, মিলিটারি পুলিস তা করতে চায়নি। রানা বলল, 'ওখানে নিয়ে চলো আমাকে।'

'কিন্তু স্যার···' রানার মুখের ব্যাণ্ডেজের দিকে তাকিয়ে শুরু করল ফরহাদ, কিন্তু ওর চোখের দৃষ্টি দেখে মাঝপথে থেমে গেল।

গাড়ি ছেড়ে দিল ফরহাদ।

গভীর চিন্তায় ডুবে আছে রানা। অফিসারদের ব্রীফকেসে ভুল তথ্য ভরা কাগজ-পত্র ভরে দেয়ার কাজ-কর্মে নানা ধরনের অসুবিধে দেখা দিচ্ছে, এই অভিযোগ কয়েকজন জেনারেলের। ব্রিগেডিয়ার নুরুদ্দীন হাফিজের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন তাঁরা, বলতে চাইছেন, মাত্র একজন ইসরায়েলি এজেন্টকে বোকা বানাবার জন্যে এত ঝামেলার মধ্যে না গেলেই কি নয়! লোকটা কোত্থেকে, কার কাছ থেকে ইনফরমেশন পাচ্ছে, সেটা কেন জানা যাচ্ছে না? তাহলে সব অফিসারের ব্রীফকেসে বাজে কাগজ না ভরে মাত্র একজনের ব্রীফকেসে ভরে দিলেই ল্যাঠা চুকে যাবে। কিংবা স্পাই লোকটাকে গ্রেফতার করা হোক। ইন্টেলিজেন্স করছে কি!

এগুলো যুক্তির কথা, স্বীকার করে রানা। কোন্ অফিসারের কাছ থেকে তথ্য পাচ্ছে আলেক, সেটা এখনও আবিষ্কার করতে না পারার জন্যে নিজেকেই দায়ী করে ও। ব্রিগেডিয়ার হাফিজকে অনুরোধ করেছে, আরও ক'টা দিন সময় দেয়া হোক, তারপর নাহয় ভুল তথ্য সরবরাহ করার এই ব্যবস্থা বাতিল করা যাবে। তার এই অনুরোধে ফল কি হয়েছে, এখনও জানা হয়নি রানার।

'সঙ্গিনী?' যেন হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেছে রানার, জানতে চাইল, 'নাম?'

ফরহাদ বলল, 'রোপা ইরিনা।'

'কোন্ রোপা ইরিনা?' অবাক হলো রানা। 'বেলি ড্যান্সার?'

'জ্বী, স্যার।'

আর কিছু জিজ্ঞেস করল না রানা। ভাবল, লোকটার নার্ভ আছে বলতে হবে! টপ সিক্রেট সামরিক তথ্য চুরি করার ফাঁকে মিশরের সবচেয়ে জনপ্রিয় বেলি ড্যান্সারের সাথে ডিনার খেতে যায়। যা করার করেছে, এখন থেকে আলেককে আর এতটা অসাবধান অবস্থায় পাওয়া যাবে না। একদিক থেকে ওর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে—এই ঘটনা থেকে আলেক জেনে গেল, তার পিছনে এখনও লেগে আছে ইন্টেলিজেন্স।

পুলিস হেডকোয়ার্টার প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে দেখে বিরক্ত বোধ করল রানা। কয়েকজন সার্জেন্ট আর কনস্টেবলকে দেখা গেল, কিন্তু সাব-ইন্সপেক্টর, সুপারিনটেনডেন্ট বা আরও বড় পদের কাউকে পাওয়া গেল না।

একজন সার্জেন্ট বলল, 'ব্রিগেডিয়ার হাফিজ ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন, মিস রোপা ইরিনাকে মেজর রানা ইন্টারোগেট করবেন। তাই এখনও আমরা কেউ তার ঘরে যাইনি।'

'এখানে ওকে নিয়ে আসার পর থেকে ওর সাথে কি ধরনের ব্যবহার করা হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

'ব্রিগেডিয়ার যা বলে দিয়েছিলেন,' জানাল সার্জেন্ট। 'আমাদের ভাষায় এটাকে বলা হয়, নো-ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট। খালি একটা কামরায় রাখা হয়েছে। কিছু খেতে দেয়া হয়নি। পানি চেয়ে জবাব পায়নি। কোন প্রশ্নও করা হয়নি।'

'গুড,' বলল রানা। ভাবল, কিন্তু এর একটা খারাপ দিকও আছে। প্রশ্নের উত্তরে কি বলবে তা ঠিক করার সময় পেয়ে গেছে মেয়েটা। যুদ্ধ-বন্দীদের ইন্টারোগেট করার অভিজ্ঞতা থেকে জানে ও, ধরা পড়ার সাথে সাথে খোঁচাখুঁচি করলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়, বন্দী যখন মৃত্যুভয়ে অস্থির হয়ে থাকে। পরে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়ায়, খেতে দেয়ায়, তার সাথে কথা বলায় নিজেকে সে সৈনিক নয়, বরং একজন বন্দী বলে ভাবতে শুরু করে, এবং তখন তার মনে পড়ে যায় বন্দী হিসেবে তার কিছু অধিকার আছে, আছে কিছু দায়িত্ব। এতে করে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় তার, মুখ বুজে থাকার সাহস পেয়ে যায়। ঠিক এই কারণেই রোপা ইরিনাকে গ্রেফতারের সাথে সাথে ইন্টারোগেট করতে পারলে ভাল হত। নো-ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট অবশ্য খারাপ নয়, মন্দের ভাল। নির্দেশটা দিয়ে কাজের কাজই করেছেন ব্রিগেডিয়ার।

সার্জেন্টের পিছু পিছু লম্বা একটা করিডর ধরে ইন্টারভিউ কামরার দিকে চলল ওরা। দরজার গায়ে ছোট একটা জানালা, সেটা খুলে ভেতরে তাকাল রানা।

চৌকো একটা কামরা। কোন জানালা নেই, তবে বৈদ্যুতিক আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে। একটা টেবিল, দুটো হাতলহীন কাঠের চেয়ার, আর একটা অ্যাশট্রে ছাড়া কোন ফার্নিচার নেই। এক কোণে ছোট একটা খোপ, ওটাই টয়লেট, কিন্তু কোন দরজা বসিয়ে আড়াল করা নেই।

দরজার দিকে মুখ করে একটা চেয়ারে বসে আছে রোপা। অনেকেই যেমন মনে করে, রোপাকে সুন্দরী বলে মনে হলো না রানার। সাথে কোন বন্ধু থাকলে হয়তো বলত, খাসা মাল! শরীরে যৌবন আছে, যে কোন পুরুষ মানুষকে উত্তেজিত করার জন্যে যথেষ্ট। আঁটসাঁট শরীর, কোথাও ঢিলেঢালা ভাব নেই। সন্দেহ নেই, গায়ে জোর রাখে। মিশরীয় সুন্দরীরা সাধারণত একহারা গড়নের হয়, চঞ্চলা হরিণীর মত। রোপাকে দেখে ওর বরং মনে হলো···কিসের সাথে তুলনা করবে ভেবে পেল না প্রথমে, তারপর মনে পড়ল—বাঘিনী! উজ্জ্বল হলুদ রঙের একটা গাউন পরে আছে সে। রানার চোখে রঙটা স্থূল লাগল, কিন্তু ডুম-ডামের দর্শকরা এটাকে কামোত্তেজক বলে একবাক্যে রায় দেবে।

দেড় কি দু'মিনিট রোপাকে লক্ষ করল রানা। অনড়, টান টান হয়ে বসে আছে সে। হাত কচলাচ্ছে না, ঘরের চারদিকে নার্ভাস দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে না, সিগারেট ধরায়নি, দাঁত দিয়ে হাতের নখও খুঁটছে না। ঝুনো নারকেল, ভাবল রানা, সহজে ভাঙবে না।

তারপর হঠাৎ করেই রোপার চেহারা বদলে গেল। নিচের ঠোঁট কামড়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, লম্বা ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারি শুরু করল। মুচকি হেসে রানা ভাবল, অত ঝুনো নয় তাহলে!

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ও।

কথা না বলে এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর বসল রানা। রোপাকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পেয়েছে ও, মেয়ে হিসেবে রোপার জন্যে এটা একটা মানসিক অস্থিরতা এবং অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে। মনে মনে খুশি হলো রানা। প্রথম চালটা ওর ফেভারে গেছে। পিছনে আওয়াজ পেয়ে বুঝল, ফরহাদ ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। মুখ তুলে রোপার দিকে তাকাল ও, বলল, 'বসুন।'

পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়ে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে রোপা। প্রথমে সামান্য একটু হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে, তারপর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। হাত তুলে রানার মুখের ব্যাভেজটা দেখাল সে, জানতে চাইল, 'ও আপনার এই অবস্থা করেছে?'

জবাব না দিয়ে আবার বলল রানা, 'বসুন।'

'ধন্যবাদ,' বলল রোপা। এগিয়ে এসে আগের চেয়ারটাতেই বসল।

'ও মানে? কার কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'যাকে আপনারা উত্তমমধ্যম দিতে চেষ্টা করলেন,' বলল রোপা। 'নামটা বোধহয় আলেক···আলেক বোগান।'

'কে এই আলেক বোগান?'

'ডুম-ডাম ক্লাবের ধনী একজন পৃষ্ঠপোষক।'

'তার সাথে কত দিনের পরিচয় আপনার?'

হাতঘড়ি দেখল রোপা। 'পাঁচ ঘণ্টার কিছু বেশি।'

'আপনার সাথে সম্পর্ক?'

কাঁধ ঝাঁকাল রোপা। 'হি ওয়াজ এ ডেট।'

'দেখা হলো কিভাবে?'

'সাধারণত যেভাবে হয়। আমি নাচ শেষ করার পর একজন ওয়েটার এসে একটা চিরকুট দিল, আলেক বোগান নামে একজন ভক্ত চান আমি যেন তাঁর টেবিলে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে বসি।'

'কে?'

'মানে?'

'ওয়েটারটা কে?'

'মনে নেই?'

'বলে যান।'

'টেবিলে গিয়ে বসতে মি. বোগান আমার জন্যে শ্যাম্পেনের অর্ডার দিলেন, তারপর আমাকে তাঁর সাথে বাইরে কোথাও গিয়ে ডিনার খেতে অনুরোধ করলেন। আমি রাজি হলাম। তারপর কি ঘটেছে, আপনি জানেন।'

'নাচের পর দর্শকদের টেবিলে এর আগে কখনও বসেছেন?'

'প্রায় রোজই বসতে হয়,' জানাল রোপা। 'এটাই রীতি।'

'ওদের সাথে প্রায়ই কি ডিনার খেতে যান?'

'মাঝে মধ্যে।'

'আজকের প্রস্তাবটা গ্রহণ করার পিছনে কি কারণ ছিল?'

'মি. বোগানকে দেখে কেন যেন আমার মনে হলো, ইনি সাধারণ নন। ভদ্রলোকের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু একটা ছিল বলে মনে হওয়ায় আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হই। তাঁর সাথে ডিনার খেতে রাজি হবার এটাই একমাত্র কারণ।' রানার মুখের ব্যান্ডেজে আরেকবার চোখ বুলাল সে। 'ভদ্রলোক যে সাধারণ নন, সেটা প্রমাণ হয়েছে, কি বলেন?'

'আপনার পুরো নাম বলুন।'

'রোপা ইরিনা।'

'আপনি ইহুদি।'

প্রশ্ন নয়, কাজেই উত্তর দেবার গরজ দেখাল না রোপা।

'ঠিকানা?'

'জাইদান, জামালেক। ওটা একটা হাউজবোট।'

'বয়স?'

'কি অশালীন!'

'বয়স?'

'উত্তর দিতে রাজি নই।'

'নিজের বিপদটা বুঝতে চেষ্টা করুন...'

'আপনি নিজের বিপদ বুঝতে চেষ্টা করুন, মিস্টার!' হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে রানাকে চমকে দিল রোপা। রানা বুঝল, রাগ আর ক্ষোভ এতক্ষণ চেপে রেখেছিল মেয়েটা। ওর মুখের সামনে হাতের আঙুল বারবার খুলল আর বাঁকা করল রোপা। 'কি ভেবেছেন আপনি আমাকে! কম করেও পঁচিশ জন লোক আমাকে গ্রেফতার হতে দেখেছে। কাল দুপুরের মধ্যে কায়রোর সবাই জানবে, অচেনা একজন লোকের সাথে ডিনার খাবার অপরাধে তাদের প্রিয় শিল্পীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কাল রাতে আমাকে ডুম-ডামে না দেখা গেলে, শহরে দাঙ্গা বেধে যাবে। পুলিস তো ছার, মিলিটারি নামিয়েও সেটা থামানো যাবে না।' একটু দম নিল রোপা, তারপর আবার শুরু করল, 'আর, এখান থেকে যদি একটা আঁচড় বা দাগ নিয়ে যাই, আমার ভক্তরা আগুন ধরিয়ে দেবে শহরে। তখন কোথায় থাকবেন আপনি?' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'বলে কিনা, বিপদ বুঝতে চেষ্টা করুন! রাতটা কাটুক, টের পাবেন কার বিপদ! যত্তোসব! নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকার আর উপায় পাননি, সম্মানী, নিরীহ মানুষকে ধরে নিয়ে এসে আবোলতাবোল প্রশ্ন করছেন! বেরিয়ে যান কামরা থেকে, আমি আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই।'

কাউকে ডেকে মেয়েটার চুল কেটে দিতে বলবে নাকি? ভাবল রানা। কিন্তু চিন্তাটাকে বাতিল করে দিল ও। এমন সুরে কথা বলল, যেন কিছুই ঘটেনি। 'আপনার কথাগুলো আবার শোনা যাক। বললেন, আলেক বোগানের সাথে ডুম-ডামে দেখা হয়েছে আপনার...'

'না!' রোপার চেহারায় জেদ ফুটে উঠল। 'সেটি হবে না। আপনাদের সাথে সহযোগিতা করতে রাজি আছি, নাহয় প্রশ্নেরও উত্তর দেব, কিন্তু জেরা বা ইন্টারোগেট করতে পারবেন না।' উঠে দাঁড়াল সে, চেয়ারটা ঘোরাল, তারপর

রানার দিকে পিছন ফিরে বসল।

রোপার মাথার পিছন দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল রানা। কঠোর একটা সিদ্ধান্ত নিতে যাবে, এই সময় ঘরের দরজা খুলে উঁকি দিল সার্জেন্ট। 'আপনার ফোন, মেজর রানা।'

ঝট্ করে রানার দিকে ঘাড় ফেরাল রোপা। 'দেখুন গিয়ে, হয়তো কোন মেজর জেনারেল বা মন্ত্রী ফোন করেছেন। মনে মনে তৈরি হয়ে যান, আমাকে ছেড়ে দেবার হুকুম হবে।'

ইশারা করল রানা, কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ফরহাদ। দরজাটা নিজের হাতে বন্ধ করে ফিরে এসে আবার টেবিলের ওপর বসল ও। 'চেয়ারটা আমার দিকে ঘুরিয়ে বসুন।'

পিছন ফিরেই বসে থাকল রোপা, একচুল নড়ল না।

'চেয়ারটা আমার দিকে ঘুরিয়ে বসুন,' আবার বলল রানা।

'ইউ গো টু হেল, মেজর রানা।'

পকেট থেকে লাইটার বের করল রানা। জ্বালল। লাইটারের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল রোপা। 'আপনার চুল কিন্তু ভারি সুন্দর,' বলল রানা। গ্যাস লাইটারটা বন্ধ করেনি ও, আগুনের দু'ইঞ্চি লম্বা নীলচে শিখা খাড়া হয়ে আছে।

চোখ দুটো একটু যেন বড় হয়ে উঠল রোপার। রানার মনের কথা পড়ে ফেলেছে বলে মনে হলো। চেয়ার ঘুরিয়ে রানার দিকে মুখ করে বসল সে। 'আপনার এই আচরণের কথা আমার মনে থাকবে!'

'খারাপ কোন আচরণ করেছি কি?' মুচকি একটু হাসল রানা। লাইটার নিভিয়ে পকেটে ভরল। 'চুলের প্রশংসা করা যদি অন্যায় হয়,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা, 'আমার কিছু বলার নেই।'

'আপনি আমাকে থ্রেট করেছেন,' ফুঁসে উঠল রোপা। 'চুল পুড়িয়ে দেবেন বলে ভয় দেখিয়েছেন!'

'কোন সাক্ষী নেই।' বলল রানা। 'আর কোন সাক্ষী নেই বলেই আপনাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারি আমি। এবং দরকার হলে করব।'

'মানে? কি করবেন? রেপ?'

চেহারায় বিতৃষ্ণা ফুটে উঠল রানার। 'আপনাকে ছুঁতেও আমার রুচিতে বাধবে। যা জানতে চেয়েছি, আপনার সাথে আলেকের প্রথম দেখা হয় ডুম-ডামে?'

চুপ করে থাকল রোপা। তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'হ্যাঁ।'

'তার সাথে আপনার সম্পর্ক?'

'কোন সম্পর্ক নেই।'

'আপনার ঠিকানা?'

'জাইদান, জামালেক। হাউজবোট।'

'আলেক বোগানের ঠিকানা?'

'জানি না।'

'আলেক বোগানের ঠিকানা?'
'বললাম তো, জানি না।'
'আলেক বোগানের পেশা?'
'আমাকে বলেননি।'
'লোকটা যদি মেথর বা মুচি হত, তার সাথে আপনি ডিনার খেতে যেতেন?'
'তিনি তা নন।'
'তাহলে তিনি কি?'
'তাঁর কথাবার্তা আর কাপড়চোপড়ে তাঁকে আমার ভদ্রলোক মনে হয়েছিল।'
'কি কি কথা হয় তার সাথে আপনার?'
'সব কথা মনে নেই।'
'যেগুলো মনে আছে বলুন।'
'বেশিরভাগ সময় আমার নাচের প্রশংসা করেন তিনি,' বলল রোপা। 'আমি নাকি বেহেশতে ওরা যারা আছে তাদের মত নাচি।'
'আপনি তার প্রশংসা করেননি?'
'না।'
'আলেক বোগানকে মিলিটারি পুলিস কেন ধরতে গিয়েছিল, আপনি জানেন?'
'জানি। তিনি নাকি জাল টাকা চালাবার চেষ্টা করেছিলেন।'
'আপনার বিশ্বাস হয়?'
'অবান্তর প্রশ্ন,' বলল রোপা। 'কয়েক ঘন্টার পরিচয়ে একজন মানুষকে চেনা যায় না।'
হঠাৎ করে জানতে চাইল রানা, 'গার্ডেন সিটি, ভিলা ডি অলিভিয়ার্স, ওখানে ক'বার গেছেন?'
সাথে সাথে জবাব দিল রোপা, 'চিনি না।'
'আলেক আব্বাস আপনাকে কিছু প্রেজেন্ট করেছে?'
'আলেক আব্বাস? এই নামে কাউকে আমি চিনি না।'
দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ফরহাদ। চেহারাটা থমথম করছে।
'চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আমি যা বলেছি, তাই!' সবজান্তার হাসি ফুটে উঠল রোপার মুখে।
এগিয়ে এসে রানার কানে কানে নিচু গলায় বলল ফরহাদ, 'মেজর জেনারেল আসলাম হোবায়দা আপনার সাথে কথা বলতে চান, স্যার।'
'কি ব্যাপারে বলেছেন কিছু?' জানতে চাইল রানা।
'উনি জানতে চান, রোপা ইরিনার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ আছে কিনা। আমি বলেছি, মেজর রানা বলতে পারবেন।'
'ঠিক করেছ,' বলে টেবিল থেকে নেমে দরজার দিকে এগোল রানা। ফরহাদ পিছু নিল।
ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে রানা, পিছন থেকে রোপা বলল, 'ফোনে কথা বলার পর পালিয়ে যাবেন না যেন! আপনার চেহারাটা একবার দেখতে ইচ্ছে

করি।'

অফিস রুমে ঢুকে ফোনের রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল রানা। 'মেজর রানা।'

'হ্যালো, মেজর,' জলদগম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর। 'জেনারেল আসলাম হোবায়দা। শুনলাম, শিল্পী রোপা ইরিনা আপনার কাস্টডিতে আছে, রাইট?'

'কেন জিজ্ঞেস করছেন, জেনারেল?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

জবাব দিলেন না জেনারেল, জানতে চাইলেন, 'ওর বিরুদ্ধে আপনার নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ আছে, মেজর?'

'যদি থাকেও, ইন্টেলিজেন্সের লোক ছাড়া সেটা জানার অধিকার আর কারও নেই।'

অপরপ্রান্তে কয়েক সেকেন্ড আর কোন সাড়াশব্দ নেই। মেজর জেনারেল টের পেয়েছেন, ঘানি বড় শক্ত। তারপর আগের চেয়ে কিছুটা নরম সুরে বললেন তিনি, 'শিল্পী রোপা ইরিনা আমাদের সংস্কৃতির গর্ব, মেজর। কোন কারণ ছাড়া ওকে অপমান করা হলে নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।'

'কাল যে গর্ব ছিল, নিজের কর্ম দোষে আজ যদি সে কলঙ্ক হয়ে ওঠে, কার কি করার আছে, বলুন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই, তবু জোর দিয়ে বলতে পারি, আপনি আমাকে ভুল ইনফরমেশন দিচ্ছেন, জেনারেল। মিশরীয় সংস্কৃতি এত নোংরা হতে পারে না।'

'আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন, মেজর!' হুঙ্কার ছাড়ল জেনারেল। 'জানেন, আপনাকে যে-কোন মুহূর্তে বরখাস্ত করতে পারি আমি?'

তিক্ত একটু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'না, পারেন না। কারণ, আমি আপনাদের বেতনভুক কর্মচারী নই। আপনার আর কিছু বলার আছে, জেনারেল?'

'আমি চাই, এই মুহূর্তে শিল্পী রোপা ইরিনাকে ছেড়ে দেয়া হোক!'

'আমার কিছু বলার নেই।'

'আপনি আমার অর্ডার অমান্য করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?'

'আপনাকে আমি চিনি না,' বলল রানা। 'আপনি একজন পকেটমার বা খুজলি-পাঁচড়ার মলম বিক্রেতা নন, জানব কিভাবে? আমাকে কিছু যদি বলার থাকে, প্রপার চ্যানেল ধরে আসুন।' বলে রিসিভার রেখে দিল সে।

উত্তেজনায় ঘেমে গেছে ও। রাগে লাল হয়ে উঠেছে চেহারা। ভাবল, কাজটা কি ভাল হলো? তারপর ভাবল, আমি কেয়ার করি না!

অফিস কামরা থেকে বেরোতে যাবে ও, আবার বেজে উঠল টেলিফোন। একটা হাত তুলে ওদেরকে থামতে অনুরোধ করল সার্জেন্ট। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল সে। কথা শুনে রিসিভারের মুখে হাত চাপা দিয়ে নিচু গলায় বলল, 'মেজর রানা, জেনারেল ইয়াজদানী আপনার সাথে কথা বলতে চান।'

মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সের চীফ! তবে কি জেনারেল আসলাম হোবায়দা তাঁর অফিস থেকেই কথা বললেন ওর সাথে? এগিয়ে এসে রিসিভার নিল রানা। 'মেজর রানা।'

'যা ঘটে গেল সেজন্যে আমি দুঃখিত, রানা,' জেনারেল ইয়াজদানীর কণ্ঠস্বর চিনতে পারল রানা। 'ভুল হয়েছে আমারই। প্রথমেই যদি আমি কথা বলতাম, এটা ঘটত না। ব্যাপারটা আগে আমাকে জানতে হবে, রানা। মেয়েটার ব্যাপারে কি করবে বলে ভেবেছ তুমি?'

'এখনও ঠিক করিনি,' বলল রানা।

'ওর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী ধরনের কোন অভিযোগ উঠতে পারে? মানে, তোমার হাতে তেমন কোন প্রমাণ আছে?'

'এখনও নেই,' বলল রানা। 'একটা দেশের বিরুদ্ধে যারা কাজ করে তারা প্রমাণ ছড়িয়ে বেড়ায় না, জেনারেল।'

'ব্যাপারটা খুব নাজুক, রানা,' মৃদু কণ্ঠে বললেন জেনারেল ইয়াজদানী। 'রোপা ইরিনা গ্রেফতার হয়েছে, এই খবর জানতে কারও বাকি নেই। ইহুদি মহল্লাগুলোয় যুবকদের চোখে ঘুম নেই, তারা মিছিল বের করবে বলে প্রস্তুতি নিচ্ছে। মনে রাখতে হবে, ওর ভক্তদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশি, এবং তারাও বসে নেই। তাই বলছিলাম, ওর বিরুদ্ধে যদি নিরেট কোন প্রমাণ না থাকে…অবশ্য, এ-ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করা হবে। এখন, ভেবে দেখো। এইমাত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী টেলিফোনে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। তুমি যদি মনে করো তোমাকে অপমান করা হয়েছে, তাহলে দুঃখ প্রকাশ করা দরকার, সে-ব্যবস্থা আমি নিশ্চয়ই করব…'

'এটা ব্যক্তিগত মান-অপমানের ব্যাপার নয়, জেনারেল,' বলল রানা। 'এর সাথে একটা দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। দেশটা আপনাদের। এখন আপনারাই যদি…' কাঁধ ঝাঁকাল রানা, তারপর আবার বলল, 'ওকে হয়তো আটকে রাখার কোন দরকার পড়বে না, কিংবা আটকে রেখে কোন লাভও হবে না। আসলে, ওকে ভাল করে আটকাবার জন্যেই এখন ছেড়ে দেব বলে ভেবেছি।'

'এখন ছেড়ে দিচ্ছ, এটুকুই স্বস্তি,' বললেন জেনারেল ইয়াজদানী। 'অন্তত আপাতত একটা দাঙ্গা থামানো যাবে।'

'কিন্তু তারপর? আমার হাতে যখন ওর বিরুদ্ধে প্রমাণ থাকবে?'

অপরপ্রান্তে চুপ করে থাকলেন জেনারেল ইয়াজদানী।

'আপনার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি চাই, জেনারেল,' বলল রানা। 'প্রমাণ সহ বা হাতেনাতে ওকে ধরতে পারলে, কেউ আমাকে ওর ব্যাপারে সুপারিশ করতে পারবে না। আপনি যদি প্রতিশ্রুতি দিতে না পারেন, সকালের ফ্লাইটে আমি ঢাকা ফিরে যাব।'

'না, রানা,' ভারী গলায় বললেন ইয়াজদানী। 'তোমার ঢাকায় ফেরার দরকার নেই। আমি কথা দিলাম। কথা যদি রাখতে না পারি, চাকরিতে ইস্তফা দেব। ওইটুকুই আমার দৌড়, রানা।'

'ঠিক আছে, সেই কথাই রইল,' বলল রানা।

'লাইনে থাকো,' বললেন ইয়াজদানী। কয়েক সেকেন্ড পর জেনারেল

আসলাম হোবায়দার গলা পেল রানা।

'আমি দুঃখিত, মেজর!' হিস হিস শব্দে কথাটা বলে ঝনাৎ করে রিসিভার রেখে দিলেন জেনারেল আসলাম হোবায়দা। রানার পিছু পিছু করিডরে বেরিয়ে এসে উদ্বেগের সাথে জানতে চাইল ফরহাদ, 'কি ঠিক হলো, স্যার?'

'ওকে ছেড়ে দিতে হবে,' বলল রানা। 'ওদেরকে জানিয়ে দাও। আর, পুলিস সুপারিনটেনডেন্টের বাড়ির ঠিকানাটা দরকার।'

প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়ার জন্যে চলে গেল ফরহাদ। ওয়েটিং রুমে একা বসে রোপার কথা ভাবতে লাগল রানা। ওকে গ্রাহ্য না করার স্পর্ধা দেখাল রোপা, এত শক্তি পেল কোত্থেকে? শক্তির উৎসটা কোথায়? ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে যা বলল তা সত্যি বা মিথ্যে যাই হোক, ওর তো ভয় পাবার কথা। হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে, অভিযোগ করবে, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্যে একটু বেশি কথা বলবে, কিন্তু ঘটল ঠিক উল্টোটা। এই শক্তির উৎস জনপ্রিয়তা, রানার তা বিশ্বাস করতে মন চাইল না। প্রভাবশালী মহলে ওর প্রচুর ভক্ত আছে, সেজন্যে কিছুটা নিরাপত্তা বোধ করতে পারে ও, কিন্তু তা থেকে একজন সামরিক অফিসারকে অপমান করা বা হুমকি দেয়ার দুঃসাহস আসতে পারে না। নির্জন একটা সেলে ঢুকিয়ে দিলে, তার ইচ্ছে-শক্তি, সাহস, নিরাপত্তা বোধ সব ধসে পড়ে। সেটাই স্বাভাবিক। কথাটা বিশেষ করে নামকরা ব্যক্তিত্বের বেলায় আরও সত্যি। এদের জগৎটা রঙিন, স্বপ্নে ঘেরা, বাস্তব দুনিয়ার সাথে তেমন সম্পর্ক নেই। জটিল কোন বিপদে পড়লে আর সবার চেয়ে এরাই বেশি বিচলিত হয়ে পড়ে।

এত শক্তি কোত্থেকে পায়? রোপার সাথে কথাবার্তা যা যা হয়েছে, সব স্মরণ করল রানা। বয়স কত জিজ্ঞেস করতেই বিস্ফোরিত হলো সে। অবসর নেয়ার বয়স পেরিয়ে এসেও নাচ দেখিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করতে পারছে, কাজেই এই আতঙ্ক তার মনে না থেকেই পারে না যে কবে না-জানি দর্শক তাকে প্রত্যাখ্যান করে বসে! উঁহুঁ, এখানে কোন সূত্র নেই। বাকি সময় শান্তই ছিল সে, চেহারায় কোন ভাব ফোটেনি। কিন্তু ওর ব্যান্ডেজের দিকে তাকিয়ে যখন হাসল হাসিটার মধ্যে একটু ব্যঙ্গের ভাব ছিল। রোপা যখন বিস্ফোরিত হলো, তার তখনকার চেহারাটা পরিষ্কার মনে করতে পারল রানা। কি ছিল সেই চেহারায়? শুধু রাগ নয়। ভয় নয়।

তারপর ব্যাপারটা ধরতে পারল রানা। রোপার তখনকার চেহারায় ছিল ঘৃণা।

ওকে ঘৃণা করে মেয়েটা। কিন্তু তা করার কোন কারণ নেই। ও একজন সামরিক অফিসার, অনুরোধ করায় মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সের কিছু কাজ করে দিতে এসেছে। হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা। রানা বুঝল, রোপা ইরিনা মিশরীয়দের ঘৃণা করে। আর এই ঘৃণাই তাকে স্পর্ধা দেখাবার শক্তি যুগিয়েছে।

মাত্র একবার, এক সেকেন্ডের জন্যে তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা অনুভব করল রানা মুখে। কেউ যেন ধারাল ফলা ঢুকিয়ে দিল। মুখের শিরা আর পেশী অনুভূতি ফিরে পাচ্ছে। দু'হাতের আঙুল দিয়ে কপালের দু'পাশ টিপে ধরল রানা, ব্যথা করছে।

পাশের ফ্ল্যাটের ছোট ছেলেটার কথা মনে পড়ল। ওর বোনকে নিয়ে ভগ্নীপতি

ইউরোপ বেড়াতে গেছে। গত সন্ধেয় রওনা হয়ে গেছে তারা। ডনকেও নিয়ে যেত, কিন্তু যেতে চায়নি সে, বলেছে সামনে পরীক্ষা। ওর বোন ছোট ভাইয়ের দেখাশোনার ভার রানার ওপরই চাপিয়ে গেছে। সেজন্যে অবশ্য ওকে তেমন কোন অতিরিক্ত ঝামেলা পোহাতে হবে না। রানা যতক্ষণ ফ্ল্যাটে থাকে, ওর সাথে জোঁকের মত লেগে থাকে ছেলেটা। সাংঘাতিক ন্যাওটা হয়ে উঠেছে। কুরবান আলির সাথেও তার খুব ভাব। ফরহাদ এত দেরি করছে কেন—ভাবল রানা। আরও তো কাজ রয়েছে ওদের। ব্রেকফাস্টের সময় ফ্ল্যাটে ফিরতে হবে ওকে। তা না হলে ওর অপেক্ষায় বসে থাকবে ডন।

ফিরে এল ফরহাদ।

'মেয়েটা মিশরীয়দের ঘৃণা করে, বুঝলে?' বলল রানা। উঠে দাঁড়াল ও। ওয়েটিং রূম থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে আবার বলল, 'আলেক বোগান ওর নতুন একটা ডেট, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এল ওরা। চারদিকে বেশ অন্ধকার, ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেনি। ফরহাদ বলল, 'স্যার, আপনি খুব ক্লান্ত···'

'হ্যাঁ। কিন্তু মাথা এখনও ঠিকভাবেই কাজ করছে। পুলিস সুপারের ঠিকানা এনেছ?'

'জ্বী।'

'নিয়ে চলো আমাকে।'

গাড়িতে উঠল ওরা। পকেট থেকে বের করে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার ফরহাদের কোলের ওপর ফেলল রানা। ওর ঠোঁটে একটা সিগারেট গুঁজে দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল ফরহাদ। রানা ভাবল, দু'ঢোক স্কচ হুইস্কি গিলতে পারলে হত।

স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল ফরহাদ, বলল, 'গেজিরা দ্বীপে থাকে সুপার। খাদিম সারওয়ার।'

সীটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল রানা। মুখের ব্যথাটা ক্রমেই বাড়ছে। অনেকক্ষণ পর আবার যখন চোখ খুলল, দেখল, একটা ব্রিজ পেরোচ্ছে গাড়ি। পুবের আকাশে ম্লান আলোর আভাস।

রানাকে চোখ মেলতে দেখে পর পর দু'বার কি যেন বলতে গিয়েও চুপ করে থাকল ফরহাদ। রানার একবার ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার? কিন্তু উৎসাহ বোধ করল না।

'স্যার,' আরও খানিক ইতস্তত করে বলেই ফেলল ফরহাদ। 'আমি যে ক'জন অফিসারের সাথে কাজ করেছি, তাদের মধ্যে আপনিই···মানে,' চেহারা একটু লাল হয়ে উঠল তার। সরাসরি প্রশংসা করা হয়ে যাচ্ছে, যা ভদ্রতা বিরুদ্ধ, অথচ কথাটা বলার জন্যে ভেতর থেকে প্রচণ্ড একটা তাগিদ অনুভব করছে সে। 'মানে···আপনি, স্যার, আমার আদর্শ অফিসার। আপনার মত মানুষ হয় না। আমি এর কোন ব্যাখ্যা দিতে পারব না, কিন্তু···'

'ফরহাদ···,' মহা অস্বস্তি বোধ করল রানা। চটে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু ফরহাদ

মনে আঘাত পাবে বলে নিজেকে সামলে নিল, বলল, 'ধন্যবাদ, ফরহাদ। ধন্যবাদ।'

'আমরা পৌঁছে গেছি, স্যার।'

ছোট, কিন্তু সুন্দর একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাল ফরহাদ। একতলা বাড়ি, সামনে সযত্নলালিত বাগান। বুঝতে অসুবিধে হয় না, উপহার উপঢৌকন বাগিয়ে ভালই আছে পুলিস সুপার; কিন্তু যাকে বলে রাজার হালে, তা নেই। সম্ভবত খুব সাবধানী লোক, লোকে সন্দেহ করতে পারে ভেবে বেঁচে থাকার জন্যে রাজকীয় আয়োজন এড়িয়ে গেছে। রানা শুনেছে, একজন পুলিস সুপ্যারের মাসিক আয় এক থেকে দু'লাখ পাউন্ড।

বাইরে থেকেই খোলা গেল গেট। ভেতরে ঢুকে দেখে, গার্ডরুমে একটা টুলের ওপর বসে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে একজন কনস্টেবল। তাকে আর না জাগিয়ে সরু কংক্রিটের পথ ধরে বাড়ির সামনে এসে থামল ওরা। দরজার গায়ে কলিং বেলের বোতাম, সেটা টিপে ধরল ফরহাদ।

মিনিট দুয়েক পর পাশের একটা জানালা থেকে একটা ঘুম জড়ানো চেহারা উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল। গম্ভীর সুরে বলল ফরহাদ, 'মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স, দরজা খুলুন।'

সুদর্শন এক লোক দরজা খুলল। বয়স আন্দাজ করল রানা, ত্রিশ-বত্রিশ। স্বাস্থ্যটা ভাল। শান্ত চেহারা, কিন্তু চোখ দুটো অস্থির এবং সতর্ক। জানতে চাইল, 'হে হে, কি ব্যাপার?'

এবার কথা বলল রানা, ইংরেজীতে, 'ইমার্জেন্সী, মি. সারওয়ার। ভেতরে ঢুকতে পারি?'

মাথা নাড়ল পুলিস সুপার খাদিম সারওয়ার। 'তার আগে পরিচয় পত্র, হে হে, প্লীজ।'

পকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ড বের করে দেখাল রানা।

'আসুন,' বলে পথ ছেড়ে দিল পুলিস সুপার। তার চেহারা দেখেই বুঝল রানা, লোকটা ভয় পেয়েছে। কিন্তু কারণটা আন্দাজ করতে পারল না। এত রাতে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হয়েছে বলে? নাকি অন্য কোন কারণ আছে?

ভেতরে ঢুকে এক জোড়া সোফায় পাশাপাশি বসল রানা আর ফরহাদ। পুলিস সুপার বসল না, ওদের সামনে সতর্ক অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকল।

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই,' বলল রানা। 'একজনের ওপর নজর রাখতে হবে, আপনি তার ব্যবস্থা করবেন।'

'অবশ্যই,' বলে দেরাজ থেকে কাগজ কলম বের করল পুলিস সুপার। 'ঠিকানাটা দিন, কার ওপর নজর রাখতে হবে, নাম বলুন।'

'নাম, রোপা ইরিনা...'

'বেলি ড্যান্সার রোপা...?'

'হ্যাঁ। একটা হাউজবোটে থাকে। নাম জাইদান, জামালেকে আছে। আমি চাই, রাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা ওটার ওপর নজর রাখা হোক।'

ধীরেসুস্থে, সময় নিয়ে সব লিখে নিল পুলিস সুপার। তারপর খানিক ইতস্তত করে জানতে চাইল সে, 'হে হে, তার অপরাধের ধরনটা কি যদি বলেন…'

'অপরাধ কি জানা থাকলে তার ওপর নজর রাখতে বলতাম না, গ্রেফতার করতে বলতাম,' বলল রানা। ভাবল, আসল কথা তোমাকে আমি জানাচ্ছি না। 'জাল টাকায় বাজার ছেয়ে গেছে, জানেন তো? আমাদের সন্দেহ, এই ব্যাপারটার সাথে ওর সম্পর্ক আছে।'

'তার মানে আপনি জানতে চান, হাউজবোটে কে বা কারা আসা-যাওয়া করে, তাদের হাতে কিছু থাকে কিনা, বোটে কতক্ষণ থাকে তারা, এইসব তো?'

'হ্যাঁ। বিশেষ করে একজন লোক সম্পর্কে আমরা আগ্রহী। আলেক বোগান, হাফ ইউরোপিয়ান, হাফ ঈজিপশিয়ান—আসিউত মার্ডার কেসের আসামী। নিশ্চয়ই তার চেহারার বর্ণনা জানা আছে আপনার?'

'অবশ্যই। ডেইলি রিপোর্ট চান?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'তবে, আলেক বোগানকে দেখা গেলে গ্রেফতার করে সাথে সাথে খবর দিতে হবে আমাকে। দিনের বেলা আপনি আমার বা আমার সহকারী ফরহাদের সাথে জেনারেল হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করতে পারবেন। ফরহাদ, ফোন নাম্বারগুলো জানিয়ে দাও।'

'এই হাউজবোটগুলো চিনি আমি,' বলল পুলিস সুপার। 'টোপাথে সন্ধেবেলা বেশ ভিড় হয়, লোকজন হাওয়া খেতে যায়। প্রেমিক-প্রেমিকাদেরও প্রিয় জায়গা, হে হে।'

একটা কাগজে ফোন নাম্বার লিখে পুলিস সুপারের হাতে ধরিয়ে দিল ফরহাদ।

'এখুনি রওনা হওয়া দরকার আপনার,' বলল রানা। 'চলুন যাবার পথে আপনাকে আমরা পুলিস হেডকোয়ার্টারে নামিয়ে দেব।'

'ধন্যবাদ, হে হে, কিন্তু নামাজ পড়ার সময় হয়েছে, আমার একটু দেরি হবে, মেজর,' বলল খাদিম সারওয়ার।

'ঠিক আছে, কিন্তু দেরি করবেন না।' উঠে দাঁড়াল রানা। হঠাৎ করেই মাথাটা ঘুরে গেল ওর। মনে হলো পড়ে যাবে। ভাবল, ডা. কুলসুম আগেই সাবধান করে দিয়েছিল!

ছুটে এসে ওকে ধরে ফেলল ফরহাদ। পুলিস সুপারও এগিয়ে এল।

'আপনি অসুস্থ, মেজর,' বলল খাদিম সারওয়ার। 'ইচ্ছে করলে এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে…'

ফরহাদের হাত সরিয়ে দিয়ে মৃদু হাসল রানা। 'কিছু না, ঠিক হয়ে গেছে। আমি যেতে পারব।' চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, আবার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সব।

'চোট পেলেন কিভাবে?' সহানুভূতি প্রকাশ করে জানতে চাইল পুলিস সুপার।

'পেয়েছি,' বলে আর দাঁড়াল না রানা। ফরহাদকে পিছনে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। ওদের সাথে গেট পর্যন্ত এল খাদিম সারওয়ার।

বলল, 'রোপা ইরিনার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন, মেজর রানা। আমি নিজে তার ওপর নজর রাখব।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। কেন যেন মনে হলো ওর, দেখে যা মনে হয় তা ছাড়াও পুলিস সুপারের অন্য কি যেন একটা পরিচয় আছে। সেটা কি, ধারণা করতে পারল না সে।

আট

গালে হাত দিয়ে গুম হয়ে বসে থাকল রোপা। সকাল বেলা পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে ফেরার সময় প্রায় ধরেই নিয়েছিল, হাউজবোটে দেখতে পাবে আলেককে। কিন্তু ফিরে দেখল, হাউজবোট ঠাণ্ডা আর খালি। আলেকের ওপর রাগবে নাকি তাকে ঘৃণা করবে, ঠিক বুঝতে পারল না সে। তাকে মিলিটারি পুলিসদের হাতে রেখে আলেক পালিয়ে যাওয়ায় প্রথমে প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল তার। একা, তার ওপর অসহায় মেয়েমানুষ, স্পাইং-এর কাজে আলেককে সাহায্যও করেছে, তাকে নিয়ে মিলিটারি পুলিস কি না কি করে ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল সে। বার বার মনে হচ্ছিল, অমন কাপুরুষের মত পালিয়ে যাওয়া একদম উচিত হয়নি আলেকের। শুধু নিজের কথা ভাবল সে, তার নিরাপত্তার কথা ভাবল না। কিন্তু তারপর মাথা ঠাণ্ডা হতে বুঝল, পালিয়ে গিয়েই বরং বুদ্ধিমানের কাজ করেছে আলেক। তাকে ফেলে পালিয়ে গিয়ে মিলিটারি পুলিসের সন্দেহ তার ওপর থেকে সরিয়ে দিয়েছে আলেক। ব্যাপারটা মেনে নিতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু পালিয়ে গিয়ে এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ভাল কাজটাই করেছে আলেক। পুলিস হেডকোয়ার্টারের নির্জন সেলে একা একা বসে আলেকের ওপর রাগে ফুঁসছিল সে, রাগটুকু তার ওপর থেকে গিয়ে পড়ল মিশরীয় সেনাবাহিনীর ওপর। এই একই সেনাবাহিনী তার বাবার মৃত্যুর জন্যে দায়ী। সেজন্যেই মারমুখো ভাব নিয়ে ওদের সাথে কথা বলেছে সে। তাতে কাজও হয়েছে। পিছিয়ে যেতে দিশে পায়নি মেজর রানা।

রানার মুখে সাদা ব্যান্ডেজের কথা মনে পড়ে যেতে নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল রোপার ঠোঁটে। বিড় বিড় করে বলল, ঠিক হয়েছে! সন্দেহ নেই, ছুরি দিয়ে আলেকই ঘাই দিয়েছে ওর গালে। উচিত শিক্ষা! একেবারে জানে খতম করে দিলে আরও ভাল হত।

আচ্ছা, আলেক গেলই বা কোথায়? যাবার আর তো কোন জায়গা নেই তার। অবশ্য সব কথা বলে না তাকে, হতে পারে গা-ঢাকা দেবার মত জায়গা ঠিক করে রাখা আছে, গেছে সেখানেই। বিপদ কেটে গেছে মনে করলে আবার আসবে এখানে।

মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল রোপার। আলেক থাকলে নিজের সাহসের কথা শোনাতে পারত। মেজর রানাকে কেমন নাকানিচুবানি খাইয়েছে, শুনলে হাসতে

হাসতে মরে যেত আলেক।

পাতলা ফিনফিনে নাইলনের নাইটড্রেস পরল রোপা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, রাত জাগার ক্লান্তি কালো ছাপ ফেলে দিয়েছে চেহারায়। ঘুমানো দরকার। কিন্তু ঘুম আসবে বলে মনে হলো না। খানিকটা হুইস্কি খেতে হয়।

বোতল থেকে গ্লাসে খানিকটা স্কচ হুইস্কি ঢালল রোপা। পানি মিশিয়ে চুমুক দিতে যাবে, গ্যাংপ্ল্যাঙ্কে পায়ের আওয়াজ হলো। মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেহারা, বলল, 'আলেক···?'

ছ্যাঁৎ করে উঠল রোপার বুক। আলেকের পায়ের আওয়াজ চেনে সে। অন্য কেউ আসছে। এর হাঁটার গতি দ্রুত, পা ফেলছে হালকা ভাবে। সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল সে, হাতে ধরা রয়েছে হুইস্কির গ্লাস। ফিনফিনে নাইলন উরুর সাথে লেপ্টে থাকল। হ্যাচ খুলে নিচের দিকে তাকাল একজন আরব।

'হে হে, মিস রোপা ইরিনা?' জানতে চাইল সে।

'ইয়েস···'

'আপনি অন্য কাউকে, হে হে, আশা করছিলেন, তাই না?' বলতে বলতে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল লোকটা।

দ্রুত ভাবছে রোপা, কে লোকটা? কি চায়? আবার গ্রেফতার করতে এসেছে নাকি?

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে রোপার সামনে দাঁড়াল লোকটা। একহারা, ছোটখাট গড়ন, কিন্তু চেহারাটা সুন্দর। হাঁটা-চলায় আশ্চর্য একটা ক্ষিপ্রতা আছে। পরনে ইউরোপিয়ান সাদা শার্ট, কালো ট্রাউজার, পালিশ করা কালো জুতো। 'আমি পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট খাদিম সারওয়ার।' রোপার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে কৃতার্থ বোধ করছি।'

হ্যান্ডশেক করল না রোপা, ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে এল ঘরের মাঝখানে, ডিভানে বসল। মিলিটারির হাত থেকে ছুটে এল, তারপর আবার পুলিসী ঝামেলা কেন? এর শেষ কোথায়? বুঝল, মোটা টাকা বেরিয়ে যাবে ঘুষ দিতে। নিজেকে বোঝাল সে, ব্যাপারটা যদি ঘুষ পর্যন্ত গড়িয়ে থেমে যায়, তবু ভাল। গ্লাসে চুমুক দেয়ার সময়ও খাদিম সারওয়ারের ওপর থেকে চোখ সরাল না সে। অবশেষে বলল, 'কই দেখি, আইডেনটিটি কার্ড দেখান।'

পকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ড বের করে দেখাল খাদিম সারওয়ার।

'কি চান আপনি?' জানতে চাইল রোপা।

'আমি আসলে আলেক বোগান সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড, হে হে···' একটু বিরতি নিল সুপার, কিন্তু রোপা কিছু বলছে না দেখে আবার মুখ খুলল, 'আমরা জানি, সে আপনার বন্ধু।'

'মিথ্যে কথা!' দৃঢ় সুরে বলল রোপা। 'সে আমার বন্ধু নয়।'

রোপার কথা কানেই তুলল না খাদিম সারওয়ার। 'সামরিক সূত্র থেকে আলেক বোগান সম্পর্কে দুটো তথ্য পেয়েছি আমি। এক, আসিউতে একজন করপোরালকে খুন করেছে সে। দুই, কায়রোয় জাল টাকা চালাবার চেষ্টা

করেছে।'

'এসব কথা আমাকে শোনাবার মানে কি?' ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইল রোপা। 'সে আমার কেউ নয়, তার ব্যাপারে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আপনার যদি আর কিছু বলার না থাকে, আসতে পারেন।'

'কিন্তু তাৎপর্যটা ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেবেন না, মিস রোপা?' ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে জানতে চাইল খাদিম সারওয়ার। 'দুটো ঘটনা থেকে কয়েকটা প্রশ্ন বেরিয়ে আসে। যে লোক কায়রোয় জাল নোট চালাবার চেষ্টা করে সে আসিউতে কি করতে গিয়েছিল? একজন করপোরালকে খুন করার দরকার হলো কেন? এই জাল টাকাই বা কোত্থেকে পেল সে?'

অন্যদিকে ফিরে বসে থাকল রোপা, ধীরে ধীরে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। ভাবল, এখন যদি ফিরে আসে তাহলেই সর্বনাশ!

'এই তো গেল মিলিটারি সূত্র,' বলল খাদিম সারওয়ার। 'এবার আমার নিজের সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য। এসব তথ্য মিলিটারির হাতে নেই।'

মুখ ঘুরিয়ে সুপারের দিকে তাকাল রোপা।

'আলেক বোগান কে, আমি তা জানি। তার সৎ বাবা একজন উকিল ছিল। কিন্তু ইহুদি বাবার ঔরসে তার জন্ম। তার মা ছিল জার্মান। সেই সাথে আরও জানি, প্রায় বছর পাঁচেক এই দেশে ছিল না সে। আপনি একজন ইহুদির মেয়ে, আলেকও একজন ইহুদির ছেলে। পাঁচ বছর আগে আলেক বোগান যখন কায়রোয় থাকত, তার সাথে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এসব কথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন?'

অনড় বসে থাকল রোপা, কিন্তু বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে তার। অনুভব করল হাতের তালু ঘামছে।

'শহরময় ছড়িয়ে দিল জাল টাকা, এত টাকা সে পেল কোত্থেকে? মিশরে এই টাকা ছাপতে সাহস হবে না কারও। সে যোগ্যতাও কোন প্রেসের নেই। তার মানে টাকাটা অন্য কোথাও থেকে এসেছে। এই কাজ মিশরের শত্রুই শুধু করতে পারে। মিশরের শত্রু বলতে আমরা তো শুধু ইসরায়েলকেই চিনি, তাই না?'

বোকার মত খাদিম সারওয়ারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রোপা।

'পাঁচ বছর আগে গায়েব হয়ে গিয়েছিল আলেক বোগান, কোথায় গিয়েছিল সে? নিশ্চয়ই ইসরায়েলে! তারপর আবার ফিরে এল—আসিউত হয়ে। কেন? কারণ, কারও চোখে ধরা না পড়ে মিশরে ফিরতে চেয়েছিল সে। যদি শুধু জাল টাকার কারবারী হত তাহলে এই গোপনীয়তার এতটা দরকার ছিল না। কিন্তু তা সে নয়। অর্থাৎ এখানে একটা রহস্য রয়েছে।'

একচুল নড়ছে না রোপা, কিন্তু ঝড় বয়ে যাচ্ছে মনে। সব জানে, লোকটা সব জানে।

'মিলিটারি থেকে বলা হয়েছে, এই হাউজবোটের ওপর আমাকে নজর রাখতে হবে,' বলল খাদিম সারওয়ার। 'কে আসে, কে যায় সব রিপোর্ট করতে হবে ওদেরকে। ওদের ধারণা, আলেক বোগানও আসবে। এলে, আমি গ্রেফতার করে

খবর দিলেই ওরা ছুটে আসবে। টরচারের মুখে একটা কথাও চেপে রাখতে পারবে না সে। তখন আপনার অবস্থা কি হবে, ভেবে দেখেছেন, মিস রোপা?'

বোটের ওপর নজর রাখা হচ্ছে? মনে মনে আঁতকে উঠল রোপা। তাহলে তো আলেক কোনদিন ফিরতে পারবে না। কিন্তু এসব কথা তাকে কেন বলছে পুলিস সুপার?

'আলেক বোগানকে নিয়ে যে রহস্য, আলেক বোগানের ইতিহাসে তার সুরাহা নিহিত রয়েছে বলে আমার ধারণা,' বলল খাদিম সারওয়ার। এগিয়ে এসে রোপার পাশে বসল সে ডিভানে। রোপার চোখে চোখ রেখে আবার বলল, 'একজন ইহুদির সন্তান হিসেবে ইসরায়েলের প্রতি তার টান থাকবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। সেই টানেই ইসরায়েলে গিয়েছিল সে। তারপর ফিরে এসেছে মিশরের ক্ষতি করার জন্যে। জাল টাকা বাজারে ছড়িয়ে দিলে মিশরের যে ক্ষতি হবে, সবাই সেটা জানে। কিন্তু শুধু এই সামান্য একটা কাজ নিয়ে ফিরে এসেছে সে, এ আমি বিশ্বাস করি না। আমার ধারণা, আলেক বোগান আসলে একজন ইসরায়েলি স্পাই।'

রোপা ভাবল, কিন্তু তাকে কোথায় পাওয়া যাবে তা তুমি জানো না। সেজন্যেই আমার কাছে এসেছ তুমি। লোকটা অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লক্ষ করে চোখ ফিরিয়ে নিল সে।

'তাই যদি হয়, মানে আলেক বোগান যদি স্পাই হয়, তাকে ধরা আমার জন্যে কোন কঠিন কাজ নয়। তেমনি, তাকে বাঁচানোও আমার জন্যে পানির মত সহজ।'

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রোপা। 'এ-কথার অর্থ?'

'আমি তার সাথে দেখা করতে চাই। হে হে, গোপনে।'

'কিন্তু…কেন?'

'মিস রোপা, ভাববেন না শুধু মিশরীয় ইহুদিরাই এই সরকারের পতন চায়।'

'মানে?'

'আমরা একটা বিদ্রোহী গ্রুপ, ইসরায়েলের পক্ষে কাজ করছি,' গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলল খাদিম সারওয়ার। 'আমরা সরাসরি ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পথ-নির্দেশ চাই। সেটা একমাত্র সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে।'

'আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'ইসরায়েলে খবর পাঠিয়েছি আমরা, আমাদের একটা রেডিও চাই। উত্তর এসেছে, কায়রোয় একজন স্পাই আছে, সে আমাদেরকে রেডিও দিয়ে সাহায্য করতে পারে। এই লোকের নাম আমাদের জানানো হয়নি। ঠিক হয়েছে, তার কোন আপত্তি বা অসুবিধে না থাকলে সে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে রেডিও দেবে। আমার বিশ্বাস, সেই স্পাই আর কেউ নয়, এই আলেক বোগানই।'

চিন্তা-ভাবনা সব এলোমেলো হয়ে গেল রোপার। কি ভাববে, কি বলবে স্থির করতে পারল না। শত্রু থেকে হঠাৎ মিত্র হয়ে উঠতে চাইছে খাদিম সারওয়ার,

কতটা বিশ্বাস করা যায় তাকে? উপলব্ধি করল, ব্যাপারটা নিয়ে ভাববার মত সময় দরকার তার।

'চেষ্টা করলে আপনি তার সাথে আমার একবার দেখা করিয়ে দিতে পারেন না?' আবার জানতে চাইল পুলিস সুপার।

ঝোঁকের মাথায় এধরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে রাজি নয় রোপা। বলল, 'না।'

'হাউজবোটের ওপর নজর রাখা হচ্ছে,' বলল খাদিম সারওয়ার। 'দৈনিক রিপোর্ট মেজর রানার কাছে যাবার আগে আমার হাতে আসবে একবার। আপনি যদি আলেক বোগানের সাথে আমাকে দেখা করিয়ে দিতে পারেন, প্রতিটি রিপোর্টে আমি প্রয়োজনীয় অদলবদল করব, আপনার জন্যে অস্বস্তিকর ব্যাপারগুলো যাতে মেজর রানার চোখে ধরা না পড়ে।'

নজর রাখার কথাটা ভুলেই গিয়েছিল রোপা। আলেক যদি হাউজবোটে আসে—আগে বা পরে আসবেই সে—মেজর রানা সেটা জানবে। তবে পুলিস সুপার হাতে থাকলে তাকে দিয়ে ডেইলি রিপোর্ট এডিট করানো যাবে, আলেকের আসার খবরটা মেজর তাহলে জানবে না। রোপা বুঝল, সুপারের প্রস্তাবে রাজি হলে সব দিক রক্ষা পায়। কিন্তু লোকটাকে কি বিশ্বাস করা যায়? তারপর রোপা ভাবল, আমাদের প্রায় সব কথাই জানে ও। ইচ্ছে করলে আমাকে এখুনি গ্রেফতার করতে পারে। কিন্তু তা না করে সহযোগিতা বিনিময় করতে বলছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাজি হয়ে গেল সে, বলল, 'ঠিক আছে। ব্যবস্থা করব আমি।'

'গুড, হে হে,' বলে উঠে দাঁড়াল খাদিম সারওয়ার। 'পুলিস হেডকোয়ার্টারে টেলিফোন করে একটা মেসেজ দেবেন, বলবেন, জাহিদ আমার সাথে দেখা করতে চায়, তাহলে বুঝব আপনি ব্যবস্থা করতে পেরেছেন, তারিখ আর সময় ঠিক করার জন্যে আপনার সাথে আমার দেখা করা দরকার। কেমন?'

'হ্যাঁ।'

সিঁড়ির কাছে গিয়ে আবার ফিরে এল খাদিম সারওয়ার। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে রোপার একটা পাসপোর্ট সাইজ ফটো বের করল, সেটা রোপার দিকে বাড়িয়ে ধরে অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে অনুরোধ করল, 'দয়া করে আপনি যদি এই ফটোতে একটা সই করেন, হে হে, আমার ওয়াইফ সাংঘাতিক খুশি হবেন। তিনি আপনার একজন অন্ধ ভক্ত।'

ফটোর গায়ে রোপা লিখল, 'শুভেচ্ছা সহ মিসেস খাদিম সারওয়ারকে,' তারপর সই করল। ভাবল, কি বলব এটাকে? মায়া, না, দুঃস্বপ্ন?

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ।' ফটো নিয়ে মানিব্যাগে ভরে রাখল খাদিম। তারপর রোপার দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। এবার তার সাথে হ্যান্ডশেক করল রোপা।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল সুপার, হ্যাচটা বন্ধ করে দিয়ে গেল।

রোপার সমস্ত পেশীতে ঢিল পড়ল। কিভাবে যেন গোটা ব্যাপারটা সুচারু ভাবে সামলে নিতে পেরেছে সে। যদিও, খাদিমের আন্তরিকতা সম্পর্কে এখনও তার

মনে সন্দেহ আছে। তবে এর মধ্যে কোথাও যদি ফাঁদ থেকে থাকে, সে দেখতে পাচ্ছে না।

ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। গ্লাসের হুইস্কিটুকু দু'চুমুকে শেষ করে পর্দা সরিয়ে বেডরুমে ঢুকল। পরনে এটা কোন কাপড়ই নয়, ঠাণ্ডা লাগছে তার। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে গায়ে দেবার চাদরটা তুলে ভাঁজ খুলছে, মনে হলো একটা শব্দ পেল। ভাবল, মনের ভুল। কিন্তু শব্দটা আবার হতেই ধক করে উঠল বুক, ঘাড় ফিরিয়ে নদীর দিকের একটা পোর্টহোলের দিকে তাকাল। শব্দটা ওদিক থেকেই এসেছে।

প্রথমে কিছুই দেখা গেল না। তারপর কাঁচের বাইরে একটা মুখ জেগে উঠল। ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল রোপা। সাথে সাথে সরে গেল মুখটা।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে চেহারাটা চেনা চেনা ঠেকল রোপার। মনে হলো, আলেক। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল সে। হ্যাচ খুলে বেরিয়ে এল ডেকে। কিনারায় দাঁড়িয়ে নিচে উঁকি দিতেই পানিতে দেখতে পেল তাকে। উলঙ্গ বলে মনে হলো। একটা পোর্টহোল ধরে নিজেকে খানিকটা উঁচু করল সে, হাতটা ধরে তাকে বোটে উঠতে সাহায্য করল রোপা। ডেকে উঠে কিছুক্ষণ হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকল আলেক, চেহারায় সপ্রতিভ ভাব, সতর্ক খরগোশের মত নদীর এক কিনারা থেকে আরেক কিনারায় চোখ বুলাল। তারপর খোলা হ্যাচ দিয়ে সিঁড়িতে নামল সে। সিঁড়ি থেকে বোটের নিচে।

কার্পেটে দাঁড়িয়ে রোপার মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল আলেক। উদোম শরীর থেকে অজস্র পানির ধারা নেমে আসছে। ঠাণ্ডায় থর থর করে কাঁপছে সে।

'কিভাবে এলে?'

'গোসলের পানি দাও,' বলল আলেক।

বেডরুম হয়ে বাথরুমে চলে এল রোপা। ইলেকট্রিক ওয়াটার হিটারটা চালু করে দিয়ে বাথটাবে খানিকটা সুগন্ধ ঢালল। তারপর খুলে দিল পানির কল। বাথটাবে নেমে আধ-শোয়া হলো আলেক। ফুলে উঠে তাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে কলের পানি।

'কি ঘটল?' আবার জানতে চাইল রোপা।

কাঁপুনিটা বন্ধ হয়েছে আলেকের। 'ভাবলাম, হাউজবোটের ওপর নজর রাখা হতে পারে,' বলল সে। 'তাই নদীর পাড়ে কাপড়-চোপড় খুলে রেখে সাঁতার কেটে চলে এলাম। পোর্টহোলে চোখ রেখে দেখি, একজন লোক কথা বলছে তোমার সাথে। কে? নিশ্চয়ই পুলিস?'

'হ্যাঁ।'

'পানিতে লুকিয়ে থেকে ভাবছিলাম, শালা যায় না কেন!'

হেসে উঠল রোপা। 'আহা, বেচারী!' এগিয়ে এসে বাথটাবের পাশে বসল সে। একটা হাত রাখল আলেকের বুকে। 'খুব কষ্ট হয়েছে, না?'

'এত কিছু ঘটে গেল, আর তুমি কিনা হাসছ! তেলআবিবের এক বানচোত

জাল টাকা দিয়েছে আমাকে, তাকে আমি ইলেকট্রিক চেয়ারে না বসাই তো আমার নাম আলেক বোগান নয়।'

'দিল কেন?'

'অযোগ্যতা, নাকি বেঈমানী, জানি না। জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সে মিশরের কোন এজেন্ট হয়তো সুঁই হয়ে ঢুকে আছে। কল বন্ধ করো।' পা থেকে নদীর কাদা ধুতে শুরু করল আলেক।

'সুটকেস ভর্তি টাকা, সব অচল হয়ে গেল,' বলল রোপা। 'এখন তোমাকে নিজের টাকা খরচ করতে হবে।'

'ব্যাংক থেকে তুলতে পারলে তবে তো! ওরা বসে নেই, ইতিমধ্যে ব্যাংক-কে জানিয়ে দিয়েছে, আমাকে দেখা মাত্র অমুক নাম্বারে ফোন করে খবরটা জানিয়ে দিতে হবে। মাঝেমধ্যে চেক লিখে বিল মেটাতে পারব, কিন্তু তাতেও আমার হদিস পাবার একটা রাস্তা পেয়ে যেতে পারে ওরা। কিছু কিছু স্টক আর শেয়ার বিক্রি করে দিতে পারি, শেষ পর্যন্ত বাড়িটাও বিক্রি করা যায়, কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও টাকাটা আমাকে নিয়ে আসতে হবে বা আনাতে হবে ওই সেই ব্যাংক থেকেই।'

তার মানে, এখন আমার টাকা খরচ করবে তুমি, ভাবল রোপা। জানি, চেয়ে তুমি নেবে না, হাত পাতার স্বভাব তোমার কোন কালেই ছিল না। দরকার হলে চাও না, স্রেফ নিয়ে নাও। ঠিক করল ব্যাপারটা নিয়ে পরে চিন্তা-ভাবনা করা যাবে। বলল, 'পুলিস অফিসার বলে গেল, হাউজবোটের ওপর নজর রাখা হচ্ছে...মেজর রানার নির্দেশে।'

দেঁতো হাসল আলেক। 'আচ্ছা! আমাকে তাহলে সে-ই ধাওয়া করেছিল!'

'মেজরের মুখের জিওগ্রাফি অমন বদলে দিল কে, তুমি?'

'মুখে না কোথায় লাগল অন্ধকারে দেখতে পাইনি...'

'মুখেই। এই এত্ত বড় একটা ব্যান্ডেজ রয়েছে। হি হি হি!'

ভরাট গলায় হেসে উঠল আলেক। 'লোকটাকে একবার দেখতে পেলে হত!' হঠাৎ ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল, 'তুমি তাকে দেখলে কোথায়? সেই কি তোমাকে জেরা করেছে?'

'হ্যাঁ।'

চেহারা কঠোর হয়ে উঠল আলেকের। 'কি বলেছ তাকে তুমি?'

'বলেছি, তোমাকে আমি চিনি না, মাত্র পরিচয় হয়েছিল।'

আলেকের চেহারা থেকে মেঘ কেটে গেল। 'লক্ষ্মী মেয়ে!' প্রশংসার দৃষ্টিতে রোপার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। জেরার সময় রোপা মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পেরেছিল, সেজন্যে একটু অবাকই হলো সে। তারপর জানতে চাইল, 'তোমার কথা বিশ্বাস করেছে তো?'

'বোঝাই যায়, বিশ্বাস করেনি। করলে নজর রাখার দরকার হত না।'

চেহারায় আবার মেঘ জমল, ভুরু কুঁচকে তুলে আলেক বলল, 'বিপদের কথা। এখানে আসতে হলেই নদী সাঁতরাতে হবে, তা কি সম্ভব?'

'চিন্তা কোরো না,' বলল রোপা। 'সমস্যার সমাধান আমি করেই রেখেছি।'

'কি বললে?' রাগ আর অবিশ্বাসের সাথে তাকাল আলেক। 'সমাধান করেছ? তুমি?'

সমাধান হয়তো নয়, ভাবল রোপা, কিন্তু এই আয়োজনে কাজ চলবে। 'পুলিস অফিসার, যাকে রিপোর্ট করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, লোকটা আমাদের সাথে সহযোগিতা করবে।'

'মানে?'

'আমাদের মত সে-ও ইসরায়েলের হয়ে কাজ করছে,' বলল রোপা। 'তোমার রেডিওটা ব্যবহার করতে চায়।'

দ্রুত জানতে চাইল আলেক, 'লোকটার নাম কি বলো তো?'

'খাদিম সারওয়ার। পুলিস সুপার।'

'মাই গড!' এই লোকের সাথেই যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে তাকে। 'কিন্তু আমার কাছে রেডিও আছে জানল কিভাবে?'

'জানে না,' শান্ত সুরে বলল রোপা। 'মেজর রানার কাছ থেকে তোমার সম্পর্কে শুনে তার ধারণা হয়েছে, তুমি একজন স্পাই। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের সাথে নাকি যোগাযোগ করেছিল সে, তারা তোমার নাম বলেনি তাকে, তবে কায়রোয় তোমার উপস্থিতি সম্পর্কে আভাস দিয়েছে।'

ব্যাপারটা নিয়ে মিনিটখানেক চিন্তা-ভাবনা করল আলেক। তারপর বলল, 'এসবের সাথে নিজেকে আমি জড়াতে চাই না।'

কিন্তু খাদিম সারওয়ারকে কথা দিয়েছে রোপা, এখন আর পিছিয়ে আসা সম্ভব নয়। তীক্ষ্ণ সুরে বলল, 'না জড়িয়ে তোমার উপায়ই বা কি?'

'হুঁ,' মাথা নিচু করে বলল আলেক। যুক্তিটা বুঝতে পারছে সে পরিষ্কার।

রোপা অনুভব করল, তার হাতে অদ্ভুত একটা ক্ষমতা এসে গেছে। গোটা ব্যাপারটাই এখন যেন তার কন্ট্রোলে।

'দিনে দিনে আমার একেবারে কাছে চলে আসছে ওরা,' বলল আলেক। 'কাল রাতের মত হঠাৎ কোন বিপদে যাতে না পড়ি, সেজন্যে সাবধান থাকতে হবে আমাকে। এই হাউজবোট আমার জন্যে নিরাপদ নয়, কিন্তু আর যাই-ই বা কোথায়! আমার টাকা যে টাকা নয়, খলিফা তা জানে। কায়দামত পেলেই আমাকে সে মেজর রানার হাতে ধরিয়ে দেবে।'

'এখানে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ,' জোর দিয়ে বলল রোপা। 'পুলিস সুপার যাতে সহযোগিতা করে সে দায়িত্ব তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

বাথটাবের কিনারায় উঠে বসল রোপা। আলেকের নগ্ন শরীরে হাত রাখল সে। আলেক যে ভয় পেয়েছে তা নয়, কিন্তু উদ্বিগ্ন হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। চেহারায় উত্তেজনার রেখা, চোখের দৃষ্টিতে ক্ষীণ অস্থিরতা। জীবনে এই প্রথম, রোপা ভাবল, তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে আলেক। রোপার টাকা দরকার তার, রোপার আশ্রয় দরকার।

'ভাবছি...'

'কি?'

'সেই মেয়েটার সাথে কি দেখা করব? উচিত হবে?' জিজ্ঞেস করল আলেক। 'আজ রাতেই তো ডেট। নাদিয়া আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।'

'অবশ্যই দেখা করবে,' জোর দিয়ে বলল রোপা। 'বিপদ একরকম কেটেই গেছে, তবু ভয় পাচ্ছ কেন? নাদিয়ার সাথে পুলিস বা মিলিটারির কোন সম্পর্ক নেই। সে তোমাকে খুঁজে বের করেনি। তার সাথে তোমার দেখা হয়েছে একটা দোকানে।'

'তা ঠিক,' বলল আলেক। 'তবু ভাবছি, ক'টা দিন বাইরে না বেরুলেই বোধহয় ভাল হত।'

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রোপা। 'ওকে আমার চাই।'

চোখের চারপাশ কুঁচকে রোপার দিকে তাকাল আলেক। রোপা ভাবল, ওর মনে কি হচ্ছে এখন? ও কি নাদিয়ার কথা ভাবছে, নাকি আমার এই নতুন পাওয়া ক্ষমতার কাছে অসহায়বোধ করছে?

'ঠিক আছে,' অবশেষে বলল আলেক। 'তোমার কথাই থাকুক। আমাকে ঝুঁকি নিতে হবে, এই আর কি।'

পরাজয় মেনে নিল আলেক। নিজের ক্ষমতাটা পরীক্ষা করে দেখে নিল রোপা, জিতে গেছে সে। এক ধরনের রোমাঞ্চ অনুভব করল সে।

'এখনও ঠাণ্ডা লাগছে আমার,' আলেক বলল। 'আরও খানিক গরম পানি দাও।'

'না।' নাইলনের নাইটড্রেস না খুলেই বাথটাবে নেমে পড়ল রোপা। আলেকের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল সে। ফিনফিনে নাইলন কোমর পর্যন্ত তুলে বলল, 'ইট মি।'

বুজম রেস্তোরাঁর একটা টেবিল দখল করে বসে আছে রানা। সামনে ঠাণ্ডা মার্টিনির গ্লাস, পাশে সহকারী ফরহাদ।

সারাদিন একটানা ঘুমিয়ে তাজা ঝরঝরে হয়ে গেছে শরীর। ব্যান্ডেজের ভেতর ব্যথা আছে, কিন্তু অসহ্য নয়। ঘুম থেকে উঠে হাসপাতালে গিয়েছিল ও, ডা. কুলসুমকে খুঁজে বের করে তার কাছেই আত্মসমর্পণ করে। সার্জেন প্রচুর তিরস্কার করেছে ওকে, তারপর বলেছে, 'আপনি বোকা, কিন্তু ভাগ্যবান বোকা। আপনার ক্ষত এরই মধ্যে শুকোতে শুরু করেছে।' আগের ব্যান্ডেজ খুলে তারচেয়ে অনেক ছোট একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে সে।

সোয়া সাতটা বাজে। রানা আশা করছে আর কয়েক মিনিটের মধ্যে আলেক বোগানকে গ্রেফতার করতে পারবে ও।

রেস্তোরাঁর পিছনে বসে আছে ওরা, এখান থেকে সবটা জায়গা দেখা যায়। রেস্তোরাঁয় ঢোকার মুখে প্রথম যে টেবিল, সেটা দখল করে আছে হোৎকা চেহারার দু'জন সার্জেন্ট, দেখে মনে হয় মেদসর্বস্ব ব্যবসায়ী। রোস্ট আর মুরগী খাচ্ছে ওরা, বিল দেয়া হবে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স থেকে। বাইরে, রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা গাড়ি, ভেতরে বসে আছে দু'জন মিলিটারি পুলিস। সবার মত এদের

পরনেও সাদা পোশাক।

ফাঁদ ভালই পাতা হয়েছে। বাকি রয়েছে শুধু টোপ। রানা আশা করছে, যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে নাদিয়া।

সকালে ওর মুখে ব্যান্ডেজ দেখে ভেউ ভেউ করে কেঁদেই ফেলেছিল ডন। শত চেষ্টায় তাকে থামাতে না পেরে অগত্যা তাকে দিয়ে শপথ বাক্য উচ্চারণ করিয়ে নিয়ে সত্যি কথাই বলতে হয়েছে রানাকে। 'একজন ইসরায়েলি স্পাইয়ের সাথে মারপিট করতে হয়েছে। লোকটার হাতে ছুরি ছিল, ঘ্যাচ করে মেরে পালিয়ে গেল। কিন্তু আজ রাতে তাকে আমি গ্রেফতার করতে পারব বলে মনে হয়।'

বলে ফেলার পর উপলব্ধি করেছে রানা, কাজটা অন্যায় হয়ে গেছে। এধরনের একটা গোপন তথ্য ফাঁস করা অপরাধ। ডন ছেলেমানুষ, কিন্তু ওর অনেক আচরণ পরিণত বয়স্কদেরকেও ছাড়িয়ে যায়। ফ্রেন্ড সম্বোধনটা আবদার বা রসিকতা করে বলে, অথচ মাঝে মধ্যে এই সম্বোধনটাকে আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করে বসে রানা। যা হবার হয়েছে, ডন তো আর ঘরের বাইরে কোথাও বেরোতে পারছে না, শেষ পর্যন্ত এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছে ও নিজেকে। ফ্ল্যাট থেকে বেরোবার আগে কুরবান আলিকে বিশেষ ভাবে নির্দেশ দিয়ে এসেছে, ডনকে যেন চোখের আড়াল না করা হয়।

গল্পটা শোনার পর আর তো কাঁদেইনি, বরং সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ডন। অথচ প্রৌঢ় কুরবান আলি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরে ভয়ে একেবারে গুটিয়ে গিয়েছিল, কথা বলার সময় ফিসফিস করছিল সে, হাঁটছিল পা টিপে টিপে।

আবার হাতঘড়ি দেখল রানা। সাড়ে সাতটা। সিগারেট ধরাল ও। যে-কোন মুহূর্তে এসে যাবে আলেক বোগান। দেখলেই লোকটাকে চিনতে পারবে ও—প্রায় ছ'ফিট লম্বা, পেশীবহুল, চওড়া, গায়ের রঙ তামাটে, চওড়া কাঁধ, লম্বা হাত পা, প্রশস্ত চোয়াল। কিন্তু আলেক রেস্তোরাঁয় ঢুকলেও, সাথে সাথে কিছু করবে না ও। নাদিয়া না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। দু'জন পাশাপাশি বসে কথা শুরু করবে, এই সময় টেবিল ছাড়বে রানা আর ফরহাদ। আলেক যদি ওদের হাত গলে বেরিয়ে যায়, দরজা বন্ধ করে দেবে সার্জেন্টরা। আর সার্জেন্টরা যদি তাকে বাধা দিতে ব্যর্থ হয়, বাইরে দাঁড়ানো প্রাইভেট কার থেকে মিলিটারি পুলিসরা পায়ে গুলি করে ফেলে দেবে তাকে।

সাতটা পঁয়ত্রিশ।

আলেককে ইন্টারোগেট করার আশায় রয়েছে রানা। দু'জনের ইচ্ছেশক্তির মধ্যে জোর লড়াই হবে, সন্দেহ নেই।

সাতটা উনচল্লিশ। আলেক দেরি করছে। একটা সম্ভাবনা, নাও আসতে পারে সে। রানা প্রার্থনা করল, তা যেন না হয়। লে. কর্নেল মোসাদ্দেক হাসানকে বলা কথাটা মনে পড়ে গেল—'আশা করছি কাল রাতে তাকে আমি গ্রেফতার করতে

পারব।'

নিজের সমালোচনা করল রানা, এধরনের কথা বলা নিজের কাছে ছোট হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। ক্ষীণ হলেও, এতে গর্ব প্রকাশ পায়। কোন ভদ্রলোকের তা শোভা পায় না।

মন বলছে, আলেক আসবে। সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত গা ঢাকা দিয়ে থাকা এই লোকের স্বভাব নয়, অন্তত রানার তাই ধারণা।

সাতটা চল্লিশে রেস্তোরাঁর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল নাদিয়া। হঠাৎ জোরাল হয়ে উঠল ফরহাদের শ্বাস টানার আওয়াজ, শুনতে পেল রানা। ওকেও মনে মনে স্বীকার করতে হলো, সাজগোজ করায় অপরূপ সুন্দর লাগছে নাদিয়াকে, দম আটকে আসার মত ব্যাপারস্যাপার। ক্রীম রঙের একটা সিল্ক ড্রেস পরেছে নাদিয়া, পুরোপুরি আঁটসাঁট বা একেবারে ঢিলেঢালা নয়, একহারা শরীরটাকে ভদ্রোচিত দূরত্ব থেকে ঘেরাও দিয়ে রেখেছে। কাপড়ের রঙের সাথে ওর গায়ের রঙ এক হয়ে মিশে যাওয়ায় দূর থেকে ভুল হয়, কিছু পরে নেই বুঝি।

রেস্তোরাঁর চারদিকে তাকাল নাদিয়া। বোঝাই যায়, আলেক বোগানকে খুঁজছে। রানার সাথে চোখাচোখি হলো, কিন্তু এতটুকু ইতস্তত না করে সরিয়ে নিল দৃষ্টি। এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল হেডওয়েটার। তার সাথে কথা বলল নাদিয়া। হেডওয়েটার তাকে নিয়ে চলে গেল কাছাকাছি একটা টেবিলে। নাদিয়া বসল।

দু'জন সার্জেন্টের একজন চট্ করে একবার তাকাল রানার দিকে। সামান্য একটু মাথা ঝাঁকাল রানা। বুঝিয়ে দিল, এই মেয়েটাই নাদিয়া, আলেক বোগানের টোপ।

কিন্তু আলেক বোগান কোথায়?

আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা। মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে ওর। যদি আসে, তাহলে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে একটু আগেই আসবে সে, ভেবেছিল ও। কোন মেয়ের সাথে ডেট স্থির হলে সেটাই নিয়ম। মেয়েটা আসবে পরে, একটু দেরি করে। তাহলে নাদিয়া আসন দখল করার সাথে সাথে আলেককে গ্রেফতার করা যেত। এখন ব্যাপারটা উল্টোভাবে ঘটতে যাচ্ছে।

যদি আসে! তা না হলে উল্টো সিধে কিছুই ঘটবে না।

নাদিয়ার টেবিলে ঠাণ্ডা পানীয় পরিবেশন করল ওয়েটার। সাতটা পঁয়তাল্লিশ। চট্ করে একবার রানাদের টেবিলের দিকে তাকাল নাদিয়া, অসহায় ভঙ্গিতে ছোট্ট করে কাঁধ ঝাঁকাল। ভাবটা এই রকম, আমি কি করব বলুন!

রেস্তোরাঁর দরজা খুলে গেল, ঠোঁটে সিগারেট তুলতে গিয়ে মাঝপথে স্থির হয়ে গেল রানার হাত। পরমুহূর্তে ঢিল পড়ল পেশীতে। না, ছোট একটা ছেলে। আলেক বোগান নয়।

ছেলেটা হেডওয়েটারকে কাগজের একটা চিরকুট দিল। তারপর বেরিয়ে গেল। ওয়েটারকে ডেকে আরেক প্রস্থ ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল রানা।

হেডওয়েটারকে নাদিয়ার টেবিলের দিকে এগোতে দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল

রানার। দেখল, কাগজের টুকরোটা নাদিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

ব্যাপারটা কি? আলেক খবর পাঠিয়েছে, কথা রাখতে পারলাম না বলে দুঃখিত? কাগজের ভাঁজ খুলে পড়ল নাদিয়া, অস্পষ্ট একটা বিমূঢ় ভাব লক্ষ করা গেল তার চেহারায়। রানার দিকে তাকাল সে, অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল আবার।

নাদিয়ার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে, কি ব্যাপার? কিন্তু অ্যামবুশের গোপনীয়তাটুকু নষ্ট করা হবে তাতে। ওরা দু'জন কথা বলছে, এই সময় যদি দরজা খুলে রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ে আলেক! ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার কাছ থেকেই ছুট লাগাবে সে। তখন শুধু তাকে মিলিটারি পুলিসদের বাধা টপকাতে হবে। ছয়জনের জায়গায় দু'জনকে ফাঁকি দিতে পারলেই চলবে।

নিচু গলায় ফরহাদকে বলল রানা, 'ওয়েট।'

হ্যান্ডব্যাগ তুলে নিয়ে চেয়ার ছাড়ল নাদিয়া। রানার দিকে আরেকবার তাকাল সে, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। রানা ভাবল, নাদিয়া বোধহয় লেডিস রুমে যাচ্ছে। কিন্তু না! সোজা দরজার দিকে এগোচ্ছে সে, রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে যাবে।

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল রানা আর ফরহাদ। ইতোমধ্যে দরজা খুলে ফেলেছে নাদিয়া। সার্জেন্টদের একজন চেয়ার ছেড়ে খানিকটা উঠেছে, রানার দিকে চোখ, হাত ঝাপটা দিয়ে তাকে বসে পড়তে নির্দেশ দিল রানা। নাদিয়াকে বাধা দিয়ে লাভ নেই কোন। দ্রুত এগোল ও, পিছনে ফরহাদ।

সার্জেন্টদের পাশ কাটাবার সময় রানা বলল, 'ফলো মি!'

দরজা পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। চারদিকে তাকাল রানা। দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে রয়েছে অন্ধ এক ফকির, হাতে ফুটো একটা বাসন। তিনজন লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে টলছে, গাঁজা-ভাঙ নয়তো সস্তা দরের মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়েছে ওরা। ক্রু-কাট চুল দেখেই বোঝা যায়, সৈনিক। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বিরহের করুণ গান জুড়ে দিয়েছে। রেস্তোরাঁর ঠিক সামনেই মিশরীয় ব্যবসায়ীদের একটা দলের সাথে আরেক দলের হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে, মহা শোরগোল তুলে করমর্দন করছে আর পরস্পরের কাঁধ চাপড়াচ্ছে তারা। একজন হকার কোত্থেকে যেন ছুটে এল, রানার সামনে দাঁড়িয়ে এক ডজন ব্লেড কেনার জন্যে অনুনয় শুরু করে দিল। কয়েক গজ দূরে দেখা গেল নাদিয়াকে, খোলা দরজা দিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চড়ছে।

ছুটল রানা।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল ট্যাক্সির, সেই সাথে সচল হলো।

রাস্তার ওপারে স্টার্ট নিল মিলিটারি পুলিসদের কার। এগোতে শুরু করেছে, এই সময় ছ্যাঁৎ করে সামনে চলে এল লোক ভর্তি একটা বাস। বাসের গায়ে ধাক্কা খেলো কার।

ট্যাক্সিটাকে ধরে ফেলল রানা। দরজা বন্ধ, লাফ দিয়ে রানিং বোর্ডের ওপর উঠে পড়ল ও। হঠাৎ স্পীড বেড়ে গেল ট্যাক্সির, কাত হয়ে গেল একদিকে। ট্যাক্সির ছাদ থেকে পিছলে গেল রানার হাত। পিছন দিকে আছাড় খাবার ভঙ্গিতে পড়ে যাচ্ছে, দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে বাধ্য হয়ে রানিং বোর্ড থেকে রাস্তায় পা নামাল ও।

সামনের দিকে খানিকটা দৌড়ে ব্যালেন্স রাখার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, ছিটকে সটান পড়ে গেল।

সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল রানা। ব্যথা পেয়েছে, কুঁচকে রয়েছে মুখ। ব্যান্ডেজের ভেতর তরল অনুভূতি টের পেয়ে বুঝল, আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। ফরহাদ আর সার্জেন্ট দু'জন ঘিরে দাঁড়াল ওকে। রাস্তার ওপারে বাস ড্রাইভারকে একজন মিলিটারি পুলিস এই মারে তো সেই মারে।

ট্যাক্সিটাকে কোথাও দেখা গেল না।

নয়

বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে নাদিয়ার। শুরুতেই ব্যাপারটা ভণ্ডুল হয়ে গেছে। আলেককে রেস্তোরাঁর ভেতর গ্রেফতার করার কথা অথচ এখন সে তার সাথে একটা চলন্ত ট্যাক্সিতে রয়েছে।

হাসছে আলেক, কিন্তু চেহারায় আড়ষ্ট একটা ভাব। হাত দুটো শক্ত মুঠো পাকিয়ে বসে আছে নাদিয়া, মাথার ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে তার।

'লোকটা কে?' জানতে চাইল আলেক।

কি বলবে ভেবে পেল না নাদিয়া। আলেকের দিকে তাকাল, সাথে সাথে চোখ ফিরিয়ে নিল। আবার তাকাল, আবার মুখ ফেরাল। একটা ঢোক গিলে জানতে চাইল, যেন আলেকের কথা শুনতে পায়নি বা বুঝতে পারেনি, 'কি?'

'পিছু পিছু ছুটে এল, দেখলে না?' জিজ্ঞেস করল আলেক। 'কে লোকটা? রানিং বোর্ডে উঠে পড়েছিল। ভাল করে চেহারাটা দেখতে পেলাম না। গায়ের রঙে মনে হলো বিদেশী। কে ও?'

মন থেকে ভয় তাড়াবার চেষ্টা করল নাদিয়া। 'ওর নাম মাসুদ রানা, কথা ছিল তোমাকে গ্রেফতার করবে,' গড় গড় করে বলে ফেললে কি ঘটবে? আলেক কোন অভিযোগ করছে না বা দুষছে না ওকে, মনে একটু সাহস ফিরে এল ওর। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আলেক কিছু সন্দেহ করেনি। ওর সন্দেহ দূর করার জন্যে বিশ্বাস্য একটা গল্প বানিয়ে বলতে হবে। রেস্তোরাঁ থেকে পিছু নিয়ে কেন একজন লোক তার ট্যাক্সিতে চড়ার চেষ্টা করবে? 'লোকটা···কে, তা আমি বলতে পারব না। রেস্তোরাঁয় ঢোকার পর থেকেই দেখছিলাম ওকে।' গল্পের বাকি অংশটা হঠাৎ করেই তৈরি হয়ে গেল মনের ভেতর। উৎসাহ বোধ করল নাদিয়া। 'ছোট লোক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। গুণ্ডাপাণ্ডা হবে। যতক্ষণ ছিলাম, বিরক্ত করে মেরেছে। আমি একা, প্রতিবাদ করার সাহস পাইনি। আপনিই দায়ী, এত দেরি করে এলেন কেন!'

'দুঃখিত, নাদিয়া,' তাড়াতাড়ি বলল আলেক। 'সত্যি দুঃখিত আমি।'

কোন রকম জেরা ছাড়াই গল্পটা আলেক বিশ্বাস করল দেখে আত্মবিশ্বাস

আরও একটু বাড়ল নাদিয়ার। 'কিন্তু মি. বোগান, আমরা ট্যাক্সিতে কেন?' জানতে চাইল সে। 'এরকম তো কথা ছিল না! আপনার সাথে কোথাও যেতে হবে জানলে...'

'একটুও ভয়ের কিছু নেই,' হাসি হাসি মুখ করে, আদর করার সুরে বলল আলেক। 'আমি...'

'কথা ছিল আপনি আমাকে বুজম রেস্তোরাঁয় ডিনার খাওয়াবেন। তা না, চিঠি পাঠিয়ে বাইরে ডেকে পাঠালেন...'

'তোমাকে নিয়ে আরও চমৎকার একটা প্ল্যান করেছি, নাদিয়া,' বলল আলেক। 'ডিনার তো সবাই খায়, আমরা খাব পিকনিক। গাড়ির পেছনে একটা বাস্কেট আছে।'

সত্যি, না মিথ্যে? রেস্তোরাঁয় ওর জন্যে ফাঁদ পাতা আছে, তা কি আগেভাগে টের পেয়েছিল ও? তাই কি ভেতরে না ঢুকে চিঠি পাঠিয়ে বাইরে বের করে নিয়ে এসেছে তাকে? মেজর রানার হয়ে কাজ করছে সে, ও কি তা জানে? তাই প্রতিশোধ নেবার জন্যে দূরে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে তাকে? মরুভূমিতে নিয়ে গিয়ে বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে?

হঠাৎ গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ার একটা ঝোঁক চাপল নাদিয়ার। চোখ বুজে মাথা ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করল সে। ভাবল, ফাঁদ টের পেয়ে থাকলে রেস্তোরাঁর বাইরে পর্যন্ত এল কেন আলেক? রানিং বোর্ডের লোকটা সম্পর্কে তার গল্প বিশ্বাস করেছে বলে মনে হয়, কিন্তু আড়ষ্ট হাসিটার পিছনে কি লুকিয়ে আছে কে জানে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল নাদিয়া।

'শহর থেকে মাইল কয়েক দূরে, নদীর ধারে ভাল একটা স্পট চিনি আমি, পিকনিকের জন্যে আদর্শ,' বলল আলেক। 'গাছের তলায় বসে দেখতে পাব সূর্য ডুবে যাচ্ছে। দেখো না, পরিবেশটা এত সুন্দর, মুগ্ধ হয়ে যাবে তুমি।'

'না।'

ব্যস্ত হয়ে উঠল আলেক। 'সে কি! কি হলো তোমার?'

'আপনাকে আমি ভাল করে চিনি না পর্যন্ত...?'

'দূর পাগলী! তাতে কি! প্রথম অবস্থায় কেউই তো কাউকে চেনে না। এদিকে ফেরো, আমার মুখের দিকে তাকাও।' ফিরল নাদিয়া। 'আমাকে ভাল করে দেখো, মনে হয়, আমি খারাপ লোক?'

তুমি একটা খুনী! তোমাকে আমি ঘৃণা করি! তুমি ইসরায়েলের স্পাই! মুখে বলল নাদিয়া, 'তা জানি না। কিন্তু বুঝতে পারছি, ট্যাক্সি থেকে নেমে যাওয়া উচিত আমার।'

'প্লীজ, নাদিয়া!' আবেদনের সুরে বলল আলেক। 'তাহলে আমি কিন্তু সাংঘাতিক আঘাত পাব মনে। তোমার সঙ্কোচ আমি বুঝি। কিন্তু আমরা তো একা থাকছি না, আমাদের সাথে ড্রাইভার রয়েছে না? তাছাড়া, কিভাবে তুমি ভাবতে পারলে আমি তোমার অসম্মান করব? ছি, ছি। তোমাকে দেখে...বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, মনে হলো এ তো সেই আমার স্বপ্নে দেখা মেয়েটি...'

'থাক!'

'জানো, শুধু তোমার জন্যে কি কি নিয়ে এসেছি আমি? রোস্ট করা মুরগী, জ্যাম, জেলি, পনির, মাখন, রুটি, কলা, মধু···দাঁড়াও মনে করি, আরও আছে···পুডিং, কাজু বাদাম, সোডা ওয়াটার, শ্যাম্পেন, চিংড়ির কাটলেট··· টুকিটাকি আরও কত কি!'

'খুব খুশির কথা,' বলল নাদিয়া। 'কিন্তু ডিনারের জায়গায় পিকনিক করতে চাইলে আরেকজনের অনুমতি যে দরকার হয়, এই সাধারণ ভদ্রতাটুকু কেন নেই আপনার?'

'শেষ মুহূর্তের প্ল্যান, নাদিয়া,' সবিনয়ে ব্যাখ্যা করল আলেক। 'তাই তোমার সাথে যোগাযোগ করার সময় পাইনি। সেজন্যে আমি দুঃখিত।'

'হঠাৎ পিকনিকের বুদ্ধি মাথায় এল কেন?' জানতে চাইল নাদিয়া।

'আসলে কি জানো, রেস্তোরাঁর পরিবেশ আমার কোন কালেই পছন্দ নয়,' বলল আলেক। 'বিশেষ করে তোমার মত এমন সুন্দরী এক মেয়ের সাথে কোথাও বসে খেতে হলে নির্জন একটা জায়গা দরকার, যেখানে নদী থাকবে, খোলা বাতাস থাকবে, সূর্য ডোবার পর আকাশে চাঁদ থাকবে···'

'চুপ করুন!' চাপা গলায় বলল নাদিয়া। 'আপনি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন!'

একদম গুম মেরে গেল আলেক। খানিক পর ম্লান সুরে বলল, 'ঘাট হয়েছে, মাফ করে দাও।'

লোকটা এত কেন হুজুর হুজুর করছে? ওর আচরণে অশুভ কিসের যেন একটা ইঙ্গিত আছে, সেটা যে কি, ধরতে পারা যাচ্ছে না। পরিস্থিতিটা ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করার চেষ্টা করল নাদিয়া। ইচ্ছে করলে ট্যাক্সি থেকে নেমে যেতে পারে সে, তার নিরাপত্তার জন্যে সেটাই সবচেয়ে ভাল। জীবনে আর কখনও এই লোকের মুখ দেখবে না। সে নিজে চায়ও ঠিক তাই। কিন্তু জানে, সে-ই মেজর রানার একমাত্র ভরসা। তার ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করছে মেজর। তারপর ভাবল, রানার ব্যাপার রানা বুঝবে, তা নিয়ে আমার এত কিসের মাথাব্যথা? মনে করলেই হবে, ওই নামে কোন মেজরের সাথে তার কখনও দেখা হয়নি, আবার সে তার নিজের নাচ আর গানের জগতে ফিরে যাবে···

কিন্তু রানার ব্যাপারে তার মাথাব্যথা নেই, এটা সত্যি নয়। অন্তত, রানা তার একটা কাজে ব্যর্থ হবে, এটা ভাবতেই খারাপ লাগছে তার। উঁহুঁ, আলেক বোগানকে ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে না, কাজটা রানার প্রতি অন্যায় করা হয়ে যাবে। মেজর আমার বন্ধু নয়, প্রেমিক নয়, কিন্তু তবু ওর জন্যে আমার ভালবাসা আছে। ও আমাকে আকৃষ্ট করে। ওর জন্যে আমি অনেক কিছু করতে পারি। বড় ভাইয়ের জন্যে ছোট বোন যেমন অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, তেমনি আমিও রানার জন্যে অনেক কিছু ত্যাগ করতে পারি।

কিন্তু রানাকে নিয়ে এত রাজ্যের কথা ভাবার সময় এটা নয়। আলেকের সাথে তাকে থাকতে হবে, সেটাই আসল কথা। সাথে থেকে ওর মন জয় করতে হবে, আদায় করতে হবে আরেকটা ডেট, জানতে চেষ্টা করতে হবে কোথায় থাকে ও।

ফস্ করে প্রস্তাব দিয়ে বসল, 'চলুন, তারচেয়ে আপনার ওখানে যাওয়া যাক।'

কপালে ভুরু তুলে আলেক জানতে চাইল, 'হঠাৎ এ-কথা?'

নাদিয়া বুঝল, ভুল করে ফেলেছে। সংশোধনের জন্যে তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি অস্বস্তি বোধ করছি, মি. বোগান। যাই বলুন, আপনাকে আমি চিনি না। লোকজন নেই, ফাঁকা জায়গা, আপনার সাথে বসতে আমার খারাপই লাগবে। একটা পাড়ার ভেতর একটা বাড়ি, সেটা যেন অনেক নিরাপদ, স্বস্তিকর। কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনার আচরণ কেমন যেন! রেস্তোরাঁয় ছেলেটাকে না পাঠিয়ে আপনিও তো ঢুকতে পারতেন? প্রস্তাব দিতে পারতেন যে ডিনারের বদলে পিকনিকে যেতে চান। কিন্তু তা না করে আপনি…'

'তুমি শহুরে, আধুনিক মেয়ে, এত ভয় পাবে জানলে…'

'আপনার ওখানে যেতে আপত্তি কিসের?' মৃদু গলায় জানতে চাইল নাদিয়া।

'আপত্তি নেই, একটু অসুবিধে আছে,' বলল আলেক।

নাদিয়ার মনে হলো, তার ভূমিকা না বদলালে প্রোগ্রামটা বাতিল করে দিতে পারে আলেক। সেক্ষেত্রে আরেকটা ডেট আদায় করার আশায় গুড়ে বালি। বাড়িতে কেন নিয়ে যেতে চাইছে না, বোঝাই যাচ্ছে। মাত্র দু'দিনের পরিচয় যার সাথে তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না আলেক। কাজেই এ-ব্যাপারে কথা আর না বাড়ানোই ভাল, তাকে সন্দেহ করে বসতে পারে। 'তাহলে বেশ, তবে তাই—আপনি যা বলেন।'

নাদিয়াকে লক্ষ করছিল আলেক। সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে নিয়ে বলল সে, 'তুমি খুব বিচ্ছু মেয়ে, বাবা! পসাইডোনকে এমন শাসালে! বিশ্বাস করো, তুমি পাশে বসে আছ সেজন্যে ভয়ই করছে আমার। গায়ে গা ঠেকে গেলে কি না কি ভেবে বসো।'

নাদিয়া একটু গম্ভীর হলো, কথা বলল না।

'যতদূর বুঝতে পারছি, পুরুষদের তুমি বিশেষ পাত্তা দাও না,' আবার বলল আলেক। 'আমার ভাগ্যটা খুলল কিভাবে?'

'বিদেশী লোকদের প্রতি ছোটবেলা থেকেই আমার একটা কৌতূহল আছে,' বলল নাদিয়া। 'তাই আপনার ডিনারের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলাম।'

'আমি অবশ্য হাফ বিদেশী,' বলল আলেক। 'তোমার এই ড্রেস কিন্তু ফ্যানটাসটিক, দারুণ মানিয়েছে। অবশ্য তুমি অসাধারণ সুন্দর বলেই।'

সলজ্জ ভঙ্গি করল নাদিয়া, বলল, 'সত্যি কথাটা বললেই আমি বরং বেশি খুশি হব।'

'তুমি একেবারে যা-তা, কুৎসিত,' হাসল আলেক। 'খুশি হয়েছ?'

নাদিয়া চুপ করে বসে থাকল, হাসল না।

'ভাবছি…' বলে থেমে গেল আলেক।

'তাকাল নাদিয়া। 'কি ভাবছেন?'

'না…মানে, আমি যে পসাইডোন নই, সেটা তোমাকে মনে রাখতে হবে।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল নাদিয়া। দুর্বল একটু হাসি দেখা গেল ঠোঁটে। বলল,

'আচ্ছা।' কিসের ইঙ্গিত দিল আলেক, মেয়ে হয়ে সেটা বুঝতে না পারার কথা নয় তার।

ড্রাইভারের দিকে মনোযোগ দিল আলেক। শহর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ট্যাক্সি, ড্রাইভারকে পথ-নির্দেশ দিতে শুরু করল সে। কয়েকটা গ্রাম ছাড়িয়ে এসে মেঠো পথে পড়ল ট্যাক্সি। ক্রমশ উঁচু হয়ে ছোট একটা পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে। একেবারে মাথায় না উঠে বাঁক নিল ট্যাক্সি, মস্ত একটা সমতল ঝুল-পাথরের ওপর থামল। ওদের ঠিক নিচেই নদী, দূর প্রান্তে দেখা গেল ছোট বড় নিখুঁত আকৃতির খেত-জমি, বিস্তৃত হয়ে বহু দূরের মরুভূমির কিনারায় গিয়ে থেমেছে।

'কি,' জানতে চাইল আলেক, 'জায়গাটা তোমার পছন্দ হয় না? এখানে দু'একবার আরও এসেছি আমি, এলেই আরবী কবিতা আবৃত্তি করতে ইচ্ছে করে।'

দৃশ্যটা যে নয়ন জুড়ানো, স্বীকার না করে পারল না নাদিয়া। এক ঝাঁক রঙের উত্থান ওর চোখের দৃষ্টিকে নিচে থেকে ওপর দিকে টানল, দেখল, কিনারায় কমলা রঙ মেখে গোধূলির মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে। লম্বা এক যুবতী মেয়ে মাথায় পানির কলস নিয়ে নদীর পাড় ধরে চঞ্চল পায়ে বাড়ি ফিরছে। সরু একটা পাল তোলা নৌকো তর তর করে ভাটির দিকে ছুটে চলেছে, তাকে ঘিরে চক্কর দিতে দিতে এগোচ্ছে নিঃসঙ্গ একটা পাখি।

গাড়ি থেকে নেমে গজ পঞ্চাশেক দূরে, একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল ড্রাইভার। ওর সাথে কি আগেই কথা হয়ে আছে আলেকের?—ভাবল নাদিয়া। গাড়ি থেকে নেমে দূরে সরে গিয়ে আলেককে সুযোগ করে দেবে? আত্মরক্ষার জন্যে মনে মনে তৈরি হয়ে গেল নাদিয়া। প্রাণ দিতে হয় দেবে, কিন্তু এই পশুটার লালসার কাছে নতি স্বীকার করবে না সে। গাছের আড়ালে চলে গেলেও, লোকটাকে দেখা গেল মাঝে মধ্যে। একটা খবরের কাগজ খুলে ওদের দিকে পিছন ফিরে বসেছে সে।

গাড়ির পিছনের বনেট তুলে ভেতর থেকে একটা বাস্কেট বের করে নিয়ে এল আলেক। সেটা থেকে খাবার জিনিস নামাচ্ছে। নাদিয়া জানতে চাইল, 'এই জায়গা আপনি আবিষ্কার করলেন কিভাবে?'

'আমি যখন কিশোর, মা আমাকে এখানে বেড়াতে নিয়ে আসত,' বলল আলেক। নাদিয়ার হাতে শ্যাম্পেন মেশানো সোডা ওয়াটারের গ্লাস ধরিয়ে দিল সে। 'বাবা মারা যেতে মা একজন মুসলমানকে বিয়ে করে। মা ছিল জার্মান, খ্রিস্টান। আমার সৎ বাবার সাথে তার বিবাহিত জীবনটা খুব একটা সুখের হয়নি। যখনই মন খারাপ হয়ে যেত, আমাকে নিয়ে চলে আসত এখানে।'

'আপনার ছোটবেলা কেমন কেটেছে এখানে?'

'মার একটা স্বভাব ছিল কি জানো, ভাল কিছু উপভোগ করার যো ছিল না, ঠিক মাঝপথে বাধা দিয়ে ভণ্ডুল করে দিত। এখানে বেড়াতে নিয়ে এসে সৎ-বাবার ওপর যত রাগ জমা থাকত সব ঝাড়ত আমার ওপর। বলত, তুমি তোমার বাপের মত হয়েছ, স্বার্থপরের চূড়ান্ত। ওই বয়সে আমার নতুন মুসলিম পরিবারটিকে আমি পছন্দ করতে শুরু করেছি। আমার সৎ-ভাইয়েরা ছিল শয়তানের একশেষ, কেউ তাদের শাসন করত না। লোকের বাগান থেকে কমলা চুরি করতাম আমরা, পাথর

ছুঁড়ে ঘোড়া ক্ষেপাতাম, সাইকেলের বাতাস ছেড়ে দিতাম··· কিন্তু মার চোখ ফাঁকি দেয়া সম্ভব ছিল না। তার মনটা খুব নরম ছিল, বেশি বকাঝকা করত না, শুধু সাবধান করে দিয়ে বলত, একদিন তুই ধরা পড়বি, আলেক!'

মা তোমার ঠিকই বলত, ভাবল নাদিয়া, তোমাকে আমরা ঠিকই একদিন ধরে ফেলব। ভয় ভয় ভাবটা কাটিয়ে উঠছে নাদিয়া। কিন্তু মনের কোণে হঠাৎ একটা প্রশ্ন উঁকি দিতেই আবার উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠল শরীর, সেই ছুরিটা, যেটা দিয়ে আসিউতে করপোরালকে খুন করেছে আলেক, সেটা কি ওর সাথে আছে এখনও?

পরিবেশটা এত সুন্দর, সুসংযত একজন ভদ্রলোক নদীর পাশে বসে একটা মেয়ের সাথে নিজের সুখ-দুঃখের কথা বলছে···লোকটার কাছ থেকে কিছু যে আদায় করতে হবে, একথা ভুলেই গিয়েছিল নাদিয়া।

'এখন আপনি থাকেন কোথায়?' জানতে চাইল ও।

'আমার বাড়িটা···নিজেদের কাজে লাগিয়েছে মিলিটারি,' মৃদু কণ্ঠে বলল আলেক। 'আপাতত বন্ধুদের কাছে আছি।' নাদিয়ার হাতে একটা চীনামাটির প্লেট ধরিয়ে দিল সে। চোখ নামিয়ে মুরগীর রোস্টের দিকে তাকাল নাদিয়া।

ভাবল, এত খাতির করছে, নিশ্চয়ই কিছু আদায় করতে চায় লোকটা! কিন্তু কি সেটা?

রাগে অন্ধ হয়ে গেল রানা। আর যতই রাগল, ততই বাড়তে লাগল মুখের ব্যথা। নিজের ওপর নিজের রাগ, কাজেই কারও কাছ থেকে সান্ত্বনাও পাওয়া গেল না। নিজেকে ব্যঙ্গ করল ও, বড় মুখ করে বলে বেড়ালে আলেক বোগানকে গ্রেফতার করবে, এখন? তুমি একজন প্রফেশন্যাল হয়েও আলেক বোগানের কাছে এমনিভাবে হেরে গেলে। লোকটা তোমাকে বোকা বানিয়ে ছাড়ল। মাঝখান থেকে বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়ল বেচারী নাদিয়া।

নিজের ফ্ল্যাটে একা বসে আছে রানা। চোয়ালে নতুন করে ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়েছে। ব্যথা কমাবার জন্যে পেইন-কিলার ট্যাবলেট খেয়েছে ও, এখন জিন ভরা গ্লাসে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে। নিজের ব্যর্থতাকে ক্ষমা করতে পারছে না ও। এত সহজে হাত ফস্কে গেল আলেক! ওর দৃঢ় বিশ্বাস, অ্যামবুশের কথা আগেভাগে জানতে পারেনি আলেক, জানলে রেস্তোরাঁর এক মাইলের মধ্যে আসত না সে। না, শুধু সাবধানের মার নেই বলে সতর্কতা অবলম্বন করেছিল, এবং সেটাই কাজে লেগে গেছে।

ট্যাক্সিটাকে ওরা সবাই ভাল করে দেখার সুযোগ পেয়েছিল। জার্মান গাড়ি, প্রায় নতুনই বলা চলে। বর্ণনা এবং নম্বর পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে সবগুলো থানায়। মিলিটারি পুলিসকেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে অন্তত কয়েকশো পুলিস আর এম.পি. গাড়িটার খোঁজ করছে। তাদের ওপর নির্দেশ আছে, গাড়িটাকে দেখতে পেলে থামাতে হবে, গ্রেফতার করতে হবে আরোহীদের সবাইকে।

ট্যাক্সিটা পাওয়া যাবে, রানা জানে। সেই সাথে জানে, ততক্ষণে দেরিও হয়ে

যাবে অনেক। অন্তত আলেক বোগানকে তাতে পাবার আশা না করাই ভাল। তবু ফোনের পাশেই বসে আছে রানা।

নাদিয়া…এই মুহূর্তে কি করছে সে? হয়তো অভিজাত কোন রেস্তোরাঁর নির্জন কেবিনে বসে আছে, মোমবাতির ঠাণ্ডা আলো পড়েছে তার সরল মুখে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আলেক, সেটা লক্ষ করে দুষ্টামির ক্ষীণ হাসি ফুটল নাদিয়ার ঠোঁটে। কি নিয়ে যেন কৌতুক করল আলেক, খিলখিল করে হেসে উঠল নাদিয়া, হাতের গ্লাস থেকে ছলকে পড়ল খানিকটা কোক। সেই হাসি দেখে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল আলেকের, ভাবল, এই মেয়ের কাছে যা খুশি চাইলেই পাব আমি।

হাতঘড়ি দেখল রানা। এতক্ষণে হয়তো ডিনার শেষ করেছে। এরপর কি করবে ওরা? নতুন প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্যে প্রায় ধরাবাঁধা নিয়ম হলো, চাঁদের আলোয় পিরামিড দেখতে যাওয়া।

কল্পনার চোখে দেখতে পেল রানা—কালো আকাশ, মিটি মিটি জ্বলছে অসংখ্য তারা, চারদিকে ধু-ধু মরু প্রান্তর, ওদের সামনে নিখুঁত ত্রিভুজ আকৃতির সমাধি, পিরামিড। গোটা এলাকাটা হবে নির্জন, থাকলে বড়জোর থাকতে পারে আরও এক জোড়া কপোত-কপোতী। ধাপ বেয়ে সমাধির খানিকটা ওপরেও উঠতে পারে ওরা। প্রথমে লাফ দিয়ে বেশ একটু উঠে যাবে আলেক, তারপর দ্রুত নেমে এসে হাত বাড়িয়ে নাদিয়ার কব্জি চেপে ধরে উঠতে সাহায্য করবে। এরই মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে নাদিয়া, একটু একটু হাঁপাচ্ছে। হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে সে বলবে, না, থামো, একটু জিরিয়ে নিই। কিন্তু হো হো করে হেসে উঠে তার কথা উড়িয়ে দেবে আলেক, আরও একটু নিচে নেমে এসে দু'হাত দিয়ে নাদিয়াকে ধরবে সে, পাঁজাকোলা করে তুলে নেবে বুকে।

সূর্য অস্ত গেলেও, পাথর এখনও গরম হয়ে আছে। সেই গরম পাথরে পাশাপাশি গায়ে গা ঠেকিয়ে বসবে ওরা। ফুরফুরে বাতাসে উড়বে নাদিয়ার চুল, চোখ থাকবে আকাশের গায়ে তারার মেলায়। ঠিক এরপর কি ঘটতে পারে, নিজেকে কল্পনা করতে দিল না রানা।

ট্যাক্সির দিকে ফেরার সময় হাত কাটা গাউন পরে থাকায় ঠাণ্ডায় একটু একটু কাঁপবে নাদিয়া। আলেক হয়তো তাকে একটু গরম দেয়ার জন্যে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরবে কাঁধটা। ট্যাক্সিতে চড়ে আলেক কি নাদিয়াকে চুমো খাবার চেষ্টা করবে? উঁহুঁ, এই আচরণের বয়স পেরিয়ে এসেছে আলেক। প্রেম নিবেদন করার জন্যে আরও পরিশীলিত কোন কৌশলের সাহায্য নেবে সে। নাদিয়াকে নিয়ে সে কি তার বাড়িতে যেতে চাইবে? নাকি বলবে, চলো, তোমার বাড়িতেই যাওয়া যাক? ঠিক কোন্‌টা আশা করা যায়, ভেবে পেল না রানা। ওরা যদি আলেকের বাড়ি যায়, সকালে ওর কাছে রিপোর্ট করবে নাদিয়া, তাহলে বাড়িতেই আলেককে গ্রেফতার করতে পারবে ও। সেই সাথে হাতে আসবে তার রেডিও, কোড বুক ইত্যাদি। কিন্তু তার মানে এই হবে যে আলেকের সাথে একটা রাত কাটিয়েছে নাদিয়া।

চিন্তাটা মাথায় আসতেই রাগে অস্থির হয়ে উঠল রানা। আলেকের মত একটা

লোকের সাথে নাদিয়ার মত ভাল একটা মেয়ে রাত কাটাতে বাধ্য হবে, চিন্তাটাই তার কাছে অসহ্য লাগল। অথচ এর কোন কারণ খুঁজে পেল না ও।

আর, ওরা যদি নাদিয়ার বাড়িতে যায়, আলেককে গ্রেফতার করা কোন সমস্যাই হবে না। তিনটে গাড়ি আর দশজন লোক নিয়ে ওখানে অপেক্ষা করছে ফরহাদ।

সোফা ছেড়ে মেঝেতে পায়চারি শুরু করল রানা। এক সময় টেবিলের পাশে থামল, অলস হাতে তুলে নিল ইংরেজী উপন্যাস রেবেকা। ওর ধারণা, কোডের বেস হিসেবে এই বইটাকেই ব্যবহার করছে আলেক। প্রথম লাইনটা পড়ল ও—'লাস্ট নাইট আই ড্রেমট আই ওয়েন্ট টু ম্যানডারলি এগেন।' বইটা রেখে দিল ও।

কার বয়স বেশি, ওর না নাদিয়ার? নাকি দু'জনে সমান সমান? সিগারেট ধরাল রানা। নাদিয়া সম্পর্কে কি জানে আর কি জানে না তার একটা হিসেব শুরু হলো মনের ভেতর। মেয়েটা উল্টো আভাস দিলেও, রানা বিশ্বাস করে, ওর চরিত্রে কোন কলঙ্ক নেই। ওর ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ ওকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। মেয়েটা জন্মগতভাবে নিরীহ ও ভাল। নিজেও ফুলের মত, ফুল ভালও বাসে। জীবনের প্রতি ওর একটা বিতৃষ্ণা আছে, তার কারণ কেউ ওকে বুঝতে চায়নি, এমন কি নিজের বাবাও ওকে ভুল বুঝে আঘাত দিয়েছেন।

নাদিয়ার মুখে তার জীবনের এইসব দুঃখের কথা শোনার সময় সহানুভূতিতে কাতর হয়ে উঠেছিল রানার মন। সেটা মুখে প্রকাশ করেনি, কারণ, নাদিয়াকে দিয়ে কাজ করাতে হলে ওর সাথে বেশি মাখামাখি বা ঘনিষ্ঠতা করা চলবে না বলে নিজেকে আগেই সাবধান করে রেখেছিল ও। কিন্তু কৌশলে তার অন্ধ বাবার ঠিকানাটা ঠিকই আদায় করে নিয়েছিল। সেই ঠিকানায় নাদিয়ার বাবার কাছে সব কথা জানিয়ে চিঠিও লিখেছে রানা। লিখেছে, আপনার মেয়েকে আপনি ভুল বুঝেছেন। নাদিয়া শিশুর মতই নিষ্পাপ। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে আরও লিখেছে, আপনি আমাকে নাদিয়ার ভাই বলে মনে করবেন। আমি ওর শুভানুধ্যায়ী। তারপর লিখেছে, আপনাকে যে টাকাটা পাঠানো হলো, সেটা আপনার মেয়েরই টাকা, অগ্রিম দেয়া হলো তাকে। নাদিয়া এখন দেশের স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করছে। যে-কোন বাপের জন্যে গর্ব করার মত একটা কাজ সেটা। আমি আন্তরিকভাবে চাই নাদিয়ার উপার্জন করা এই টাকা দিয়ে আপনি আপনার চোখের চিকিৎসা করাবেন। শুনেছি, অপারেশন করলেই আপনার চোখ সেরে যাবে। সবশেষে রানা লিখেছে, সিটি আই হসপিটালের সাথে যোগাযোগ করব আমি, ওখানে পৌঁছলেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাবেন আপনি।

ভদ্রলোক চিঠি এবং টাকা এতদিনে নিশ্চয়ই পেয়েছেন। কোন উত্তর পায়নি রানা, তবে টাকাটাও ফেরত আসেনি। হতে পারে, নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন নাদিয়ার বাবা। চোখ সারিয়ে তারপর হয়তো মেয়ের সাথে দেখা করবেন।

হাতের সিগারেট নিভে গেছে। সেটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে আবার একটা ধরাল রানা। জানি অনেক কিছু, ভাবল সে, কিন্তু শুধু একটা ব্যাপার জানা হয়নি।

আমাকে কি মনে করে নাদিয়া? কি ভাবে আমার সম্পর্কে?

সময় এত আস্তে আস্তে কাটছে কেন! ফোন কেন বাজছে না! দু'দিনের মধ্যে কিভাবে সে আলেক বোগানকে আঙুলের ফাঁক গলে দু'বার বেরিয়ে যেতে দিতে পারল! নাদিয়া কোথায়?

নাদিয়া...তার কোন বিপদ হয়নি তো?

নাদিয়াকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে ঘরে বসে আছে ও, চিন্তাটা মাথায় আসতেই নিজেকে দায়িত্বহীন বলে মনে হলো। ঘুম যে আসবে না, আসা উচিত নয়, এটুকু পরিষ্কার বুঝল। ডা. কুলসুম বিশ্রাম নিতে বলেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে তা সম্ভব নয়। গায়ে কোট চড়াল, ইউনিফর্ম ক্যাপটা হাতে নিল, তারপর কুরবান আলিকে দরজা বন্ধ করে দিতে বলে বেরিয়ে এল বাইরে।

মোটরসাইকেল নিয়ে নাদিয়ার বাড়ির দিকে ছুটল রানা।

দশ

ঝুল-পাথরের কিনারায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ওরা। দূরে দেখা গেল কায়রো শহরের ঝলমলে আলো। কৃষকদের অন্ধকার গ্রামগুলো একেবারে কাছে, মাঝে মধ্যে দু'একটা নিবু নিবু প্রদীপ দেখা যায়। দীন এক যুবক কৃষককে কল্পনা করতে চেষ্টা করল নাদিয়া। সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে, অথচ দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। সরল, নিরীহ মানুষ, কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে। রাতের বেলা খড় বিছিয়ে শোয়, শীত লাগলে গায়ে দেয়ার কিছু থাকে না, বউকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে গরম পেতে চায়। এটা ঠিক নাদিয়ার কল্পনা নয়। গ্রামের মেয়ে সে, ছোটবেলা থেকে এই দৃশ্যই দেখে আসছে। জ্ঞান হবার পর থেকে তাই গরীব মানুষ দু'চোখে দেখতে পারত না সে। গরীব পরিবারের মেয়ে বলে নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিত। আজ অনেক দিন পর আবার মনে পড়ল কাদিরের কথা। সে-ও গরীব পরিবারের যুবক। বাবা অনেক কষ্টে লেখাপড়া শেখালেও কাদির চাকরি জোগাড় করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত বিনা বেতনে গ্রামের স্কুলে মাস্টারী করত সে, মাঝে মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকরা মাস দু'মাসে দাওয়াত করে এক-আধ বেলা খাওয়াতো, লাভের মধ্যে এইটুকু। এই কাদির ভালবাসত তাকে। কিন্তু ওই গরীব বলেই তাকে কখনও পাত্তা দেয়নি নাদিয়া। আজ তার বড় জানতে ইচ্ছে করে, কাদির এখন কোথায়? কি করছে? সে কি বিয়ে করেছে?

ছেলেটা সৎ ছিল। হবেই তো, বাবার ছাত্র ছিল যে! দেখতে কালো হলেও, শান্ত চেহারায় কোন খুঁত ছিল না। কথা বলত খুব কম, স্বভাবটা ছিল নির্বিরোধী। কারও সাতে-পাঁচে থাকত না, আঘাত পেলেও মুখ বুজে সহ্য করত। নিজের ভাগ্য ফেরাবার কোন চেষ্টা-উদ্যোগ ছিল না তার, সেজন্যেই তাকে দু'চোখে দেখতে পারত না নাদিয়া। কাদির ওকে ভালবাসে জানার পর ওর মনের পর্দায় দুঃস্থ এক

সংসারের ছবি ফুটে উঠেছিল। সে সংসারের কর্তা হলো বিনা বেতনের এক স্কুল মাস্টার আর কর্ত্রী হলো ছেঁড়া কাপড় পরা হাড় জিরজিরে একটা মেয়ে—নাদিয়া। সেই থেকে কাদিরের কথা মনে পড়লেই ভয়ে শিউরে উঠত সে।

আজ অবশ্য তেমন কিছু হলো না। বরং কাদির সম্পর্কে জানার জন্যে নিজের মধ্যে আশ্চর্য একটা কৌতূহল জাগল। কেন যেন মনে হলো, এত অভাব, এত কুসংস্কার থাকা সত্ত্বেও গ্রামের সহজ সরল জীবনে কি যেন একটা আছে, শহরে যা পাবার কোন আশা নেই, সেই জিনিসটা কি পরিষ্কার বুঝতে না পারলেও, আজ হঠাৎ করে সেটার দারুণ অভাব বোধ করল সে।

দর্শকদের মনোরঞ্জন, অশ্লীল নাচ, এসবের মধ্যে আর ফিরে যাবে না নাদিয়া। ভালবাসা পাবার জন্যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছোটাছুটি করেছে সে, পায়নি কোথাও। এতদিনে বুঝেছে, ভাগ্যে না থাকলে জিনিসটা পাবার নয়। তাই খোঁজাখুঁজি করা বৃথা। তারচেয়ে নিজেকে নিজের ভেতর গুটিয়ে নেয়াই ভাল।

মেজর রানার কথা মনে পড়ল। ভাবল, এই লোককে ভালবাসার প্রশ্নই ওঠে না। যাকে বোঝাই কঠিন, নাগালের মধ্যে আসে না, তাকে একটা মেয়ে ভালবাসে কিভাবে? আনাড়ী, অনভিজ্ঞ একটা ভাব আছে মেজরের আচরণে, কিন্তু তার মানে এই নয় ফাঁদ পাতলেই তাতে ধরা পড়বে। উঁহুঁ, ধরা পড়বে জানলেও রানার জন্যে ফাঁদ পাতবে না সে। কেউ বলে দেয়নি তবু জানে সে, এই লোকের নাগাল পাবার সাধ্য নেই তার। দুনিয়ায় কিছু মানুষ থাকে, যাদেরকে চাওয়া যায়, কিন্তু পাওয়ার আশা করা বোকামি ছাড়া কিছু নয়। মেজর তাদেরই একজন। তাই, নিজের করে পাবার জন্যে ওকে কামনা না করাই ভাল।

যুক্তি দিয়ে বোঝা গেল, ওকে তাহলে আমি ভালবাসি না। তাহলে, আমার জীবন থেকে সরে যাবে মনে হলেই বুকের ভেতর কষ্ট হয় কেন?

তা তো অনেক কারণেই হতে পারে, পারে না? ভাই কোথাও দূর দেশে চলে গেলে বোনের মন কাঁদে না? বন্ধুর সাথে বিচ্ছেদ হলে খারাপ লাগে না?

কিন্তু রানাকে আমি বন্ধু হিসেবেও তো পেতে চাই না। তাহলে?

এই প্রশ্নের উত্তরটাই পেতে হবে তাকে। রানার সাথে কি সম্পর্ক চাই আমি?

তারপর পাশে দাঁড়ানো আলেক বোগানকে নিয়ে ভাবনা শুরু হলো নাদিয়ার। লোকটা যদি জোর করে কিছু আদায়ের চেষ্টা করে, কি করবে সে? চিৎকার করলে কেউ শুনতে পাবে না। ড্রাইভারকে হয়তো শেখানো আছে, শুনতে পেলেও সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। ভয় পেয়ে গেল নাদিয়া। তারপর ভাবল, মেজর রানার হয়ে কাজ করছি, লোকটা কি তা জানে? এখন যদি হঠাৎ আমাকে ধাক্কা দিয়ে পাহাড় থেকে ফেলে দেয়?

মনে মনে আঁতকে উঠল নাদিয়া। ঘুরে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সির দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। পিকনিক শেষ হয়েছে ওদের। খাবার-দাবারের পিছনে যথেষ্ট খরচ করেছে আলেক। এবার সে তার উপহার চাইবে। কাজেই সাবধান হওয়া দরকার। ট্যাক্সির কাছে এসে দাঁড়াল নাদিয়া। ঘাড় ফেরাতে যাবে, আঁতকে উঠে

দেখল, পাশে চলে এসেছে আলেক। পিছু পিছু কখন এসেছে, টের পায়নি।

'সময়টা ভালই কাটল, কি বলো?' জানতে চাইল আলেক।

জোর করে একটু হাসল নাদিয়া। 'হ্যাঁ, বেশ ভালই তো লাগল। ধন্যবাদ। এবার আমি বাড়ি ফিরতে চাই।'

নাদিয়ার শেষ কথাটা আলেক যেন শুনতেই পায়নি, হাতছানি দিয়ে ড্রাইভারকে ডাকল সে, তারপর নাদিয়ার পাশে উঠে বসল গাড়িতে।

গাড়ি ছেড়ে দিল ড্রাইভার।

নাদিয়া ভাবল, আলেক বোগান, যত ধূর্তই তুমি হও, আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার তুমি পাবে না। বাড়ি ফিরতে চাইলাম, এমন ভান করলে যেন শুনতেই পাওনি! ঠিক আছে, দেখা যাক তুমি আমাকে বাধা দিতে পারো কিনা। তারপরই মনে পড়ল, মেজর রানা বলে দিয়েছে, লোকটার সাথে তাকে ঘনিষ্ঠ হতে হবে, ভান করতে হবে সে তার প্রেমে পড়েছে। তা না হলে নিজের ঠিকানা ইত্যাদি দেবে কেন লোকটা!

'সীমান্তের খবর শুনেছেন?' হঠাৎ জানতে চাইল নাদিয়া।

'এসব কিছু না,' বলল আলেক। 'ইসরায়েল খোঁচা দিয়ে দেখছে, মিশরের দুর্বলতা কোথায়। ব্যাপক আক্রমণ আসবে আরও পরে।'

'তাই?'

'একজন মিশরীয় হিসেবে আমি চাইব ইসরায়েলি হামলা যেন না হয়,' বলল আলেক। 'কারণ আমি জানি, ধাক্কাটা মিশর সামলাতে পারবে না।'

'কেন, মিশর কি ইসরায়েলের চেয়ে দুর্বল?'

'হয়তো দু'জনেই সমান সমান,' বলল আলেক। 'কিন্তু মিশরীয় সেনা-বাহিনীতে শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই। জেনারেল আর কমান্ডিং অফিসাররা ভোগ-বিলাসেই সময় কাটায়, প্রতিরক্ষা নিয়ে তাদের তেমন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। তুমি জানো না, ইহুদি মেয়েদের নিয়ে কি রকম নাচানাচি করে ওরা!'

নাদিয়া চুপ করে থাকল।

'আরও একটা ব্যাপার কি জানো, প্রভু আর দাস, দুনিয়াটা এই দু'দলে ভাগ করা। যারা বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী, এবং নিজেদের অধিকার রক্ষায় সচেতন, তারাই প্রভু। বাকি সবাই দাস।'

'বুঝলাম না,' বলল নাদিয়া। 'ঠিক কি বলতে চাইছেন?'

'ইহুদি আর মুসলমানদের কথা বলছি আমি,' বলল আলেক। 'মিশরীয়দের মধ্যে যারা বেদুইন, তারা স্বাধীনচেতা, পরিশ্রমী—এদেরকে তুমি প্রভুর জাত বলতে পারো, বাকি মিশরীয়রা সবাই দাস। কাজেই বড় ধরনের যুদ্ধ বাধলে মিশরের পরাজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

শহরে ঢুকল ট্যাক্সি। 'কি জানি, এত তত্ত্বকথা বুঝি না।'

'তুমি থাকো কোথায়?' জানতে চাইল আলেক।

ঠিকানাটা বলল নাদিয়া। মনে মনে ভাবল, কি চালাক, ঠিকানা জেনে ফেলব এই ভয়ে আমার বাড়িতে যেতে চাইছে!

'এই, আমরা কিন্তু আজকের মত আবার একদিন বেরুব, কেমন?' জিজ্ঞেস করল আলেক। 'কি, তুমি রাজি তো?'

'ঠিক আছে,' বলল নাদিয়া।

'সেবার কিন্তু তুমি আমাকে আপনি বলবে না।'

একটু হাসতে হলো নাদিয়াকে।

শারিয়া আব্বাসে পৌঁছল ওরা। ড্রাইভারকে আলেক বলল, 'থামো।'

বিস্মিত হলো নাদিয়া। এখানে থামতে বলার উদ্দেশ্য? কি ঘটবে এখন?

তার দিকে ফিরল আলেক। বলল, 'মত দিয়েছ, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ, নাদিয়া। খুব তাড়াতাড়ি আবার আমরা দেখা করব, কেমন?' বলে গাড়ি থেকে নেমে গেল সে।

হতভম্ব হয়ে গেল নাদিয়া। দেখল, মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে ড্রাইভারকে ভাড়া দিচ্ছে আলেক। সেই সাথে নাদিয়ার ঠিকানাটা জানিয়ে দিল। মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার। ট্যাক্সির ছাদে একটা চাপড় দিল আলেক, ড্রাইভার ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। পিছনের জানালা দিয়ে তাকাল নাদিয়া, দেখল, আলেক হাত নাড়ছে। তারপর নদীর দিকে হাঁটতে শুরু করল সে।

নাদিয়া ভাবল, এসব থেকে কি বুঝব আমি?

কোন ইঙ্গিত নয়, নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ নয়, এমন কি চুমো খাবারও কোন চেষ্টা নয়··· ব্যাপারটা কি? আমাকে পাওয়া এত সহজ নয়, আলেক কি এই কথাটাই বোঝাতে চাইল?

বাড়ি ফেরার পথে গোটা ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে লাগল নাদিয়া। কে জানে, আলেকের এটাই হয়তো টেকনিক। একটা মেয়েকে প্রথমে সে অবাক করে দেয়, মানসিক ভাবে অস্থির করে তোলে, তারপর হয়তো টোপ ফেলে গেঁথে তুলতে চেষ্টা করে। কিংবা, কে জানে, লোকটা এই রকমই, একটু বিদঘুটে। তা সে যাই হোক, আপাতত নিষ্কৃতি পাওয়ায়, ভাগ্যের ওপর কৃতজ্ঞ বোধ করল সে। পিছনের সীটে হেলান দিয়ে ঢিল করে দিল শরীরটা। এই লোক যদি তাকে বিছানায় নিয়ে তুলত, বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারত না সে। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে। একটা ফাঁড়া কেটেছে যেন।

ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে থামল ট্যাক্সি। হঠাৎ করে, কোত্থেকে যেন গর্জে উঠল তিনটে গাড়ি। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক করে ট্যাক্সির নাকের ডগায় থামল একটা, আরেকটা থামল পাশে, শেষেরটা পিছনে। অন্ধকার ছায়া থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল লোকজন। ট্যাক্সির চারটে দরজাই হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলে ফেলা হলো। ভেতরে ঢুকল চারটে রিভলভারের ব্যারেল। মুখে হাত চাপা দিয়ে আর্তনাদ করে উঠল নাদিয়া।

দরজা দিয়ে একটা মাথা ঢুকল ট্যাক্সির ভেতর। রানাকে চিনতে পারল নাদিয়া।

'চলে গেছে?' জানতে চাইল রানা।

কি ঘটেছে, বুঝতে পারল নাদিয়া। নিজেকে সামলে নিতে নিতে বলল, 'আপনারা আমাকে গুলি করে মেরে ফেলতে যাচ্ছিলেন!'

'ট্যাক্সি থেকে কোথায় নামল সে?'

'শারিয়া আব্বাস।'

'কতক্ষণ আগে?'

'পাঁচ-সাত মিনিট। ট্যাক্সি থেকে নামব?'

নাদিয়ার একটা হাত ধরল রানা, ট্যাক্সি থেকে বেরিয়ে এসে ফুটপাথে দাঁড়াল নাদিয়া। রানা বলল, 'ভয় পেয়েছ, সেজন্যে আমি দুঃখিত···'

'একেই বলে, ঘোড়া পালালে ঘোড়াশালের দরজা বন্ধ করা!'

'হ্যাঁ,' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল রানা। আলেক বোগান আবার ফাঁকি দিয়েছে ওকে, চেহারায় ফুটে উঠল ব্যর্থতার গ্লানি।

তাই দেখে নাদিয়ার মনে উথলে উঠল দরদ। রানার হাত ছুঁলো সে। 'এর জন্যে আমিই হয়তো দায়ী। আরও একটু চেষ্টা করলে লোকটা হয়তো আমার সাথে ফ্ল্যাটে আসতে রাজি হত।' এক সেকেন্ড থেমে আবার বলল সে, 'বিশ্বাস করুন, লোকটার সাথে যতক্ষণ ছিলাম, শুধু আপনার কথা মনে পড়ছিল।' বলেই বুঝল, রানা তাকে নির্লজ্জ ভাবতে পারে। শুধরে নেবার আশায় আবার বলল সে, 'মানে, লোকটার হাত থেকে কখন আপনি এসে আমাকে উদ্ধার করবেন, তাই ভাবছিলাম।'

রানা শুধু তাকিয়ে থাকল, কিছু বলল না।

'আপনার লোকদের ফেরত পাঠিয়ে চলুন না, আমার ঘরে একটু বসবেন?' জিজ্ঞেস করল নাদিয়া।

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরল রানা, বলল, 'ফরহাদ, হেডকোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে ড্রাইভারকে চেপে ধরো, কিছু তথ্য পেয়ে যেতে পারো। তোমার লোকদের ফেরত যেতে বলো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আসছি আমি।'

'ইয়েস, স্যার।'

পথ দেখিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে রানাকে নিয়ে এল নাদিয়া। নিজের নিরাপদ আস্তানায় ফিরে এসে পরম স্বস্তি বোধ করল সে। সোফায় বসে পা ছুঁড়ে জুতো খুলল। পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আলেক নেই, তার বদলে রানা এখানে। মেজরের সাথে থাকতে তার কোন ভয় নেই।

সামনের সোফায় বসেছে রানা, সিগারেট বের করে ধরাচ্ছে। নাদিয়া জানতে চাইল, 'বলুন, গরম নাকি ঠাণ্ডা?'

'কিছুই না, ধন্যবাদ।'

'কিভাবে কি ঘটল, ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে পরিষ্কার নয়,' বলল নাদিয়া। 'গোলমালটা বাধল কোথায়?'

সিগারেটে টান দিয়ে ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ল রানা, ধোঁয়ার একটা স্তম্ভ উঠে গেল সিলিঙের দিকে। 'আমরা আশা করেছিলাম, কিছু না বুঝে সরাসরি ফাঁদে পা দেবে আলেক। কিন্তু অত্যন্ত সাবধানী লোক, কোন কারণ ছাড়াই তার সন্দেহ হয়। কাজেই তাকে আমরা রেস্তোরাঁয় ধরতে পারিনি। তারপর কি ঘটল, বলো।'

সোফার পিঠে মাথা রাখল নাদিয়া, চোখ বুজল, তারপর পিকনিকের ব্যাপারটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে বলল রানাকে। আলেক তাকে বিছানায় তুলতে পারে, আর এই ভয়ে আতঙ্কিত ছিল সে, বলার সময় এই প্রসঙ্গটা বাদ দিয়ে গেল। আলেক যে তাকে একবারও স্পর্শ করেনি, তাও বলল না। কথা বলল খুব দ্রুত—মনে করার জন্যে নয়, ভুলে যাবার জন্যে।

রানার চেহারা থমথমে হয়ে উঠল দেখে ক্ষীণ একটু কৌতুক বোধ করল নাদিয়া। রাগটা কার ওপর কে জানে! ওর মুখের ব্যান্ডেজটা আবার দেখল খুঁটিয়ে। রেস্তোরাঁয় থাকতেও দেখেছিল, কিন্তু তখন কিছু জিজ্ঞেস করার উপায় ছিল না। 'আপনার মুখের এই অবস্থা হলো কিভাবে?'

'কাল রাতে একটুর জন্যে ধরতে পারিনি লোকটাকে,' বলল রানা।

'সে কি!' তার মানে, ভাবল নাদিয়া, চব্বিশ ঘণ্টায় দু'বার হেরে গেছে মেজর রানা। চেহারায় যে রাগ থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি! ইচ্ছা হলো ওকে সান্ত্বনা দেয়, ওর হাত ধরে থাকে। ইচ্ছে হলো রানার মাথাটা নিয়ে কোলে রাখে। মাথার চুলে বিলি কাটে। তারপর, এক দুর্বল মুহূর্তে আচমকা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, আজ রাতে মেজরকে আমি আমার কাছে চাই!

নাদিয়ার চোখে কি দেখল কে জানে, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকাল রানা। জানতে চাইল, 'আলেককে তোমার কেমন মনে হলো?'

'বুদ্ধিমান। সদয়। বিপজ্জনক। বোঝা যায়, প্রয়োজনে এই লোক নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে।'

'চেহারা?'

'পরিচ্ছন্ন,' বলল নাদিয়া। 'গরিলা, কিন্তু মেদ নেই। গোঁফটা মানায়নি। শার্টটা সিল্ক। ঠিক কি জানতে চান আপনি?'

'কিছু না। আবার সবকিছু।'

রানার মন মেজাজ আসলে বুঝতে পারছে না নাদিয়া। মনে মনে চাইছে, উঠে এসে পাশে বসুক মেজর। তাকে বলুক, তুমি সুন্দরী। বলুক, আজ তুমি যা করেছ, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

কিন্তু ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, এসবের ধার দিয়েও যাবে না রানা। অগত্যা নিজেই জিজ্ঞেস করল, 'কেমন করেছি আমি?'

'কি জানি কি করেছ!'

'কেন, বললাম তো!'

'সবটুকু নয়।'

'আর কি বলব?'

'হ্যাঁ, তাও তো বটে,' গম্ভীর দেখাল রানাকে। 'ভালই করেছ, ধন্যবাদ।'

নাদিয়া ভাবল, ধন্যবাদ দিল বটে, কিন্তু মেকি। লোকটার হয়েছে কি? কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে। সেটা কি হতে পারে, নাদিয়ার মনে ধরা দিয়েও দিচ্ছে না। রানার তাকাবার মধ্যে, চোখ ফিরিয়ে নেয়ার মধ্যে আভাস রয়েছে।

'আবার দেখা হবে কিনা জানিয়েছে কিছু?'

'হ্যাঁ,' বলল নাদিয়া।
'ঠিক কি জানিয়েছে?'
'বলল, আবার আমরা এই রকম করব।'
'আচ্ছা! আবার আমরা এই রকম করব, না?'
'হ্যাঁ।'
'কথাটা বলে ঠিক কি বোঝাতে চাইল, বলবে আমাকে? এইরকম মানে কি?'
কাঁধ ঝাঁকাল নাদিয়া। 'আরও একটা ডেট, আরও একবার পিকনিক···আচ্ছা, মেজর রানা, বলতে পারেন আপনার কি হয়েছে?'
'কিছু না, স্রেফ কৌতূহল বোধ করছি,' বলল রানা। চেহারায় আবার থমথমে ভাবটা ফিরে এল। 'জানতে চেষ্টা করছি তোমরা দু'জন কি কথা বললে, কি করলে, কি খেলে, তোমাদের মধ্যে আর কি ঘটল। ট্যাক্সি করে ফেরার সময় দু'জনে কে কোথায় বসেছিলে। বিদায় নেবার সময় কি বলল সে, বা কি করল। তার আগে, নদীর ধারে, অন্ধকারে, তুমি সুন্দরী মেয়ে আর সে একজন সমর্থ পুরুষ, সেখানের পরিস্থিতিটা কি রকম ছিল। এইসব আমার জানতে ইচ্ছে করছে।'
'শাট-আপ!' চোখ বুজল নাদিয়া। এতক্ষণে ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে সে। চোখ না খুলেই বলল, 'আমি ক্লান্ত। শোব। যখন যাবেন, দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে গেলেই হবে।'
কয়েক সেকেন্ড পর দরজায় শব্দ হলো, নাদিয়া বুঝল, রানা চলে গেছে। সোফা থেকে উঠে খোলা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে রানাকে বেরিয়ে যেতে দেখল। মোটরসাইকেলে চড়ে বসে স্টার্ট দিল রানা, বেরিয়ে গেল গেট দিয়ে। বাঁকের কাছে পৌঁছেও স্পীড কমাল না। একটা অ্যাক্সিডেন্ট না বাধিয়ে বসে, ভাবল নাদিয়া।
রাতটা একা কাটাতে হবে, কথাটা মনে হতেই নিজের ওপর রাগ হলো তার। কেমন মেয়ে সে, একটা পুরুষকে বশ করতে পারে না? রানা কিভাবে তাকে এড়িয়ে থাকতে পারে? আমাকে ওর ভাল লাগে, তার প্রমাণ আজ পাওয়া গেছে। কিন্তু আমি ওকে কাছে টানতে ব্যর্থ হচ্ছি কেন?
এত রাগের মধ্যে মুচকি একটু হাসি ফুটল নাদিয়ার ঠোঁটের কোণে। কারণ, আজ একটু আশার আলো দেখতে পেয়েছে সে। বুঝতে পেরেছে, ওর ওপর দুর্বলতা আছে মেজর রানার। বিড়বিড় করে বলল সে, 'মেজর রানা, আমার ধারণা, তুমি ঈর্ষায় ভুগছ।'

এগারো

এই নিয়ে তিন দুপুর হাউজবোটে এল মেজর তারেক।
আগের নিয়মেই রোপা আর আলেক যে-যার দায়িত্ব পালন করল। মেজর

আসছে বুঝতে পেরেই আলমিরাতে লুকাল আলেক। হাতে স্কচ হুইস্কির গ্লাস নিয়ে মেজরের সাথে লিভিংরুমে দেখা করল রোপা। তাকে সেখানেই বসাল সে, লক্ষ্য রাখল বেডরুমে যাবার আগে ব্রীফকেসটা যেন লিভিংরুমেই রেখে যায়। বসার দু'এক মিনিট পরই রোপাকে চুমো খেতে শুরু করল তারেক। সময়ের সাথে সাথে তার ওপর আশ্চর্য কর্তৃত্ব এসে গেছে রোপার, তাকে দিয়ে এখন যা খুশি তাই করিয়ে নিতে পারে সে। নারীদেহের লোভে কুত্তা হয়ে গেছে লোকটা। গতবারের মত তারেকের প্যান্ট খুলে নিল রোপা, প্যান্টের পকেটেই থাকে ব্রীফকেসের চাবি। এর একটু পরই তাকে নিয়ে বেডরুমে চলে এল সে।

আলেকের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, মেজর তারেকের জীবনে এই ধরনের ঘটনা এই প্রথম ঘটেছে। যতদিন ভোগ করার এই অনুমতি বা অধিকার থাকবে, ততদিন রোপার ক্রীতদাস হয়ে থাকতে আপত্তি করবে না সে। নিজের ভাগ্যের প্রতি কৃতজ্ঞ আলেক, শক্ত মনের অন্য কোন লোক হলে ব্যাপারটা এত সহজ হত না।

বিছানা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করছে শুনেই আলমিরা থেকে বেরিয়ে এল আলেক। প্যান্টের পকেট থেকে চাবি বের করে ব্রীফকেস খুলল। পাশেই রয়েছে নোট বুক আর পেন্সিল।

মেজর তারেকের গতবারের ব্রীফকেসে গুরুত্বপূর্ণ কিছুই ছিল না। আলেকের ভয় হয়েছিল, যুদ্ধ পরিকল্পনা বা প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কাগজ-পত্র তারেক হয়তো কদাচ বহন করে।

তার সেই ভয়টা এবার দূর হলো। ব্রীফকেস খুলে টপ সিক্রেট লেখা ওপরের কাগজে চোখ বুলাতেই আলেক বুঝল, আবার তার হাতে সোনার খনি পড়েছে।

প্রথম রিপোর্টটা সিনাই এলাকার মাইনফিল্ড সংক্রান্ত। সীমান্তের লাগোয়া এবং পিছনের এলাকার কোথায় কিভাবে মাইনফিল্ড তৈরি করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এতে। আনন্দে উত্তেজনায় ধেই ধেই করে নাচতে ইচ্ছে করল আলেকের। শুধু বর্ণনা নয়, সেই সাথে ডিটেলস ম্যাপও রয়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর হাতে এই ম্যাপ আর রিপোর্ট পড়লে চোখ বন্ধ করে সিনাই দখল করতে পারবে তারা, একজন সৈনিকও আহত হবে না মাইন বিস্ফোরণে।

দ্বিতীয় রিপোর্টে রয়েছে সিনাই এলাকায় মোতায়েন করা ডিভিশনগুলোর গোলাগুলি মওজুদের পরিমাণ। হেডিংটা পড়েই আলেক বুঝল, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর জন্যে এটা আরও একটা সোনার খনি। সিনাইয়ে মিশরীয়দের গোলাবারুদ কি ধরনের কতটা আছে জানা থাকলে ইসরায়েলিদের পক্ষে প্রস্তুতি নেয়া সহজ হয়ে যাবে।

আলেকের ভাগ্যই বলতে হবে, প্রথম বারের মত এবারের তথ্যগুলো ভুয়া নয়। মিশরীয় সেনাবাহিনীর হাই কমান্ড থেকে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে একটা নোট পাঠিয়ে জানানো হয়েছে, ভুয়া তথ্য ঠাসা কাগজ-পত্র অফিসারদের ব্রীফকেসে ভরে দেয়ার যে ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল সেটা বাতিল করা হয়েছে। এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। এই নোটটা সেকশন ইনচার্জ লে. কর্নেল মোসাদ্দেক

হাসানের হাতে পড়ে, কিন্তু কোন কারণ ছাড়াই রানার কাছে ব্যাপারটা গোপন করে যায় সে।

রিপোর্টগুলো কপি করতে শুরু করল আলেক। প্রায় শেষ করে এনেছে, এই সময় বোতলের ছিপি খোলার আওয়াজে মনোযোগ ছুটে গেল। লেখার গতি বাড়িয়ে দিয়ে ভাবল সে, দিনে দিনে প্রেম করার সময় কমে আসছে মেজরের। ছিপি খোলার এই আওয়াজ মানেই, কাজ শেষ, যে-কোন মুহূর্তে লিভিংরুমে বেরিয়ে আসতে পারে ব্যাটা।

তাড়াতাড়ি লেখা শেষ করে ব্রীফকেসে কাগজগুলো ভরে রাখল আলেক। তালা বন্ধ করে চাবির গোছাটা ঢুকিয়ে দিল প্যান্টের পকেটে। আলমিরার ভেতর আর নয়, একবারই যথেষ্ট। ট্রাউজারের পকেটে জুতো জোড়া ভরে পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ডেকে, সেখান থেকে গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক হয়ে টোপাথে। এখানে থেমে জুতো পরে নিল সে। তারপর শিস দিতে দিতে চলল লাঞ্চ খেতে।

পুলিস সুপার খাদিম সারওয়ার হালকা একটু চাপ দিয়ে করমর্দন করল, নরম গলায় জানতে চাইল, 'এখন কেমন আছেন, মেজর রানা?'

'বসুন,' বলল রানা। 'জখমের চেয়ে ব্যান্ডেজটাই বরং উৎপাত করছে। দিন দেখি,' বলে সুপারের হাত থেকে এনভেলাপটা নিল ও।

সোফায় বসে পায়ের ওপর পা তুলে দিল খাদিম সারওয়ার, ট্রাউজারের ভাঁজগুলোর ওপর যাতে চাপ না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখল। 'হে হে, রিপোর্টটা নিজেই নিয়ে এলাম। কিন্তু...' কাঁধ ঝাঁকাল সে, '... তেমন কিছু নেই এতে।'

এনভেলাপ খুলে এক শীট কাগজ বের করল রানা। টাইপ করা রিপোর্ট পড়তে শুরু করল।

কাল রাত এগারোটায় হাউজবোটে ফিরেছে রোপা ইরিনা, সম্ভবত ডুম-ডাম থেকে। সাথে আর কেউ ছিল না, একা। আজ সকালে দশটার দিকে আবার তাকে দেখা যায়, ডেকের ওপর চাদর মুড়ি দেয়া অবস্থায়। ডাক পিয়ন আসে বেলা একটায়। বিকেল চারটের দিকে বাইরে বেরিয়ে যায় রোপা, ফেরে ছ'টায়। হাতে একটা ব্যাগ ছিল, কায়রোর একটা অভিজাত দোকানের ছাপ মারা। সম্ভবত নতুন কোন ড্রেস কিনেছে সে। এর একটু পরই ওয়াচারের পালা বদলের সময় হয়।

কালও একজন মেসেঞ্জার ঠিক এই রকম একটা রিপোর্ট দিয়ে গিয়েছিল রানাকে। তার মানে দু'দিনের রিপোর্ট থেকে জানা গেল, রোপা ইরিনার আচরণে সন্দেহ করার মত কিছু নেই। আলেক বোগান বা আর কেউ তার হাউজবোটে আসেনি।

ব্যাপারটা মেনে নিতে পারল না রানা। মনে হলো, এর মধ্যে কোথায় যেন কি একটা গলদ আছে। এমন হতে পারে, রোপা ইরিনা আন্দাজ করতে পেরেছে, হাউজবোটের ওপর নজর রাখা হবে, তাই পরিচিত সবাইকে আসতে নিষেধ করে দিয়েছে সে।

'ওয়াচার হিসেবে যাদের আমি দায়িত্ব দিয়েছি, হে হে,' বলল খাদিম সারওয়ার,

'তারা সবাই অত্যন্ত বিশ্বস্ত, সরাসরি আমাকেই রিপোর্ট করছে, মেজর।'

রানা ভাবল, আলেক বোগানের সাথে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও দেখা করছে রোপা। বলল, 'আপনি নিজে এসেছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ, সুপার। গুড বাই।'

'আমরা সিভিলিয়ান, আপনাদের খেদমত করার জন্যেই তো আছি, হে হে,' বলল খাদিম সারওয়ার। 'গুড বাই।'

পুলিস সুপার চলে যেতে গুম হয়ে বসে থাকল রানা। তারপর রিপোর্টটা আবার একবার পড়ল। আলেক বোগানের সাথে রোপা ইরিনার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ না হয়েই যায় না, এই বিশ্বাস থেকে একচুল নড়তে রাজি নয় ও। অন্য কোথাও দেখা করছে ওরা। দরজার দিকে মুখ করে ডাকল ও, 'ফরহাদ!'

কয়েক সেকেন্ড পর দরজায় দেখা গেল ফরহাদকে। 'স্যার?'

'আজ থেকে সন্ধেটা তুমি ডুম-ডাম নাইটক্লাবে কাটাবে,' বলল রানা। 'চোখ রাখবে রোপা ইরিনার ওপর। নাচের আগে বা পরে কে কে তার সাথে দেখা করে রিপোর্ট করবে আমাকে।'

'ইয়েস, স্যার।'

চলে যাচ্ছে ফরহাদ, পিছন থেকে রানা বলল, 'সবাই ওখানে ফুর্তি করতে যায়, সে-অনুমতি তোমারও থাকল।'

হাঁটার গতি মুহূর্তের জন্যে একটু শ্লথ হলো ফরহাদের, সকৃতজ্ঞ হাসি ফুটল ঠোঁটে।

ফরহাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে রানাও হাসল, ভুল হলো সেখানেই। ঘুমিয়ে থাকা ব্যথাটা হঠাৎ করে জেগে উঠল মুখে। শুধু গ্লুকোজ খেয়ে মানুষ কতদিন বাঁচে, তাই কুরবান আলি চমৎকার এক বুদ্ধি বের করেছে রানার জন্যে। প্রিয় সমস্ত খাবারই খেতে পাচ্ছে রানা, তবে তরল আকারে। মাংস, ডিম, মাছ, ভাত, শাক-সব্জী এমন কি চীনাবাদাম পর্যন্ত তরল করে ফেলছে কুরবান আলি। লোকটা না থাকলে কি যে হত, কল্পনা করতে পারে না রানা। ব্যথা কমবে এই অজুহাতে জিনের পরিমাণ একটু বাড়িয়ে দিয়েছে ও, নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে আলেক বোগান ধরা পড়লে কমিয়ে ফেলবে।

রোপা ইরিনা যদি আলেক বোগানের সন্ধান দিতে না পারে, ভাবল রানা, নাদিয়া পারবে। নাদিয়ার ফ্ল্যাটে ঘটনাটা কেন ঘটল, জানে ও। আলেক বোগানকে ধরতে পারেনি, এই ব্যর্থতার জন্যে নিজের ওপর রেগে ছিল ও। সবকথা বিশদভাবে না বলে সেই রাগটা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল নাদিয়া। নাদিয়া ব্যাপারটাকে কিভাবে নিয়েছে, তাও পরিষ্কার বুঝেছে রানা। মেয়েটার ধারণা, আলেকের সাথে নিরিবিলিতে সময় কাটিয়েছে সে, তাই ঈর্ষা হয়েছে রানার। কথাটা যতবারই মনে পড়ছে, হাসি পাচ্ছে রানার। নাদিয়াকে ওর ভাল লাগে, জানে নাদিয়ারও ওর ওপর দুর্বলতা আছে। কিন্তু কাজে ব্যাঘাত ঘটবে বলে একটা দূরত্ব বজায় রাখছে ও। আলেক বোগানের সঙ্গ নাদিয়ার মত মেয়ের যে ভাল লাগতে পারে না, এ তো জানা কথা। ওরা দু'জন একসাথে কিছুটা সময় কাটিয়েছে বলে ঈর্ষা হবে, এটা একটা হাস্যকর ধারণা। অথচ নাদিয়া ঠিক তাই ভেবে বসে আছে।

কাউকে ভাল লাগলে সেটা চেপে রাখা যায় না, বা উচিতও নয় বোধহয়। রানা ঠিক তাই করছে বটে, কিন্তু মনে মনে আশা করে আছে, আলেক বোগান ধরা পড়লে নাদিয়ার ছুটি হবে, তখন যদি সুযোগ আর সময় হয় মনের কথা ফাঁস করা যেতে পারে। দু'জনের প্রতি যখন দু'জনের টান আছে, কিছুটা সময় না হয় হেসে-খেলে কাটানো যাবে, মন্দ কি!

কিন্তু কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত রানা ওকে বিশেষ ঘনিষ্ঠ হতে দেবে না।

আলেক বলেছে, নাদিয়ার সাথে আবার তার দেখা হবে। লোকটা তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুক, আশা করল রানা। নাদিয়াই এখন একমাত্র ভরসা।

শেষ বিকেলের দিকে বাজার করছে নাদিয়া। মনটা আজ সারাদিনই চঞ্চল ছিল, ঘর-সংসারের কোন কাজই সারা হয়নি। এই রোদ এই বৃষ্টির মত কখনও বিষণ্ন বোধ করেছে সে, কখনও আনন্দ। তার উজ্জ্বল রঙের একটা ঘাগরা পরে বেরিয়ে পড়েছে বাজার করতে। আলসেমি করে দুপুরে আজ খায়নি, সন্ধের খাওয়াটা আজ খুব আয়োজনের সাথে খাবে বলে ঠিক করে ফেলেছে।

ফল আর শাক-সব্জীর দোকানগুলো ভাল লাগে নাদিয়ার। এখানে এলে নিজেকে তাজা আর সজীব লাগে তার। টমেটোর দোকানের সামনে থামল সে। দোকানদার একটা দাগী টমেটো ঝুড়ি থেকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। হাসি চাপল ও। জানে, দোকানদারের এই আচরণটা নেহাতই লোক দেখানো। খদ্দের চলে গেলেই আবার টমেটোটা তুলে রাখবে সে, নতুন আরেকজন খদ্দেরের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার অভিনয়টার পুনরাবৃত্তি করার জন্যে। দর নিয়ে একটু তর্ক করল নাদিয়া, কিন্তু দোকানদার বুঝল, এদিকে তার মন নেই। প্রথম যে দাম হেঁকেছিল প্রায় সেই দামেই টমেটো বিক্রি করল সে।

মাংস আগেই কিনেছে, এবার ডিমও কিনল। ওমলেট খুব পছন্দ করে সে। ব্যাগটা বেশ ভারী হয়ে উঠেছে, তবু আর কি কেনা যায় ভাবতে লাগল। ব্যাগভরা বাজার করতে পারলে সেদিন মনটা দারুণ খুশি থাকে তার। ছেলেবেলায় আধবেলা আধপেটা খেয়ে মানুষ হয়েছে, বাজারে এলে বার বার সেটা মনে পড়ে যায়। হাতের কাছে যা পায় তাই কিনে ব্যাগ ভরে ফেলতে ইচ্ছে করে তার।

ফেরার পথে নিজের জন্যে কিছু কাপড়ও কিনল নাদিয়া। ওর নিজের ড্রেস মেকার নেই, কিন্তু আশা আছে একদিন সামর্থ্য হবে, তখন ভাল একজন ড্রেস মেকারকে দিয়ে পোশাক তৈরি করাবে সে। এই প্রসঙ্গে মনে একটা প্রশ্ন উঁকি দিল, আচ্ছা, মেজর রানা কি তার স্ত্রীর জন্যে একজন ড্রেস মেকারের ব্যবস্থা করতে পারবে? লাগাম ছাড়া চিন্তা এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে দিল। আচ্ছা, স্ত্রীর সাথে কি রকম আচরণ করবে মেজর রানা? নিশ্চয়ই খুব ভালবাসবে। জন্মদিনে আর কিছু দিক বা না দিক, ফুলের একটা তোড়া উপহার দিতে ভুল করবে না। রোজ সকালে কাজে যাবার সময় বউকে কিভাবে চুমো খাবে?

আপন মনে হাসছে দেখে রাস্তার কেউ কেউ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল নাদিয়াকে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে লজ্জা পেল সে। মনে মনে নিজের কাছেই

জবাবদিহি দেয়ার সুরে বলল, মেজরের কথা মনে পড়লেই ভাল লাগে আমার, সেজন্যে আমি দায়ী নই!

কিন্তু আলেক বোগানের কথা মনে পড়তেই আনন্দটুকু উবে গেল।

ইচ্ছে করলে আমি পালাতে পারি, ভাবল সে। আলেকের সাথে দেখা করব না, মুখ ফুটে এই কথাটা বললেই হয়। কেউ তাকে জোর করবে না। আলেক খবর দেবে, উত্তরে কিছু না বললেই ব্যাপারটার ইতি ঘটতে পারে। ছুরি দিয়ে মানুষ খুন করে যে লোক, তার জন্যে নিজেকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে বাধ্য নয় সে। কিন্তু চট করে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। নড়বড়ে দাঁত যেমন দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়, এই ব্যাপারটাও তাকে তেমনি দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল।

বাড়ি ফিরে প্রথমে মাংস রান্না করল নাদিয়া। তারপর ভেজিটেবল সুপ আর ওমলেট। সবশেষে সেঁকা রুটিতে মাখন মাখাল। খেতে শুরু করবে, এই সময় নক হলো দরজায়।

মেজর নাকি?

তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে ছুটল নাদিয়া। দরজা খুলে হতভম্ব হয়ে গেল সে। প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন, প্রথমে তাকে চিনতেই পারল না সে। তারপর মনে হলো, বাবার চেহারার সাথে এই লোকের চেহারা আশ্চর্য রকম মিলে যায়। কিন্তু তার বাবা অন্ধ, ইনি নন। ভদ্রলোক আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাসতে শুরু করেছেন, হাসিটা দেখেই তাকে চিনে ফেলল নাদিয়া।

'দিয়া!'

আদর করে এই নামে ডাকত তাকে বাবা। আজও ডাকল।

'বাবা!' অবিশ্বাসে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল নাদিয়ার। এক সেকেন্ডের মধ্যে রাজ্যের অনেক কথা মনে পড়ে গেল তার। বাবা তাকে ঘৃণা করতেন, শেষ চিঠিতে লিখেছিলেন, একজন বেশ্যার টাকা আমি ছুঁয়ে দেখতে রাজি নই। মনে পড়ল, মৃত্যুর সময় মাকে দেখতে পায়নি সে। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাবা, একচুল নড়ছে না, যেন মেয়েকে ছুঁতে ভয় করছে তার। 'মা,' আবার বলল প্রৌঢ়, 'এখনও তুই আমার ওপর রাগ করে আছিস?'

'বাবা!' বলে ছুটে গেল নাদিয়া। মেয়েকে দু'হাতে ধরে ফেললেন প্রৌঢ়, নিজের বুকে টেনে নিলেন মাথাটা। আধ মিনিট পর বাবার বুক থেকে মাথা তুলে একটা হাত ধরল নাদিয়া, বাবাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। ঘাড় ফিরিয়ে বন্ধ দরজার দিকে কি মনে করে একবার তাকাল প্রৌঢ়। কিন্তু কিছু বলল না।

নাদিয়ার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো, আমার ঠিকানা তুমি পেলে কোথায়? ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করে, তোমার চোখ ভাল হলো কবে? কিন্তু বাবাকে সোফায় বসিয়ে তার মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে থাকল সে, কথা বলতে ভাল লাগল না।

টেবিলের দিকে চোখ পড়তে মেয়েকে প্রৌঢ় বলল, 'খেতে বসেছিলি?'

বাবার হাত ধরে তাকে টেনে নিল নাদিয়া, বলল, 'এসব তোমাকে খেতে হবে

এখন। এসো।'

হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বাবা বলল, 'দূর পাগলী! আমি তো খেয়েই এসেছি। নে, তুই খা, আমি দেখি।'

ঠোঁট ফোলাল নাদিয়া। তারপর জানতে চাইল, 'খাবে কিনা বলো। যদি না খাও, এখুনি আমি বেরিয়ে যাব।'

অসহায় হাসিতে ভরে উঠল বাবার মুখ, বলল, 'একটুও বদলাসনি, সেই আগের মতই আছিস!' মেয়ের সাথে জেদ ধরে পারা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে হাত ধুয়ে অগত্যা খেতে বসল। 'কিন্তু তুই···?'

'আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না,' বাবার মুখে ওমলেট ভরে দিতে দিতে বলল নাদিয়া। 'এসবের এক কণাও যদি পড়ে থাকে··· কি যে করব সে আমিই জানি।'

খাওয়াতে শুরু করে নাদিয়া বুঝল, বাবার খিদে পেয়েছিল। ঝোঁকের মাথায় প্রচুর রান্না করেছে সে, না না করতে করতে প্রায় সবটুকুই খেয়ে শেষ করতে পারল বাবা। এত বছর পর বাবাকে আজ পেট ভরে খাওয়াতে পেরে তৃপ্তিতে ভরে উঠল মন।

খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে, এই সময় একটা দুটো করে কথা শুরু হলো। ভাই-বোনদের খবর জানতে চাইল নাদিয়া। মায়ের মৃত্যুর পর চার ভাই-ই যে যার নিজস্ব ভঙ্গিতে বাবাকে ছেড়ে চলে গেছে। সবচেয়ে বড়টা শহরে আসার নাম করে কোথায় গেছে, আজও তার কোন হদিস মেলেনি। তার ছোটটা রেললাইনে পা কেটে হাসপাতালে মারা গেছে। বাকি দু'জন মারা গেছে কলেরায়। শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে বাবা, কারণটা বুঝতে অসুবিধে হলো না নাদিয়ার। সন্তানদের কেউই নেই, তাই কি সব ভুলে গিয়ে চলে এসেছেন মেয়ের কাছে? কিন্তু বাবাকে চেনে নাদিয়া, একবার কারও দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে সেদিকে আর ভুলেও তাকান না। আদর্শের সঙ্গে আপস করা তাঁর রক্তে নেই। নাদিয়া ভাবতে লাগল, এই অসম্ভব সম্ভব হলো কিভাবে?

'কি করছিস আজকাল?' জানতে চাইল বাবা।

সত্যি কথাই বলল নাদিয়া। 'মিশরীয় ইন্টেলিজেন্স একজন ইসরায়েলি এজেন্টকে ধরার চেষ্টা করছে, আমি ওদেরকে সাহায্য করছি।'

'ভাল,' মৃদু কণ্ঠে মন্তব্য করল বাবা। 'দেশের কাজ।'

'কিন্তু এর মধ্যে ঝুঁকি আছে,' বলল নাদিয়া। 'আমাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, ওই এজেন্টের সাথে বন্ধুত্ব পাতাবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে। ভাবছি, না করে দেব। বলব, অন্য কোন কাজ থাকলে দাও। এ আমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

'কেন, সম্ভব নয় কেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইল বাবা।

অসৎ একজন লোকের সাথে বন্ধুত্ব পাতাবার অর্থ কি, বাবা কি তা বুঝতে পারছেন না? কিভাবে তিনি এটাকে অনুমোদন করতে পারেন? কোথায় গেল তাঁর নীতিবোধ?

নাদিয়া চুপ করে আছে দেখে প্রৌঢ় বলল, 'এর মধ্যে খারাপ কিছু নেই, নাদিয়া। দেশের প্রয়োজনে কাজটা তোমার করা দরকার।' গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলার সময় বাবা সম্বোধন পাল্টে তাকে তুমি বলতেন, অভ্যেসটা এখনও রয়েছে।

'তুমি আমার ঠিকানা পেলে কোত্থেকে?'

'কেন,' বিস্মিত হলেন প্রৌঢ়, 'মেজর রানা তোকে কিছু বলেনি?'

'মেজর রানা?' এবার নাদিয়ার অবাক হবার পালা। 'মেজর রানা··· মেজর রানা···তার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? তুমি কোথায় দেখা পেলে তার?'

কি যেন বুঝতে পেরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল প্রৌঢ়ের চেহারা। 'বুঝেছি! তোকে কিছু না জানিয়েই আমাকে চিঠি লিখেছিল মেজর।'

'তোমাকে চিঠি লিখেছিল মেজর রানা?' হাঁ হয়ে গেল নাদিয়া।

'হ্যাঁ,' হাসল প্রৌঢ়। 'খুব ভাল ছেলে, রে। লিখেছে, আপনি আমাকে নাদিয়ার ভাই বলে মনে করবেন। তোর বস্, তাই না? খুব স্নেহ করে, বোঝাই যায়।'

হঠাৎ কি যেন একটা আবিষ্কারের আনন্দে নেচে উঠল নাদিয়ার মন। ভাই! বন্ধু নয়, প্রেমিক নয়, ভাই! মেজরের সাথে নিজের সম্পর্কটা সনাক্ত করতে পারছিল না সে, বাবার মুখে ভাই শব্দটা শোনার সাথে সাথে উপলব্ধি করল, অন্তরের অন্তস্তলে। এই সম্পর্কটাই স্থির করেছিল সে, নিজের অজান্তে।

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মন খারাপ হয়ে গেল নাদিয়ার। ভাই বোন? উঁহুঁ! ভাই আর বোনের মাঝখানে রয়েছে অনেক বাধা-নিষেধের বেড়া। কিন্তু রানার সাথে এমন একটা সম্পর্ক চায় সে, যার মাঝখানে কোন বাধা নেই, কোন নিষেধ নেই। সেই রকম একটা সম্পর্কের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে। নাদিয়া শুধু নামটা মনে আনতে পারছে না।

ভাই-বোন! ভাই-বোন! ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত একটা কথা মনে পড়ে গেল। বিড়বিড় করে বলল, ইউরেকা! পরমুহূর্তে আপন মনে লজ্জা পেয়ে একটু লালচে হয়ে উঠল চেহারা।

'তোর এই বসই আমার চোখ খুলে দেয়,' বলে চলেছে প্রৌঢ়। 'নিজের ভুল বুঝতে পারি আমি। তুই যে টাকা পাঠিয়েছিস, সেই টাকা দিয়েই চিকিৎসা করে ভাল হয়েছে চোখ···'

'টাকা পাঠিয়েছিলাম?' অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল নাদিয়া। 'কই দেখি তো, বাবা, চিঠিটা তোমার কাছে আছে?'

বুক পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করল প্রৌঢ়। 'এই তো।'

চিঠিটা আগাগোড়া দু'বার পড়ল নাদিয়া। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো তার। ভাবল, আমাকে না জানিয়ে বাবাকে টাকা পাঠিয়েছে মেজর রানা, বাবার ভুল ভাঙিয়েছে, এমন মহৎপ্রাণ মানুষ আজও তাহলে আছে দুনিয়ায়! রানার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেল তার মন।

বাবার জন্যে কফি বানাতে বসে গভীর চিন্তায় ডুবে থাকল নাদিয়া। বাবা কথা বলে চলেছেন, কিন্তু সেদিকে তার মন নেই। মেজর রানাকে আজ যেন নতুন করে চিনল সে। তারপর মনে হলো, মানুষটা রহস্যময়, এই ধরনের মানুষকে কেউই

কোন দিন ভাল করে চিনতে পারে না। সেই সাথে উপলব্ধি করল, ওকে নিজের করে পাবার আশা করাটা নিছক বোকামি। নিজেকে রানার উপযুক্ত বলে ভাবতে পারল না সে।

বাবার একটা কথায় ধ্যান ভাঙল নাদিয়ার। জানতে চাইল, 'কি বললে, বাবা?'

'বলছিলাম, কফি খেয়ে আজকের মত আসি…'

'সে কি! চলে যাবে? অসম্ভব…'

প্রৌঢ় হাসলেন। 'আগে আমার সব কথা শোনো তো। আগামীকাল আমাদের গ্রামে একটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠান। আমি যদি ওখানে না থাকি…'

'কিন্তু…'

একটু ইতস্তত করে প্রৌঢ় জানতে চাইলেন, 'কাদিরের কথা মনে আছে তোর?'

'কাদির…কাদির…হ্যাঁ।' হঠাৎ চমকে মত উঠল নাদিয়া। 'হ্যাঁ, মনে আছে।' লেখাপড়া শেষ করে চাকরি পায়নি, বিনা বেতনে স্কুলে পড়াত। তাকে ভালবাসত ছেলেটা। কিন্তু সে কোনদিন তাকে পাত্তা দেয়নি।

'আমাদের সেই কাদির গত বছর লটারিতে দু'লাখ পাউন্ড পেয়েছে। পুরো টাকাটাই এই স্কুল তৈরির পেছনে ব্যয় করেছে সে। আমার নামে নামকরণ করেছে স্কুলের, জিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমাকে থাকতেই হবে, নিয়ে যাবার জন্যে কায়রোয় চলে এসেছে সে…'

নাদিয়ার মনে পড়ল, কাদিরের আদর্শ পুরুষ ছিল বাবা। বাবার নামে স্কুল খুলছে কাদির! আজ এসব ঘটছে কি! সবাই এভাবে মহৎপ্রাণ হয়ে উঠছে কিভাবে! জানতে ইচ্ছে করল, কাদির কি বিয়ে করেছে? তার কথা আজও কি মনে রেখেছে সে? কিন্তু প্রশ্নগুলো গলা থেকে উঠল না। জানতে চাইল, 'কায়রোয় এসেছে? উঠেছে কোথায়?'

'হোটেলে,' বলল প্রৌঢ়। 'সেই তো আমাকে হাসপাতাল থেকে বের করে আনল। বলল, আজই গ্রামে ফিরতে হবে।' এক সেকেন্ড দ্বিধা করে আবার বলল সে, 'আমার সাথেই এসেছে, নিচে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি।' মেয়ের হাত থেকে কফির কাপ নিল সে।

স্তম্ভিত হয়ে গেল নাদিয়া। কাদির এসেছে! তাকে বাবা নিচে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছেন! জানতে চাইল, 'তুমি আমার কাছে এসেছ, জানে?'

'জানে। এত করে আসতে বললাম, রাজি হলো না।'

'কেন?' ফিসফিস করে প্রশ্ন করল নাদিয়া।

'তা তো বলতে পারি না।'

মাথা নিচু করে বসে থাকল নাদিয়া। বুঝল, তাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলা হবে ভেবেই ফ্ল্যাটে আসেনি কাদির। ও চিরকালই একটু বেশি ভদ্র, মানুষের সুবিধে অসুবিধের দিকে তীক্ষ্ণ নজর। একবার ভাবল, ডেকে নিয়ে আসবে কিনা। সিদ্ধান্ত

নিল, না যাকে ভালবাসি না তার সাথে নতুন সম্পর্ক না করাই ভাল। আমার মত আমি আছি, তার মত সে থাক। 'ঠিক আছে, বাবা, তোমাকে তাহলে আটকে রাখব না। কিন্তু কথা দিয়ে যাও, মাস শেষ হবার আগেই আবার তুমি আসবে।'

'চোখ ফিরে পেয়েছি, এখন আমার অনেক কাজ,' সহাস্যে বলল প্রৌঢ়। 'আসব তো বটেই, তবে চলতি মাসে বোধহয় হয়ে উঠবে না রে, আগামী মাসে একদিন নিশ্চয়ই এসে দেখে যাব তোকে···' কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'সাবধানে থাকিস, মা। আল্লার কাছে দোয়া করি, স্পাইটাকে তোরা যেন ধরতে পারিস। খোদা মিশরকে রক্ষা করুন।'

'বাবা!'

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে প্রৌঢ়, পিছন থেকে মেয়ের ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কিছু বলবি, মা?'

'কাদির···ও কি··· মানে, বিয়ে টিয়ে করেছে?'

'না।' বলে আর দাঁড়াল না প্রৌঢ়, দ্রুত বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

কাদির বিয়ে করেনি। কেন? তাহলে কি আজও সে তাকে ভালবাসে? আপনমনে হেসে উঠল নাদিয়া। সম্ভব! পাগলটার পক্ষে সবই সম্ভব! তারপর কাঁধ ঝাঁকাল সে, ভাবল, মরুকগে!

শেষ যে তথ্যগুলো পেয়েছে আলেক, রেডিওর একটা বালব নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সেগুলো ইসরায়েলে পাঠানো হয়নি। বালব কিনতে হবে, কিন্তু যে-কোন দোকানে কিনতে যাওয়া চলবে না। অন্তত শহরের কোন দোকান থেকে তো নয়ই। রেডিওর কোন পার্টস কিনতে হলে দোকানদারকে রেডিওর লাইসেন্স দেখাতে হবে, তার মানে ঘুষ দিয়ে লাইসেন্সটা যোগাড় করতে হবে আগে। এসবের মধ্যে ঝুঁকি আছ, সময়সাপেক্ষ কাজ। তার মানে আগামী দু'চারদিনের মধ্যে মেসেজ পাঠাবার কোন উপায় নেই। মনে মনে ঠিক করল আলেক, আরও কিছু তথ্য যোগাড় হোক, সব একসাথে পাঠানো যাবে।

কথা হচ্ছিল নাদিয়াকে নিয়ে। তার সম্পর্কে রোপার দারুণ কৌতূহল, জ্বালাতন করে মারছে।

'বললাম তো, মেয়েটাকে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি,' চিন্তিত দেখাল আলেককে। বিছানায় বসে আছে সে, ওর সামনে দাঁড়িয়ে কাপড় পরছে রোপা। 'পিকনিকের কথা বলতেই ভয়ে তটস্থ হয়ে উঠল। বলল, আমাকে সে ভাল করে চেনে না। যেন, আমার সাথে কোথাও যেতে হলে তার সাথে একজন দারোয়ান থাকতে হবে।'

'আসলেও থাকা দরকার,' খিল খিল করে হেসে উঠে বলল রোপা। 'তুমি যে কি ভয়ঙ্কর, হয়তো আন্দাজ করতে পেরেছে।'

'অথচ, মাঝেমধ্যে আচরণ দেখে মনে হয়েছে, অত্যন্ত সাহসী মেয়ে, স্মার্ট, পুরুষ সঙ্গীর সাথে বাইরে বেরোবার অভিজ্ঞতা আছে।'

'তুমি শুধু কোনভাবে এখানে একবার নিয়ে এসে ফেলো ওকে,' বলল রোপা। 'তারপর যা করার আমি করব। ওকে নরম করতে দু'ঘণ্টার বেশি লাগবে না আমার।'

'যাই বলো, গোটা ব্যাপারটা কেমন যেন!' মাথা নিচু করে ভাবছে আলেক, থেমে থেমে কথা বলছে। 'ওই লোকটাই বা কে? ট্যাক্সিতে ওঠার চেষ্টা করল?'

'ভিখিরি।'

'কিন্তু লোকটাকে আমার বিদেশী বলে মনে হলো...'

'তাহলে বিদেশী ভিখিরি।' চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে আয়নায় চোখ রেখে আলেকের দিকে তাকাল রোপা। 'এই শহরে কত উদ্ভট কিসিমের লোকের বাস, অনেক দিন পর এসেছ, তুমি জানো না। খবর রাখো, বেশি ভিক্ষার দাবিতে ভিখিরিরা এখানে জঙ্গী মিছিল বের করে? গাড়ি পুড়িয়ে দেয়, সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি করে? তাই বলছি, বাতাসে গাছের পাতা নড়তে দেখলেও যদি ভয় পাও, কোন কাজ হবে না। মেয়েটাকে আমাদের চাই, শুধু এই কথাটা মনে রেখে বাকি সব ভুলে যাও। উৎসাহ বাড়াবার জন্য একটা কাজ করতে পারো।'

আলেক চুপ করে থাকল।

'চোখ বন্ধ করে কল্পনা করো, বিছানায় আমাদের দু'জনের মাঝখানে গোঙাচ্ছে মেয়েটা, মোচড় খাচ্ছে।'

দেঁতো হাসি দেখা গেল আলেকের ঠোঁটে। দৃশ্যটা উপভোগ্য, কিন্তু পাগল করে তোলার মত নয়। বিকৃতি রোপার, তার নয়। তার উপস্থিত বুদ্ধি তাকে সাবধান করে দিয়ে বলছে, কয়েকটা দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকো, কারও সাথে দেখা-সাক্ষাৎ কোরো না। সেজন্যেই রেডিওর পার্টস কিনতে বেরোয়নি সে। কিন্তু রোপা জেদ ধরছে, নাদিয়াকে এনে দাও। মুশকিল হলো, রোপার সাহায্য এখনও দরকার তার, তাকে চটানো সম্ভব নয়।

'আরেকটা কথা,' বলল রোপা। 'খাদিম সারওয়ারের সাথে যোগাযোগ করব কখন? তুমি যে এখানে থাকছ ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই জেনে গেছে সে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল আলেক। আরেকটা ডেট! আরেকটা ঝুঁকি! রোপা ছাড়াও এই খাদিম সারওয়ারের সাহায্যও তার দরকার হয়ে পড়েছে এখন। 'আজ ক্লাব থেকে ফোন করো তাকে। এখুনি দেখা করার কোন ইচ্ছে নেই আমার, তবে তাকে শান্তও করা দরকার।'

'আমি আর দেরি করতে পারি না, ট্যাক্সি পৌঁছে গেছে,' বলল রোপা। 'নাদিয়ার সাথে কিন্তু আজই যোগাযোগ করবে তুমি।' বলে বেরিয়ে গেল সে।

আগে যেমন রোপা তার হাতের মুঠোয় ছিল, এখন আর তা নেই, উপলব্ধি করল আলেক। নিজেকে রক্ষার জন্যে যে দেয়ালগুলো তুমি তৈরি করো, সেই দেয়াল তোমাকে চারদিক থেকে আটকেও ফেলে। সে কি রোপাকে অগ্রাহ্য করতে পারে? পরিষ্কার কোন বিপদ দেখতে পেলে, তাৎক্ষণিক কোন সঙ্কট উপস্থিত হলে, সম্ভব। কিন্তু বিপদ তো শুধু নার্ভাস হয়ে পড়েছে বলে কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে সে। এর কোন চেহারা এখনও ফোটেনি। এই পরিস্থিতিতে রোপার সাথে

গোলমালে যাওয়া বোকামি হয়ে যাবে। রাগলে মেয়েটা মানুষ থাকে না। রাগের মাথায় পুলিসের হাতে তাকে ধরিয়ে দেয়াও তার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়।

কম বিপদের পথ ধরে চলাই ভাল, ঠিক করল আলেক। বিছানা থেকে নেমে কাগজ-কলম যোগাড় করল সে। নাদিয়াকে লিখতে হবে।

বারো

বাবার সাথে দেখা হবার পরদিন আলেক বোগানের মেসেজ পেল নাদিয়া। হাতে এনভেলাপ নিয়ে ছোট একটা ছেলে এল দরজায়। ছেলেটাকে এক পাউন্ড বকশিশ দিয়ে এনভেলাপটা নিল নাদিয়া। ছোট্ট একটা চিঠি, আলেক লিখেছে—'প্রিয় নাদিয়া, তোমার জন্যে মন কেমন করছে। আগামী বৃহস্পতিবার রাত আটটায় বুজম রেস্তোরাঁয় এসো, কেমন? তোমারই, আলেক বোগান।'

বৃহস্পতিবার, তার মানে পরশু দিন। খুশি হবে, না ভয় পাবে, বুঝতে পারল না নাদিয়া। প্রথমে ভাবল, মেজর রানাকে টেলিফোন করে। কিন্তু তারপর ইতস্তত করতে লাগল।

রানা সম্পর্কে কৌতূহলের অন্ত নেই তার। মানুষটা সম্পর্কে কত কম জানে সে। যখন স্পাইদের ধাওয়া করছে না, সেই সময়টা কি করে সে? গান ভালবাসে, স্ট্যাম্প সংগ্রহের হবি আছে, পাখি শিকারে বেরোয়? কবিতা ভালবাসে, নাকি আর্কিটেকচারের দিকে ঝোঁক? আচ্ছা, রানা কি অ্যান্টিক পছন্দ করে? তার ঘরগুলো কিভাবে সাজানো? বাড়িতে কাদের সাথে বসবাস করে সে? ওর স্লিপিং গাউনের রঙ কি?

তার ফ্ল্যাটে এসেছিল রানা, দু'জনের মধ্যে একটু মনোমালিন্যের সৃষ্টি হলো, বিদায় দেবার সময় তাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছেও দেয়নি নাদিয়া। ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেলা দরকার। তাছাড়া, রানার বাড়িটাও একবার দেখতে হয়। যাবার একটা অজুহাত যখন পাওয়া গেছে, সেটা হাতছাড়া করতে চায় না নাদিয়া।

কাপড় বদলানো দরকার। তারপর ঠিক করল, আগে গোসল করে নিই। ভাবল, গোসলই যখন করব, চুলটাও ধুয়ে নিলে হয়। বাথটাবে বসে ভাবতে লাগল, কোন্ ড্রেসটা পরবে। কোন্ কোন্ পোশাক পরে রানার সামনে গেছে, স্মরণ করার চেষ্টা করল সে। ম্লান পিঙ্ক কালারের ড্রেসটা দেখেনি রানা। কাঁধের কাছে ফুলে থাকে ওটা, সামনের দিকে নিচ থেকে গলা পর্যন্ত বোতাম আছে। বিশেষ শখ করে বানিয়েছিল ওটা, তার অত্যন্ত প্রিয় ড্রেস। ঠিক করল, ওটাই পরবে আজ।

নিজের অজান্তেই গুনগুন করছে সে। দামী সেন্ট মাখল। সুটকেস থেকে বের করে সিল্কের আন্ডারঅয়্যার পরল। এটা পরলে সব সময় ওর মেয়ে মেয়ে একটা অনুভূতি জাগে। ছোট চুল, খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গেল। আয়নার সামনে বসল হাতে চিরুনি নিয়ে। মুখের চারদিকে কালো চুলের রিঙগুলো চকচক করছে।

'আমাকে সুন্দরী না বলে উপায় নেই,' বিড়বিড় করে বলল নাদিয়া।

এনভেলাপটা হ্যান্ডব্যাগে নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পড়ল নাদিয়া। রানা হয়তো আলেকের হাতের লেখা দেখতে চাইবে। আলেকের ব্যাপার হলেই সমস্ত খুঁটিনাটি জানতে চায় ও। এর কারণ সম্ভবত এই যে দূর থেকে বা অন্ধকারে দেখা হলেও, দু'জন দু'জনকে সামনে থেকে পরিষ্কার দেখেনি একবারও। আলেকের হাতের লেখা স্পষ্ট, গোটা গোটা। দেখে রানা হয়তো কোন তাৎপর্য আবিষ্কার করতেও পারে।

হাতঘড়ি দেখল নাদিয়া। মোটে সাতটা। জানে, অফিস আওয়ারের পরও কাজ করে রানা, কাজেই তাড়াহুড়ো করার কোন দরকার নেই। ট্যাক্সি না নিয়ে হেঁটেই চলল সে। ফুরফুরে বাতাস, ভালই লাগছে হাঁটতে। একদল সৈনিক ওকে দেখে শিস দিল। অন্য সময় হলে ভুরু কোঁচকাত নাদিয়া, আজ কিন্তু ওদেরকে একটু প্রশ্রয় দিয়ে হাসল সে। পিছু পিছু বেশ খানিকদূর এল তারা, তারপর একটা রেস্তোরাঁ দেখে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

মনটা খুশি নাদিয়ার, সেই সাথে আশ্চর্য স্বাধীন আর বেপরোয়া বোধ করছে। জীবনটা যেন নতুন একটা মোড় নিতে যাচ্ছে। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে বেঁচে থাকাটা আনন্দময় হয়ে উঠবে। বাবার কথা মনে পড়ল, বাবা আর এখন তাকে ঘৃণা করে না। বাবা এখন আর অন্ধ নয়। আবার কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেল মন।

ফ্ল্যাটবাড়িটা খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হলো না। নাম্বার মিলিয়ে একটা ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দাঁড়াল সে। চাপ দিল কলিংবেলের বোতামে।

দরজা খুলে দিল শান্ত চেহারার এক প্রৌঢ়, মাথা জোড়া চকচকে টাক। 'গুড মর্নিং, ম্যাডাম।' বিশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ, ঠিক একজন ইংলিশ বাটলারের মত।

'আমি নাদিয়া, মেজর রানার সাথে দেখা করতে চাই।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল কুরবান আলি, তারপর বলল, 'দুঃখিত, ম্যাডাম। স্যার এখনও অফিস থেকে ফেরেননি।'

'তাহলে তো আমাকে অপেক্ষা করতে হবে,' বলল নাদিয়া।

দরজা ছেড়ে একপাশে সরে গেল কুরবান আলি, 'প্লীজ, ম্যাডাম, ভেতরে এসে বসুন।'

একটু আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হলঘরে ঢুকল নাদিয়া। ঠাণ্ডা পরিবেশ, কোথাও কোন শব্দ নেই। হলঘরের সিলিংটা অনেক উঁচুতে। চারদিকে ভাল করে দেখা হয়নি, কুরবান আলি বলল, 'এদিকে, ম্যাডাম, প্লীজ!' পথ দেখিয়ে নাদিয়াকে ড্রইংরুমে নিয়ে এল সে। 'আমার নাম কুরবান আলি। আপনার কিছু দরকার হলে সাথে সাথে জানাবেন।'

'ধন্যবাদ, কুরবান আলি।'

ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে গেল কুরবান আলি। রানার ফ্ল্যাটে ঢুকে একা চারদিকে চোখ বুলাবার এই সুযোগ পেয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল নাদিয়া। ড্রইংরুমের মেঝে মোজাইক করা, ফার্নিচারগুলো ইংলিশ। পরিবেশটা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, যেন সাজাবার পর এই ঘর এখনও কেউ ব্যবহার করেনি। এসব থেকে কি

একজন মানুষ সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়? মনে হয় না।

দরজা খুলে অল্প-বয়েসী এক কিশোর ঢুকল ভেতরে। অত্যন্ত সুন্দর দেখতে, চোখে সপ্রতিভ একটা ভাব। দশ কি বারো বছর বয়স হবে। নাদিয়ার মনে হলো, মেজর রানার সাথে ছেলেটার চেহারা একটু যেন মেলে। পরমুহূর্তে প্রায় আঁতকে উঠে ভাবল, মেজরের ছেলে নয় তো?

চোখে আতঙ্ক নিয়ে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থাকল নাদিয়া। রানা তাহলে বিবাহিত! এ তার ছেলে! রানা বিবাহিত হতে পারে, কথাটা একবারও মনে হয়নি কেন? সুদর্শন, মহৎ, উদার, বুদ্ধিমান, ভাল চাকরি করে, এই রকম পাত্র বেশিদিন অবিবাহিত থাকতে পারে না।

এগিয়ে এসে একটা হাত বাড়িয়ে দিল ডন। 'হ্যালো?'

হাতটা ধরে একটু যেন জোরেই চাপ দিল নাদিয়া। 'হাউ ডু ইউ ডু? আমি নাদিয়া।'

ব্যথা পেল ডন, কিন্তু কোন অভিযোগ করল না। বলল, 'আমি ডন। মেজর রানার বন্ধু আমি। উনি কখন ফিরবেন, আগে থেকে বলা কঠিন। আপনার ভাগ্য ভাল হলে, এখুনি ফিরে আসবেন।'

'কি বললে? বন্ধু?'

'হ্যাঁ,' বলল ডন। সম্পর্কটা ব্যাখ্যা করার কোন গরজ দেখাল না সে। 'আপনার জন্যে কি করতে পারি? কিছু খান? কফি? কিংবা ঠাণ্ডা কিছু?'

বয়সের তুলনায় একটু বেশি ফরম্যাল, ভাবল নাদিয়া, কিন্তু বাপের মতই ভদ্র। মাথা ঝাঁকাল সে, বলল, 'না, ধন্যবাদ।'

'তাহলে অনুমতি দিন, ডিনার সেরে আসি। সামনে পরীক্ষা তো, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে ভোর অন্ধকার থাকতে উঠতে হবে। আপনাকে একা রেখে যেতে হচ্ছে বলে দুঃখিত।'

'না না, তাতে কি! তুমি যাও,' বলল নাদিয়া। 'কিন্তু একটা কথা। তোমার সাথে মেজরের সম্পর্কটা ঠিক বুঝলাম না।'

'বললাম তো,' একগাল হেসে বলল ডন, 'উনি আমার ফ্রেন্ড। আপনার যদি কিছু দরকার হয়, কুরবান আলিকে ডাকবেন, প্লীজ।' চলে গেল সে।

বাপকে কেউ ফ্রেন্ড বলে? অসম্ভব নয়। ধপ্ করে একটা সোফায় বসে পড়ল নাদিয়া। কপালের দু'পাশে ব্যথা শুরু হয়েছে। ভাবল, কিন্তু আমার তাতে কি এসে যায়? মেজর রানার একটা ছেড়ে দশটা ছেলে থাকলেই বা কি! তাতে আমি কেন অসুস্থ হয়ে পড়ি!

অস্থির লাগছে, সোফা ছেড়ে ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল নাদিয়া। ফুলদানীর ফুল দেখল, দেয়ালে টাঙানো পেইন্টিং দেখল। আমি একটা বোকা, ভাবল সে। ছেলেটা রানার কেউ না-ও হতে পারে। রানা হয়তো সত্যি বিয়ে করেনি। পরমুহূর্তে কল্পনা করতে চেষ্টা করল, রানা যদি বিয়ে করে থাকে, বউটা দেখতে কেমন! পিয়ানোর সামনে এসে দাঁড়াল সে। পিয়ানোর ওপর একটা বই পড়ে রয়েছে। হাতে নিয়ে দেখল, রেবেকা। বইয়ের প্রথম লাইনটা পড়ল সে

'লাস্ট নাইট আই ড্রেমট আই ওয়েন্ট টু ম্যানডারলি এগেন।' বইটা কি রানার, না ওর স্ত্রীর? রানার স্ত্রীর হলে পড়ার জন্যে বইটা নাদিয়া ধার চাইবে না।

ড্রইংরুমে ফিরে এল ডন। তাড়াতাড়ি বইটা পিয়ানোর ওপর রেখে দিল নাদিয়া, এমনভাবে তাকাল যেন চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে। ব্যাপারটা লক্ষ করল ডন।

বলল, 'ওটা তেমন ভাল বই নয়। বোকা একটা মেয়ের গল্প, হাউজকিপারের ভয়ে তটস্থ থাকে। অ্যাকশন বলতে কিচ্ছু নেই।'

সোফায় ফিরে এসে বসল নাদিয়া। পাশেই বসল ডন।

'তার মানে বইটা তুমি পড়েছ?'

'রেবেকা? হ্যাঁ, কিন্তু পছন্দ করতে পারিনি। তবে খারাপ লাগুক, ভাল লাগুক, শেষ না করে ছাড়ি না।'

'কি ধরনের বই ভাল লাগে তোমার?'

'টেক।'

'টেক মানে?'

'ডিটেকটিভ। আগাথা ক্রিস্টি আর ডরোথি সেয়ার্স-এর সব বই শেষ করে ফেলেছি।'

'তাই? আমিও কিন্তু ডিটেকটিভ বই ভালবাসি।'

'আপনার প্রিয় ডিটেকটিভ কে?' উৎসাহের সাথে জানতে চাইল ডন।

এক সেকেন্ড চিন্তা করল নাদিয়া। 'মাইগ্রেট।'

'বাপ্‌স্! আগে কখনও নামই শুনিনি। লেখকের নাম?'

'জর্জেস সাইমেনন। ফ্রেঞ্চ ভাষায় লেখেন, কিছু বই ইংরেজীতে অনুবাদ হয়েছে। বেশির ভাগ প্যারিসের পটভূমিকায় লেখা। খুব…মানে, জটিল।'

'আমাকে একটা ধার দেবেন নাকি? কায়রোয় নতুন বই পাওয়া বড্ড কঠিন। স্কুল লাইব্রেরীতে নতুন বই তো আসেই না। আমার ফ্রেন্ড অবশ্য বলেছে, বাজারে নতুন বই এলেই…'

বাধা দিল নাদিয়া, জানতে চাইল, 'তোমাদের দু'জনের বয়সের এত পার্থক্য, পরস্পরের বন্ধু হও কিভাবে?'

'বন্ধুত্বের সাথে বয়সের কি সম্পর্ক!' অবাক হয়ে বলল ডন। 'বাপ আর ছেলে, এরা সত্যিকার অর্থে পরস্পরের বন্ধু নয়? ছাত্র আর শিক্ষক, এরা কি একজন আরেকজনের বন্ধু নয়? বয়সটা এখানে কোন ব্যাপার নাকি!'

'কি বলে ডাকো?'

'ফ্রেন্ড!'

'আর মেজর?'

'উনি কখনও ফ্রেন্ড বলেন, কখনও নাম ধরে ডাকেন।'

'তোমার আম্মা…'

'উনি নেই,' বেশ সহজ ভাবেই বলল ডন। চেহারায় কোন কাতর ভাব ফুটল না।

'নেই মানে?'

'মা মারা গেছেন।'

'দুঃখিত, ডন।' নাদিয়া ভাবল, রানা তাহলে বিপত্নীক! হ্যান্ডশেক করার সময় ছেলেটার হাতে জোরে চাপ দিয়েছিল বলে নিজেকে অভিশাপ দিল সে, ছি! এই হাতে আমি আগুনের ছ্যাঁকা খাব! 'ঠিক আছে,' বলল সে। 'তুমি চাইলে আমরা বই বদল করতে পারি। আমি তোমাকে জর্জেস সাইমেনন দেব, বদলে আমাকে দেয়ার মত কি আছে তোমার কাছে?'

'আগাথা ক্রিস্টি?'

'চলবে,' বলল নাদিয়া। হাতঘড়ি দেখল সে। সাড়ে আটটা।

নাদিয়ার দেখাদেখি ডনও হাতঘড়ি দেখল। ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল সে। 'সেরেছে! এত তাড়াতাড়ি সাড়ে আটটা বেজে গেল! ফ্রেন্ড যদি ফিরে দেখে আমি বিছানায় যাইনি, রেগে যাবে। আমি যাই!' বলে দরজার দিকে এগোল সে।

'এক মিনিট পর তোমার কাছে যাব?' জিজ্ঞেস করল নাদিয়া। 'তোমাকে গুডনাইট জানাবার জন্যে?'

'যদি ইচ্ছে করেন।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ডন।

বলছে, বন্ধু। বাড়িতে আর কোন বয়স্ক লোক বা মহিলা নেই, এক কুরবান আলি ছাড়া। কে হতে পারে ডন, রানার ছেলে ছাড়া? এরা তিনজন বাস করে এই ফ্ল্যাটে। এদের প্রত্যেকের যার যার আলাদা জগৎ আছে। এই পরিবারে হাসি-আনন্দ আছে কি? এরা কেউ গান গায়? পিকনিকে যায়?

ড্রইংরূম থেকে করিডরে বেরিয়ে এল নাদিয়া। পাশাপাশি দু'তিনটে বেডরূম। মাঝখানেরটায় ঢুকল নাদিয়া। আশা করছে খেলনা প্লেন, একটা ট্রেন সেট, খেলাধুলোর সরঞ্জাম ইত্যাদি দেখতে পাবে। মেঝেতে কাপড়-চোপড় পড়ে থাকতে দেখলে আশ্চর্য হবে না। আশ্চর্য হবে না চকচকে টেবিলের ওপর একজোড়া ফুটবল বুট দেখতে পেলে। কিন্তু এসব কিছুই দেখল না সে। বাচ্চা ছেলের ঘর, কিন্তু দেখে মনে হলো, বয়স্ক লোকই বাস করে এখানে। কাপড়-চোপড় নিখুঁতভাবে সাজানো রয়েছে একটা আলনায়। টেবিলের ওপর বই-পত্র কিছু নেই, বদলে একটা অ্যাশট্রে রয়েছে। খেলনা বলতে পাওয়া গেল কাঠের একটা ট্যাংক। বিছানায় শুয়ে আছে ডন, গলা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢাকা। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে, বুকের ওপর একটা বই খাড়া করে ধরে পড়ছে ডন।

'তোমার ঘরটা আমার ভালই লাগল।'

'হ্যাঁ, আমারই ঘর বলতে পারেন, তবে অস্থায়ী।'

'অস্থায়ী কেন?' জানতে চাইল নাদিয়া।

'পাশের ফ্ল্যাটটা আমাদের,' বলল ডন। 'আমার বোন আর দুলাভাই ইউরোপ থেকে বেড়িয়ে ফিরলেই এখান থেকে চলে যাব।'

থ হয়ে গেল নাদিয়া। ডন তাহলে এই ফ্ল্যাটের কেউ নয়? জানতে চাইল, 'তোমার বাবা?'

'উনিও মারা গেছেন। আমি খুব ছোট থাকতে...'

ডনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল নাদিয়া। তারপর ধীরে ধীরে বিছানার কিনারায় বসল। কয়েক সেকেন্ড পর মৃদু গলায় বলল, 'রাত জাগা উচিত নয়, ডন। এবার ঘুমিয়ে পড়ো। তোমার বন্ধু এসে দেখলে রাগ করবেন।'

'আইন হলো, ন'টায় আলো নেভাতে হবে,' বলল ডন।

হঠাৎ করে ডনের দিকে ঝুঁকে পড়ল নাদিয়া, ওকে চুমো খাবে। ঠিক সেই মুহূর্তে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা।

ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। থতমত খেয়ে গেল নাদিয়া, সিধে হলো। বলল, 'হ্যালো, মেজর!'

'হ্যালো!'

'গুড নাইট, ডন,' বলল নাদিয়া।

'গুড নাইট, মিস নাদিয়া। অ্যান্ড থ্যাঙ্কস।'

রানার সামনে এসে দাঁড়াল নাদিয়া। 'আপনার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি, মেজর।'

'এক মিনিট, প্লীজ,' বলে ডনের দিকে এগোল রানা।

পিছন থেকে নাদিয়া বলল, 'আমি বরং ড্রইংরূমে বসি।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

বিছানার ওপর বসল রানা, ডনের মাথায় একটা হাত রেখে জানতে চাইল, 'মেহমানের খাতির-যত্ন হয়েছে তো?'

'উনি কিছু খেতে চাননি,' বলল ডন। 'আমি অবশ্য কিছুটা সময় সঙ্গ দিয়েছি।'

'গুড ম্যান।'

'ভদ্রমহিলাকে খুব ভাল লাগল,' বলল ডন। 'ঠিক হয়েছে, আমরা বই বদল করব।'

'ভাল। আজকের পড়া হয়েছে তো?'

'সব। লেখার খাতা তোমার দেখার জন্যে কুরবান আলির কাছে জমা রেখেছি। মিস নাদিয়া, উনি কে?'

'আমার সাথে একটা প্রজেক্টে কাজ করছেন···ব্যাপারটা একটু গোপনীয়।'

'তার মানে, ঠোঁটে আমার তালা!'

হাসল রানা। 'ঠিক তাই।'

গলা একেবারে খাদে নামিয়ে জানতে চাইল ডন, 'উনি কি একজন সিক্রেট এজেন্ট?'

নিজের ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল রানা। 'স্‌ স্‌ স্‌! দেয়ালেরও কান আছে!'

চোখে রাজ্যের সন্দেহ নিয়ে ডন বলল, 'আমাকে গোপন করা কি উচিত হচ্ছে, ফ্রেন্ড?'

এদিক ওদিক মাথা নেড়ে বলল রানা, 'দুঃখিত।'

সিলিঙের দিকে চোখ তুলে নিজের কপালে ছোট্ট একটা চাঁটি মারল ডন। 'কপাল মন্দ!'

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'ন'টায় আলো নেভাতে হবে।'

'গুড নাইট, ফ্রেন্ড।'

'গুড নাইট, ডন,' বলে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা।

ড্রইংরূমে ঢুকে দেখল, কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে নাদিয়া।

'অফিসে বোধহয় কাজের খুব চাপ?'

'সাংঘাতিক,' বলল রানা। 'কাজ তো আর একটা নয়, সব দিক সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। আবার একবার অফিসে যেতে হবে। তা, তোমার খবর কি? তোমার বাবার সাথে দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। আপনি যা করেছেন...আমি সেজন্যে...'

'ও কিছু না। ভাল কথা, তোমাকে দেয়ার জন্যে তোমার বাবা একটা চিঠি রেখে গেছেন, যাবার সময় নিয়ে যেয়ো।'

'আলেক যোগাযোগ করেছে,' মৃদু কণ্ঠে বলল নাদিয়া।

'চমৎকার!' উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'নিশ্চয়ই একটা ডেট চেয়েছে—কবে?'

'বৃহস্পতিবার।' আলেকের খুদে চিঠিটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিল নাদিয়া।

চিঠিটা পড়ল রানা, জিজ্ঞেস করল, 'কে দিয়ে গেল?'

'বাচ্চা একটা ছেলে।'

'কোন প্রশ্ন করোনি? কে দিল চিঠিটা, দেখতে কেমন, কোথায় দিল, এই সব?'

হতভম্ব দেখাল নাদিয়াকে। 'না,' বলল সে। 'এসবের যে গুরুত্ব আছে, মনেই হয়নি...'

'কিছু এসে যায় না,' বলল রানা। ভাবল, নিশ্চয়ই সম্ভাব্য সবরকম সাবধানতা অবলম্বন করেছিল আলেক, ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানা যেত না।

'কি করব আমরা?'

'আগে যা করেছি...মানে করব বলে ঠিক করেছিলাম,' বলল রানা। 'আশা করি, এবার আমরা ব্যর্থ হব না।' যতটা অনুভব করল, তারচেয়ে বেশি আত্মবিশ্বাসের সাথে কথাগুলো বলল রানা। ব্যাপারটা পানির মত সহজই। একজন লোক একটা মেয়ের সাথে কোথায় দেখা করবে জানা থাকলে, দলবল নিয়ে তাকে গ্রেফতার করা মোটেও কঠিন কাজ নয়। কিন্তু মুশকিল হলো, আলেকের ব্যাপারে আগে থেকে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে, এবার তাকে পালাতে দেবে না বলে পণ করেছে রানা। বিশ-ত্রিশ জন লোক দিয়ে রেস্তোরাঁটা ঘিরে রাখবে সে। রোড ব্লকের ব্যবস্থা করা হবে। আলেক ওখানে পৌঁছলে তাকে ফিরে যেতে দেয়া হবে না কিছুতেই।

হঠাৎ করে নাদিয়া বলল, 'আমি কিন্তু আরও একটা সন্ধে তার সাথে কাটাতে পারব না!'

'কেন?'

'ওকে আমার ভয় করে।'

'কিন্তু সেদিন তোমার কোন ক্ষতি হয়নি।'

'প্রেম করার প্রস্তাব দেয়নি, কাজেই "না" বলার দরকার পড়েনি আমার,' বলল নাদিয়া। 'কিন্তু প্রস্তাব সে দেবে, এবং আমি "না" বললেও সেটা মানবে না।'

'এবার তাকে পিকনিক করতে দেয়া হবে না,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'তার আগেই গ্রেফতার হবে সে। কাজেই তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই।'

কামরায় ঢুকল কুরবান আলি, বলল, 'ডিনার রেডি, স্যার।'

নাদিয়াকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'তুমি খেয়েছ?'

'ননা।'

'কি রকম আয়োজন করেছ, বলো তো, শুনি?' কুরবান আলিকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'সুপ, স্টু, স্ক্র্যাম্বলড এগস, প্লেইন রাইস; সেইসাথে ফিরনি, পুডিং, ছোলার ডালের হালুয়া,' বলল কুরবান আলি। 'ম্যাডামের জন্যে একটা চপ গ্রিল করে রেখেছি।'

অবাক হয়ে জানতে চাইল নাদিয়া, 'আপনি কি রোজ এই সব খান?'

'না, চোয়ালে চোট পাবার পর থেকে খেতে হচ্ছে,' বলল রানা। 'চিবাতে পারি না।' উঠে দাঁড়াল ও। 'এসো।'

ডাইনিংরুমে ঢুকে নাদিয়া জানতে চাইল, 'এখনও তাহলে ব্যথা আছে?'

'শুধু যখন হাসি,' বলল রানা। 'কথাটা সত্যি—ওদিকের পেশী নাড়তে পারি না।'

হাসি চেপে নাদিয়া বলল, 'না হাসলেই পারেন।'

'তা সম্ভব নয়। আজকাল অবশ্য মুখের একদিকের হাসি অনেকটা অভ্যেস হয়ে গেছে।'

বসল ওরা। কুরবান আলি সুপ পরিবেশন করল।

নাদিয়া বলল, 'ডনকে আমার খুব ভাল লাগল।'

ডনের সাথে সম্পর্ক, এই ফ্ল্যাটে তার থাকার কারণ ইত্যাদি ব্যাখ্যা করল রানা। বলল, 'ওকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে।'

ডিনারের পর ড্রইংরুমে কফি পরিবেশন করল কুরবান আলি। তাকে ছুটি দিয়ে শুতে পাঠিয়ে দিল রানা। তারপর একটা সিগারেট ধরাল। ইচ্ছে হলো, পিয়ানোর সামনে বসে কিছু বাজায়। সম্ভবত ওর মনের কথা বুঝতে পারল নাদিয়া। বলল, 'কিছু শোনাবেন?'

বেটোফোনের কিছু সিমফনি মুখস্থ আছে রানার, কিন্তু আজ দেশের একটা গান বেছে নিয়ে সেটার সুর তুলল পিয়ানোয়। করুণ রসের পল্লী গীতি, কিছুই বুঝল না নাদিয়া, তবু চোখের পাতা ভিজে উঠল তার। পিয়ানো থামিয়ে সোফায় নাদিয়ার পাশে এসে বসল রানা। দু'জনের দিকে দু'জন তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, এই সময় বাইরে বৃষ্টি শুরু হলো। নিজেকে বলে রাখা অনেক কথাই ভুলে গেল রানা, নির্জন ঘরে সুন্দরী নারী তাকে উন্মাদ করে তুলল। ধীরে ধীরে নাদিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। দু'জনের কারও চোখেই পলক নেই।

ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট স্পর্শ করবে, এই সময় কথা বলল নাদিয়া। 'মেজর রানা, তোমাকে আমি ভালবাসি।'

নাদিয়ার মুখটা দু'হাতে আলতোভাবে ধরল রানা। আঙুলগুলো সুন্দর মুখের ওপর বুলাচ্ছে আলতো করে। আবার তার দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা।

'তুমি আমার বন্ধু নও,' আবার বলল নাদিয়া। 'প্রেমিকও নও! তোমার সাথে আমার ভাই-বোনের সম্পর্ক!'

হঠাৎ যেন সাপ দেখে আঁতকে উঠল রানা। 'কি বললে!'

'জানি তোমাকে ধরে রাখতে পারব না, সে-যোগ্যতা নেই আমার,' নিচু গলায় বলল নাদিয়া। 'তাই তোমাকে প্রেমিক হিসেবে কল্পনা করি না। তোমাকে আমি ভাই হিসেবেই পেতে চাই, রানা।'

রানা ভাবল, নাদিয়া কি আমার সাথে এই অসময়ে ঠাট্টা করছে? নাদিয়ার মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিজের কোলে টেনে নিল ও। 'ভাই হিসেবে পেতে চাও? মানে?' অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে উঠল ওর চোখ জোড়া। নাদিয়ার চেহারা দেখে বুঝল, না, ঠাট্টা করছে না।

'ভাই-বোনের সম্পর্কের মধ্যে আশ্চর্য একটা মাধুর্য আছে, রানা। আমি...'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা, রাগে-দুঃখে-অপমানে লাল হয়ে উঠেছে চেহারা। খপ করে তার একটা হাত চেপে ধরে টান দিল নাদিয়া।

বলল, 'কি হলো? কোথায় যাচ্ছ?'

কথা না বলে হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু নাদিয়াও জোর খাটাল, বলল, 'আমি মেয়ে, মুখ ফুটে সব কথা বলতে পারি না। তুমি বোঝো না, এই মুহূর্তে কি চাই আমি? এতদূর এগিয়ে দিয়ে কোন পুরুষের কি চলে যাওয়া উচিত?'

বুঝল না রানা, বোকার মত তাকিয়ে থাকল নাদিয়ার দিকে।

'বসো,' আবার রানাকে কাছে টানল নাদিয়া।

নিজের অজান্তেই বসল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'এসবের মানে কি?'

'কিসের মানে?' নিচু গলায় জানতে চাইল নাদিয়া।

'বলছ ভাই-বোনের সম্পর্ক, তারপর আবার ভাব দেখাচ্ছ...ব্যাপারটা কি?'

রানার শার্টের একটা বোতাম খুলে ভেতরে হাত গলিয়ে দিল নাদিয়া। 'ব্যাপারটা আর কিছু না, আমি খ্রিস্টের জন্মের চার হাজার বছর আগে চলে যেতে চাই।'

তাকিয়ে থাকল রানা। 'কি?'

'অন্তত এই সময়টায় কানে কম শুনো না, প্লীজ,' বলল নাদিয়া। 'প্রাচীন মিশরের ইতিহাস পড়েছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তাহলে তোমার অজানা থাকার কথা নয়,' বলল নাদিয়া। 'সে-সময় ভাই-বোনের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক হত। এমন কি বিয়েও...'

নাদিয়ার সামান্য ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁটে নেমে এল রানার ঠোঁট। দু'হাতে ওর

গলা জড়িয়ে ধরল নাদিয়া।

দশ মিনিট পর শান্ত হলো ঝড়। কেমন যেন নেতিয়ে পড়ল নাদিয়া।

প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা। 'আচ্ছা, আমরা কি এখনও প্রাচীন মিশরে আছি, নাকি আধুনিক মিশরে ফিরে এসেছি?'

'এখনও আসিনি, একটু পর আসব,' বলে উঠে বসল নাদিয়া। 'ধারণাটা কিন্তু মন্দ নয়। ইচ্ছে হলেই আমরা প্রাচীন মিশরে ফিরে যাব।'

'তারপর কাজ হয়ে গেলে...'

রানার কাঁধে ঘুসি বসিয়ে দিল নাদিয়া। 'অসভ্যতা করবে না!'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল রানা।

'হাসছ কেন?'

'সত্যিই তো! হাসছি কেন!' বলে আবার একবার গলা ছেড়ে হেসে উঠল রানা। তারপর বলল, 'জানো, সব শেষ হয়ে গেলে অনেক কিছু করেছি আমি, কিন্তু এভাবে কখনও হেসেছি বলে মনে পড়ে না!'

'তার মানে কি আমি তোমাকে সুখী করতে পেরেছি?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইল নাদিয়া।

'স্বর্গ থেকে ঘুরে এলাম।'

রানার কাঁধে দু'হাত রেখে ওর কপালে কপাল ছোঁয়াল নাদিয়া। 'তাহলে আমার এ দান সার্থক হয়েছে, রানা!'

রাত এগারোটায় নাদিয়াকে তার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে গেল রানা। আসার সময় এনভেলাপটা নিয়ে এসেছে নাদিয়া। ঘরে ঢুকে আলো জেলে দরজা বন্ধ করল। বিছানায় বসে এনভেলাপটা খুলে বের করল ছোট একটা চিঠি। রানা বলল, বাবার চিঠি, কিন্তু নিচে নাম রয়েছে কাদিরের। ভুরু কুঁচকে উঠল নাদিয়ার। ব্যাপারটা কি? কাদির তাকে চিঠি লিখেছে? কেন? কি লিখেছে? দ্রুত পড়তে শুরু করল সে।

'প্রিয় দিয়া,

জানি, আমাকে তুমি ভালবাস না। কিন্তু সেই সাথে এ-ও জানি, একদিন বাসবে। সেদিনের অপেক্ষায় আছি। তোমার সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলে। ওসব আমাকে স্পর্শ করে না। তুমি যদি অপবিত্রও হয়ে থাকো, জানবে, আমার ভালবাসা দিয়ে তোমাকে আমি পবিত্র করে নিতে পারব।

তোমার সাথে এই আমার শেষ যোগাযোগ। কিন্তু তোমার জন্যে চিরকাল আমি অপেক্ষায় থাকব। ইতি, কাদির।'

চিঠিটা হাতে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল নাদিয়া। চাঁদের আলোয় অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। বুক ঠেলে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস। মাথার ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। বুকে বালিশ চেপে জানালা দিয়ে চাঁদ দেখতে দেখতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সে। চিঠিটা রয়ে গেল হাতেই।

তেরো

কাজ থাকলেও অত রাতে আর অফিসে ফেরেনি রানা। পরদিন অফিসে ঢুকে দুটো মেসেজ পেল ও। প্রথম মেসেজটা এসেছে এস.আই.এস এর পর্তুগাল অফিস থেকে। রানার অনুসন্ধানের উত্তরে জানানো হয়েছে, ইংরেজী বই বিক্রি হয় এই ধরনের কয়েকটা পুরানো বইয়ের দোকানে খোঁজ চালিয়ে জানা গেছে, একটা দোকান থেকে ইসরায়েলি দূতাবাসের এক কর্মচারীর স্ত্রী রেবেকা নামের ছয়টা উপন্যাস কিনেছিল।

লিসবন থেকে সাহারা হয়ে কায়রোয়, ভাবল রানা। অসম্ভব? সন্দেহ নেই, এই রেবেকা উপন্যাসই আলেক বোগানের কোড-এর বেস। কায়রোয় ইসরায়েলের আরও একজন স্পাই কাজ করছে, এ-কথা মনে করার কোন কারণ নেই। তথ্যটা আগে বা পরে কাজে লাগবে, জানে রানা। বই আর ডিকোড করা মেসেজের সাথে কোড কী আবিষ্কার হলে সোনায় সোহাগা হত।

দ্বিতীয় মেসেজটা প্রথমটার চেয়ে জরুরী। আজ সকাল দশটায় মিশরীয় সেনাবাহিনীর হাই কমান্ড বৈঠকে বসছে, সেখানে রানাকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। হাতঘড়ি দেখল রানা। যেতে হলে এখুনি বেরিয়ে পড়তে হয়।

ক্যান্টনমেন্টের ভেতরেই বৈঠক বসেছে, পৌঁছতে তিন মিনিট লাগল রানার। গিয়ে দেখল, ওর জন্যেই অপেক্ষা করছে সবাই। বৈঠকে যোগ দিয়েছেন চারজন মেজর জেনারেল, সাতজন কর্নেল, একজন ব্রিগেডিয়ার। রানার সাথে সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন ব্রিগেডিয়ার নুরুদ্দীন হাফিজ। সবাই ওর দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকল, একটু আড়ষ্টই বোধ করল রানা।

আলোচ্য বিষয় সূচী জানিয়ে দেয়া হলো রানাকে। পয়লা নম্বরে রয়েছে যুদ্ধ পরিকল্পনাটা। একজন মেজর জেনারেল ছোট্ট একটা ভূমিকা করে আলোচনার সূচনা করলেন।

তিনি বললেন, 'প্রথমেই মেজর রানাকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ, শত্রুর হাতে ভুয়া তথ্য তুলে দেয়ার পরিকল্পনাটা তারই ছিল। এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে আশ্চর্য ফল পেয়েছি আমরা। তাই হাই কমান্ড থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, এই ধরনের নতুন নতুন আইডিয়া কেউ দিলে, সেটা আমরা পরীক্ষা করে দেখব। কিন্তু কথাটা প্রচার করা হলে ব্যাঙের ছাতার মত গাদা গাদা আইডিয়ার জঞ্জাল জড়ো হবার ভয় আছে, তাই শুধুমাত্র বিশেষ কয়েকজন অফিসারকে নতুন আইডিয়া ভেবে বের করার দায়িত্ব দেয়া হবে। এখানে একটা তালিকা তৈরি করা হয়েছে,' হাতের কাগজ নেড়ে দেখালেন মেজর জেনারেল। 'তালিকায় প্রথমেই রয়েছে মেজর রানার নাম।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

ব্রিগেডিয়ার বললেন, 'যুদ্ধ পরিকল্পনা সংক্রান্ত নতুন কোন আইডিয়া চিন্তা করার সময় একটা কথা তোমাকে বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে, রানা। এমন কোন পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হবে না, যাতে নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। তোমার প্রথম পরিকল্পনার কথাই ধরো। অফিসারদের ব্রীফকেসে ভুয়া তথ্য ভরে দেয়ার ব্যবস্থা দু'একদিনের জন্যে ঠিকই ছিল, কিন্তু বেশিদিন চালু থাকায়, নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছিল। সেজন্যেই ওটা বাতিল করা হয়...'

'কি?' আকাশ থেকে পড়ল রানা। 'ওটা বাতিল করা হয়েছে?'

'কেন, তুমি জানো না?' জিজ্ঞেস করল ব্রিগেডিয়ার। 'তোমার সেকশন অফিসারকে তো নোটিশ পাঠানো হয়েছে।'

আতঙ্ক বোধ করল রানা। ভাবল, সর্বনাশ হয়ে গেছে! জানতে চাইল, 'কবে থেকে বাতিল করা হয়েছে?'

'আজ চারদিন।'

'মাই গড!' আঁতকে উঠল রানা। 'কিন্তু লে. কর্নেল হাসান আমাকে জানালেন না কেন?'

'ঠিক আছে, আমি তার কাছ থেকে জবাব চাইব।' রাগে ফেটে পড়লেন ব্রিগেডিয়ার।

এর একটু পর কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে এল রানা। ঝড় বয়ে যাচ্ছে মনে। না জানি কি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে গেছে আলেক।

অফিসে ফিরে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকল রানা। পাঁচ মিনিট চিন্তা-ভাবনা করার পর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও। গত চারদিনে গুরুত্বপূর্ণ কাগজ-পত্র জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে যে ক'টা বাইরে গেছে তার একটা তালিকা চেয়ে পাঠাবে ও। ফরহাদকে ডেকে তখুনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রাখল।

দুপুর নাগাদ তালিকাটা চলে এল রানার হাতে। চোখ বুলাতেই দেখল, মাত্র একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনারেল হেডকোয়ার্টারের বাইরে বেরিয়েছে। প্রেসিডেন্ট নিজে দুটো তথ্য জানতে চেয়েছিলেন। এক, সিনাই এলাকায় মাইন ফিল্ড কতটা নির্ভরযোগ্য। দুই, সিনাই এলাকায় যে-সব ডিভিশন রয়েছে তাদের গোলাগুলির মওজুদ কি পরিমাণ আছে। তথ্যগুলো নিয়ে জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে রওনা হয় একজন মেজর, নাম তারেক।

ফরহাদকে নির্দেশ দিল রানা, মেজর তারেককে দরকার।

দশ মিনিট পর এসে ফরহাদ রিপোর্ট করল, 'মেজর তারেককে অফিসে বা বাড়িতে কোথাও পাওয়া গেল না।'

'খোঁজ নিতে থাকো,' বলল রানা। 'হদিস পাওয়া মাত্র এখানে চলে আসতে বলবে।'

ফরহাদ চলে গেল। উত্তেজিত ভাবে পায়চারি শুরু করল রানা। এই তথ্য দুটো আলেকের হাতে যদি পড়ে থাকে, ধরে নিতে হবে সিনাই এলাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রসুনের খোসার চেয়েও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

প্রেসিডেন্ট হাউসে ফোন করল রানা। একজন মিলিটারি অফিসারকে চাইল ও। যোগাযোগ হতে রানা নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইল, 'তিনদিন আগে আপনাদের ওখানে টপ সিক্রেট দুটো সামরিক রিপোর্ট পৌঁছুবার কথা ছিল। ওগুলো কি পৌঁছেছে?' তথ্যগুলো কি কি, তার একটা বিবরণও দিল রানা।

সাত মিনিট অপেক্ষা করতে হলো। তারপর জবাব এল, 'হ্যাঁ, পৌঁছেছে। মেজর তারেক ওগুলো পৌঁছে দিয়ে গেছেন।'

'ধন্যবাদ,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

মেজর তারেকের সন্ধান পাওয়া গেল বিকেল চারটের সময়। চারটা দশে রানার অফিস কামরায় দেখা গেল তাকে।

'কোথায় ছিলেন, মেজর?' রানার প্রথম প্রশ্ন।

'আমার বোন হাসপাতালে, তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।'

'তিন দিন আগে দুটো রিপোর্ট নিয়ে প্রেসিডেন্ট ভবনে যান আপনি,' বলল রানা। 'হেডকোয়ার্টার থেকে সরাসরি গিয়েছিলেন, নাকি পথে কোথাও থেমেছিলেন?'

মুখ শুকিয়ে গেল মেজর তারেকের। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'কোথাও থামিনি!'

কয়েক সেকেন্ড নিস্পলক তাকিয়ে থাকল রানা। মেজর তারেক কোথাও যদি থেমেও থাকে, স্বীকার করবে না। 'ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন।'

'জানতে পারি, ডেকে নিয়ে এসে প্রশ্নটা কেন করা হলো আমাকে?'

'রুটিন,' বলে এড়িয়ে গেল রানা।

মেজর তারেক চলে যাবার পর আবার পায়চারি শুরু করল রানা। লোকটার কথা কি বিশ্বাস করা যায়? প্রশ্ন শুনে মুখ অমন শুকিয়ে গেল কেন? হয়তো কিছু না, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স প্রশ্ন করলে সবারই অমন মুখ শুকায়।

ভুয়া তথ্য যোগান দেয়ার ব্যবস্থা বাতিল করায় ব্যাপারটা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠল। হাই কমান্ডের সিদ্ধান্তের ওপর কোন কথাও চলে না।

এখন একমাত্র উপায়, আলেক বোগানকে গ্রেফতার করা। তাকে আটকাতে না পারলে টপ সিক্রেট ইনফরমেশন ইসরায়েলে যাবেই, ঠেকাবার কোন উপায় নেই।

রানা উপলব্ধি করল, সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখন তার ওপরই চাপছে। ভাবল, পরশু বৃহস্পতিবার। সেদিন কি আলেক বোগানকে ধারা সম্ভব হবে?

সংকেত-৩

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৮৫

এক

লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোসাদ্দেক হাসানের অবস্থা খারাপ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য মেজর মাসুদ রানাকে ইচ্ছে করেই জানায়নি সে, সেজন্যে তাকে ব্যক্তিগতভাবে এবং অফিশিয়ালী শায়েস্তা করেছেন ব্রিগেডিয়ার নুরুদ্দীন হাফিজ। তথ্যটা রানাকে না জানাবার কারণ হিসেবে অজুহাত খাড়া করার চেষ্টা করেছিল সে, কিন্তু ব্রিগেডিয়ার ওসবে কান দেননি। তাঁরই পরামর্শে কাজে গাফিলতির জন্যে লিখিতভাবে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে লে. কর্নেল। এক অর্থে বড় বাঁচা বেঁচে গেছে সে, ক্ষমা না চাইলে গুরুতর সাজা হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টাও পেরোয়নি, আবার নিজের স্বভাব মত রানার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে সে।

গোপনে রানাকে ক্ষমতা দেয়া আছে, ইচ্ছে করলে যে-কোন মুহূর্তে লোকটাকে বদলি করে দিতে পারে ও, এমন কি ওর চাকরিও নট করে দিতে পারে। দুটোর একটা যা-ই করুক রানা, সেটা ক্ষমতার অপব্যবহারও হবে না। লোকটা কোন কম্মেরই নয়, সেকশনের মাথার ওপর বোঝা হয়ে বসে আছে। সারাদিন কাজ বলতে যাকে সামনে পায় তার সাথেই গল্পে মেতে ওঠা। কোন ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবে, সে যোগ্যতা তার নেই। রানা এখনও লোকটার বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশন নেয়নি শুধু সময়ের অভাবে। গোটা মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সকে পরীক্ষা করে দেখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ওকে। কোথাও কোন ফুটো আছে কিনা লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে সেদিকে। তার ওপর, মূর্তিমান আতঙ্ক আলেক বোগানকে নিয়ে নাকানি-চোবানি খাওয়া তো আছেই। এত সব জরুরী কাজের মধ্যে সময় কোথায় যে একজন বিরক্তিকর লোককে শায়েস্তা করবে।

লে. কর্নেল অযোগ্য তো বটেই, রানার বিশ্বাস, আরও দু'একটা খারাপ গুণও রয়েছে তার। সময় এবং সুযোগ মত সেগুলো আবিষ্কার করার ইচ্ছে আছে ওর।

আজ একেবারে গায়ে পড়ে রানার সাথে ঝগড়া করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে লে. কর্নেল। ঠোঁটে ব্যঙ্গ মেশানো নাটকীয় হাসি। বার বার খুক খুক করে কাশছে দেখে বোঝা যায় রানার সাথে লাগার ঝুঁকি নিয়ে মনে মনে নার্ভাসও বোধ করছে। হাত দুটো স্থির রাখতে পারছে না, ডেস্কের গুছানো কাগজ-পত্র এলোমেলো করে আবার গুছাচ্ছে, পায়ের ওপর পা তুলছে আর নামাচ্ছে, চকচকে ক্রিকেট বলটাকে শুধু শুধু ঘষছে ট্রাউজারের ওপর।

তার সামনে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছে রানা। চোখে ঠাণ্ডা

দৃষ্টি।

মিশরীয় সেনাবাহিনীর হাই কমান্ড থেকে বলা হয়েছে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র এবং শক্তিশালী করার জন্যে কোন পরামর্শ দেয়ার থাকলে সেটা যেন মানচিত্র সহ বিশদ ভাবে লিখে জমা দেয়া হয়। সিনাই সীমান্তে ইসরায়েলিরা বড় বেশি উৎপাত করছে, সামরিক সূত্রে জানা গেছে, মাঝারি থেকে বড় ধরনের আক্রমণ করে বসা বিচিত্র কিছু নয়। ওখানে ওদের নাটের গুরু একজন জেনারেল, জেনারেল দারহাম। এই জেনারেলকে একটু প্যাঁচে ফেলে শায়েস্তা করার ইচ্ছে থেকেই একটা ডিসেপশন প্ল্যান তৈরি করেছে রানা। প্ল্যানটা তৈরি করার সময় খুঁটিনাটি অনেক সামরিক তথ্য দরকার হয়েছে ওর, চাহিদা মোতাবেক লে. কর্নেলই সেগুলো যোগান দিয়েছে ওকে। সরাসরি হাই কমান্ডের সাহায্য নিতে পারত রানা, কিন্তু তাতে সময় লাগত বেশি।

এরপর লে. কর্নেলের কাছ থেকে তাগাদার ওপর তাগাদা আসতে লাগল, প্ল্যানটা তাকে যেন একবার দেখানো হয়। সরল মনে গোটা ডিসেপশন প্ল্যানের একটা কপি সেকশন চীফকে পাঠিয়ে দিয়েছিল ও। সেটা নিয়ে আলোচনা করার জন্যেই আজ সকালে রানাকে ডেকে পাঠায় লে. কর্নেল।

'আসলে কি জানেন, মেজর রানা, যার কাজ তাকেই সাজে, অন্য লোকের বিষম বাজে!' খুক করে একবার কাশল লে. কর্নেল। 'স্ট্র্যাটেজি আমার বা আপনার কাজ নয়। আমরা ইন্টেলিজেন্সের লোক, সূক্ষ্ম বুদ্ধির মার-প্যাঁচ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই মানায় ভাল। আমার পরামর্শ, আপনার এই ডিসেপশন প্ল্যান ছিঁড়ে ফেলে দিন। এটা কিছু হয়নি।'

রানার চেহারায় কোন পরিবর্তন ঘটল না। শান্ত সুরে শুধু জানতে চাইল, 'কিছুই হয়নি?'

'হত, কিন্তু এর ভেতর যে হাজারটা গলদ! আপনার দোষ কি। যারা আপনাকে এই দায়িত্ব দিয়েছে তাদের আক্কেল··· কি আর বলব!'

'গলদগুলো কি কি তা যদি একটু বলতেন···' নিরীহ সুরে জানতে চাইল রানা।'

খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল লে. কর্নেল। 'ভাল কথা, একটার কথাই বলি। এই একটা থেকেই পাখা মেলে বেরিয়ে আসবে আরও কয়েক ডজন গলদ। আপনার প্ল্যানে দেখা যাচ্ছে, জেনারেল দারহামকে প্রতিরক্ষা রেখা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হবে। এর চেয়ে বড় ভুল আর কি হতে পারে?'

'ভেতরে কেন ঢুকতে দেয়া হবে সেটা একটু ভেবে দেখুন।'

'কেন ঢুকতে দেয়া হবে, সেটা পরের কথা,' গম্ভীর সুরে বলল মোসাদ্দেক হাসান। 'ঢুকতে দেয়া হবে এই ধারণাটাই তো মাথায় আগুন ধরিয়ে দেয়। আপনার প্ল্যানে দেখা যাচ্ছে দারহামকে আপনি আমাদের দুর্বল জায়গাগুলোয় হামলা চালাতে উৎসাহিত করতে চান, যাতে ভেতরে ঢোকার সবচেয়ে ভাল সুযোগটা কাজে লাগাতে পারে সে। কি ভয়ঙ্কর! আমার ধারণা, আপনাকে আমাদের উপকারের জন্যে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে, মেজর রানা! কিন্তু জেনে

হোক না জেনে হোক, আপনি আমাদের ক্ষতি করে ফেললে আশ্চর্য হব না।'

রানার ইচ্ছে হলো, দুম করে লোকটার নাকে একটা ঘুসি বসিয়ে দেয়। কিন্তু পরমুহূর্তে লোকটার শয়তানী উপলব্ধি করে হাসি পেল ওর। ভাবল, লোকটার দৌড় কতদূর দেখা যাক। শান্ত সুরে বলল ও, 'হ্যাঁ, কিছু দুর্বল পয়েন্ট ইচ্ছে করেই তৈরি করব আমরা, যাতে সহজে ভেতরে ঢুকতে পারে জেনারেল দারহাম। সে ভেতরে ঢুকলে তবেই না আমাদের অ্যামবুশ সফল হবে।'

'এত ঝামেলার মধ্যে না গেলেই তো হয়। আমরা যদি চাই আমাদের শক্তিশালী পয়েন্টে হামলা করুক দারহাম, এবং সেটাই স্বাভাবিক, তাহলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়। আমরা তাকে ঠেকিয়ে দিতে পারি। ভেতরে ঢোকার খায়েশ তার মিটে যাবে।'

'এতদিন ধরে তাই করা হচ্ছে,' বলল রানা। 'বাধা পেয়ে পিছু হটছে দারহাম, কিন্তু অল্প। তারপর আবার কোমর বেঁধে এগিয়ে আসছে সে। এর একটা বিহিত করতে না পারলে বার বার একই ঘটনা ঘটতে থাকবে। দুর্বল জায়গা দিয়ে একবার যদি ভেতরে ঢোকাতে পারি, অ্যামবুশের মধ্যে ফেলে চিরকালের জন্যে তাকে ঠুঁটো করে দেয়া সম্ভব।'

'না-না-না! রিস্কি, রিস্কি! ভুলে যাচ্ছেন কেন, ওটাই আমাদের প্রথম এবং শেষ ডিফেন্স লাইন। এই লাইন পেরিয়ে এলে তার আর কায়রোর মাঝখানে থাকবে শুধু একটা খাল। আপনি আসলে বুঝছেন না...'

'বক বক একটু কম করুন,' কড়া কথা, কিন্তু রানার গলার সুর শান্ত। 'প্ল্যানটা আমি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করছি, যদি না বোঝেন, মনে করব এর তাৎপর্য বোঝার ক্ষমতা আপনার নেই। দুর্বল ডিফেন্স লাইন পেরিয়ে ভেতরে যদি ঢুকতে পারে দারহাম, তেমন কোন বাধা ছাড়া সহজে জিতে যাবে মনে করে এগারো, তেরো, পনেরো, ষোলো, সতেরো, উনিশ আর একুশ পয়েন্টের দিকে মার্চ করবে সে। চোরাবালির কারণে এসব পয়েন্টে দক্ষিণ দিক থেকে হামলা চালাবে সে। আমরা যদি দুর্বল পয়েন্টে তাকে হামলা চালাতে উৎসাহিত না করি, সে হয়তো ডিফেন্স লাইনের উত্তর প্রান্তে হামলা চালাবে। চোরাবালি থাকায় ওদিক থেকে হামলা আসবে না ভেবে আমরা তৈরি হইনি। ফলে হামলা যদি আসে, ঠেকাতে পারব না। কিন্তু দক্ষিণ দিক থেকে হামলা এলে আমরা ওই রকম কয়েকজন দারহামকে ঠেকাতে পারব। আরেকটা কথা, ওদিক থেকে দারহাম এলে, তার পিছু হটার পথ বন্ধ করা সম্ভব।'

সবজান্তার মত মাথা ঝাঁকাল লে. কর্নেল। 'এখন যেন একটু বোধগম্য লাগছে। তবে গলদ যে একেবারে নেই তা নয়। ঠিক আছে, এটা আমার কাছেই থাক, ভুল-ত্রুটি যা আছে শুধরে পাঠিয়ে দেব হাই কমান্ডে।'

রানা যা সন্দেহ করেছিল, তাই। ওর প্ল্যানটাকে নিজের বলে চালিয়ে কৃতিত্বের সবটুকু নিজে নিতে চায় মোসাদ্দেক হাসান। মুচকি একটু হাসল ও। বলল, 'ঠিক আছে। আমি শুধু বলতে চাই, প্ল্যানটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজে লাগানো দরকার। দেরি হয়ে গেলে এর আর কোন মূল্যই থাকবে না। আপনি বরং

ব্রিগেডিয়ার হাফিজের সাথে বসে…'

'সে আমি বুঝব,' কর্তৃত্বের সুরে বলল লে. কর্নেল। 'সব কিছুই তো নির্ভর করছে আপনার ওই স্পাইটাকে ধরার ওপর। ডিফেন্স লাইনের কোন্ পয়েন্টগুলো দুর্বল, আলেকের মাধ্যমেই দারহামকে তা জানাতে হবে।'

'সেটা আমিও জানাতে পারি,' বলল রানা। 'যদি আলেককে দু'একদিনের মধ্যে ধরা সম্ভব হয়।'

'মানে?'

'আলেক ধরা পড়লে তার রেডিওটা আমাদের হাতে চলে আসছে,' বলল রানা। 'আলেকের পরিচয় দিয়ে আমি যোগাযোগ করব ইসরায়েলের সাথে।'

মাথা ঝাঁকাল লে. কর্নেল। 'আইডিয়াটা মন্দ নয়, কিন্তু আজেবাজে ব্যাপারে আপনি যেভাবে মাথা ঘামাচ্ছেন, লোকটাকে ধরবেন কখন, তাই ভাবছি।' এক সেকেন্ড চিন্তা করল সে, তারপর আবার বলল, 'ভাল কথা, আজ রাতের অপারেশন আমি নিজে দেখাশোনা করব, যাতে সেবারের মত এবারও আলেক পালাতে না পারে। ফাঁদটা কিভাবে পাততে চান, বিকেলের মধ্যে আপনি আমাকে জানাবেন। তারপর দু'জন মিলে গলদ বের করব…'

দরজায় নক হলো। কবাট খুলে ভেতরে ঢুকলেন ব্রিগেডিয়ার নজিব। লে. কর্নেল এবং রানা উঠে দাঁড়াল।

'গুড মর্নিং, স্যার।' চেহারাটা বিনয়ে বিগলিত করে তুলল মোসাদ্দেক হাসান।

'বসুন,' বললেন ব্রিগেডিয়ার। 'মেজর রানা, আপনাকেই খুঁজছিলাম আমি।'

'আমরা, স্যার, একটা ডিসেপশন প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করছিলাম…' শুরু করল লে. কর্নেল।

'হ্যাঁ, প্ল্যানের একটা কপি আমিও পেয়েছি।'

'ও।' থতমত খেয়ে গেল লে. কর্নেল। 'মেজর রানা আপনাকেও তাহলে এক কপি পাঠিয়েছেন!'

লে. কর্নেলের দিকে তাকাল না রানা, কিন্তু বুঝল, চোখে আগুন নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা।

'হ্যাঁ,' বললেন ব্রিগেডিয়ার নজিব। রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'মেজর রানা, আপনার কাজ স্পাই ধরা। কিভাবে যুদ্ধে জিততে হবে সে-ব্যাপারে জেনারেলদের পরামর্শ দেয়া আপনার কাজ নয়। আদর্শ সিকিউরিটি অফিসার হতে চাইলে ভবিষ্যতে আর কখনও ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যাবেন না।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা।

'আমি স্যার ঠিক সেই কথাই মেজরকে বলছিলাম,' অতি উৎসাহের সাথে শুরু করল লে. কর্নেল।

ব্রিগেডিয়ার তাকে বাধা দিলেন। 'তবে, মেজর রানা, আপনি একজন ইন্টেলিজেন্স অফিসার হওয়া সত্ত্বেও হাই কমান্ড আপনার কাছ থেকে যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্পর্কে পরামর্শ চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। প্ল্যানটা আমি পড়ে দেখেছি, এক কথায় অপূর্ব। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন চলুন, হাই কমান্ডের মীটিং

বসেছে, ওখানে আপনাকে আমাদের দরকার।' লে. কর্নেলের দিকে ফিরলেন তিনি। 'মেজর রানাকে আপনার দরকার আছে, লে. কর্নেল?'

'জী-না!' হিসহিস করে বলল মোসাদ্দেক হাসান।

ব্রিগেডিয়ারের পিছু পিছু কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা। বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল ও, ঘুরল। দেখল ওর দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে লে. কর্নেল। মুচকি একটু হাসল রানা, তারপর লোকটার মুখের ওপর বন্ধ করে দিল দরজা।

দুই

আজ রাতে বুজম রেস্তোরাঁয় নাদিয়ার সাথে দেখা করার কথা আলেকের। কিন্তু ওখানে সে দেখা করবে না। খবর এসেছে, আজ দুপুরে আবার হাউজবোটে আসছে মেজর তারেক। তারেক চলে যাবার পর চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেবে আলেক, নাদিয়ার সাথে কোথায় দেখা করা যায়।

ঠিক সময় মতই হাজির হলো মেজর তারেক। সরাসরি জেনারেল হেড-কোয়ার্টার থেকেই এল সে। আলেকের ভাগ্যই বলতে হবে, ব্রীফকেস থেকে আজকের পাওয়া তথ্য গুরুত্বের দিক থেকে আগের পাওয়া তথ্যগুলোকে ম্লান করে দেয়।

আগের সেই ছক বাঁধা রুটিনই অনুসরণ করল আলেক আর রোপা। গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কে পায়ের আওয়াজ হতেই আলমিরার ভেতর লুকাল আলেক। মেজর তারেককে লিভিংরূমে অভ্যর্থনা জানাল রোপা, তাকে কাউচে বসিয়ে আদর-সোহাগে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। তারপর বিবস্ত্র তারেককে নিয়ে বেডরূমে ঢুকল সে। দু'কামরার মাঝখানের পর্দাটা টেনে দিতে ভুল হলো না তার। আলমিরা থেকে বেরিয়ে এল আলেক। দেখল, মেঝেতে পড়ে রয়েছে তারেকের ব্রীফকেস। পাশেই রয়েছে বুট জুতো আর প্যান্ট, প্যান্টের পকেট থেকে বাইরে উঁকি দিয়ে রয়েছে চাবির গোছা।

ব্রীফকেস খুলে কাগজ বের করল আলেক। পড়তে শুরু করল।

এটা প্রেসিডেন্টের জন্যে তৈরি করা বিশেষ একটা রিপোর্ট। দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পেতে চেয়েছেন তিনি, তাই এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। মিশরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিশদ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে রিপোর্টে, তার সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে হঠাৎ ইসরায়েল হামলা করে বসলে কিভাবে সেটা মোকাবিলা করা হবে তার প্ল্যান। এই রকম একটা সাতরাজার ধন হাতে পেয়ে প্রথমে নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারল না আলেক। ব্যাপারটা হজম করতে কয়েক মিনিট সময় লাগল তার। তারপর উপলব্ধি করল সে, এই রিপোর্ট হাতে পেলে ইসরায়েলি জেনারেলেরা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মিশরকে ধ্বংস করে দিতে পারবে।

আনন্দের আতিশয্যে দিশেহারা বোধ করল আলেক। কল্পনার চোখে বিজয়ী ইসরায়েলি সৈনিকদের কায়রোর রাস্তায় মার্চ করতে দেখল সে। প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে সাড়ম্বর অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী মিশরের গভর্নর জেনারেলের পদে আলেক বোগানকে বরণ করে নিচ্ছেন। তার পার্সোন্যাল সেক্রেটারি হিসেবে পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রোপা ইরিনা। চারদিক থেকে মুহুর্মুহু করতালির আওয়াজ ভেসে আসছে।

বেডরূম থেকে খিল খিল করে হেসে উঠে আলেকের দিবাস্বপ্ন ভেঙে দিল রোপা। এসপিওনাজ জগতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বলে বিবেচিত হবে এটা, ভাবল আলেক, এই রিপোর্ট যদি ইসরায়েলে পাচার করতে পারে সে। রিপোর্টটা তাড়াতাড়ি লিখে ফেলা দরকার। বেশ বড় রিপোর্ট, সময় লাগবে। মুখ তুলল সে, দেখল, পর্দা সরিয়ে লিভিংরূমে চলে এসেছে মেজর তারেক। তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

'তুমি শালা কে?' হুঙ্কার ছাড়ল মেজর।

নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হলো আলেকের। বেডরূমে কি হচ্ছে না হচ্ছে, সেদিকে কোন খেয়ালই ছিল না তার। কোথাও কোন অনিয়ম ঘটেছে, বোতলের ছিপি খোলেনি তারেক। হঠাৎ আতঙ্ক অনুভব করল আলেক। শত বাধা টপকে যে মুহূর্তে সাফল্যের উজ্জ্বল আলো দেখতে পেল, ঠিক তখনই এ-কি বিপদ! মরিয়া হয়ে উঠল সে। তীরে এসে তরী ডুববে তা সে হতে দেবে না।

'ওটা আমার ব্রীফকেস!' কর্কশ সুরে বলল তারেক। এক পা সামনে বাড়াল সে।

বিদ্যুৎ বেগে হাত বাড়িয়ে তারেকের পা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল আলেক। তাল সামলাতে না পেরে ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেল মেজর।

চেঁচিয়ে উঠল রোপা।

আলেক এবং তারেক, দু'জনেই ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে উঠে দাঁড়াল।

রোগা, একহারা চেহারা মেজর তারেকের। দৈত্যাকার আলেকের সামনে শিশু বৈ কিছু নয় সে। নিজের অজান্তেই পিছু হটল সে, দু'চোখে আতঙ্ক। একটা শেলফের সাথে ধাক্কা খেলো সে, চট করে তাকাল একপাশে। শেলফের ওপর কাঁচের একটা গ্লাস দেখে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল, তারপর ছুঁড়ে মারল আলেকের মাথা লক্ষ্য করে।

মাথা সরিয়ে নিল আলেক। কিচেন সিঙ্কের ওপর পড়ে সশব্দে চুরমার হয়ে গেল গ্লাসটা।

এইরকম আরও দু'একটা আওয়াজ হলেই বিপদ, ভাবল আলেক। কৌতূহলী লোকের ভিড় জমে যাবে। তারেকের দিকে এগোল সে।

পিঠ দেয়ালে ঠেকল তারেকের। 'হেলপ!' গলার রগগুলো উঁচু হয়ে উঠল তার। 'বাঁচাও!' আবার মুখ খুলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু চোয়ালে ঘুসি খেয়ে সর্ষে ফুল দেখল চোখে, গলা থেকে গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এল।

নির্দয় হয়ে উঠল আলেক। দ্বিতীয় ঘুসিতেই জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা হলো তারেকের, কিন্তু আরও কিছুক্ষণ কিল ঘুসি খেতে হলো তাকে। বেডরুম থেকে বেরিয়ে এসে আলেককে থামাল রোপা। বলল, 'কাকে মারছ? ও তো অজ্ঞান হয়ে গেছে!'

আঙুলের উল্টো পিঠ ডলতে ডলতে আলেক আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাসল একটু, বলল, 'এতেই!'

'এখন?' জানতে চাইল রোপা। ভয় পেয়েছে সে, কিন্তু নিজেকে বেসামাল হয়ে উঠতে দেয়নি। নিজের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে তার। 'ওকে নিয়ে কি করব আমরা?'

'জানি না,' বলল আলেক। কি করা যায় ভাবতে লাগল সে। তারেককে খুন করলে গনগনে আগুন হয়ে উঠবে এই শহর। টপ সিক্রেট ইনফরমেশন সহ একজন সামরিক অফিসার নিখোঁজ হলে কায়রোর প্রতিটা ইট খুলে পরীক্ষা করা হবে, বন্ধ করে দেয়া হবে শহর থেকে বেরোবার সমস্ত রাস্তা। লাশ সরানো, সে-ও এক ঝামেলা।

তারেককে ছেড়ে দেয়াও সম্ভব নয়। তবু ব্যাপারটা নিয়ে খানিক চিন্তা করল আলেক।

গুঙিয়ে উঠল তারেক। পা নাড়ল।

ছেড়ে দিলে তারেক আর কখনও হাউজবোটে আসবে না। কিন্তু হাউজবোটে কি ঘটেছে সেটা রিপোর্ট করাও তার পক্ষে কঠিন হবে। কারণ তাতে করে নিজেও ফেঁসে যাবে সে। শুধু যে তার ক্যারিয়ার খতম হবে তাই নয়, জেলও খাটতে হবে তাকে। এত বড় ঝুঁকি কি নেবে লোকটা? উঁহুঁ, মনে হয় না। মনের জোর এই লোকের নেই বললেই চলে।

কিন্তু যুক্তি যাই বলুক, তারেককে কোনমতেই মুক্তি দেয়া সম্ভব নয়। আলেক বোগান নামে একজন ইসরায়েলি স্পাইয়ের অস্তিত্ব এবং ঠিকানা একজন মিশরীয় সামরিক অফিসার জানবে, এ হতে দিতে পারে না সে। অসম্ভব!

চোখ মেলল তারেক। 'তুমি...তুমি কাবিল, ফ্রন্টিয়ার রেজিমেন্ট...' রোপার দিকে তাকাল সে, তারপর আবার আলেকের দিকে। '...তুমিই ওর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে আমার...ডুম-ডাম নাইটক্লাবে...গোটা ব্যাপারটাই একটা ফাঁদ...'

'শাট আপ!' চাপা গলায় বলল আলেক। দ্রুত চিন্তা করছে সে। মারব, নাকি ছেড়ে দেব? এই দুইয়ের আর কোন বিকল্প নেই? আছে। হাত-পা-মুখ বেঁধে এখানে রেখে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু কতদিন? যতদিন না যুদ্ধ বাধে? যতদিন না ইসরায়েল দখল করে কায়রো?

'তোমরা স্পাই!' চেহারা সাদা হয়ে গেছে তারেকের, চোখ দুটো বিস্ফারিত।

'জ্বী-ই-ই,' প্রলম্বিত সুরে বলল রোপা। মুখে ব্যঙ্গের হাসি, 'তুমি শালা ভেবেছিলে, তোমার প্রেমে আমি হাবুডুবু খাচ্ছি, তাই না?'

'আমি তো শেষ,' বলল তারেক, বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে উঠছে সে, 'কিন্তু তোমাদের অবস্থা কি হবে ভেবে দেখেছ?'

'কিস্যু হবে না,' বলল রোপা। 'আমরা যেমন আছি তেমনি থাকব।'

'তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল, দেহ দেখিয়ে যার দিন কাটে, বিছানায় বেশ্যার মত...'

এগিয়ে এসে তারেকের পাঁজরে একটা লাথি মারল রোপা। 'তোকে শালা মেরেই ফেলব!'

'আহ্, থামো তো!' রোপাকে ধমকে দিল আলেক। 'ওকে নিয়ে কি করব সেটা আগে ঠিক করতে দাও। ভাল করে বাঁধতে হবে। রশি আছে?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রোপা। 'ডেকে পাবে। ফরওয়ার্ড লকারে।'

কিচেন থেকে ভারী একটা লোহার লম্বা রড নিয়ে এসে রোপার হাতে ধরিয়ে দিল আলেক। বলল, 'নড়তে দেবে না। নড়ছে দেখলেই এটা দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দেবে মাথায়।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করবে আলেক, গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কে পায়ের আওয়াজ হলো।

ছ্যাঁৎ করে উঠল রোপার বুক। 'ডাক-পিয়ন!'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুরি বের করল আলেক, এগিয়ে এল। তারেকের নাকের সামনে ছুরির ফলা ধরে বলল, 'মুখ খোলো!'

কিছু বলতে চাইল তারেক, সেই সুযোগে তার মুখের ভেতর ছুরির ফলাটা ঢুকিয়ে দিল আলেক। 'যদি একটু নড়ো বা কথা বলতে চেষ্টা করো, জিভ কেটে বের করে আনব।'

স্থির হয়ে গেল তারেক, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল আলেকের দিকে। হঠাৎ খেয়াল হলো আলেকের, সম্পূর্ণ দিগম্বরী সেজে দাঁড়িয়ে রয়েছে রোপা। 'গা ঢাকো!' ফিসফিস করে তাগাদা দিল সে।

ছুটে গিয়ে বিছানার চাদরটা তুলে গায়ে জড়াল রোপা, আরেক ছুটে চলে এল সিঁড়ির গোড়ায়।

সিঁড়ির মাথায় হ্যাচটা খুলে যাচ্ছে। আলেক জানে, ওখান থেকে উঁকি দিয়ে নিচে তাকালে তাকে আর তারেককে দেখতে পাবে ডাক-পিয়ন। যদি না ডাক-পিয়ন আর ওদের দু'জনের মাঝখানে একটা আড়াল সৃষ্টি করে রোপা।

সিঁড়ি বেয়ে খানিকটা উঠে গিয়ে হাত বাড়াল রোপা, ডাক-পিয়নের হাত থেকে চিঠিগুলো নিল। 'গুড মর্নিং, ম্যাডাম,' বলল ডাক-পিয়ন। হাত বাড়াবার ছুতোয় গায়ের চাদর অনেকখানি খসে পড়তে দিয়েছে রোপা, তার শরীরের উন্মুক্ত এলাকার ওপর দৃষ্টি বুলাল লোকটা। ধাপ বেয়ে আরও একটু ওপরে উঠল রোপা, লোকটা যাতে পিছু হটতে বাধ্য হয়। গায়ের চাদর আরও একটু খসতে দিল সে।

'ধন্যবাদ,' বলল রোপা। আবার হাত বাড়িয়ে হ্যাচটা বন্ধ করে দিতে গেল।

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল ডাক-পিয়ন, যেন কিছু বলতে চায়। কিন্তু রোপার চোখে কোন রকম প্রশ্রয় নেই দেখে মাথা সরিয়ে নিল সে। হ্যাচ বন্ধ করে দিল রোপা।

আটকে রাখা নিঃশ্বাস আস্তে আস্তে ছাড়ল আলেক। ডাক-পিয়নের পায়ের আওয়াজ গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক হয়ে টোপাথের দিকে চলে যাচ্ছে।

'দেখি, চাদরটা দাও আমাকে,' বলল আলেক।

গায়ের চাদর খুলে আবার বিবস্ত্র হলো রোপা।

তারেকের দুই পাটি দাঁতের ফাঁক থেকে ছুরির ফলা বের করে চাদরের খানিকটা কেটে নিল আলেক। কাপড়ের টুকরোটা গোল পাকিয়ে ভরে দিল তারেকের মুখে। তারেক বাধা দিল না। বগলের নিচে খাপের ভেতর ছুরিটা ঢুকিয়ে রাখল আলেক। দাঁড়াল সে। চোখ বুজল তারেক। দেখে মনে হলো, নেতিয়ে পড়েছে, মেনে নিয়েছে পরাজয়।

লোহার রড তুলে নিল রোপা, তারেককে আঘাত করার জন্যে তৈরি হয়ে থাকল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল আলেক।

লকারটা খুঁজে পেতে একটু সময় লাগল আলেকের। সেটা খুলে দেখল, সরু মোটা অনেক ধরনের রশি রয়েছে। হাত-পা বাঁধার জন্যে সরু একটা রশি বেছে নিল সে। কানে ঢুকল রোপার গলা। তীক্ষ্ণ সুরে কি যেন বলল সে। পরমুহূর্তে ভেসে এল তার আর্ত চিৎকার। সেই সাথে সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। কে যেন পড়িমরি করে উঠে আসছে।

হ্যাচ থেকে ছিটকে ডেকে বেরিয়ে এল তারেক। পরনে শুধু আন্ডারপ্যান্ট। হাতের রশি ফেলে ঝট করে ঘুরল আলেক। তারেককে দেখে বুঝল, তার নেতিয়ে পড়ার ভাবটা আসলে অভিনয় ছিল। ডেকে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল মেজর, চেহারায় বেপরোয়া, জঙ্গী একটা ভাব। আলেককে দেখতে পেয়ে উল্টোদিকে ছুটল সে।

ধাওয়া করল আলেক।

গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের দিকে ছুটছিল তারেক, আলেক পিছু নিয়েছে দেখে দিক বদলে ডেকের আরেক দিকে ছুটল সে, তারপর কিনারায় পৌঁছে লাফ দিয়ে রেলিং টপকাতেই সোজা একেবারে ঝপাৎ করে পানিতে গিয়ে পড়ল।

রেলিঙের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে বলল আলেক, 'সর্বনাশ!' দ্রুত চারদিকে চোখ বুলাল সে। না, আশপাশের হাউজবোটের ডেকে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। লাঞ্চ খাবার সময় এটা। কিন্তু টোপাথে একজন লোক বসে রয়েছে, অথর্ব এক বুড়ো ভিখিরি। বুড়ো যাতে মুখ না খোলে, খাদিম সারওয়ারকে দিয়ে সে-ব্যবস্থা করা যাবে। আরও একজন লোককে দেখা গেল। অনেকটা দূরে, ওদের দিকে পিছন ফিরে হাঁটছে সে, ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। নদীর দিকে ফিরল আলেক। একজোড়া রাজহাঁস দেখা গেল আধ মাইলখানেক দূরে। তাদের পাশ দিয়ে পাল তোলা একটা নৌকা ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

রেলিঙের ওপর ঝুঁকে নিচে তাকাল আলেক। এইমাত্র পানি থেকে মাথা তুলেছে তারেক, মুখ খুলে বাতাস গিলছে। হাত দিয়ে চোখ মুছে এদিক ওদিক তাকিয়ে দিক্‌ভ্রান্ত ভাবটা কাটাতে চেষ্টা করল সে। পানিতে নামার তেমন অভ্যেস নেই, অকারণে হাত-পা ছুঁড়ে চারদিকে আলোড়ন আর ঢেউ তুলছে। তারপর

সাঁতরাতে শুরু করল। হাউজবোট থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু গতি খুবই শ্লথ। বোঝাই যায়, ভাল সাঁতার জানে না।

ধীরে সুস্থে রেলিং টপকাল আলেক। তারপর ঝাঁপ দিল। তারেকের মাথার ওপর পা দিয়ে পড়ল সে।

কার কি অবস্থা, কোত্থেকে কোথায় যাচ্ছে, কয়েক সেকেন্ড কিছুই বোঝা গেল না। দু'জোড়া হাত আর দু'জোড়া পা পরস্পরের সাথে জড়িয়ে গেছে, আলেক অনুভব করল, নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে তারা। উপলব্ধি করল, নিচে নামা চলবে না, পানির ওপর মাথা তুলতে হবে। এই সময় মরিয়া হয়ে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল তারেক। গায়ে শক্তি বেশি, তারেককে নিচের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজেকে ওপর দিকে তুলতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না আলেকের। নিজেকে তারেকের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পানির ওপর মাথা তুলল সে।

পানির নিচে অনেকক্ষণ থেকে হাঁপিয়ে গেছে আলেক। মুখ খুলে বাতাস টানছে সে। চোখ খুলতেই সামনে দেখতে পেল তারেককে, এইমাত্র ভেসে উঠল মাথাটা।

খক্ খক্ করে কাশতে শুরু করল তারেক। হাত-পা ছুঁড়ে চারদিকে পানি ছড়াচ্ছে। দু'হাত বাড়িয়ে তার মাথাটা ধরল আলেক, তারপর নিজের আর নিচের দিকে টান দিল। মাছের মত ছটফট করতে লাগল তারেক। তার মাথা ছেড়ে দিয়ে দুই কাঁধে হাত রেখে নিচের দিকে চাপ দিল আলেক, তারপর তার সাথে নিজেও নেমে গেল পানির নিচে। পাঁচ সেকেন্ড পর পানির ওপর মাথা তুলল সে। হাত দুটো পানির নিচেই থাকল, তারেকের কাঁধ ধরে আছে। পানির নিচে ছটফট করছে মেজর।

পানির নিচে দম বেরোতে একজন লোকের কতক্ষণ লাগে?—ভাবল আলেক। হঠাৎ প্রচণ্ড এক ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল তারেক। মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে গেল আলেক। পানির ওপর মাথা তুলে ফুসফুস ভরে বাতাস নিল মেজর। সংবিৎ ফিরে পেয়ে তাকে লক্ষ্য করে ঘুসি চালাল আলেক। লাগল সেটা, কিন্তু জোরে নয়। মুখ খুলে বাতাস নিচ্ছে তারেক, প্রতিবার বাতাস ছাড়ার সময় কাশছে, বমি করতে যাচ্ছে। পানি অবশ্য আলেকের পেটেও গেছে। কৌশলে এবার তারেকের পিছনে চলে এল সে। একটা হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল তার গলা, অপর হাতটা তার মাথায় রেখে চাপ দিতে লাগল নিচের দিকে।

আলেক ভাবল, গড, কেউ যদি দেখে ফেলে!

নিস্তেজ হয়ে আসছে তারেক। মাথার ওপর চাপ দিয়ে এখন নিচের দিকে নামানো যাচ্ছে। তার পিঠের ওপর একটা হাঁটু রাখল আলেক। শত চেষ্টা করলেও আলেককে ঠেলে আর সে ওপরে উঠতে পারবে না। পানির নিচে এখনও অবশ্য হাত-পা ছুঁড়ছে, ঝাঁকি দিচ্ছে, মোচড় খাচ্ছে, কিন্তু মনে মনে তার জানা হয়ে গেছে, বিধি বাম!

ডোব শালা, ডোব! তারেক জ্ঞান হারাতে দেরি করছে দেখে ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে আলেক। বিড় বিড় করে বলে চলেছে, 'কত জ্বালাবি আর! ডোব! ডোব, শালা! মর!' অনুভব করল, চোয়াল ঝুলে পড়ল তারেকের। বুঝল, এতক্ষণে

ফুসফুসে পানি নিচ্ছে লোকটা। কিন্তু সেই সাথে তীব্র ঝাঁকি দিতে শুরু করল তারেক। আলেকের মনে হলো, বোধহয় ছুটেই যাবে এবার। মানুষ মরতে এত কষ্ট পায়!

তারেকের সাথে পানির নিচে চলে আসতে হলো তাকে। চোখ বন্ধ করে শ্বাস আটকে রাখল সে। এবার শেষবারের মত নিস্তেজ হয়ে আসছে তারেক। ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই তার ফুসফুসের অর্ধেকটা ভরে গেছে পানিতে, ভাবল আলেক। কয়েক মুহূর্ত পর বাতাসের জন্যে নিজেই হাঁসফাঁস করতে শুরু করল সে।

দুর্বল হয়ে গেছে তারেক, কিন্তু পুরোপুরি অসাড় হয়নি। তাকে ধরে রেখে ওপর দিকে উঠল আলেক। পানির ওপর মাথা তুলে বুক ভরে শ্বাস নিল সে। ঝাড়া এক মিনিট ঘন ঘন হাঁপাল। ভারী পাথরের একটা বোঝা মনে হচ্ছে তারেককে, পা ছুঁড়ে সাঁতার দিয়ে হাউজবোটের দিকে এগোল। মাঝে মধ্যে পানির ওপর জেগে উঠল তারেকের মাথা, তার মুখে প্রাণের কোন চিহ্ন দেখল না আলেক।

বোটের পাশে পৌঁছল সে। গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে ডেকে দাঁড়িয়ে আছে রোপা, রেলিঙের ওপর ঝুঁকে তাকিয়ে আছে নিচের দিকে।

'কেউ দেখেছে?' জানতে চাইল আলেক।

'বুঝতে পারছি না,' চাপা গলায় বলল রোপা। 'আমি কাউকে দেখিনি! ও কি···শেষ?'

'হ্যাঁ।' আলেক ভাবল, এই লাশ নিয়ে এখন কি করি আমি? বোটের গায়ে তারেককে চেপে ধরল সে। ওকে ছেড়ে দিলে, ডুববে না, ভেসে বেড়াবে নদীতে। কারও না কারও চোখে পড়বেই, খবর যাবে পুলিসে। পুলিস এসে প্রতিটি হাউজবোটে তল্লাশী চালাবে। ব্রীফকেস আর শর্টস যদি সরিয়েও ফেলে ওরা, আশপাশের হাউজবোটের লোকজন পুলিসকে জানাবে, তারেককে তারা জাইদানে আসা-যাওয়া করতে দেখেছে।

তাহলে? লাশটা বোটে লুকিয়ে রাখাও সম্ভব নয়। পচে গন্ধ ছড়াবে। কোথায় ফেলা যায়! কোথায় ফেলা যায়! ফেলার একটা জায়গার খোঁজে লাশ কাঁধে শহর চষে বেড়াতে হবে নাকি!

ছ্যাঁৎ করে উঠল আলেকের বুক। হঠাৎ ঝাঁকি খেলো তারেক।

'গড,' আঁতকে উঠে বলল আলেক। 'বেঁচে আছে!' চাপ দিয়ে আবার পানির নিচে নামিয়ে দিল তাকে। প্রায় অজ্ঞান হয়ে আছে মেজর, বাধা দেবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু পানির নিচে গিয়েও নড়াচড়া করতে লাগল। এভাবে হবে না, ভাবল আলেক। শালা মরতে বড় বেশি সময় নিচ্ছে।

তারেককে ছেড়ে দিয়ে বগলের নিচ থেকে ছুরিটা টেনে নিল আলেক। ছেড়ে দিতে পানির একটু নিচে তলিয়ে গেছে তারেক, অল্প অল্প নড়াচড়া করছে। ছুরির হাতলটা বাগিয়ে ধরে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আলেক। পানিতে বলে ছুরির একটা কোপও সরাসরি মারতে পারল না সে, তবু এলোপাতাড়ি চালিয়ে গেল। পানির ভেতর ঘুরপাক খেতে শুরু করল তারেক। পানির ওপর ভেসে থাকা ফেনা লালচে হয়ে উঠল। অবশেষে তারেকের মাথার চুল ধরতে পারল আলেক, লক্ষ্য

স্থির করে তার গলায় ছুরি চালাল সে।

ভাবল, সেই তো মরলি, কিন্তু ভোগাতে ছাড়লি না! তারেককে ছেড়ে দিয়ে খাপের ভেতর ছুরিটা ঢুকিয়ে রাখল সে। নদীর পানি তার চারদিকে লাল হয়ে উঠেছে। রক্তের ওপর ভেসে আছে সে। লাশটা স্রোতের টানে একটু একটু করে ভেসে চলে যাচ্ছে দেখে হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরে ফেলল। হঠাৎ করেই উপলব্ধি করল, মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে সে। পানিতে ডুবে মরেছে একজন মেজর, সম্ভব। কিন্তু নদীতে গলাকাটা মেজরের লাশ মানে তাকে কেউ খুন করেছে।

লাশটা এখন লুকাতে হবে। কিন্তু কোথায়? মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল সে। 'রোপা?'

'আমার বমি আসছে!'

'খবরদার! নিজেকে শক্ত করো! আমি একটা উপায় ভেবেছি…'

'কি?'

'যেভাবেই হোক, নদীর তলায় নামিয়ে দিতে হবে ওকে।'

মুখ খুলে কয়েকবার অঁক অঁক আওয়াজ করল রোপা, কিন্তু বমি হলো না। 'ইস, এত রক্ত কেউ দেখে ফেললে…'

'থামো! যা বলছি শোনো!' আলেকের ইচ্ছে হলো চিৎকার করে কথা বলে, কিন্তু অনেক কষ্টে গলার আওয়াজ শান্ত রাখল সে। 'রশিটা…সেই রশিটা নিয়ে এসো!'

রেলিঙের কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল রোপা। একটু পর রশি নিয়ে ফিরে এল আগের জায়গায়। ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে। আলেক বুঝল, ঘাবড়ে গেছে রোপা, সব কথা ব্যাখ্যা করে না বললে ওর কাছ থেকে কাজ আদায় হবে না। 'মন দিয়ে শোনো, রোপা। তারেকের ব্রীফকেসটা আনতে হবে। তার আগে, খুব ভারী কিছু ভরো ওতে।'

'ভারী কিছু…কি?'

তাই তো! ভারী কিছু…কি? কি আছে আমাদের? দ্রুত ভাবতে লাগল আলেক। বই? হ্যাঁ, বই মোটামুটি ভারী হয়। কিন্তু এক আধটা বইতে হবে না। পেয়েছি! বোতল! 'রোপা! শ্যাম্পেনের বোতল, ওগুলো ভরো। খালিগুলো নয়, ভরা বোতল…'

'ভরা বোতল? কেন?'

'প্রশ্ন কোরো না, যা বলছি করো!' চাপা গলায় বলল আলেক।

আবার অদৃশ্য হয়ে গেল রোপা। পোর্টহোলের দিকে তাকিয়ে আলেক তাকে সিঁড়ি বেয়ে লিভিংরুমে নামতে দেখল। হাঁটাচলায় কোন ব্যস্ততা নেই, যেন ঘুমের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে।

তাড়াতাড়ি কর, মাগী! শেষ পর্যন্ত তুই-না ডোবাস!

নিজের চারদিকে ঢুলু ঢুলু চোখে তাকাল রোপা। দৃষ্টি মাঝেমধ্যে ঝাপসা হয়ে আসছে তার। বোটের নিচে কেন নেমে এসেছে, এই মনে পড়ছে, এই ভুলে যাচ্ছে। মেঝেতে খোলা ব্রীফকেস পড়ে থাকতে দেখে চোখ দুটো একটু উজ্জ্বল

হয়ে উঠল তার। হাঁটু গেড়ে বসল সে। ব্রীফকেসটা নেড়েচেড়ে দেখল কিছুক্ষণ।

দাঁতে দাঁত চেপে অভিশাপ দিতে শুরু করল আলেক, মর মাগী, মর!

ব্রীফকেস বন্ধ করল রোপা, উঠে দাঁড়াল। সেটা নিয়ে কিচেনে চলে এল সে। এদিক ওদিক ঘুরঘুর করল কয়েক সেকেন্ড, তারপর আইসবক্সটা খুলল।

আশপাশের হাউজবোটগুলোর ওপর চোখ বুলাল আলেক। কাউকে দেখল না। চোখ ফিরিয়ে নিতে যাবে, দেখল একটা বোটের ডেকে উঠে এল একজন লোক। ডুব দিল ও, ভেসে থাকা লাশটা এক হাত দিয়ে টেনে নিচে নামাল। বিশ সেকেন্ড পর পানির ওপর মাথা তুলল আবার। দেখল, লোকটা নেই।

পোর্টহোলের ভেতর দিয়ে রোপার দিকে তাকাল আলেক। রোপার এক হাতে ব্রীফকেস, আরেক হাতে শ্যাম্পেনের একটা বোতল। বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে সে, যেন এরপর কি করতে হবে ভুলে গেছে। আরও কয়েক সেকেন্ড পর চোখে ফিরে এল সচেতন ভাব, তাড়াতাড়ি ব্রীফকেসে বোতলটা ভরল সে। আইসবক্স থেকে আরেকটা বোতল তুলে নিল।

প্রথম বোতলটা খাড়া ভাবে ব্রীফকেসে দাঁড় করিয়ে রেখেছে রোপা। তাই দেখে দাঁতে দাঁত চাপল আলেক। দ্বিতীয় বোতলটাও সেভাবে খাড়া করে রাখল রোপা। মাগীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ভাবল আলেক। ব্রীফকেস বন্ধ করবে কিভাবে!

তিন নম্বর বোতল ব্রীফকেসে দাঁড় করিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল রোপা। ভুলটা ধরতে পারল সে। বোতলগুলো এক এক করে ধরে শুইয়ে রাখল সে।

এই তো! ভাবল আলেক। লক্ষ্মী মেয়ে! দোহাই লাগে, আরেকটু হাত চালাও।

ব্রীফকেসে চারটা বোতল ভরল রোপা। ভেতরে জায়গা আছে আরও, কিন্তু বোতল নেই। এদিক ওদিক তাকাল সে, ভাবছে, আর কি ভরা যায়। কাঁচের দুটো গ্লাস আর একটা পেপারওয়েট ভরল। তারপর বন্ধ করল ব্রীফকেসের ঢাকনি। হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, তার জন্যে পানিতে অপেক্ষা করছে আলেক। আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল, ব্যস্ততার সাথে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ডেকে। 'আলেক, ব্রীফকেস নিয়ে এসেছি! আর কি করতে হবে বলো!'

'রশির একটা প্রান্ত হাতলের সাথে বাঁধো,' বলল আলেক। 'জলদি!'

দ্রুত হাত চালাল রোপা।

'খুব শক্ত করে বাঁধা চাই,' নির্দেশ দিল আলেক।

'ঠিক আছে।'

'একবার দেখো তো, আশপাশে আছে কেউ?'

চারদিকে চোখ বুলাল রোপা। 'দেখছি না।'

'কুইক!'

রশি দিয়ে ব্রীফকেসের হাতলটা বাঁধল রোপা।

'এবার ওটার আরেক দিক ছুঁড়ে দাও আমাকে।'

রশির অপর প্রান্ত নিচের দিকে ছুঁড়ে দিল রোপা, আলেক সেটা ধরে নিল।

লাশ ধরে ভেসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, রোপাকে পানিতে নামতে বলবে কিনা ভাবল একবার। না, রোপা অসুস্থ হয়ে পড়লে আরেক ঝামেলা হবে। লাশের বগলের নিচ দিয়ে রশিটা ঘুরিয়ে আনল সে, তারপর বুকের ওপর দুটো প্যাঁচ দিয়ে গিট আঁটল। হাত দুটো কাজে ব্যস্ত থাকায় ভেসে থাকতে হিমশিম খেতে হলো তাকে। বার কয়েক পানির নিচে তলিয়ে গেল মাথা, রক্ত মেশানো লাল দু'ঢোক পানি চালান হয়ে গেল পেটে।

কাজটা শেষ হলো।

'তোমার গিট শক্ত হয়েছে তো? টেনেটুনে ভাল করে দেখে নাও।'

দেখল রোপা। 'ঠিক আছে।'

'ব্রীফকেসটা এবার ছুঁড়ে দাও, যতটা দূরে পারো,' বলল আলেক।

তাই করল রোপা। হাউজবোট থেকে দু'গজ দূরে পড়ল সেটা, ছলকে উঠল পানি। পানিতে পড়েই ডুবে গেল সেটা। সেই সাথে নেমে যেতে শুরু করল রশি। একটু পর লাশ আর ব্রীফকেসের মাঝখানে টান টান হয়ে উঠল রশি, তারপর ধীরে ধীরে নিচে নেমে যেতে লাগল লাশ। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে পা দিয়ে লাশটা স্পর্শ করার চেষ্টা করল আলেক। কিন্তু পায়ে কিছু ঠেকল না। নাগালের বাইরে নেমে গেছে সেটা।

হাঁপাতে হাঁপাতে ডেকে উঠে শুয়ে পড়ল আলেক। রেলিঙের ওপর বুক ঠেকিয়ে এখনও নদীর দিকে ঝুঁকে আছে রোপা। ফিসফিস করে বলল, 'লাল রঙ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে!'

কে যেন একজন বলল, 'গুড মর্নিং!'

ঝট্ করে উঠে বসল আলেক। চরকির মত আধপাক ঘুরে টোপাথের দিকে তাকাল রোপা।

'গুড মর্নিং,' উত্তর দিল রোপা। ফিসফিস করে আলেককে বলল, 'ভদ্রমহিলা আমাদের প্রতিবেশী।'

মাঝ-বয়েসী ভদ্রমহিলার ওজন হবে মণ তিনেক, হাতে একটা শপিং বাস্কেট নিয়ে বাজার করতে যাচ্ছে। আলেক শুয়ে ছিল বলে দেখতে পায়নি তাকে, উঠে বসায় দেখে ফেলল। টোপাথের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল মহিলা। 'পানিতে খুব ধস্তাধস্তি হচ্ছিল,' বলল সে। 'ব্যাপারটা কি বলুন তো?'

'ও কিছু না,' মুখে জোর করা হাসি ধরে রেখে বলল রোপা। 'আমাদের বিড়ালটা...পানিতে পড়ে গিয়েছিল আর কি! মি. হাশিম অনেক কষ্টে সেটাকে উদ্ধার করেছেন!'

'তাই?' চোখ বড় বড় করে বিস্ময় প্রকাশ করল মহিলা। 'আমি ভাবলাম কি না কি। তা, আপনার যে বিড়াল আছে, কই, দেখিনি তো!'

'এই তো কাল মাত্র আনলাম,' বলল রোপা। 'আমার এক বান্ধবী প্রেজেন্ট করেছে।'

'বাচ্চা?'

চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল আলেকের, গেলি!

'হ্যাঁ,' বলল রোপা।

'আমি আবার বিড়াল খুব ভালবাসি,' মহিলা ওদের গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের দিকে এক পা এগোল। 'কোথায়, দেখছি না যে?' পরিষ্কার বোঝা যায়, বোটে উঠতে চাইছে সে।

'দেখতে চাইলে কালকে,' বলল রোপা। 'ঘরের ভেতর তালা দিয়ে রাখা হয়েছে—শাস্তি!'

'আহা বেচারী!'

'আমি বরং নিচে গিয়ে কাপড় বদলাই, কি বলো?'

মহিলাকে বলল রোপা, 'কাল তাহলে কথা হবে, কেমন?'

'মি. হাশিম, আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' মহিলা বলল। 'তা, আমাদের বোটে এক সময় বেড়াতে আসতে ভুলবেন না যেন।'

'ঠিক আছে, যাব একদিন,' বলল আলেক, কিন্তু মহিলার দিকে তাকাল না। সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে নেমে গেল সে। তাকে অনুসরণ করল রোপা।

সিঁড়িতে নেমে হ্যাচের দরজা বন্ধ করে দিল রোপা। নিচে নেমে কাউচের ওপর ধপাস করে বসল সে। ভিজে কাপড় ছাড়ছে আলেক।

'আমার জীবনে এ-ধরনের ঘটনা আর ঘটেনি,' বলল রোপা।

'নতুন একটা অভিজ্ঞতা, হ্যাঁ,' বলল আলেক। 'মানুষ খুন—চিন্তা করলে অনেক কিছু, ফুঃ করে উড়িয়ে দিলে কিচ্ছু না।'

'আমি ভাবছি, এর পরিণতি কি?'

'শত্রু নিধনের পরিণতি সব সময় শুভই হয়।'

'হ্যাঁ, এইটুকুই যা সান্ত্বনা,' বলল রোপা। 'লোকটা একজন মিশরীয় মুসলমান, তার ওপর সামরিক অফিসার। আজকের এই ঘটনার পর বলতে পারি আমি, বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ কিছুটা হলেও নিতে পেরেছি।'

'আনন্দে নাচা উচিত আমাদের।'

'ভেবেছ, নাচব না? দাঁড়াও একটু জিরিয়ে সুস্থির হয়ে নিই।'

বাথরুমে ঢুকে বাথটাবের কল খুলে দিল আলেক। আবার যখন বেডরুমে ফিরে এল সে, রোপা জানতে চাইল, 'লোকটাকে খুন করে কিছু লাভ হলো না? নাকি শুধু বিপদটাই বাড়ানো হলো?'

'লাভ হয়নি মানে!' আঙুল দিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা টপ সিক্রেট রিপোর্টটা দেখাল আলেক। 'ওটা কি জানো? দশ কোটি মার্কিন ডলার দাম হাঁকলেও ইসরায়েলি জেনারেলরা ওটা কেনার পক্ষে রায় দেবে। ঈজিপ্টের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ব্লু-প্রিন্ট ওটা। এক কথায়, আগুন! ইসরায়েলের হাতে পড়লে মিশর দখল করতে ওদের চব্বিশ ঘণ্টার বেশি লাগবে না...'

'কখন পাঠাবে ওটা?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইল রোপা।

'রেডিও মেরামত করে রেখেছি,' বলল আলেক। 'আজ রাত বারোটায় পাঠাব।'

'মনে আছে তো, আজ রাতে নাদিয়াকে তুমি এখানে নিয়ে আসছ।'

রোপার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল আলেক।

'কি দেখছ?'
'তোমাকে।'
'আমি নতুন নাকি?'
'না। ভাবছি, এই মাত্র একজন লোককে খুন হতে দেখলে, তারপরও তুমি কিভাবে চাইতে পারো...'
খানিক ইতস্তত করল রোপা, আড়ষ্ট একটু হাসল, তারপর বলল, 'বললে বিশ্বাস করবে কিনা জানি না...ঘটনাটা ঘটে যাওয়ায় অসম্ভব সেক্সি লাগছে নিজেকে...'
'মাই গড!'
'কথা কিন্তু রাখতে হবে, আলেক। কোন ওজর আপত্তি শুনব না আমি। নাদিয়াকে না নিয়ে বোটে ফিরতে পারব না। মনে থাকবে তো?'
ইতস্তত করতে লাগল আলেক। 'কিন্তু নাদিয়া এখানে থাকলে আমি মেসেজ পাঠাব কিভাবে?'
'তুমি তোমার রেডিও নিয়ে ব্যস্ত থেকো,' মুচকি একটু হাসল রোপা। 'আমি আমার নাদিয়াকে নিয়ে ব্যস্ত থাকব।'
'কিন্তু...'
'কোন কিন্তু নয়!' হঠাৎ হিংস্র বাঘিনীর চেহারা হয়ে উঠল রোপার মুখ। 'তোমার কাছে এটা আমার পাওনা হয়েছে!'
'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাই হবে। উত্তেজিত হয়ো না।'
ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রোপা। 'ধন্যবাদ। আজ ওকে নিয়ে এলে তোমার প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব আমি।'
'বললাম তো, আনব।'
বাথরুমে ঢুকল আলেক। ভাবল, ওটা একটা মেয়ে না ডাইনী? বাথটাবের গরম পানিতে নামল সে।
বেডরুম থেকে কথা বলল রোপা, 'কিন্তু তারেকের কাছ থেকে আর কোন তথ্য তুমি পাচ্ছ না।'
'তার আর কোন দরকারও নেই,' বলল আলেক। 'ভাইসাব যাবার আগে আসল জিনিসটাই দিয়ে গেছে।' গায়ে সাবান ঘষে রক্তের দাগ তুলতে শুরু করল সে।

তিন

নাদিয়ার ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাতঘড়ি দেখল রানা। এক ঘণ্টা পর আলেকের সাথে দেখা করতে যাবে নাদিয়া।
দরজায় নক্ করল ও। কবাট খুলে সামনে দাঁড়াল নাদিয়া। কালো সিল্কের

একটা ককটেল-ড্রেস পরেছে সে, কালো হাইহিলের সাথে সিল্কের মোজা। এই মাত্র শেষ করেছে মেকআপ। কালো চুল চক চক করছে। রানার অপেক্ষাতেই ছিল সে।

পথ ছেড়ে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল নাদিয়া, খুঁটিয়ে লক্ষ করছে রানাকে। জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে তোমার, রানা?'

নাদিয়া হাসল না, কিন্তু রানার চোখে আশ্চর্য সুন্দরী লাগল তাকে। 'বলছি।' নাদিয়ার পিছু পিছু লিভিংরুমে চলে এল ও।

'বসো,' বলল নাদিয়া। 'কিছু খাবে?'

'তোমার মুখে হাসি নেই কেন?' জানতে চাইল রানা। 'আলেকের কথা ভেবে ভয় করছে?'

'না,' বলল নাদিয়া। রানার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে অন্য দিকে তাকাল সে। কাদিরের চিঠিটা রানার হাত থেকেই এসেছে তার কাছে, রানা কি পড়েছে সেটা? মনে হয় না। এতটা ভদ্রতাবোধ রয়েছে যার, অন্যের চিঠি খোলে না সে।

'তবে?'

'পরে বলব,' জানাল নাদিয়া। 'তোমার কি হয়েছে তাই বলো।'

সোফায় বসে মাথার চুলে আঙুল চালাল রানা। 'সারাটা দিন গাধার খাটনি গেছে,' বলল ও। 'ইন্টেলিজেন্সের একজন মেজরকে পাওয়া যাচ্ছে না। ব্রীফকেসসহ।'

'আলেক?'

'হতে পারে। খোঁজ শুরু হতে জানা গেছে, ওর আগের হপ্তায় দু'দিন লাঞ্চের সময় কোন হদিস পাওয়া যায়নি মেজরের। কেউ জানে না এই দু'দিন কোথায় গিয়েছিল সে। হতে পারে, আলেকের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল।'

'কিন্তু··· তাহলে একেবারে গায়েব হবে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'নিশ্চয়ই খারাপ কিছু একটা ঘটেছে।'

'ব্রীফকেসে কি ছিল আজ?'

কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা। কতটা জানানো উচিত নাদিয়াকে? আলেককে ধরা যে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা যদি তাকে হৃদয়ঙ্গম করাতে হয়, সব কথা খুলে বলাই দরকার। 'মনে কোরো না বাড়িয়ে বলছি, মিশরের গোটা প্রতিরক্ষা সম্পর্কে একটা বিশদ রিপোর্ট প্রেসিডেন্টকে দেয়ার জন্যে তৈরি করা হয়েছিল, মেজরের ব্রীফকেসে সেই রিপোর্টটা ছিল।'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল নাদিয়া।

'কাজেই, আলেককে আজ ধরতেই হবে, নাদিয়া।'

'কিন্তু দেরি হয়ে যাবে না তো?'

'না,' বলল রানা। 'ওর পাঠানো একটা সিগন্যাল আমাদের হাতে পড়েছিল, পাঠিয়েছিল মাঝরাতে। এক-একজন এজেন্টের মেসেজ পাঠাবার এক একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে। সেই সময়টা ছাড়া তার কথা লিসনিং পোস্ট শুনতে পাবে না। তাই আমি ধরে নিয়েছি, আজ মাঝরাতে মেসেজ পাঠাবে সে।'

হাতঘড়ি দেখল নাদিয়া। 'আটটায় বুজম রেস্তোরাঁয় আসবে সে···এটাই তাহলে আমাদের শেষ সুযোগ?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আরও একটা ব্যাপার। রেবেকা নামে একটা ইংরেজী উপন্যাসকে কোডের বেস হিসেবে ব্যবহার করছে আলেক। বইটার এক কপি আছে আমার কাছে। এখন শুধু কোডের কী-টা যদি পেতাম···'

'কি সেটা?'

'কাগজের ছোট একটা টুকরো, সিগন্যাল এনকোড করার নিয়ম লেখা আছে···'

'আচ্ছা। পেলে কি করতে?

'কোডের কী পেলে রেডিওতে নিজেকে আলেক বোগান বলে পরিচয় দিতাম,' বলল রানা। 'ইসরায়েলে ফল্‌স্ ইনফরমেশন পাঠানো সম্ভব হত। গোটা পরিস্থিতি তাহলে রাতারাতি বদলে দেয়া যেত। এমন সব ইনফরমেশন দিতাম, মিশর আক্রমণের কথা আপাতত কিছুদিন কল্পনাও করতে পারত না ওরা। সেই সাথে, আলেক যে ক্ষতি করেছে, সেটাও অনেকটা মেরামত করে নেয়া যেত। কিন্তু সবের মূলে দরকার ওই কী, সেটা আমাকে পেতেই হবে।'

'আজ রাতে আমাদের প্ল্যান কি?'

'প্রথমবারের মতই,' বলল রানা। 'আমি আর ফরহাদ রেস্তোরাঁয় থাকব। আমাদের কাছে রিভলভার থাকবে।'

'কিন্তু তুমি না সেদিন বললে জেনারেল হেডকোয়ার্টারে যারা কাজ করে তাদের সাথে রিভলভার রাখা নিষেধ?'

'স্পেশাল পারমিশন নিয়েছি,' বলল রানা। 'তাছাড়া রিভলভার নিয়ে জেনারেল হেডকোয়ার্টারে ঢুকছি না আমরা।'

'হাতে কখনও রিভলভার ধরিনি,' বলল নাদিয়া। 'দেখি তো।'

'সাথে নেই,' বলল রানা। 'ওগুলো নিয়ে রেস্তোরাঁয় থাকবে ফরহাদ। এবার বলো, তোমার চেহারা এমন শুকনো কেন?'

'বাবা যে চিঠিটা আমাকে দেবার জন্যে তোমার কাছে রেখে গিয়েছিল,' বলল নাদিয়া, 'ওটা বাবার চিঠি নয়। কাদিরের।'

কোন প্রশ্ন বা মন্তব্য করল না রানা।

'লিখেছে, আমি ওকে ভালবাসি না তা সে জানে। কিন্তু একদিন নাকি বাসব, সেই অপেক্ষায় আছে সে, চিরকাল থাকবেও।'

পকেট থেকে প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাল রানা।

'কিছু বলছ না যে?'

'কি বলতে পারি? এই রকম প্রেম সচরাচর দেখা যায় না।'

'আর কিছু বলার নেই তোমার?'

মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর মুখ তুলে বলল, 'আমি মেয়ে হলে এই ছেলেটাকে ভালবাসার চেষ্টা করতাম। জানতাম, ওর সাথে বিয়ে হলে আমি সুখী হতে পারব।'

'কিন্তু যাকে ভালবাসি না···চেষ্টা করে কাউকে ভালবাসা যায়?'
'এ-ধরনের সমস্যাতে আমি কখনও পড়িনি। বোধহয় যায়। ঠিক জানি না।'
রানার দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল নাদিয়া।
'কি করবে, কিছু ভেবেছ?'
'কার ব্যাপারে?'
'কাদিরের ব্যাপারে।'
'না,' বলল নাদিয়া। 'তবে তোমার ব্যাপারে ভেবেছি।'
'মানে?'
এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল নাদিয়া। ঝুঁকে পড়ে ওর শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করল। 'মানে, আবার আমি খ্রিস্টের জন্মের দু'হাজার বছর আগের মিশরে ফিরে যেতে চাই, রানা!'
নাদিয়াকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাবার উদগ্র একটা ইচ্ছে জাগল রানার। কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল সে। বলল, 'আরেকবার চিন্তা করো নাদিয়া। এমন কিছু কোরো না যাতে পরে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়।'
'পুরুষমানুষ এত সংযমী হয় কিভাবে?' রানার শার্টের বোতাম খোলা শেষ করে ওকে টেনে দাঁড় করাল নাদিয়া। 'এখনও কারও প্রেমে পড়িনি আমি, বা কাউকে বিয়েও করে বসিনি, কাজেই ভবিষ্যতে অপরাধী বোধ করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। প্রেমে পড়ার সুযোগ অনেকবারই আসবে আমার জীবনে, কিন্তু তোমার প্রেমে পড়ার জন্যে যে সময় দরকার সেটা আমি পাব না। কাজ শেষ হলেই তো দেশের ছেলে দেশে ফিরে যাবে। তার আগে, যতটা পারি, তোমাকে পেতে চাই।'
নিজেকে আর সামলাতে পারল না রানা, নাদিয়াকে বুকে টেনে নিয়ে চুমো খেলো। 'লাগে, আস্তে!' চাপা গলায় হেসে উঠল নাদিয়া। 'এক মিনিট, আগে খুলে নিই···'
'কিন্তু সময় নেই যে বেশি···'
'বাজে কথা!' আবার হাসল নাদিয়া। 'অন্তত এই একটা কাজে সময়ের কোন অভাব হয় না মানুষের···ভাল কথা, তোমার মুখের খবর কি?' একে একে রানার সব কাপড় খুলে নিচ্ছে সে।
ব্যান্ডেজের ওপর হাত বুলাল রানা। 'প্রায় সেরে গেছে, এবার খুলে আর ব্যান্ডেজ লাগাতে হবে না। হঠাৎ এ-প্রশ্ন?'
'সেদিন তুমি বললে ব্যথা কমাবার জন্যে জিন খেতে হয়,' বলল নাদিয়া। 'তাই এক বোতল জিন এনে রেখেছি।'
'সত্যি?'
'দেখতে চাও?'
'হ্যাঁ, দুটোই।'
'দুটো মানে?'
'গ্লাসে জিন, আর আমার মত সাজে তোমাকে।'
'আসছি,' বলে কিচেনের দিকে চলে গেল নাদিয়া। ফিরে এল একটু পরই।

হাতে একটা গ্লাস আর জিনের বোতল। 'আগে দু'ঢোক খেয়ে নাও,' বলল নাদিয়া। 'তোমার চোখে নেশার ঘোর দেখতে চাই আমি।'

নাদিয়ার হাত থেকে গ্লাস আর বোতল নিল রানা। গ্লাসে খানিকটা জিন ঢেলে চুমুক দিল ও। গ্লাসটা নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। 'এসো।'

রানার সামনে এসে দাঁড়াল নাদিয়া।

ফ্ল্যাটের দরজায় নক হলো।

'ও কি?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার।

'দরজা...'

'খোলা!' আঁতকে উঠল রানা।

আবার নক হলো দরজায়, দেয়ালে বাড়ি খেলো কবাট। ভারী একটা গলা শোনা গেল, 'নাদিয়া?'

স্তম্ভিত হলে গেল ওরা। দরজায় আলেক! প্যাসেজে তার পায়ের আওয়াজ।

'ও আসছে!' আতঙ্কে বিকৃত শোনাল নাদিয়ার গলা।

নিজের নগ্ন শরীরের দিকে একবার তাকিয়েই চট করে লম্বা সোফার পিছনে চলে এল রানা। পায়ের আওয়াজ খোলা দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। ঝুপ করে বসে পড়ল ও। সেই মুহূর্তে লিভিংরুমের দরজার সামনে দেখা গেল আলেক বোগানকে।

নাদিয়ার গলা শুনতে পেল রানা, 'মি. আলেক, আপনি!'

'শালার মাথায় বুদ্ধি আছে,' বিড়বিড় করে বলল রানা। 'রেস্তোরাঁয় যাবে না, এখান থেকে নিয়ে যাবে নাদিয়াকে।'

'বাহ্, একেবারে রেডি হয়ে আছ, গুড!' বলল আলেক। 'ভেতরে আসতে পারি?'

'হ্যাঁ, মানে...' ঢোক গিলল নাদিয়া। 'আসুন, মি. বোগান।'

'কি বলেছিলাম মনে নেই?' ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল আলেক। 'বলেছিলাম, আবার যখন দেখা হবে, তুমি আমাকে আপনি বলে ডাকবে না।'

'হ্যাঁ, মানে...'

'তোমাকে কিন্তু দারুণ লাগছে,' বলল আলেক।

'হ্যাঁ, মানে...না, মানে...'

'কি ব্যাপার, নাদিয়া?' ঘরের চারদিকে চোখ বুলাল আলেক। 'হ্যাঁ মানে, না মানে করছ কেন? তোমাকে নার্ভাস দেখাচ্ছে, ব্যাপার কি বলো তো?'

'না, মানে...আপনাকে আমি এখানে আশা করছিলাম না তো, তাই...'

'ও, তাই বলো!' গলার আওয়াজ শুনে মনে হলো স্বস্তি বোধ করল আলেক। তার হাসির আওয়াজ পেল রানা। 'ভাবলাম তোমাকে একটু চমকেও দেয়া হবে, সেই সাথে কোথায় কিভাবে থাকো তাও দেখা হয়ে যাবে, তাই চলে এলাম। তুমি আমাকে দেখে খুশি হওনি, নাদিয়া?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই...' বার বার ঢোক গিলছে নাদিয়া।

কিছু করার আছে আমার?— ভাবল রানা। এই দিগম্বর অবস্থায় কি করা যায়!

'ফ্ল্যাটটা চমৎকার সাজিয়েছ,' প্রশংসার চোখে চারদিকে তাকাল আলেক। 'পসাইডোন তোমাকে তাহলে ভাল বেতনই দেয়, তাই না?'

'না, তা কেন দেবে!' বলল নাদিয়া। 'আমি তো ঠিক ওখানে চাকরি করি না। মাঝে মধ্যে যাই আর কি! দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয়, ঠেকায়-বেঠেকায় এক-আধটু সাহায্য করি।'

'বুঝেছি,' বলল আলেক। 'ধরো এগুলো তোমার জন্যে।'

'এত ফুল? ধন্যবাদ, মি. আলেক।'

'বসতে পারি?'

'হ্যাঁ, বসুন না!'

সোফাটা মচ মচ করে উঠল, মাথা আরেকটু নামিয়ে নিল রানা। লোকটা গরিলা বললেই চলে, ভাবল ও। অন্ধকার গলিতে তার সাথে ওর মারপিটের কথাটা মনে পড়ে গেল। শালার হাতে ছুরি ছিল। হাত তুলে মুখের ব্যান্ডেজটা ছুঁলো রানা। প্রতিশোধ নেবার একটা সুযোগ এটা। কাপড় পরতে শুরু করবে নাকি? কোথায় সেগুলো? তারপর মনে পড়ল, একটা সিঙ্গেল সোফার পিছনে পড়ে আছে সব। সেখানে যেতে হলে আলেকের সামনে দিয়ে যেতে হবে। সম্ভব নয়। এই অবস্থায় সটান দাঁড়িয়ে পড়লে কি হয়?

এই সুযোগ আর পাওয়া যাবে না, জানে। তবু বিবস্ত্র অবস্থায় শত্রুর মুখোমুখি হতে কেমন যেন বাধল। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিল, কোন শব্দ না করে উঠে দাঁড়াবে ও, দু'হাত এক করে আলেকের মাথায় প্রচণ্ড একটা আঘাত করবে। ঠিক মত না লাগার কোন কারণই নেই, কারণ ওর দিকে পিছন ফিরে বসে রয়েছে সে। আর লাগলে, সাথে সাথে জ্ঞান হারাবে আলেক।

ওকে দাঁড়াতে দেখে নাদিয়ার চেহারায় কোন পরিবর্তন না ঘটলেই হয় শুধু।

দাঁড়াতে যাবে রানা, সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আলেক।

'কি হলো?'

'চলো, তোমার বেডরুমটা দেখে আসি,' বলল আলেক।

ব্যাটার মতলব কি? ভাবল রানা। নাদিয়াকে রেপ করবে?

নাদিয়ার জন্যে অপেক্ষা করল না আলেক, বেডরুমের খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাল সে, কিন্তু ঢুকল না। 'বাহ্, সুন্দর!' লিভিংরুমের মাঝখানে ফিরে এল সে। 'বাথরুমটা কোন্ দিকে?' একটা হাত তুলল সে, 'ওটাই কি বাথরুমের দরজা?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল নাদিয়া। বুঝতে পারছে, ফ্ল্যাটে আর কেউ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখে নিতে চাইছে আলেক।

বাথরুমের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল আলেক। হাসতে হাসতে ফিরে এল ঘরের মাঝখানে। টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জিনের বোতল, তোমার তাহলে এসব খাওয়ার অভ্যেস আছে?'

'এক-আধটু,' বলল নাদিয়া। ভাবল, ভাগ্যিস শুধু রানার জন্যে একটা গ্লাস নিয়ে এসেছিল!

এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে গ্লাসটা তুলে নিল আলেক, বাড়িয়ে দিল নাদিয়ার দিকে। তারপর বোতলটা তুলে নিয়ে মুখের কাছে ধরে বলল, 'আমি সরাসরি এটা থেকেই ঢালি, কি বলো?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে...'

গ্লাসে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করল নাদিয়া। নির্জলা জিন, খুব কড়া লাগল।

কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রানা, কিন্তু বুঝতে পারছে, ইতোমধ্যে নিজেকে সামলে নিতে পেরেছে নাদিয়া। নিশ্চয়ই যেদিকে ও লুকিয়ে আছে সেদিকে না তাকাবার কথা মনে রেখেছে সে। আলেকের কথা ভাবল ও। লোকটা কি নাদিয়াকে নিয়ে বুজম রেস্তোরাঁয় যাবে? বলা কঠিন। জানতে পারলে বিরাট সুবিধে হত। যদি না যায়, ফাঁদটা কোন কাজেই আসবে না।

'বসুন,' নাদিয়ার গলা পেল রানা। 'দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

'বসে আর কি হবে,' বলল আলেক। 'চলো, বেরিয়ে পড়ি।'

নাদিয়া, কোথায় নিয়ে যাবে, জিজ্ঞেস করো ওকে। মনে মনে বলল রানা।

'কোথায় যাব আমরা? নিশ্চয়ই বুজম রেস্তোরাঁয়?' জিজ্ঞেস করল নাদিয়া।

'তোমাকে তো আগেই বলেছি, রেস্তোরাঁর পরিবেশ আমার ভাল লাগে না।'

'তাহলে?'

'এখনই যদি বলে ফেলি, চমক থাকে না,' সহাস্যে বলল আলেক। 'চলো যাই, নিজের চোখেই দেখতে পাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো নাদিয়া। 'ঠিক আছে। কিন্তু খুব বেশি দূরে আমি যাব না।'

'কেন, ভয় তোমার এখনও কাটেনি?' নাদিয়ার একটা হাত ধরল আলেক।

হাতটা ছাড়িয়ে নিল নাদিয়া। 'ভয় নয়, পরিমিতি বোধ,' বলল সে। 'আপনার সাথে এখনও আমার এতটা ঘনিষ্ঠতা হয়নি যে যেখানে খুশি চলে যাব আপনার সাথে।'

'যেখানে খুশি বলতে কি বোঝাতে চাও, জানি না,' গম্ভীর সুরে বলল আলেক। 'তবে একটা কথা মনে রেখো, তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোথাও যেতে বলব না তোমাকে। তোমার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চাই আমি, নাদিয়া। আমার জীবনে সেটার গুরুত্ব অনেকখানি। এসো।'

'চলুন!'

পায়ের আওয়াজ শুনে রানা বুঝল, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ওরা। বাইরে থেকে দরজায় তালা দিল নাদিয়া, সেটাও টের পেল। লাফ দিয়ে সিধে হলো ও, এক ছুটে সিঙ্গেল সোফার পিছনে চলে এসে তুলে নিল কাপড়গুলো।

কাপড় পরে খোলা জানালার সামনে চলে এল রানা। স্ক্রু খুলে গ্রিল তোলার সময় দেখল, ফ্ল্যাট বাড়ির গেটের বাইরে নাদিয়াকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আলেক। এক তলায় সিঁড়ি ঘরে মোটরসাইকেল রেখে এসেছে রানা, আশা করল আলেকের চোখে পড়েনি সেটা।

জানালার এপারে, কার্নিসে চলে এল রানা। দেখল, নাদিয়ার হাত ধরে রাস্তা

পেরোচ্ছে আলেক। রাস্তার ওপারে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ট্যাক্সি নয়, প্রাইভেট কার।

পানির পাইপ বেয়ে তর তর করে উঠানে নেমে এল রানা। এক ছুটে সিঁড়ি ঘরে ঢুকে বের করে আনল মোটরসাইকেল। একটা গাছের আড়াল থেকে দেখল, গাড়ির দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল আলেক, মাথা নিচু করে ভেতরে উঠে বসল নাদিয়া।

গাড়িটা ভাড়া কিংবা হাইজ্যাক করেছে আলেক, ভাবল রানা। দরজা বন্ধ করে গাড়ির সামনে গিয়ে আরেক পাশে চলে গেল আলেক, দরজা খুলে উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে। জানালা দিয়ে বাইরে, ফ্ল্যাট বাড়ির গেটের দিকে তাকাল নাদিয়া। রানার সাথে চোখাচোখি হলো তার। তারপর শান্ত ভাবে ফিরিয়ে নিল দৃষ্টি।

গাড়ি ছেড়ে দিল আলেক। মোটরসাইকেলে স্টার্ট দিয়ে গেট থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠে এল রানা।

রাস্তায় যানবাহনের প্রচুর ভিড়। আলেক আর নিজের মাঝখানে পাঁচ সাতটা গাড়িকে থাকতে দিল রানা। ধীরে-সুস্থে চালাচ্ছে আলেক, অনুসরণ করতে কোন অসুবিধে হলো না।

আলেক যাচ্ছে কোথায়? নিশ্চয়ই কোথাও থামবে ওরা। সেখানে একটা টেলিফোন থাকলেই হয় শুধু। বুজম রেস্তোরাঁয় ফাঁদ পেতে বসে আছে ফরহাদ, তাকে একটা খবর দেয়া দরকার।

শহর থেকে বেরিয়ে এসে গিজা-র রাস্তা ধরল আলেক। এদিকে যানবাহনের ভিড় কম, কিন্তু স্পীড বেশি। মোটরসাইকেলের আলো না জ্বাললে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, কিন্তু জ্বাললে আলেকের চোখে ধরা পড়ে যাবার ভয়।

এদিকের রাস্তায় মোটরসাইকেল চালানো রীতিমত রোমহর্ষক ব্যাপার, এমনকি দিনের বেলাতেও। ভাঙাচোরা রাস্তা, ছোট বড় গর্তে ভরা। খানিক পর পর কালচে দাগ, পেট্রলবাহী ট্রাক থেকে তেল পড়ে পিচ্ছিল হয়ে আছে রাস্তা। দুটো মাত্র চোখ, কিন্তু নজর রাখতে হয় পাঁচ সাত দিক। অন্ধকারে দেখতে পায়নি রানা, পর পর দু'বার গর্তের মধ্যে পড়ে এমন ঝাঁকি খেলো মোটরসাইকেল, সীট থেকে ছিটকে পড়েই যাচ্ছিল। সামনের রাস্তার হাল-হকিকত বুঝে গাড়ির গতি কমাচ্ছে বাড়াচ্ছে আলেক, তার সাথে সমান তাল বজায় রাখতে গিয়ে রানা হিমশিম খেয়ে গেল। মোটরসাইকেল আর গাড়ির মাঝখানে যথেষ্ট দূরত্ব, সেটা হঠাৎ করে বেশি বাড়তে দেয়ার ঝুঁকি নিতে রাজি নয় রানা। মেইন রোডের দু'পাশে অলিগলির গোলক-ধাঁধা আছে, আলেক যদি ওর চোখ ফাঁকি দিয়ে সেখানে একবার ঢুকতে পারে, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অবশেষে মরু পথে উঠে এল রানা। রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ হলো। শীত শীত করছে রানার। সামনে আকাশ-ছোঁয়া পিরামিডের কাঠামো দেখা গেল। আর কতদূর যাবে লোকটা?

হতাশ হলো রানা। এদিকে টেলিফোনের আশা করা বৃথা।

গাড়ির গতি মন্থর করল আলেক। রানা বুঝল, পিরামিডের পাশে পিকনিক

করবে ওরা। ব্রেক করে মোটরসাইকেল থামাল ও। ইঞ্জিন বন্ধ করল। আলেক গাড়ি থেকে বেরোবার আগেই মোটরসাইকেল ঠেলে রাস্তা থেকে বালির ওপর চলে এল। বালিয়াড়ির আড়াল থেকে চোখ রাখল গাড়ির ওপর।

কিছুই ঘটছে না।

দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি। ইঞ্জিন বন্ধ। ভেতরটা অন্ধকার। কি করছে? নাদিয়ার ওপর অত্যাচার হচ্ছে না তো? নাকি খাচ্ছে ওরা?

অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। আড়ালে মাথা সরিয়ে নিয়ে এসে সিগারেট ধরাল রানা। ভাবল, বিপদ দেখলে, চিৎকার করবে নাদিয়া। নাদিয়া জানে, আশপাশেই আছে ও।

এক ঘন্টা পর গাড়ির দরজা খুলে গেল। মেঘ কেটে গিয়ে উজ্জ্বল চাঁদ উঠেছে আকাশে। চারদিকের দৃশ্য গাঢ় নীল আর রূপালি রঙে রাঙানো। চকচকে বালির ওপর পিরামিডের জটিল ছায়া। কালো একজোড়া মূর্তি বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। প্রাচীন সমাধির দিকে এগোল তারা। আবছাভাবে দেখা গেল, হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে রেখেছে নাদিয়া, বোঝা যায়, শীত করছে তার। কিংবা, সে হয়তো আলেককে হাত ধরার সুযোগ দিতে চায় না। এই সময় নাদিয়ার কাঁধে একটা হাত তুলে দিল আলেক। নাদিয়া তাকে বাধা দিল না।

মনুমেন্টের গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। বোধহয় গল্প করছে। একটা হাত তুলে ওপর দিকটা দেখাল আলেক। উত্তরে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল নাদিয়া। ধাপ বেয়ে পিরামিডের ওপরে উঠতে চায় আলেক, কিন্তু নাদিয়া রাজি নয়। পাশ দিয়ে এগোল ওরা, হারিয়ে গেল পিরামিডের আড়ালে।

উল্টো দিক থেকে বেরিয়ে আসবে ওরা, সেই অপেক্ষায় থাকল রানা। কিন্তু অস্বাভাবিক দেরি করছে দেখে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল। নাদিয়াকে পাশে বসিয়ে আলেক হয়তো গল্পে মেতে উঠেছে। যাব নাকি?—ভাবল রানা। পিছন থেকে লাফ দিয়ে আলেককে কাবু করা যেতে পারে। লোকটার কাছে ছুরি আছে, রিভলভারও থাকতে পারে। কিছু এসে যায় না, অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লে সুবিধে করতে পারবে না আলেক।

উঠে দাঁড়াতে যাবে রানা, পিরামিডের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওরা। নাদিয়ার কাঁধে এখনও হাত দিয়ে আছে আলেক। গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল দু'জন। নাদিয়ার আরেক কাঁধে অপর হাতটাও তুলে দিল আলেক। তারপর চুমো দেয়ার জন্যে ঝুঁকে পড়ল তার দিকে।

ঠোঁট সরিয়ে নিল নাদিয়া, তার নাকের পাশে নাক ঘষল আলেক। নিজেকে ছাড়িয়ে নিল নাদিয়া, দরজা খুলে উঠে পড়ল গাড়িতে।

ড্রাইভিং সীটে বসল আলেক। দরজা বন্ধ করল। ইঞ্জিনের আওয়াজে খানখান হয়ে গেল নির্জন মরুভূমির অখণ্ড নিস্তব্ধতা। বিরাট একটা বৃত্ত রচনা করে রোডের ওপর উঠে পড়ল গাড়ি। হেডলাইটের আলো এদিকে ছুটে আসছে দেখে বালিয়াড়ির আড়ালে মাথা টেনে নিল রানা। সামনে দিয়ে চলে গেল গাড়ি।

মোটরসাইকেলে চড়ে স্টার্ট দিল রানা। রাস্তায় উঠে এসে বাড়িয়ে দিল

স্পীড। দূরে দেখা গেল গাড়ির টেইল লাইট।

চাঁদের আলোয় রাস্তায় গর্তগুলো আগে থেকে চেনা গেল, আগের চেয়ে সহজ হয়ে উঠল এগোনো। কিন্তু অসুবিধে হলো, পিছন দিকে চোখ পড়লে আলেক দেখতে পাবে ওকে। আরও খানিক পিছিয়ে পড়ে মাঝখানের দূরত্ব বাড়িয়ে নিল রানা। জানে, এই রাস্তা ধরে শুধু কায়রোতেই ফেরা যায়।

এরপর কি করবে আলেক? নাদিয়াকে তার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবে? তারপর? নাদিয়াকে ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে কোথায় যাবে সে? নিজের গোপন আস্তানায়?

রিভলভারটা সাথে থাকলে ভাল হত, ভাবল রানা।

হতে পারে নাদিয়াকে নিয়ে হয়তো নিজের বাড়িতে যাবে আলেক। সন্দেহ নেই, নাদিয়াকে আসলে বিছানায় তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে সে।

শহরে ফিরে এল ওরা। যানবাহনের ভিড় বাড়ল, সেই সাথে মাঝখানের দূরত্ব কমিয়ে আনল রানা। ব্রিজ পেরিয়ে জামালেকে চলে এল ওরা। কোথায় যাচ্ছে আলেক, আন্দাজ করতে পারল ও। এই জামালেকেই বেলি ড্যান্সার রোপা ইরিনার হাউজবোট আছে। আলেক নিশ্চয়ই রোপার হাউজবোটে আস্তানা গাড়েনি। হাউজবোটের ওপর নজর রাখা হচ্ছে, আলেককে ওখানে দেখা গেলে রিপোর্ট করা হত। এমন হতে পারে, নিজের বাড়িতে নাদিয়াকে নিয়ে যাবার ঝুঁকিটা নিতে চাইছে না আলেক, রোপার কাছ থেকে হাউজবোটটা হয়তো ধার করবে বলে ভেবেছে।

রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করাল আলেক। একটা গলির ভেতর ঢুকে পড়ে রানাও থামল। ইঞ্জিন বন্ধ করে মোটরসাইকেল থেকে নামল ও, গলির মুখ থেকে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে দেখল, টোপাথ ধরে হাউজবোটের দিকে এগোচ্ছে আলেক, পাশে নাদিয়া।

রাস্তার একপাশে ছয় ফিট উঁচু গভীর ঝোপ, ভেতরে ঢুকে সাবধানে এগোল রানা। ডাল আর পাতার ফাঁক দিয়ে দেখল, একটা হাউজবোটের পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে ওরা।

ঝোপের ভেতর গা ঢাকা দিয়ে আছে দু'জন সাদা পোশাক পরা পুলিস, জাইদানের ওপর নজর রাখছে। ডিউটি দিচ্ছে একজন, অন্যজন এসেছে সঙ্গ দেবার জন্যে। পাশাপাশি বসে চোলাই মদ খাচ্ছে ওরা। রানাকে ঝোপের ভেতর ঢুকতে দেখে ওর দিকে এগোল একজন, দ্বিতীয়জন তার হাত চেপে ধরে ঠোঁটে আঙুল রেখে আওয়াজ করতে নিষেধ করল।

ঝোপের ভেতর ফাঁকা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। সামনেই রাস্তা, তারপর টোপাথ, তারপর হাউজবোট জাইদান। নাদিয়ার হাত ধরে তাকে গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক ধরে এগোতে সাহায্য করল আলেক।

ওয়াচাররা আশপাশেই কোথাও আছে, ভাবল রানা। আলেক কি জানে, জাইদানের ওপর নজর রাখা হয়েছে? বোঝাই যাচ্ছে, জানে না। নাদিয়ার পিছু পিছু ডেকে উঠল আলেক। একটা হ্যাচ খুলল সে। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল ওরা।

রানার কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কথা বলছে

পুলিস দু'জন।

'সুপার বলেছেন, অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে দেখলে সাথে সাথে খবর দিতে হবে তাঁকে...'

'হ্যাঁ, এটাকে একটা অস্বাভাবিক ঘটনা বলা যেতে পারে। একজন লোক আর একটা মেয়েকে ফলো করে এল আরেকজন লোক...'

'লোকটা...'

'ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে...'

'আমি তাহলে টেলিফোন করে দিই সুপারকে?'

'কিন্তু সাবধান, লোকটা যেন দেখতে না পায়!'

'চিন্তা কোরো না, হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে যাব। এসো!'

রানা ভাবল, এখন? নাদিয়াকে নিয়ে আলেক সম্ভবত বেশ কিছুক্ষণ থাকবে বোটে। কোথাও থেকে ফরহাদকে যদি টেলিফোন করা যেত! তার আগে, ওয়াচারদের একজনকে খুঁজে বের করা দরকার। আছে তো কেউ? থাকলে তারা ওকে ঝোপের ভেতর ঢুকতে দেখেনি কেন? আর দেখে থাকলে, কাছে আসছে না কেন?

ওকে হয়তো বন্ধু বলে মনে করছে না ওরা। হয়তো লক্ষ রাখছে, কিন্তু দেখা দিচ্ছে না। এদিক ওদিক তাকিয়ে চাঁদের আলোয় কাউকে দেখতে পেল না। ঝোপ-ঝাড়ের পাতা স্থির হয়ে আছে, কিছুই নড়ছে না। চাপা গলায় ইংরেজীতে বলল ও, 'এই যে, তোমরা কেউ আছ নাকি? পুলিস? আমি মেজর রানা। ওহে...'

কারও সাড়া নেই। চাপা গলায় আবার কথা বলল রানা। ফলাফল শূন্য। ধারণা করল, ঝোপের ভেতর কোথাও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ওয়াচাররা। হয়তো একজন মাত্র লোক, কেউ কিছু বলার নেই দেখে ফাঁকি দেবার সুযোগ পেয়ে গেছে। তাই যদি হয়, লোকটাকে খুঁজে বের করা দরকার।

ঝোপের ভেতর খোঁজাখুঁজি শুরু করল রানা। একা কিছু করার চেয়ে, পুলিস সুপার খাদিম সারওয়ার বা ফরহাদকে খবর দিয়ে আনিয়ে নেয়া ভাল। বিশেষ করে হাতে যখন সময় রয়েছে। নাদিয়া সাথে রয়েছে, এখুনি কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না আলেক।

দশ মিনিট খোঁজাখুঁজির পর রানা বুঝল, ঝোপের ভেতর ওয়াচারদের একজনও নেই। ব্যাপারটা কি? ওরা কি রোজই এই রকম ফাঁকি দিচ্ছে?

হাউজবোটে একাই উঠবে কিনা ভাবতে লাগল রানা। আলেক ওর উপস্থিতি টের পেয়ে নাদিয়ার যদি কোন ক্ষতি করে বসে, সেটাই ভয়।

তারচেয়ে বোধহয় অপেক্ষা করাই ভাল। বোট থেকে এক সময় নামবেই ওরা। নাদিয়াকে তার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবে আলেক, তারপর নিজের আস্তানায় ফিরবে সে। তাকে গ্রেফতার করা তখন পানির মত সহজ হয়ে যাবে। সেই ভাল।

কিন্তু, নাদিয়া কোন বিপদে পড়েনি তো? আলেক যদি জোর করে...

টোপাথে চোখ পড়ল রানার। একটা মেয়ে হেঁটে আসছে। হাঁটার ভঙ্গিটা পরিচিত লাগল। তারপর চিনতে পারল, রোপা ইরিনা। গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক হয়ে জাইদানের

ডেকে উঠে গেল সে।

স্বস্তি বোধ করল রানা। বোটে আরেকটা মেয়ে থাকতে নাদিয়াকে বিছানায় তোলার জন্যে জোর খাটাতে পারবে না আলেক।

চার

সিঁড়ি থেকে নেমে হাউজবোটের চারদিকে তাকাল নাদিয়া। নার্ভাস বোধ করছে সে।

এর আগেও দু'একটা হাউজবোট দেখেছে নাদিয়া, কিন্তু এই রকম সাজানো গোছানো বিলাসবহুল হাউজবোট এই প্রথম দেখছে। পুরু কার্পেট, নিচু ডিভান, ফরমিকা টপ টেবিল, সিলিং থেকে মেঝেতে নেমে আসা ভেলভেটের পর্দা—এসব দেখে আশ্চর্য তো হলোই, সেই সাথে আড়ষ্ট ভাবটা বেড়ে গেল আরও। পর্দাটা বোটের নিচের অংশকে দু'ভাগে ভাগ করেছে, ওদিকে নিশ্চয়ই বেডরুম। পর্দার উল্টো দিকে, বোট যেখানে সরু হয়ে গেছে, ছোট একটা কিচেন। হিটার থেকে শুরু করে সমস্ত তৈজস-পত্র সবই অত্যন্ত দামী আর আধুনিক।

'এটা আপনার বোট?' জানতে চাইল সে।

'আমার বন্ধুর,' বলল আলেক। 'সুন্দর, তাই না? বসো, নাদিয়া।'

নাদিয়ার মনে হলো, ফাঁদে আটকা পড়েছে সে। রানা কোথায়, আন্দাজ করার চেষ্টা করল। পিরামিডের ওখানে শেষ বার দেখেছে ওকে। ও কি পিছু নিয়ে হাউজবোটের কাছে আসতে পেরেছে? জামালেকের দিকে আসার সময় ভিউ মিররে বা পিছন দিকে তাকাতে সাহস হয়নি তার, আলেকের সন্দেহ হতে পারে এই ভয়ে। প্রতি মুহূর্তে আশা করেছে সে, ওদের গাড়িটাকে ঘিরে ফেলবে আর্মিরা, গ্রেফতার হবে আলেক, মুক্তি পাবে সে। কিন্তু কিছুই ঘটেনি। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছে নাদিয়া।

গোটা ব্যাপারটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হলো তার। মনে হলো, মাসুদ রানা নামে কোন লোকের অস্তিত্ব নেই। ছটফট করছে বুক, বসতে পারল না। আইসবক্স থেকে শ্যাম্পেনের বোতল বের করল আলেক, কিচেন থেকে দুটো গ্লাস নিয়ে এল। ডিভানে বসে গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালল সে। মুখ তুলে নাদিয়ার দিকে তাকাল, হাসল।

রানা, তুমি কোথায়?

খোলা জায়গায় আলেককে এত ভয় করেনি তার। চার দেয়ালের ভেতর লোকটাকে হিংস্র বাঘের মত লাগছে। যদিও এখন পর্যন্ত তার সাথে অভদ্র বা অন্যায় কোন আচরণ করেনি আলেক। করেনি, কিন্তু করবে! পরিষ্কার বুঝতে পারল সে, তার ওপর জোর খাটাবার জন্যে মনে মনে তৈরি হচ্ছে আলেক। গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালা তারই প্রস্তুতিপর্ব।

শ্যাম্পেন ভরা একটা গ্লাস নাদিয়ার দিকে বাড়িয়ে ধরে আলেক জানতে

চাইল, 'তোমার শীত করছে, নাদিয়া?'

'না···না তো!'

'মনে হলো, কাঁপছ?'

'আরে না!' হাসতে গিয়ে নাদিয়ার ঠোঁটের চারপাশ কেঁপে গেল, নার্ভাস হয়ে পড়লে এই রকম হয় তার।

নিজের গ্লাসটা মুখের সামনে তুলল আলেক। 'তোমার স্বাস্থ্য!'

নাদিয়া অনুভব করল, মুখের ভেতরটা কাগজের মত শুকনো। গ্লাসে চুমুক দিল ও। ঠাণ্ডা বরফ শ্যাম্পেন। দু'ঢোক পেটে পড়তে চাঙা হয়ে উঠল সে।

হাত বাড়িয়ে নাদিয়ার একটা কব্জি চেপে ধরল আলেক। 'এসো, বসো এখানে।' টেনে নিজের পাশে তাকে বসাল সে। 'সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে আমি বুঝতে পারি না, নাদিয়া। একবার মনে হয়, দারুণ স্মার্ট। আবার দেখি, ভয়ে একবারে কুঁকড়ে থাকো। এমন কিছু করতে দেখেছ আমাকে, যা দেখে মনে হয় আমি খারাপ লোক?'

শ্যাম্পেনের গুণ, ছোট্ট করে কিন্তু সাবলীল ভঙ্গিতে হাসতে পারল নাদিয়া। 'কে বলেছে আপনি খারাপ লোক? কিন্তু আমি যে অস্বস্তি বোধ করব সেটাই তো স্বাভাবিক। আপনার সাথে আমার ক'দিনেরই বা পরিচয়!'

'মনের মিল থাকলে মুহূর্তের পরিচয়েও দু'জন মানুষ আপন হয়ে উঠতে পারে।' নাদিয়ার চোয়ালে হাত বুলাল আলেক। 'তোমার পিছনে লেগে আছি আমি, ভাল লাগে বলেই না! যদি বলি তুমি আমাকে জাদু করেছ, বিশ্বাস করবে? তোমাকে নিয়ে আমার মনে স্বপ্ন আছে, নাদিয়া···'

ব্যাপারটা ঘটতে শুরু করেছে, নিজেকে সাবধান করে দিল নাদিয়া।

তার হাঁটুতে একটা হাত রাখল আলেক। শক্ত পাথর হয়ে গেল নাদিয়া।

'তুমি ঠিক যেন পাকা টসটসে একটা মিষ্টি ফল। ইচ্ছে করে তোমার স্বাদ নিই।' ভারী গলায় হাসল আলেক। নাদিয়ার হাঁটুর ওপর হাত বুলাতে শুরু করল সে। 'তোমার মনটা বোধহয় একটু শক্ত, কিন্তু শরীরটা নিশ্চয়ই খুব নরম হবে—তুলতুলে। কি, ঠিক বলিনি?'

ঢোক গিলল নাদিয়া। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। নাকের নিচে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যাচ্ছে।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

আলেকের দিকে তাকাল না, জানতে চাইল নাদিয়া, 'কি কথা?'

একটা হাত তুলে নাদিয়ার মুখ ছুঁলো আলেক। কপাল, নাক, ঠোঁট, থুতনি—মুখের সবখানে আঙুল বুলাল। 'আমার সাথে কেন বেরুলে তুমি?'

ঠিক কি জানতে চাইছে আলেক? কিছু সন্দেহ করেছে নাকি? তা কি করে সম্ভব! হয়তো এসব কথাও তার প্রস্তুতিরই একটা অংশ। তার দিকে চোখ ফেরাল নাদিয়া, বলল, 'আপনাকে আমার ভাল লাগে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ,' নিচু গলায় বলল নাদিয়া।

'আমার স্বপ্ন তাহলে সত্যি হবে?' নাদিয়ার হাঁটুতে আবার হাত রাখল আলেক, ঝুঁকে পড়ল ওর দিকে।

ঠোঁট সরিয়ে নিল নাদিয়া, তার গালে ঘষা খেলো আলেকের ঠোঁট। সন্ধের পর থেকে দু'বার ঘটল এই ঘটনা। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল আলেক, 'আমাকে যদি ভালই লাগে, তাহলে ভয় পাও কেন?'

কিসের যেন শব্দ হলো ডেকে। তারপর পরিষ্কার শুনতে পেল নাদিয়া। পায়ের আওয়াজ। দ্রুত, হালকা পায়ে আসছে কে যেন। হ্যাচ খুলে গেল। নাদিয়া ভাবল, রানা!

সিঁড়ির ধাপে একটা হাইহিল জুতো নামল। রানা নয়, একটা মেয়ে, ভাবল নাদিয়া। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল মেয়েটা। আলোয় এসে দাঁড়াতে মুখটা দেখতে পেল নাদিয়া। সাথে সাথে চিনতে পারল। দেশের সবচেয়ে নামকরা বেলি ড্যান্সার, রোপা ইরিনা।

ভাবল, ব্যাপারটা কি? এসব থেকে কি বুঝব আমি?

'আমাকে খবর দিয়ে ঠিক কাজটি করেছ, সার্জেন্ট,' টেলিফোনে বলল পুলিস সুপার খাদিম সারওয়ার। 'সব আমিই সামলাব। বাড়ি ফিরে যাও, আজ তোমার ছুটি।'

'ধন্যবাদ, স্যার,' সার্জেন্ট বলল। 'গুড নাইট।'

'গুড নাইট।' রিসিভার নামিয়ে রাখল পুলিস সুপার। বিপজ্জনক পরিস্থিতি, কাজেই মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল সে। আলেক বোগান আর তার সঙ্গিনীর পিছু নিয়ে হাউজবোটের কাছে পৌঁছেছে একজন মোটরসাইকেল আরোহী। তার চেহারার বর্ণনা আবছা হলেও, লোকটা যে মেজর রানা, বুঝতে অসুবিধে হয়নি তার। এই রকম সর্বনেশে কিছু একটা ঘটতে পারে, আগে থেকেই আশঙ্কা ছিল মনে। তাই খুব একটা অবাক হয়নি সে। কিন্তু ভয় পেয়েছে।

বিপদ দেখলে চিনতে পারে সে, সেজন্যেই ইসরায়েলের পক্ষে কাজ করেও এতদিন ধরা পড়েনি। বিপদ একটা নয়, দুটো। এক, মেজরের হাতে আলেক বোগান ধরা পড়লে তার সন্ত্রাসবাদী দলের হাতে রেডিওটা আসছে না। অথচ ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে হলে রেডিও তাদের চাই-ই চাই। দুই, মেজর রানা যদি জানতে পারে হাউজবোট জাইদান ইসরায়েলি এজেন্টদের একটা আখড়া হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে, সাথে সাথে এজেন্টদের সহায়তাকারী হিসেবে সন্দেহ করা হবে তাকে। মেজর রানা বুদ্ধিমান লোক, বুঝতে পারবে, মিথ্যে রিপোর্ট দিয়ে এতদিন তাকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে।

রোপা ইরিনার ওপর আরও বেশি চাপ সৃষ্টি করেনি বলে নিজেকে তিরস্কার করল খাদিম সারওয়ার। রোপা যদি আলেক বোগানের সাথে তার দেখা করার ব্যবস্থা করত, এতদিনে তাদের হাতে চলে আসত রেডিও। কিন্তু এসব কথা ভেবে এখন আর কোন লাভ নেই। এই বিপদ থেকে যেভাবেই হোক উদ্ধার পেতে হবে তাকে।

কাপড় পরাই আছে, দেরাজ থেকে রিভলভার বের করে পকেটে ভরল। টেলিফোনের সামনে বসে ভাবতে লাগল, কি করা যায়।

হাতে বেশি সময় নেই। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে, কিন্তু যে-কোন মুহূর্তে ধৈর্য হারিয়ে ফেলতে পারে মেজর রানা। অস্থির হয়ে উঠে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটিয়ে বসতে পারে। যেভাবেই হোক, হাউজবোটে তাকে উঠতে দেয়া যাবে না। তার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে আলেক বোগানকে। আলেক গ্রেফতার হলে তার মরণ।

সে কি খুন করবে মেজর রানাকে? তার নিজের পক্ষে কাজটা করা সম্ভব নয়, কিন্তু করার মত লোক আছে দলে। খুন করা কঠিন নয়, কিন্তু পরে যে ঝামেলাটা হবে, তা থেকে নিজেকে বাঁচানো সম্ভব হবে তো?

মেজর খুন হলে তদন্ত হবে। আজ রাতে টোপাথে যা যা ঘটবে; তদন্তের ফলে সেটা প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। শেষ পর্যন্ত হয়তো সব দোষ তার ঘাড়েই চাপবে।

আপাতত মেজর রানাকে অকেজো করা দরকার, ভাবল সে। রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করল সহকারী ঈমান সাফারীকে। দলের দুর্ধর্ষ লোকদের সাথে তারই যোগাযোগ।

ঈমান সাফারীকে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল পুলিস সুপার। তারপর কি করতে হবে বলে দিল। পারবে কিনা জিজ্ঞেস করতে ঈমান হো হো করে হেসে উঠে বলল, 'এটা আবার একটা কাজ নাকি!'

'আমি চাই ব্যাপারটা তুমি আরও গুরুত্বের সাথে নাও,' গম্ভীর সুরে বলল খাদিম সারওয়ার। 'এই কাজের ওপর আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সুপার,' বলল ঈমান।

দু'মিনিট পর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল খাদিম সারওয়ার। জামালেকের দিকে ছুটল গাড়ি।

সিগারেটের আলোয় হাতঘড়ি দেখল রানা। সাড়ে এগারোটা। আর দেরি করা সম্ভব নয়, হাউজবোটে ওকে চড়তেই হবে। ঠিক বারোটার সময় মেসেজ পাঠাতে শুরু করবে আলেক। মিশরের ডিফেন্স প্ল্যান পৌঁছে যাবে ইসরায়েলে। যেভাবে হোক ঠেকাতেই হবে ওকে।

ঝোপ থেকে বেরোতে যাবে রানা, রাস্তার ওপর দুটো ছায়ামূর্তি দেখা গেল। 'পুলিস?' জানতে চাইল ও।

'মেজর রানা?' ছায়ামূর্তিদের একজন জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল বটে, কিন্তু হঠাৎ লোক দু'জনের উপস্থিতি সন্দিগ্ধ করে তুলল ওকে। লোক দু'জন রাস্তা থেকে নেমে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। কি মনে হতে চট করে ঘাড় ফেরাল রানা। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। ওর দশ গজ পিছনে, ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে আরও দু'জন লোক। দু'জনের হাত থেকেই কি যেন ঝুলছে, মনে হলো, সাইকেলের চেইন।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়েছে রানা, সেটাই কাল হলো। সুযোগটা নিয়ে সামনের লোক দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। কপালের পাশে শক্ত কিছুর বাড়ি খেলো ও। শেষ মুহূর্তে ঝট করে মাথা সরিয়ে নিয়েছিল বলে সরাসরি মাথায় লাগেনি।

মাত্র দুই কি তিন সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে গেল ব্যাপারটা, আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি হবার সময় পেল না রানা। কপালের পাশে আঘাত পেয়ে রক্তে যেন আগুন ধরে গেল ওর। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করার ফাঁকে লক্ষ করল, সামনের দ্বিতীয় লোকটা মাথার ওপর একটা রড উঁচু করে ধরেছে। দেখল, ওর মাথার ওপর নেমে আসছে সেটা। সেই সাথে টের পেল, পিছনের লোক দু'জন নাগালের মধ্যে পেতে যাচ্ছে ওকে।

বুক ভরে শ্বাস নিল রানা। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে জোড়া পা দিয়ে সামনের লোকটার বুকে পড়ল ও। লোকটার বুকের সমস্ত বাতাস হুস করে বেরিয়ে এল নাক-মুখ দিয়ে। লোকটাকে নিয়ে একটা ঝোপের ভেতর পড়ল ও। কোথাও চোট পায়নি, চোখের পলকে স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে সিধে হলো। 'আয় শালারা!' রুখে দাঁড়াল রানা।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তিনজন প্রতিপক্ষ। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ওদের দলে যোগ দিল আরও দু'জন। পাঁচজনের সাথে একা, পেরে ওঠা প্রায় অসম্ভব। আবার আক্রমণ আসার আগে পর্যন্ত দু'সেকেন্ড সময় পেল রানা। কি কৌশল অবলম্বন করবে, সেটা ভেবে বের করার জন্যে সময়টা যথেষ্ট নয়।

পাঁচজনের দলটা চারদিক থেকে দ্রুত ঘিরে ফেলল ওকে। বৃত্তটা ছোট করে আনছে ওরা। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরছে রানা, বৃত্তের দুর্বল অংশটা খুঁজে পেতে চাইছে ও। ডান পাশ থেকে একজন লোক লোহার রড দিয়ে খোঁচা দিল ওকে, হাত ঝাপটা দিয়ে সেটা সরিয়ে দিল রানা। একই সময়ে বাঁ পাশের একজন লোক লোহার চেইন দিয়ে বাড়ি মারল, সেটা দেখতে পেলেও বাধা দেবার সময় পেল না রানা। বাতাসে শিস তুলে কাঁধ আর বুকের ওপর পড়ল লোহার চেইন। ব্যথার তীব্রতা অনুভব করে রানার আশঙ্কা হলো, কাঁধের হাড়টা বোধহয় চুরমার হয়ে গেছে। চেইনটাকে ঠেকাতে পারেনি ও, কিন্তু সেটা ওর কাঁধ থেকে সরে যাবার আগে হাত দিয়ে চেপে ধরতে পারল। ধরেই হ্যাঁচকা এক টান দিল। হোঁচট খেয়ে রানার দিকে ছুটে এল লোকটা, হাঁটু ভাঁজ করে তার তলপেটে গুঁতো মারল ও। এতই জোরে লাগল সেটা, নিজের এই বিপদ সত্ত্বেও, শিউরে উঠল রানা। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানে, এই আঘাত সহ্য করে কোন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না।

এবার ওরা চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার ওপর। চারজনের মাঝখানে চাপা পড়ে গেল ও, দু'তিন সেকেন্ড দিশেহারা লাগল রানার, কি ঘটছে কিছুই বুঝল না। এই সুযোগে কিল, ঘুসি যার যা খুশি চালিয়ে গেল ওরা। হঠাৎ বসে পড়ে ওদেরকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে রানা অনুভব করল, ওর মাথার চুল শক্ত মুঠোয় ধরে রাখা হয়েছে। ওদের প্রায় সবার হাতেই একটা করে রড বা চেইন,

কিন্তু রানার একেবারে গা ঘেঁষে রয়েছে বলে সেগুলো ব্যবহার করতে পারছে না। প্রত্যেকে এরা একটা করে হাত ব্যবহার করছে।

সবাই ওর গায়ের ওপর সেঁটে থাকায় অন্ধকারে কিছুই দেখল না রানা। তাতে অবশ্য এলোপাতাড়ি কনুই চালাতে কোন অসুবিধে হলো না ওর। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে ওকে ছেড়ে দিয়ে ছিটকে দূরে সরে গেল সবাই।

আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল রানার। মিনিটখানেকও হয়নি শুরু হয়েছে মারপিট, কিন্তু এরই মধ্যে একটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা গেছে এরা কেউ প্রফেশন্যাল নয়।

আবার একটা বৃত্ত তৈরি করল ওরা। যে যার হাতের অস্ত্র বাগিয়ে ধরে এগিয়ে আসছে। এবার কেউ খালি হাত ব্যবহার করবে না। দ্রুত চিন্তা করছে রানা। ডান দিকে লাফ দেয়ার ভঙ্গি করে বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বে? বৃত্তের ফাঁক গলে ঝেড়ে দৌড় লাগাতে পারে, তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছু ধাওয়া রত লোকটাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে আঘাত করা যায়।

একটা কথা মনে হতে এই বিপদের মধ্যেও হাসি পেল রানার। ইয়া-আ-আ আলি বলে একটা হাঁক ছাড়ল ও। এই হাঁক ছাড়ার চিন্তাটা মনে আসতেই হাসি পেয়েছিল ওর। দুটো আশায় চিৎকারটা করল রানা। এক, লোকগুলোকে একটু চমকে দেয়া যাবে। দুই, ভাগ্য ভাল হলে তার গলা চিনতে পারবে নাদিয়া। তাহলে আর ওর আশায় থাকবে না সে। ওর সাহায্য আসবে না বুঝতে পেরে আলেককে মেসেজ পাঠাতে বাধা দিতে পারে। নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে পারে।

হাঁক ছেড়েই লাফ দিল রানা। হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল ওর মাথার দিকে নামতে থাকা একটা লোহার রড, সেই সাথে রড ধরা লোকটার দুই উরুর মাঝখানে ভাঁজ করা হাঁটুর গুঁতো মারল। মাটিতে পা পড়ার আগেই শরীরটাকে ঘুরিয়ে নিল রানা। ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেছে একজন, তাকেই ধাওয়া করতে গেল রানা। ফুট শব্দে গুলি হলো। সাইলেন্সার ব্যবহার করছে!

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। এদের কারও সাথে রিভলভার আছে, কল্পনাও করেনি। তিনজনের মধ্যে কে গুলি করল, অন্ধকারে বুঝতে পারল না। এই সময় আবার গুলির শব্দ। মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। ঝট করে ডান দিকে ফিরল রানা, ওদিক থেকেই গুলি আসছে। লোকটা যে-ই হোক, ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে নিজেকে। পরিচয় প্রকাশ করতে চায় না। তার মানে, লোকটা বন্ধু নয়, ওদেরই একজন।

সেই সাথে বুঝল রানা, গুলি করে মারতে চায় না ওকে, শুধু ভয় দেখাতে চায়। লক্ষ করল, প্রতিপক্ষদের অন্তত একজন গুলির আওয়াজে হতভম্ব হয়ে পড়েছে। তাকে লক্ষ্য করেই লাফ দিল ও।

তার আগেই পিছনের লোকটা রানাকে লক্ষ্য করে হাতের রড ছুঁড়ে দিয়েছে। ভারী রড বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে রানার ঘাড়ের ঠিক মাঝখানে লাগল। লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে পড়েছিল রানা, তা নাহলে ওর মাথার ওপর দিয়ে চলে যেত রড। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো ওর মাথা। ধপাস করে পড়ে গেল মাটির ওপর। জ্ঞান হারিয়েছে আগেই।

পকেটে রিভলভার ভরে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল পুলিস সুপার খাদিম সারওয়ার। দাঁড়িয়ে আছে তিনজন, চাঁদের আলোয় খাদিম সারওয়ারকে চিনতে পেরে সমীহের সাথে পথ ছেড়ে দিল তারা। ধরাশায়ী রানার সামনে এসে দাঁড়াল খাদিম সারওয়ার, ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। প্রথমে রানার বুকে একটা হাত রাখল সে। ঘোড়ার মত টগবগ করে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। পরম স্বস্তি বোধ করল সে। দ্রুত হাত চালিয়ে রানার জুতো, তারপর মোজা খুলে ফেলল। একটা মোজা গোল পাকিয়ে ভরে দিল ওর মুখের ভেতর। জ্ঞান ফিরে পেয়ে চিৎকার করবে, সে উপায় থাকল না। এরপর কারও সাহায্য ছাড়াই রানাকে উপুড় করল সে। ওর পিঠের ওপর হাত দুটো নিয়ে এসে রুমাল দিয়ে কব্জি দুটো এক করে বাঁধল। 'সাথে রশি আছে?' জানতে চাইল সে।

পকেট থেকে নাইলনের সরু কর্ড বের করে দিল একজন। রশির একটা প্রান্ত রানার জোড়া কব্জিতে বেঁধে আরেক প্রান্ত বাঁধল কাছের একটা গাছের সাথে।

খানিক পরই জ্ঞান ফিরে পাবে মেজর, কিন্তু বেশি দূর যেতে পারবে না। আওয়াজ করে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সে উপায়ও নেই। কেউ ওর ওপর হোঁচট না খেলে উদ্ধারের সম্ভাবনা কম। প্রেমিক-প্রেমিকারা এইসব ঝোপে লুকিয়ে চুরিয়ে প্রেম করতে আসে বটে, কিন্তু আজ রাতে কেউ আর আসবে বলে মনে হয় না। ঠিক আছে, এ-ব্যাপারে পরে চিন্তা-ভাবনা করা যাবে। তার আগে হাউজবোটে একবার ঢুঁ মারা দরকার।

ওদেরকে অপেক্ষা করতে বলে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল খাদিম সারওয়ার। টোপাথ ধরে হালকা পায়ে এগোল। হাউজবোটের ভেতর আলো জ্বলছে, সবক'টা পোর্টহোলে পর্দা থাকায় ভেতরটা দেখা গেল না। হঠাৎ একটা কথা মনে হতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ভাবল, একের পর এক মারাত্মক ঝুঁকি নিচ্ছে সে, পরিণতির জন্যে তাকেই সম্পূর্ণ দায়ী থাকতে হবে। তারচেয়ে ঈমান সাফারীর সাথে পরামর্শ করে কাজ করাটাই কি ভাল নয়? ক্ষতি যা হবে, দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেবে দু'জনে।

ঘুরে দাঁড়াল সে। ফিরে এল রাস্তায়। দলের একজন লোক ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল।

'বলো।'

'আমাদের একজন মারা গেছে, স্যার,' বলল লোকটা। 'আরেকজনের অবস্থা সিরিয়াস। হাসপাতালে না পাঠালে বাঁচবে বলে মনে হয় না।'

'হাসপাতাল? অসম্ভব!' একটা প্রাইভেট ক্লিনিকের নাম বলল খাদিম সারওয়ার। 'ওখানে নিয়ে যাও। আমার নাম বললে কেয়ার নেবে ওরা।'

'আর লাশটা, স্যার?'

'একটা ড্রামে কিছু পাথর আর লাশ ভরে নদীতে ফেলে দাও,' বলে আর সেখানে দাঁড়াল না পুলিস সুপার। দূরে রেখে এসেছে গাড়ি, হন হন করে এগোল সেদিকে।

রোপা বলল, 'তোমার কথা সব আমাকে বলেছে আলেক, নাদিয়া।' নাদিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে মিষ্টি করে হাসল সে, হাত বাড়িয়ে নাদিয়ার গাল টিপে দিল। 'তুমি যে এত মিষ্টি, তা কিন্তু আমি কল্পনাও করিনি!'

স্রেফ ভদ্রতার খাতিরে, জোর করে একটু হাসল নাদিয়া। ব্যাপারটা এখনও তার বোধগম্য হচ্ছে না। রোপা ইরিনাই কি তাহলে আলেকের বন্ধু, এই হাউজবোটের মালিক? আলেক কি তাহলে ওর সাথেই বসবাস করছে? আলেক জানত এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে ও? তাকে দেখে রোপা অসন্তুষ্ট হলো না, খেপল না কেন? অন্তত একটু অস্বস্তি বোধ করা কি স্বাভাবিক ছিল না? তা না, বরং উল্টোটাই ঘটতে দেখছে সে। কিছু একটা বলার জন্যেই, জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি সরাসরি ডুম-ডাম থেকে ফিরলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন হলো আজকের অনুষ্ঠান?'

'রোজ যেমন হয়,' তির্যক চোখে তাকিয়ে বলল রোপা, 'ভেড়াগুলোকে গরম করে ছেড়ে দিয়ে এসেছি!'

ছি, ভাবল নাদিয়া, এই ভাষায় কথা বলে কেউ? দেশের নাম করা একজন শিল্পীর কাছ থেকে এ-ধরনের কথা শুনতে হবে বলে আশা করেনি সে।

রোপার হাতে এক গ্লাস শ্যাম্পেন ধরিয়ে দিল আলেক। তার দিকে না তাকিয়ে গ্লাসটা নিল রোপা। নাদিয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি তাহলে পসাইডোনের দোকানে চাকরি করো?'

'ঠিক চাকরি করি না,' বলল নাদিয়া, ভাবল, তুমি কি আসলেই এসব ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড? 'দিন কয়েক সাহায্য করেছি। আমার আত্মীয়।'

'তারমানে তুমি গ্রীক?'

'হ্যাঁ।' খুচরো আলাপ হলেও, ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে নাদিয়া। এখন আর আগের মত ভয় করছে না তার। যাই ঘটুক না কেন, মিশরের সবচেয়ে জনপ্রিয় মেয়ের সামনে ছুরি বের করে তাকে রেপ করার চেষ্টা করতে পারবে না আলেক। যাক বাবা, রোপা ইরিনা সময়মত এসে বড় বাঁচা বাঁচিয়ে দিয়েছে তাকে। মনে পড়ল, মাঝরাতের আগেই আলেককে ধরতে চেয়েছে রানা।

মাঝরাত! মনে মনে আঁতকে উঠল নাদিয়া। ভুলেই গিয়েছিল সে। মাঝরাতে ইসরায়েলের সাথে যোগাযোগ করার কথা আলেকের। যে-কোন মূল্যে সেটা বন্ধ করতে চেয়েছে রানা। তাহলে এখনও কেন আসছে না ও? ওর কি কোন বিপদ হয়েছে? বিপদ বলতে এক আলেকই, সে তো এখানে—তাহলে? তারপর ভাবল, বিপদ তো কত রকমেরই হতে পারে, অ্যাক্সিডেন্ট···। আল্লাহ না করে! তা কেন ঘটতে যাবে! শেষ পর্যন্ত যদি রানা না আসে, কি করবে সে? তার একার পক্ষে কি-ই বা করা সম্ভব? রেডিওটা কোথায় আছে জানা থাকলে হত। কোথায় সেটা? এই বোটেই নেই তো? অন্য কোথাও থাকলে, বোট ছেড়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতে হবে আলেককে। আর যদি এখানেই থাকে, আলেক কি তার আর রোপা ইরিনার

সামনে মেসেজ পাঠাবে?

নাদিয়ার পাশে বসল আলেক। তার দু'পাশে দু'জন বসে থাকায়, ব্যাপারটা সামান্য একটু হুমকির মত লাগল নাদিয়ার। আলেক বলল, 'কি ভাগ্য আমার! মিশরের দুই সেরা সুন্দরীকে নিয়ে বসে আছি!'

সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল নাদিয়া, কি বলবে জানে না।

'তুমি কি বলো, রোপা, আমাদের নাদিয়া সুন্দরী নয়?' জিজ্ঞেস করল আলেক।

'সুন্দরী নয় মানে!' নাদিয়ার গাল স্পর্শ করল রোপা, চিবুক ধরে নিজের দিকে ফেরাল মুখটা। 'আমাকে তোমার সুন্দরী বলে মনে হয়, নাদিয়া?'

'হ্যাঁ...।' নিজের অজান্তেই কুঁচকে উঠল নাদিয়ার ভুরু। প্রতি মুহূর্তে ব্যাপারটা উৎকট হয়ে উঠছে। একটা আশঙ্কা উঁকি দিল তার মনে। সারা শরীর রী রী করে উঠল।

'খুশি হলাম,' বলল রোপা। নাদিয়ার হাঁটুতে একটা হাত রাখল সে। চাপ দিল।

এতক্ষণে সব পরিষ্কার হয়ে গেল নাদিয়ার কাছে। আলেকের ধৈর্য, ভদ্র আচরণ, এই হাউজবোট, হঠাৎ করে রোপা ইরিনার উদয়, সব খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। এরা দু'জন গ্রুপ সেক্সে আসক্ত। সেই ভয়টা আবার ফিরে এল নাদিয়ার মনে। আলেকের চেয়ে রোপাকেই বেশি ভয় করতে লাগল তার। বুঝল, এখানে নিরাপদ নয় সে। এরা দু'জন নিজেদের খুশিমত ব্যবহার করতে চায় তাকে। প্রতিবাদ করে লাভ নেই, বাধা দিয়ে ঠেকানো যাবে না, ওদের মাঝখানে শুতে হবে তাকে। মুখ বুজে সহ্য করতে হবে ওদের বিকৃত অশ্লীল অত্যাচার। আলেকের হাতে ছুরি থাকবে...

এতে ভয় পেলে চলে! নিজেকে সাহস যোগাবার চেষ্টা করল নাদিয়া। আমাকে নিয়ে যাই করুক ওরা, মেরে তো ফেলবে না। নিজের কথা ভুলে যাও, নাদিয়া। শরীর ধুয়ে নিলেই আবার সেটা পবিত্র হয়ে যায়। তোমার ওপর যে গুরু দায়িত্ব চেপেছে সেটার কথা ভাব। রেডিওর কথা ভাব! ভাব, আলেককে কিভাবে মেসেজ পাঠাতে বাধা দেয়া যায়।

আড়চোখে হাতঘড়ির দিকে তাকাল নাদিয়া। পৌনে বারোটা। রানার ওপর ভরসা করার এখন আর কোন মানে হয় না। যা করার একাই করতে হবে তাকে।

মনে হলো, একটা উপায় জানা আছে তার।

রোপা আর আলেকের মধ্যে চোখে চোখে কথা হলো। দু'জনেই একটা করে হাত রাখল নাদিয়ার দুই উরুতে, তারপর ওর মুখের সামনে পরস্পরকে চুমো খেলো ওরা। ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল নাদিয়া। প্রথমে ছোট্ট করে পরস্পরের ঠোঁটে চুমো খেলো ওরা, তারপর আবার, এবার অনেকক্ষণ ধরে। নাদিয়া ভাবল, এই অবস্থায় আমি কি করব বলে আশা করছে ওরা?

পরস্পরকে ছেড়ে দিল ওরা। নাদিয়ার মাথা ধরে নিজের দিকে টানল আলেক, তার ঠোঁটে চুমো খেলো। বাধা দেবার ইচ্ছে রয়েছে নাদিয়ার, কিন্তু শক্তি পেল

না। দু'হাত দিয়ে আলেককে ধাক্কা দিল রোপা, তারপর নাদিয়ার কাঁধ ধরে নিজের দিকে টানল। শুরু হলো আলেক আর রোপার মধ্যে ধস্তাধস্তি।

চোখ বুজে মনে মনে বলল নাদিয়া, এসব আমাকে সহ্য করতে হবে। মেরে তো ফেলছে না। যা খুশি করুক ওরা, সহ্য করব। মরব তো না।

হালকা ধস্তাধস্তি, একটু পর সেটা থেমেও গেল। নিজের ব্লাউজের বোতাম খুলতে শুরু করল রোপা। তারপর নাদিয়ার মাথাটা নিজের বুকের সাথে চেপে ধরল। এই সাথে গোঙানির মত আওয়াজ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে।

কোথাও কিছু নেই, রোপার গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল আলেক। রোপা একেবারে বারুদের মত জ্বলে উঠে দাঁত বের করে কামড়ে দেবার চেষ্টা করল তাকে। নির্দয় হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলে একটু সরে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করল আলেক। চোখ ইশারায় নাদিয়াকে বলল, তুমিও ঠিক আমার মত করে চড় মারো।

প্রতিবাদ করল না নাদিয়া, কারণ আশ্চর্য একটা কৌতূহল পেয়ে বসল ওকে। কেন যেন মনে হলো ওর, ও চড় মারলে রোপার প্রতিক্রিয়া অন্য রকম হবে। মারল ও, কিন্তু আলেকের মত জোরে নয়, একটু আস্তে।

যা ভেবেছিল, তাই। চড় খেয়ে শিউরে উঠল রোপা, কিন্তু চেহারা দেখে বোঝা গেল আনন্দের আতিশয্যেই শিউরে শিউরে উঠছে সে। তার গলা থেকে দুর্বোধ্য গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে আসতে লাগল।

নাদিয়া বুঝল, এই অশ্লীল আয়োজন আসলে রোপা ইরিনার বিকৃত রুচি চরিতার্থ করার জন্যেই। হাঁপাচ্ছে আর গোঙাচ্ছে আলেক নয়, রোপাই।

নাদিয়ার ভয় হলো, এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে রেডিওর কাছে চলে যাবে আলেক। রোপার হাতে একা পড়ে যাবে সে। এদিকে, তাকে নিয়ে উন্মাদিনীর মত অস্থির হয়ে উঠল রোপা। যতই ধীর স্থির ভাবে চিন্তা-ভাবনা করার চেষ্টা করল নাদিয়া, ততই তার মনে হতে লাগল, এসব আসলে বাস্তবে কিছুই ঘটছে না, দুঃস্বপ্ন দেখছে সে।

তবু পাখি পড়ানোর মত করে নিজেকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল সে, আলেককে রেডিওর কাছে যেতে দেয়া হবে না। যেমন করে হোক ওকে এখানে আটকে রাখতে হবে।

আলেককে আটকে রাখতে হলে জানতে হবে, আসলে ঠিক কি চায় ওরা। রোপাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আলেকের দিকে ফিরল সে। চুমো খেলো তাকে। গভীর ভাবে শ্বাস নিল আলেক। তার একটা হাত ধরে নিজের কোলের ওপর আনল নাদিয়া। লোভে, লালসায় চক চক করে উঠল আলেকের চোখ। পরস্পরকে আলিঙ্গন করল ওরা।

রোপা চেষ্টা করল ওদের দু'জনকে আলাদা করতে। বিরক্ত হয়ে রোপার দিকে তাকাল আলেক, তারপর আবার একটা চড় কষাল তার গালে।

সোফা থেকে পড়ে গেল রোপা। আবার নাদিয়ার দিকে মনোযোগ দিল আলেক।

রোপা আবার ওদের মাঝখানে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করল। এবার তার গালে চড়

মারল নাদিয়া।

শিউরে উঠল রোপা। গোঙাতে শুরু করল।

নাদিয়া ভাবল, রহস্যের চাবি পেয়ে গেছি! এদেরকে বশে রাখা এখন আর আমার জন্যে কোন সমস্যাই নয়। দেখল, হাতঘড়ির দিকে তাকাল আলেক।

হঠাৎ সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নাদিয়া। ওরা দু'জনেই মুখ তুলে তাকাল ওর দিকে। ধীরে ধীরে মাথার উপর হাত তুলল নাদিয়া, পরনের কাপড় মাথা দিয়ে গলিয়ে বের করে আনল। ফেলে দিল ছুঁড়ে। পরনে এখন শুধু কালো আন্ডারঅয়্যার আর মোজা। নিজেকে ছুঁলো ও, হালকাভাবে, আঙুলগুলো ছড়িয়ে পড়ল উরুর ওপর, সেখান থেকে উপর দিকে তুলে আনল, বুকের পাশে। দেখল, আলেকের চেহারা বদলে যাচ্ছে। ব্যক্তিত্বের মুখোশ খসে পড়ল, লোভাতুর চোখদুটো বিস্ফারিত করে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে তার পিঠ। জিভ বের করে ঠোঁট চাটল সে।

বাঁ পা তুলল নাদিয়া। রোপার বুকের ঠিক মাঝখানে হাইহিল রাখল সে। তারপর ভাঁজ করা হাঁটুটা গায়ের জোরে সোজা করল। ছিটকে পড়ল রোপা। দু'হাত দিয়ে আলেকের মাথা ধরল নাদিয়া। নিজের উরুর সাথে চেপে ধরল তার মুখ।

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল রোপা। নাদিয়ার পা চাটতে শুরু করল সে।

হাত ঘড়ির ওপর চোখ বুলাল নাদিয়া। রাত বারোটা।

পাঁচ

পরনে কাপড় নেই, বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে নাদিয়া। নড়ছে না, টান টান হয়ে আছে পেশী, বন্ধ চোখের ওপর কুঁচকে রয়েছে পাতা। ওর ডান দিকে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে রয়েছে রোপা, হাত-পা চাদরের ওপর ছড়ানো। ঘুমাচ্ছে সে, একটু একটু নাক ডাকছে। তার ডান হাতটা নাদিয়ার নিতম্বের ওপর। আলেক রয়েছে নাদিয়ার বাঁ দিকে, চোখে ঘুম। কয়েক সেকেন্ড আগেও নাদিয়ার ঠোঁটে আঙুল বুলাচ্ছিল।

নাদিয়া শুধু একটা কথাই ভাবছে বার বার, মরে তো আর যাইনি!

খেলাটা ছিল এককভাবে রোপারই, আলেক ছিল সংগঠক, আর নাদিয়া ছিল ওদের অসহায় শিকার মাত্র। রোপাকে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে দিয়ে জমে ওঠে নাটক, সবশেষে তাকে সাদরে গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে সার্থক হয়ে ওঠে এই আয়োজন। যতই ঠেলে সরিয়ে দেয়া হয় রোপাকে, ততই সে উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকে। অবশেষে নাদিয়াকে প্রত্যাখ্যান করে রোপাকে গ্রহণ করে আলেক। নাটকের সার্থক পরিসমাপ্তি ঘটে এখানেই। এই চিত্রনাট্য রোপা আর আলেকেরই তৈরি, এর আগেও এই নাটকে অভিনয় করেছে তারা, বহুবার।

পুরোটা সময় নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছে নাদিয়া। তবে বার বার ঘুরে ফিরে কর্তব্যের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় আরও অনেক যন্ত্রণাভোগ থেকে বেঁচে গেছে সে।

সামান্য একটু চোখ মেলল নাদিয়া। মুখ খুলে ঘুমাচ্ছে আলেক। কিন্তু এখনই যদি উঠতে চেষ্টা করে সে, ঘুম ভেঙে যেতে পারে তার। ঘুম আরও একটু গাঢ় হোক।

রানার কথা ভাবল নাদিয়া। গেল কোথায়? নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে ওর। কায়রোয় ফিরে রানা হয়তো আলেকের গাড়ি হারিয়ে ফেলেছিল। আবার নাদিয়ার মনে দুর্ঘটনার আশঙ্কা জাগল। তারপর চিন্তা করল, যাই ঘটুক না কেন, তাকে পাহারা দিচ্ছে না রানা। সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়েছে সে।

তাকে নিয়ে এরা দু'জন যা করেছে, এই অপমান জীবনে ভুলতে পারবে না নাদিয়া। শুধু সান্ত্বনা এইটুকু যে মাঝরাতে আলেকের রেডিও ব্যবহার করা ঠেকানো গেছে।

তাই বলে খুশি হবার কোন কারণ নেই। আজ রাতে না হয় ঠেকানো গেছে, কাল রাতে তাকে ঠেকাবে কে? মনে মনে ঠিক করল নাদিয়া, সকাল বেলা এখান থেকে বেরিয়ে সোজা জেনারেল হেডকোয়ার্টারে চলে যাবে সে। রানার সহকারী ফরহাদকে হাউজবোটের কথা জানাবে। মিলিটারি পুলিস নিয়ে এসে আলেককে গ্রেফতার করতে পারবে ফরহাদ। কিন্তু সকালে কেন? এখনই নয় কেন? সকালে যদি আলেক বোট ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায়?

না। যাবে না। কারণ, তার রেডিও আছে এখানে। কিন্তু যদি রেডিও নিয়ে চলে যায়?

এখুনি পালানো দরকার। সকালে দেরি হয়ে যাবে। কিন্তু এত রাতে ফরহাদকে পাবে কোথায় সে। মনে পড়ল, ফরহাদের বাড়ির ঠিকানা রানার কাছ থেকে নিয়ে নোট বুকে লিখে রেখেছে সে। নোট বইটা ফ্ল্যাটে রয়েছে। তাহলে প্রথমে ফ্ল্যাটে ফিরতে হবে তাকে। ফরহাদের বাড়ি খুঁজে বের করতে হবে। ঘুম থেকে তুলতে হবে তাকে। এসব করতে সময় লাগবে প্রচুর। ইতোমধ্যে যদি আলেকের ঘুম ভেঙে যায়?

ঘুম থেকে জেগে আলেক দেখবে, সে পালিয়েছে। নিজের বিপদ টের পাবে সে, লেজ তুলে পালিয়ে যাবে হাউজবোট ছেড়ে।

এতসব ঝুঁকি না নিয়ে, এক কাজ করলেই তো হয়!—ভাবল নাদিয়া। আলেকের রেডিওটা নষ্ট করে দিই। কিন্তু রেডিও এখানে আছে কি না তাই তো জানা হয়নি!

সন্ধেবেলা রানা কি বলেছিল তাকে, মনে পড়ে গেল। 'কোডের কী পেলে নিজেকে আলেক বোগান বলে পরিচয় দিতে পারতাম। ইসরায়েলে ফলস ইনফরমেশন পাঠানো সম্ভব হত।'

নাদিয়া ভাবল, চেষ্টা করলে আমি হয়তো খুঁজে বের করতে পারি কী। রানা বলেছে, ছোট একটা কাগজের টুকরো ওটা, সিগন্যাল কোড ও ডিকোড করার

নিয়ম লেখা আছে।

সিদ্ধান্ত নিল, হাউজবোটে তল্লাশী চালাবে।

কিন্তু নড়ল না এক চুল। ভয়ে দুরু দুরু করছে বুকের ভেতরটা। তল্লাশী চালাবার সময় আলেকের হাতে যদি ধরা পড়ে যায়···শিউরে উঠল সে। মানব জাতি সম্পর্কে আলেকের থিওরিটা মনে পড়ে গেল। দুটো মাত্র দল আছে—প্রভু আর ক্রীতদাস।

একজন ক্রীতদাসের জীবন, ওটার কোন মূল্য নেই।

প্রাণের ওপর ঝুঁকি না নেয়াই ভাল, ভাবল নাদিয়া। তারচেয়ে সকাল হোক, স্বাভাবিক ভাবে বিদায় নেবে ও। তারপর খবর দেবে ফরহাদকে।

পুরানো প্রশ্নগুলো আবার ফিরে এল মনে। ততক্ষণে আলেক যদি পালিয়ে যায়? রেডিওটা যদি এখানে নাই থেকে থাকে?

এত কথা ভাবলে কোন কাজ করা যায়? রোপার হাতটা আস্তে করে নিতম্ব থেকে নামিয়ে দিল নাদিয়া। রোপা নড়ল না। ধীরে ধীরে, একটু একটু করে বিছানার ওপর উঠে বসল সে। খাটের স্প্রিং ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল। সেই সাথে নড়ে উঠল রোপা আর আলেক।

বিস্ফারিত চোখে নাদিয়া দেখল, মাথা তুলল রোপা, তারপর আরেক দিকে ফিরে শুলো। কয়েক সেকেন্ড কোন শব্দ হলো না, তারপর আবার শুরু হলো তার নাক ডাকা। রোপার মত আলেকও চোখ মেলল না, শুধু পাশ ফিরল।

ঘুরে বসার জন্যে এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি করে নড়তে শুরু করল নাদিয়া। বিছানার মাথার দিকে মুখ করল সে। তারপর রুদ্ধশ্বাসে বসা অবস্থায় পিছু হটতে লাগল—ডান হাঁটু, বাঁ হাত, বাঁ হাঁটু, ডান হাত। চোখ পড়ে আছে ওদের মুখের ওপর। বিছানার গোড়ার দিকটা যেন কয়েক মাইল দূরে। জমাট নিস্তব্ধতা একনাগাড় বজ্রপাতের মত বিস্ফোরিত হলো তার কানে। মাঝ নদী দিয়ে একটা বার্জ চলে গেল, সেটার ঢেউ এসে লাগায় দুলতে লাগল হাউজবোট। এই সুযোগে বিছানা থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল নাদিয়া। নামল, কিন্তু ওখান থেকে সরে গেল না। ঘুমন্ত রোপা আর আলেকের মুখের দিকে খেয়াল রাখল।

একসময় থামল হাউজবোটের দোলা। ওদের কারও ঘুম ভাঙল না।

কোত্থেকে শুরু করবে তল্লাশী? একটা নিয়ম ধরে এগোনো উচিত। ঠিক করল, বোটের সামনে থেকে পিছনের দিকে এগোবে সে। বাথরুমটা প্রাউ-এ। হঠাৎ অনুভব করল, বাথরুমে তার এমনিতেও একবার যেতে হবে। পা টিপে টিপে বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল সে।

ছোট্ট বাথরুম। টয়লেটে বসে চারদিকে চোখ বুলাল সে। একটা রেডিও কোথায় লুকিয়ে রাখা যেতে পারে? কত বড় হতে পারে সেটা, তার কোন ধারণা নেই। সুটকেস বা ব্রীফকেসের মত? হাতব্যাগের মত? এখানে একটা বেসিন, ছোট একটা টাব আর কাবার্ড রয়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে কাবার্ডটা খুলল সে। দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, পিল, অ্যান্টিসেপটিক মলম আর তুলো রয়েছে।

বাথরুমে রেডিও নেই।

এখুনি বেডরুম সার্চ করার সাহস হলো না। ভেতরে ঢুকে পর্দা পর্যন্ত এল পা টিপে। আলেক ওর নাম ধরে ডাকতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। জমে একেবারে পাথর হয়ে গেল সে। কিন্তু তারপর আর কোন শব্দ হলো না। বিছানার স্প্রিং ক্যাঁচ ক্যাঁচ করল না, আলেকের গলাও শোনা গেল না। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে বিছানার দিকে তাকাল সে। ওর দিকে মুখ করে রয়েছে আলেক। ঠোঁটের কোণ বাঁকা হয়ে রয়েছে দেখে বোঝা গেল, একটু একটু হাসছে সে। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর নাদিয়া বুঝল, ঘুমের মধ্যে তার নাম ধরে ডেকেছে আলেক। নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছে।

পর্দা সরিয়ে লিভিংরুমে বেরিয়ে এল সে। দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল চারদিক। তাড়াহুড়ো করার একটা ঝোঁক চাপল, কিন্তু জোর করে নিজেকে সতর্ক আর শান্ত রাখল সে। কাজে হাত দিল, শুরু করল স্টারবোর্ড সাইড থেকে। এখানে একটা ডিভান কাউচ রয়েছে, সেটার গোড়ায় হালকাভাবে আঙুলের টোকা দিল সে। ভেতরটা ফাঁপা বলে মনে হলো। দু'হাতে ধরে শূন্যে তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। তারপর লক্ষ করল, মেঝের সাথে ডিভানের পায়া স্ক্রু দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। স্ক্রুগুলো পরীক্ষা করে দেখল সে। অনেক দিন খোলা হয়নি। এর ভেতর রেডিও নেই।

ডিভানের কাছেই রয়েছে লম্বা একটা কাবার্ড। সাবধানে খোলার চেষ্টা করলেও, মরচে ধরা কব্জা ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করে উঠল। হাত দুটো স্থির হয়ে গেল তার। একটা শব্দ ভেসে এল বেডরুম থেকে, মনে হলো গম্ভীর সুরে কে যেন উচ্চারণ করল, 'হুম।'

অপেক্ষা করছে নাদিয়া। পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এসে আলেক হাতেনাতে ধরবে ওকে। কিন্তু কিছুই ঘটল না।

কাবার্ডের ভেতর তাকাল সে। ঝাঁটা, ব্রাশ, ভাঁজ করা চটের বস্তা, বালতি, একটা বড় টর্চ এই সব রয়েছে। রেডিওর কোন খবর নেই। কবাট বন্ধ করল সে। আবার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হলো।

কিচেনে চলে এল নাদিয়া। এক দুই করে ছোট ছোট ছয়টা কাবার্ড খুলতে হলো তাকে। ওগুলোয় টিনে ভরা খাবার জিনিস, সসপ্যান, গ্লাস, কফি, চাল আর চা, এইসব রয়েছে। সিঙ্কের নিচে আবর্জনা ফেলার জন্যে একটা বাস্কেট দেখা গেল। আইসবক্সের ভেতর তাকাল নাদিয়া। শ্যাম্পেনের একটা বোতল রয়েছে। রেডিওটা কি দেরাজে ঢোকার মত ছোট হতে পারে? অনেকগুলো দেরাজ, এক এক করে সবগুলো খুলে দেখল সে। কিন্তু রেডিওর মত দেখতে কোন জিনিস পেল না।

কিচেনের পাশেই ছোট্ট একটা জায়গা, সেখানে দেয়ালে হেলান দিয়ে রয়েছে একটা ফোল্ডিং ডেস্ক। ডেস্কের নিচে ছোট একটা সুটকেস দেখল নাদিয়া। তুলতে গিয়ে আবিষ্কার করল, অসম্ভব ভারী। খোলার সময় কোন শব্দ হলো না। ধড়াস করে উঠল বুক। ভেতরে রেডিও।

সচরাচর যেমন দেখা যায়, সাধারণ একটা সুটকেস। হাতলের দু'পাশে দুটো

ক্যাচ, হাতলটা চামড়া দিয়ে বাঁধানো, এবং প্রতিটি কোণে খানিকটা করে অতিরিক্ত আবরণ। রেডিওটা ভেতরে একেবারে খাপে খাপে বসে আছে, যেন ওটার কথা মনে রেখেই তৈরি করা হয়েছে ডিজাইনটা। রেডিও আর ঢাকনির মাঝখানে একটু ফাঁক থেকে গেছে, সেই ফাঁকে পড়ে রয়েছে একটা বই। বইয়ের কাভারটা বেশ মোটা ছিল, সেটা ছিঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে, তা না হলে ওইটুকু জায়গায় বইটা ঢুকত না। বইটা তুলে খুলল নাদিয়া। দুটো পাতার মাঝখানে কাগজের একটা টুকরো ছিল, পড়ে গেল সেটা। ঝুঁকে পড়ে কাগজটা তুলল সে। দেখল, কিছু সংখ্যা, তারিখ আর শব্দ লেখা রয়েছে কাগজে, শব্দগুলো হিব্রু ভাষায়। নাদিয়ার মনে হলো, এটা নিশ্চয়ই সেই কোডের কী। রানা যেটা পাবার জন্যে অস্থির হয়ে আছে।

হঠাৎ দায়িত্বের একটা বোঝা অনুভব করল নাদিয়া। এটা না থাকলে ইসরায়েলে মেসেজ পাঠাতে পারবে না আলেক। বাধ্য হয়ে তাকে সরাসরি ভাষা ব্যবহার করতে হবে। সেক্ষেত্রে ইসরায়েলিরা তার পরিচয় সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠবে। মিশরীয়রা তার এই সরল ভাষার মেসেজ শুনে ফেলেছে এই ভয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে আলেকও। এটা না থাকলে, এক কথায় অকেজো, অচল হয়ে পড়বে আলেক বোগান। এটা থাকলে, ইসরায়েলকে মিথ্যে তথ্য যোগান দিয়ে মিশরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে মেজর রানা।

কাগজটা নিয়ে পালাতে হবে তাকে। এখুনি। মনে পড়ল, তার পরনে কাপড় নেই। অস্থির ভাবটা কাটিয়ে উঠে শান্ত হতে চেষ্টা করল সে। কাউচের ওপর পড়ে আছে ড্রেসটা। নিঃশব্দ পায়ে হেঁটে এসে কাউচের পাশে দাঁড়াল। বই আর কোডের কী সেটার ওপর রেখে তুলে নিল ড্রেস। মাথা দিয়ে গলিয়ে পরে নিল, দেখল, হাত দুটো কাঁপছে।

বিছানার স্প্রিং ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল। নিঃসন্দেহে বুঝল নাদিয়া, কেউ একজন উঠে বসল বিছানার ওপর। বিস্ফারিত চোখে পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। নড়াচড়ার শক্তি নেই শরীরে। ভারী পায়ের আওয়াজ। আলেক! পর্দার দিকে এগিয়ে আসছে!

পর্দার কাছে এসে থামল পায়ের আওয়াজ, তারপর আবার ফিরে গেল। বাথরূমের দরজা খোলার শব্দ হলো। ড্রেসের নিচে প্যান্টি পরবে, অত সময় নেই হাতে। বইয়ের ভেতর কাগজের টুকরোটা ঢুকিয়ে নিল সে। তারপর ব্যাগ আর জুতো নিল হাতে। শুনতে পেল, বাথরূম থেকে বেরিয়ে আসছে আলেক। দ্রুত পায়ে সিঁড়ির দিকে এগোল নাদিয়া। সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে ধৈর্য রাখতে পারল না, ওপর দিকে ছুটতে শুরু করল।

ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল নাদিয়া। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিয়ে রয়েছে আলেক, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। তার চোখ পড়ল মেঝেতে পড়ে থাকা খোলা সুটকেসের ওপর। মুখ ফিরিয়ে হ্যাচের দিকে তাকাল নাদিয়া। দুটো ভারী খিল দিয়ে ভেতর থেকে আটকানো রয়েছে সেটা। দ্রুত হাত চালিয়ে খিল দুটো খুলল। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, সিঁড়ির দিকে ছুটে আসছে আলেক।

হ্যাচ তুলে ফাঁকটা দিয়ে গলে ডেকে বেরিয়ে এল নাদিয়া। নিচে তাকিয়ে দেখল, সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে আলেক। কাঠের হ্যাচ কাভারটা সাংঘাতিক ভারী, সেটা ধরে অপেক্ষায় থাকল নাদিয়া। ফাঁকের কিনারায় আলেক হাত রাখতেই কাভারটা সজোরে নামিয়ে দিল সে। প্রচণ্ড ব্যথায় ককিয়ে উঠল আলেক। ভেঙে যদি নাও থাকে, আঙুলগুলো থেঁতলে তো গেছেই। ডেকের ওপর দিয়ে ছুটল নাদিয়া। চাঁদের আলোয় গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কটা পরিষ্কার দেখা গেল।

গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক পেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল সে। বোটের ডেক আর নদীর মাঝখানে এটা একটা কাঠের চওড়া তক্তা। পাড়ের দিকের প্রান্তটা ধরে উঁচু করল সে, ঠেলে দিল নদীর দিকে। গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক ঝপাৎ করে পড়ে গেল পানিতে।

হ্যাচ গলে ডেকে উঠে এল আলেক। ব্যথায় নীল হয়ে গেছে চেহারা। ডেকের ওপর দিয়ে তাকে ছুটে আসতে দেখে ভয়ে শিউরে উঠল নাদিয়া। ভাবল, গায়ে কাপড় নেই, ধাওয়া করতে পারবে না। কিন্তু বোটের কিনারা থেকে নদীর পাড় লক্ষ্য করে লাফ দিল আলেক।

টোপাথ ধরে ছুটতে শুরু করল নাদিয়া, পিছন ফিরে আলেককে দেখছে। প্রার্থনা করল, লোকটা যেন পানিতে পড়ে। কিন্তু না! পাড়ের ঠিক কিনারায় নামল সে, তাল সামলাবার জন্যে হাত দুটো পাখির পাখা ঝাপটাবার মত বিদ্যুৎগতিতে বার কয়েক ওঠা-নামা করল। হঠাৎ আশ্চর্য সাহসের পরিচয় দিল নাদিয়া। থমকে দাঁড়াল টোপাথে। ঘুরল। কয়েক পা ছুটে এসে দু'হাত দিয়ে ধাক্কা দিল আলেককে। কিনারা থেকে নদীতে পড়ে গেল আলেক।

ছুটতে ছুটতে রাস্তায় উঠে এল নাদিয়া। কোথায় যাচ্ছে জানে না। হাঁপিয়ে গেছে সে। চোখ বুজে ছুটছে। পঞ্চাশ গজও এগোয়নি, কঠিন একজোড়া বাহুর মধ্যে গিয়ে পড়ল।

চোখ মেলে ধস্তাধস্তি শুরু করল নাদিয়া। মুক্ত হলো, কিন্তু আটকা পড়ল আবার। হার হয়েছে বুঝতে পেরে নেতিয়ে পড়ল সে। ভাবল, একটুর জন্যে পারলাম না! একটুর জন্যে!

ঘোরানো হলো ওকে। লোকটা ওর দুই হাত চেপে ধরে বোটের দিকে টেনে নিয়ে চলল।

হাঁপাচ্ছে নাদিয়া। চোখের পাতায় ঘাম পড়ায় সামনেটা ঝাপসা লাগল। কিন্তু আলেককে চিনতে অসুবিধে হলো না। নদী থেকে উঠে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে সে।

হঠাৎ আতঙ্ক বোধ করল নাদিয়া। হাতে পেলে আলেক তাকে মেরে ফেলবে! আবার ধস্তাধস্তি শুরু করল সে। চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলল, কিন্তু লোকটা তার গলা পেঁচিয়ে ধরায় কোন আওয়াজ বেরোলো না।

ওদের সামনে এসে দাঁড়াল আলেক। 'কে আপনি?'

'খাদিম সারওয়ার। আপনি নিশ্চয়ই আলেক বোগান?'

'ভাগ্যিস ছিলেন আপনি!'

'আপনার খুব বিপদ, মি. বোগান,' গম্ভীর সুরে বলল পুলিস সুপার।

'আপনি বরং বোটে আসুন, ওখানে কথা হবে,' বলল আলেক। ঘুরে দাঁড়িয়ে টোপাথের দিকে এগোল সে।

নদীর পাড়ে পৌঁছে নিচে তাকাল আলেক। কাঠের তক্তাটা পানিতে ভাসছে। লাফ দিয়ে পড়লে আওয়াজ হবে, তাই ধীরে ধীরে নদীতে নেমে গেল সে। তক্তাটা আগের জায়গায় বসাতে দু'মিনিটের বেশি লাগল না তার।

মুহূর্তের জন্যেও নাদিয়াকে ছাড়ল না পুলিস সুপার। আলেকের পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে বোটের নিচে নামল ওরা।

হাত তুলে কাউচটা দেখাল আলেক, খাদিম সারওয়ারকে বলল, 'ওখানে বসিয়ে রাখুন ওকে।'

নাদিয়াকে সামান্য একটু ঠেলা দিল পুলিস সুপার। কাউচে বসল নাদিয়া। পর্দা সরিয়ে চলে গেল আলেক, বড় একটা তোয়ালে নিয়ে ফিরে এল। সেটা দিয়ে গায়ের পানি মুছতে শুরু করল। অচেনা একজন পুরুষের সামনে উলঙ্গ হয়ে রয়েছে, সেজন্যে তার কোন লজ্জা নেই।

খাদিম সারওয়ার লোকটা ছোটখাট, দেখে আশ্চর্যই হলো নাদিয়া। চেহারাটা অবশ্য ভাল। কিন্তু এই লোকের গায়ে এত জোর, ভাবা যায় না। লোকটা অস্বস্তি বোধ করছে, আলেকের দিকে বিশেষ তাকাচ্ছে না।

কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে বসল আলেক। একটা হাত চোখের সামনে তুলে বলল, 'একটা আঙুল বোধহয় ভেঙেই দিয়েছে!' মুখ তুলে নাদিয়ার দিকে তাকাল। চেহারায় রাগ, সেই সাথে একটু যেন কৌতুকের ভাব।

'মিস রোপা কোথায়?'

ইঙ্গিতে পর্দার ওদিকটা দেখিয়ে আলেক বলল, 'বিছানায়। ভূমিকম্পেও ওর ঘুম ভাঙে না। বিশেষ করে যে রাতে উৎসব হয়।'

নাদিয়া লক্ষ করল, আলেকের কথায় অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল খাদিম সারওয়ারের। একটু অসহিষ্ণু দেখাল তাকে। বলল, 'আপনার বিপদ কিন্তু গুরুতর, মি. বোগান।'

'জানি,' বলল আলেক। হাত তুলে নাদিয়াকে দেখাল সে। 'বোঝাই যাচ্ছে, মেজর রানার হয়ে কাজ করছে ও।'

'তা জানি না। আমি শুধু জানি, নদীর পাড় পর্যন্ত এসেছিল মেজর রানা।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল আলেকের চেহারা। 'হোয়াট! কোথায় সে?'

'রাস্তার ওপারে,' বলল পুলিস সুপার। 'ঝোপের ভেতর জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে। আমার লোকেরা…'

হতাশায় মুষড়ে পড়ল নাদিয়া। সাহায্যের তাহলে সত্যিই কোন আশা নেই! তারপর রানার নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল সে। মারধর করে অজ্ঞান করা হয়েছে ওকে, নিশ্চয়ই হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। জখম গুরুতর হলে, বেশি রক্ত পড়লে…দুশ্চিন্তায় অসুস্থ বোধ করল সে।

'তার মানে, নাদিয়াকে অনুসরণ করে এখানে পৌঁছেছিল মেজর,' বলল আলেক। গভীর চিন্তায় মগ্ন দেখাল তাকে। 'তার মানে আমার এই ঠিকানা দু'জনই

জানে। এখানে যদি আমাকে থাকতে হয়, ওদেরকে মেরে ফেলতে হবে।'

শিউরে উঠল নাদিয়া। লোকটা মানুষ না পিশাচ? এমন হালকা সুরে কিভাবে একজন লোক মানুষ খুন করার কথা বলতে পারে? মনে পড়ল—প্রভু আর ক্রীতদাস...।

'তাতে আমার মত নেই,' বলল খাদিম সারওয়ার। 'মেজর রানা খুন হলে শেষ পর্যন্ত দোষ চাপবে আমার ঘাড়ে। আপনি চলে যেতে পারেন, কিন্তু আমাকে এখানে থাকতে হবে।' একটু বিরতি নিল সে, চোখের চারপাশ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল আলেকের দিকে। 'আর আপনি যদি আমাকেও খুন করার কথা ভেবে থাকেন, সেটি ভুলে যান। কারণ, আমাকে খুন করলেও এখানে আপনি নিরাপদ নন—আমার লোকেরা আপনার কথা জানে।'

'কাজেই...' চোখ মুখ কুঁচকে রাগের সাথে দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ করল আলেক, '...উপায় নেই, আমাকেই অন্য কোথাও সরে যেতে হবে। শালার ভাগ্য!'

মাথা ঝাঁকাল খাদিম সারওয়ার। 'আপনি গায়েব হয়ে গেলে, সব আমি সামলে নিতে পারব। কিন্তু আপনার কাছ থেকে একটা জিনিস পাব বলে আশা করে আছি আমরা। আপনাকে কেন সাহায্য করছি, ভেবে দেখুন।'

'ইসরায়েলের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে চান।'

'হ্যাঁ।'

'আজ রাতে...সর্বনাশ! মেসেজ পাঠাবার কথা ভুলেই গেছি! আজ আর সম্ভব নয়। কাল রাতে। কি খবর পাঠাতে চান বলুন আমাকে, আমি আপনার নামে পাঠিয়ে দেব...'

'উঁহুঁ,' বলল খাদিম সারওয়ার। 'নিজেদের মেসেজ আমরা নিজেরা পাঠাতে চাই। তাছাড়া, শুধু একটা মেসেজ পাঠানো আমাদের সমস্যা নয়। সব সময় ব্যবহারের জন্যে আমাদের একটা রেডিও দরকার।'

থমথমে চেহারা নিয়ে পুলিস সুপারের দিকে তাকিয়ে থাকল আলেক।

নাদিয়া আন্দাজ করল, খাদিম সারওয়ার আরব হলেও, ইসরায়েলের হয়ে কাজ করছে সে, তার বোধহয় একটা দলও আছে।

'রেডিওটা আমরা পেলে, মেসেজ পাঠাবার জন্যে আপনাকে সেটা ব্যবহার করতে দেয়া হবে...'

পুলিস সুপারকে বাধা দিয়ে আলেক বলল, 'তার দরকার হবে না। আমার আরও একটা রেডিও আছে।'

'কথা তাহলে পাকা হয়ে গেল, কি বলেন?'

খোলা সুটকেসটা দেখাল আলেক। 'ওই আপনাদের রেডিও। ঠিক ওয়েভলেন্থে সেট করা আছে। আপনাকে শুধু মাঝরাতে ব্রডকাস্ট করতে হবে। যে-কোন রাতে।'

রেডিওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পরীক্ষা করল খাদিম সারওয়ার। নাদিয়া ভাবল, রেবেকা কোড সম্পর্কে খাদিম সারওয়ারকে কিছু বলল না কেন আলেক?

ধারণা করল, ইসরায়েলের সাথে লোকটা যোগাযোগ করতে পারুক বা না পারুক, আলেকের তাতে কিছু আসে যায় না। খাদিম সারওয়ারকে কোড জানিয়ে দিলে, তার হাত থেকে অন্য কারও হাতে পড়তে পারে সেটা। নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন ঝুঁকি নিতে চাইছে না আলেক।

'মেজর রানার বাড়ি চেনেন?' জানতে চাইল আলেক।

ঠিকানাটা জানাল খাদিম সারওয়ার। নাদিয়া ভাবল, মতলব কি আলেকের?

'মেজর বিবাহিত?'

'না।'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল আলেকের। 'ভাগ্য দেখছি কোন দিকেই সাহায্য করছে না!'

'ঠিক কি জানতে চান আপনি?' প্রশ্ন করল খাদিম সারওয়ার।

'এই ঠিকানায় মেজর রানা কি একা বাস করে? এমন কেউ নেই তার, যাকে সে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসে?'

মুচকি হাসল খাদিম সারওয়ার। 'আছে।'

'আছে?' আলেকের চোখ চকচকে হয়ে উঠল। 'কে সে? তার সাথে মেজরের সম্পর্ক কি?'

'পাশের ফ্ল্যাটের একটা কিশোর,' বলল খাদিম সারওয়ার। 'ছেলেটার অভিভাবকরা ইউরোপ বেড়াতে গেছে। মেজর রানার ফ্ল্যাটেই থাকে সে। এই ছেলের কোন বিপদ হলে, মেজর রানা স্থির থাকতে পারবে না।'

'ছেলেটার নাম? বয়স?'

'ডন। এগারো-বারো। কিন্তু এ-ব্যাপারে আপনার আগ্রহের কারণ কি?'

'রানা আমার পরম শত্রু,' মুচকি একটু হাসল আলেক। 'তার সম্পর্কে আমি কৌতূহলী।'

নাদিয়া বুঝল, আলেক মিথ্যে কথা বলছে। নিশ্চয়ই কোন শয়তানী বুদ্ধি এঁটেছে।

সন্তুষ্ট চিত্তে সুটকেসের ঢাকনি বন্ধ করল খাদিম সারওয়ার। আলেক তাকে বলল, 'নাদিয়ার ওপর একটু চোখ রাখুন।'

'ঠিক আছে।'

ঘুরে দাঁড়াল আলেক, কিন্তু সাথে সাথে ফিরল আবার। নাদিয়ার কোলে রেবেকা উপন্যাসটা রয়েছে, আগেই চোখে পড়েছে তার। হাত বাড়িয়ে বইটা ওর কোল থেকে তুলে নিল সে। তারপর পর্দা সরিয়ে বেডরুমে চলে গেল।

দ্রুত চিন্তা করছে নাদিয়া। খাদিম সারওয়ারকে কোডের কথা বলতে পারে সে। লোকটা তাহলে আলেকের কাছ থেকে কোডটা আদায় করে নেবে। পরে সুযোগ পেলে লোকটার কাছ থেকে সেটা কেড়ে নিতে পারবে রানা। কিন্তু তার কি অবস্থা হবে?

নাদিয়ার চেহারা দেখে কিছু একটা সন্দেহ করল পুলিস সুপার, জিজ্ঞেস করতে গেল, 'কি…?' কিন্তু আলেক ফিরে আসছে বুঝতে পেরে চুপ করে গেল সে।

লিভিংরূমে ঢুকে কাপড় পরতে শুরু করল আলেক। খাদিম সারওয়ার জানতে চাইল, 'আপনার কল সাইন নেই?'

'পিরামিড।'

'কোড?'

'নেই।'

'ওই বইটা তাহলে কি?' নাছোড়বান্দার মত জিজ্ঞেস করল পুলিস সুপার।

রাগে লাল হয়ে উঠল আলেকের চেহারা। 'ওটা একটা কোড, কিন্তু আপনাকে দিচ্ছি না। কোড ছাড়াও মেসেজ পাঠাতে পারবেন আপনি।'

'জানি,' বলল পুলিস সুপার। 'কিন্তু ওটা পেলে ভাল হত।'

'আমার জন্যে খারাপ হবে,' বলল আলেক। 'কাজেই ওটা পাবার কথা ভুলে যান।'

চুপ করে থাকল খাদিম সারওয়ার। মেজাজ সপ্তমে উঠে গেছে তার।

হঠাৎ করেই আলেকের হাতে বেরিয়ে এল চকচকে একটা ছুরি। 'কোন রকম চালাকি নয়, সুপার। জানি, আপনার কাছে রিভলভার আছে। কিন্তু গুলি করলেও আমি আপনাকে অন্তত আহত করতে পারব। জানাজানি হয়ে যাবে সব। আপনি বরং বিদায় হোন এবার।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে সিঁড়ির কাছে চলে গেল খাদিম সারওয়ার। এক সেকেন্ড থেমে ইতস্তত করল সে, তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। হ্যাচ গলে বেরিয়ে গেল সে।

ডেকে তার পায়ের আওয়াজ হলো, নিচ থেকে শুনতে পেল নাদিয়া। একটা পোর্টহোলের পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিল আলেক। পুলিস সুপারকে টোপাথ ধরে রাস্তার দিকে এগিয়ে যেতে দেখল সে।

পোর্টহোলের সামনে থেকে সরে এসে একমুহূর্ত কি যেন চিন্তা করল আলেক, তারপর কাবার্ড থেকে ছোট একটা সুটকেস বের করে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস ভরতে শুরু করল।

'কোথায় যাবেন?' জিজ্ঞেস করল নাদিয়া।

'দেখতেই পাবে। তুমিও আমার সাথে যাচ্ছ।'

ঘাবড়ে গেল নাদিয়া। তাকে কেন সাথে নিতে চাইছে? রানার হয়ে কাজ করছে বলে তাকে শাস্তি দেবে? কি শাস্তি? নির্জন কোথাও নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে?

অসহায় বোধ করল নাদিয়া, সেই সাথে রাগ হলো নিজের ওপর। যে কাজেই হাত দিয়েছে সে, একটাতেও সফল হতে পারেনি। এক সময় ভয় পেয়েছিল, তাকে হয়তো আলেকের সাথে বিছানায় উঠতে বাধ্য হতে হবে। সর্বনাশটা ঘটেনি, কারণ শেষ পর্যন্ত রোপাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল আলেককে। এর মধ্যে তার নিজের কোন কৃতিত্ব ছিল না। তারপর পালাবার চেষ্টা করল সে, পারল না। এখন আবার যদি পালাতে হয়···কিন্তু সাহস বা শক্তি কোনটাই নেই আর। জানে, চেষ্টা করলে আবার ব্যর্থ হবে সে।

কাউচের ওপর ব্রেসিয়ার, প্যান্টি আর মোজা পড়ে রয়েছে। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে আলেক বলল, 'ওগুলো পরে নাও।'

ওগুলো নিয়ে বেডরুমে চলে এল নাদিয়া। পরা শেষ হয়নি, সুটকেস হাতে ভেতরে ঢুকল আলেক। 'হলো?'

কাপড় পরা শেষ করে বিছানার দিকে তাকাল নাদিয়া। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আলেকও তাকাল রোপার দিকে। মুচকি একটু হাসি ফুটল তার ঠোঁটে, কিন্তু কথা বলল না। ইঙ্গিতে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল লিভিংরুমে।

সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় নাদিয়া ভাবল, এই রকম নির্দয় লোক দেখা যায় না, রোপাকে বিপদের কথা না বলেই পালিয়ে যাচ্ছে! নিজের কপালে কি আছে ভারতে গিয়ে শিউরে উঠল সে।

বোট থেকে নেমে এসে টোপাথ ধরে গাড়ির দিকে এগোল ওরা। আলেকের বাঁ হাতে সুটকেস, আরেক হাত দিয়ে নাদিয়ার কনুই চেপে ধরে আছে। দরজা খুলে গাড়ির সামনের সীটে নাদিয়াকে বসাল সে, নিজেও উঠল।

কোথায় তাকে নিয়ে যাচ্ছে আলেক জানে না নাদিয়া। ধারণা করল, যেখানেই যাক, সেখানে একটা রেডিও আছে, আছে রেবেকা আর কোডের কী। পারুক আর না পারুক, রেডিওটা নষ্ট করে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে তাকে। মেসেজটা পাঠানো বন্ধ করার ওপর নির্ভর করছে মিশরের নিরাপত্তা।

রানার কথা মনে পড়ল। রানা মুক্ত হলেও, আলেক হাউজবোটে না থাকায়, ওর আর কিছু করার থাকবে না। যা করার একাই করতে হবে তাকে।

চোখ বুজে মন থেকে ভয় তাড়াবার চেষ্টা করল নাদিয়া। যা আছে কপালে, দেশের স্বার্থে না হয় প্রাণই দেবে সে। তবু আলেককে মেসেজটা পাঠাতে দেবে না।

কতক্ষণ কেটে গেছে বলতে পারবে না নাদিয়া, গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল অনুভব করে চোখ মেলল সে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই আশপাশটা চেনা চেনা লাগল তার। 'কোথায় এলাম?' জানতে চাইল সে।

'কেন, চেনো না?' জানালা দিয়ে একটা বাড়ি দেখাল আলেক। 'ওই ফ্ল্যাট বাড়িতেই তো থাকে তোমার মেজর।'

'কিন্তু সে তো এখন নেই ওখানে!'

'জানি,' মুচকি হেসে বলল আলেক। 'কিন্তু ডন তো আছে!'

ছয়

রেডিও পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল ঈমান সাফারী। নেড়েচেড়ে দেখে বলল, 'এটা একটা হালিক্রাফটার/স্কাইচ্যালেঞ্জার, অ্যামেরিকান।' টেস্ট করার

জন্যে সেটটা চালু করা হলো। 'অত্যন্ত শক্তিশালী,' রায় দিল সে।

ফাইটার পাইলট হিসেবে রেডিও ব্যবহারের অভিজ্ঞতা আছে সাফারীর, সেটটা তার কাছেই থাকবে বলে স্থির হলো, সে-ই যোগাযোগ করবে ইসরায়েলের সাথে। খাদিম সারওয়ার তাকে জানাল, ওয়েভলেন্থ সেট করাই আছে, কলসাইন হলো পিরামিড। আলেক বোগান কোড দিতে রাজি হয়নি, কাজেই সরাসরি ভাষা ব্যবহার করতে হবে ওদেরকে। রেডিও নিয়ে কিচেনে চলে এল ওরা, লুকিয়ে রাখল আভনের ভেতর। ঠিক হলো, আজই মাঝরাতে ইসরায়েলের সাথে যোগাযোগ করবে সাফারী।

বিদায় নিয়ে জামালেকের দিকে ফিরছে পুলিস সুপার। ভাবছে, আজ রাতে তার যে ভূমিকা সেটা কিভাবে চাপা দেয়া যায়। সার্জেন্ট তাকে টেলিফোনে খবর দিয়েছিল, সেটা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। বলবে, সার্জেন্টকে আগে থেকেই নির্দেশ দেয়া ছিল, আলেক বোগানকে হাউজবোটে উঠতে দেখলে তাকে যেন খবর দেয়া হয়। সার্জেন্ট সেই নির্দেশই পালন করেছে। আলেকের পিছু পিছু একজন মোটরসাইকেল আরোহী এসেছে, এই খবরও সার্জেন্টের কাছ থেকে পায় সে। বর্ণনা শুনে তার ধারণা হয়, মোটরসাইকেল আরোহী মেজর রানা হতে পারে। মেজরের সাথে দেখা করবার জন্যে সে নিজেই চলে আসে, কিন্তু ঝোপের ভেতর ঢোকার সাথে সাথে একদল লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর, তার হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখে মাটিতে। তারপর নিজের চেষ্টায় বহুকষ্টে নিজেকে মুক্ত করে সে।

হ্যাঁ, কাজ হবে এতে।

রাস্তা আর নদী থেকে খানিকটা দূরে গাড়ি থামাল সে। সকাল হতে বেশি দেরি নেই, পুব আকাশ আলোকিত হয়ে উঠছে। ঝোপের ভেতর ঢুকে কয়েক গজ এগিয়ে থামল। মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি খেল বার কয়েক। শিশির ভেজা মাটি লেগে নোংরা হয়ে উঠল কাপড়চোপড়। উঠে বসে খানিকটা ভিজে মাটি নিয়ে ঘষল মুখে। হাতের কব্জি দুটো জোরে জোরে ঘষে লালচে করে তুলল, দেখে যেন বোঝা যায় রশি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল। উঠে দাঁড়াল সে। মেজর রানাকে এবার খুঁজে বের করা দরকার।

ঠিক যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই রানাকে দেখতে পেল সে। হাত-পায়ের বাঁধন খোলার চেষ্টা করেছে, একটু ঢিলও করতে পেরেছে, কিন্তু খোলা সম্ভব হয়নি। মুখের ভেতর গোল পাকানো মোজাটা আগের মতই রয়েছে। ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল খাদিম সারওয়ার। 'মাই গড! আপনাকেও ওরা বেঁধে রেখে গেছে!'

নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল রানা, চোখে কোন ভাষা নেই।

ব্যস্ত হাতে রানার মুখ থেকে মোজাটা বের করে নিল পুলিস সুপার। ওর বাঁধন খুলতে শুরু করে বলল, 'আপনাকে আর আলেক বোগানকে দেখে টেলিফোনে খবর দেয় সার্জেন্ট, সাথে সাথে চলে আসি আমি। ঝোপের ভেতর ঢুকেছি, অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একদল গুণ্ডা। পকেটে হাত ঢোকাবার সময়টুকুও পেলাম না। মারধর করে বেঁধে ফেলল আমাকে, ফেলে রেখে চলে গেল। জ্ঞান ফিরে পেয়েছি

এইমাত্র, নিজের চেষ্টায়…'

বক বক করে চলেছে পুলিস সুপার। একটা কথাও বলল না রানা।

নাইলনের কর্ডটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সুপার। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল রানা। মাথা ঘুরে পড়েই যাচ্ছিল, পুলিস সুপারকে ধরে ফেলে কোনরকমে সামলে নিল। কাঁধে হাত ঠেকতেই বৈদ্যুতিক ধাক্কা খেল ও, ব্যথায় নীল হয়ে উঠল চেহারা। খুলির ওপর যেখানে আঘাত পেয়েছে, এখনও দপ দপ করছে জায়গাটা, ফুলেও আছে গোল আলুর মত।

'কেমন লাগছে, মেজর?'

'ভাল,' ছোট্ট করে জবাব দিল রানা।

'আসুন, হাউজবোটে উঠি,' বলল সুপার। 'দেখি কাউকে পাওয়া যায় কিনা।' ঘুরে দাঁড়াল সে।

পুলিস সুপার ওর দিকে পিছন ফিরতেই ডান হাতের কিনারা দিয়ে ধাঁই করে তার ঘাড়ে একটা কোপ বসিয়ে দিল রানা। কোন আক্ষেপ বা প্রতিবাদ না করে মাটিতে পড়ে গেল সুপার। আরও জোরে মারতে পারত রানা, কিন্তু লোকটা তাহলে মারা যেত।

মুখে মোজা আর হাত-পা বাঁধা থাকলেও, রানার কানে কেউ তুলো গুঁজে দেয়নি। ঝোপের ভেতর থেকে টোপাথটা দেখতে পায়নি ও, কিন্তু জ্ঞান ফেরার পর খাদিম সারওয়ারের গলা পরিষ্কার শুনতে পেয়েছিল। প্রশ্নটা ছিল। 'কে আপনি?' উত্তরে পুলিস সুপার বলল, 'খাদিম সারওয়ার। আপনি নিশ্চয়ই আলেক বোগান?'

ঘাড় এবং কাঁধের একটা অংশ অসাড় হয়ে গেছে সুপারের। মানসিক আঘাতটা আরও গুরুতর। হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে সে। পা দিয়ে ঠেলে তাকে চিৎ করল রানা। সার্চ করে রিভলভারটা বের করে নিল পকেট থেকে। নাইলনের কর্ডটা খুঁজে নিল ও, সেটা দিয়েই সুপারের দুই কব্জি এক করে বাঁধল। ঠাণ্ডা সুরে নির্দেশ দিল, 'ওঠো!'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল খাদিম সারওয়ার। তারপর ধীরে ধীরে আতঙ্ক ফুটে উঠল চেহারায়। 'কি করছেন আপনি, মেজর?'

লোকটার পাঁজরে ঝেড়ে একটা লাথি কষাল রানা। 'লাথি মারছি,' বলল ও। 'ওঠো!'

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সুপার।

'ঘোরো!'

ঘুরল সুপার। এক হাতে তার শার্টের কলার ধরল রানা, আরেক হাতে থাকল রিভলভারটা। 'হাঁটো!'

ঝোপ থেকে বেরিয়ে রাস্তা পেরোল ওরা। ইতোমধ্যে পুব আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। টোপাথ হয়ে চলে এল গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কে, সেখান থেকে হাউজবোটের ডেকে।

'হ্যাচ খোলো!'

জুতোর ডগায় হ্যাচের হাতল বাধিয়ে ওপর দিকে তুলল সুপার।

'নামো!'

হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা, সিঁড়ি বেয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নামতে শুরু করল সুপার। উঁকি দিয়ে নিচেটা দেখে নিল রানা। কেউ নেই। সুপারের পিছু পিছু নামল ও। সুপারকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে পর্দা ফাঁক করল, দেখল, বিছানায় দিব্যি ঘুমাচ্ছে রোপা ইরিনা। 'ঢোকো!'

বেডরুমে ঢুকে বিছানার মাথার কাছে দাঁড়াল খাদিম সারওয়ার।

'ঘুম ভাঙাও!'

বিছানার ওপর পা তুলে, পায়ের আঙুল দিয়ে রোপাকে স্পর্শ করল সুপার। পাশ ফিরল রোপা, সরে গেল নাগালের বাইরে। চোখ দুটো খুলল না। তার গায়ে চাদর রয়েছে, কিন্তু পরনে কিছু আছে বলে মনে হলো না। সামনের দিকে ঝুঁকে তার নাকে টোকা দিল রানা।

চোখ মেলল রোপা। সুপার আর রানাকে দেখে ঘাবড়ে গেল। ঝট করে উঠে বসল সে। চাদরটা বুকের কাছে খামচে ধরল। রিভলভারের দিকে চোখ রেখে বলল, 'কি ব্যাপার!'

মুহূর্তের নিস্তব্ধতা, তারপর রানা আর রোপা একযোগে জানতে চাইল, 'আলেক কোথায়?'

রানার মনে হলো, রোপার এটা অভিনয় নয়। আলেককে সাবধান করে দিয়েছে খাদিম সারওয়ার, রোপাকে কিছু না জানিয়েই কেটে পড়েছে আলেক। সম্ভবত নাদিয়াকে সাথে করে নিয়ে গেছে সে।

'ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াও,' রোপাকে বলল রানা। 'কিছু জিজ্ঞেস না করলে মুখ খুলবে না।'

প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল রোপা, কিন্তু রানার চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেল সে। চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বিছানা থেকে নামল, রানার কথামত পুলিস সুপারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

ওদের দিকে রিভলভার তাক করে বলল রানা, 'বিশ্বাস করো, গুলি করার একটা ছুতো খুঁজছি। প্রশ্ন করব, যদি মনে হয় মিথ্যে কথা বলছ, হাঁটুর নিচে গুলি করব। পরিষ্কার?'

তাড়াতাড়ি একদিকে মাথা কাত করল দু'জনেই।

'মাঝরাতে আলেক মেসেজ পাঠিয়েছে?'

'না!' রোপার গলার রগগুলো ফুটে উঠল। 'পাঠায়নি! পাঠায়নি!'

'তুমি বোটে ফিরে আসার পর কি ঘটেছে বলো।'

'কিছু না, আমরা শুয়ে পড়ি।'

'শুয়ে পড়ি মানে?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'তোমরা তিনজন, অথচ বিছানা একটা…!'

'আমরা তিনজন একসাথে শুই…'

'একসাথে?'

'আমার কোন দোষ নেই,' তাড়াতাড়ি বলল রোপা। 'আলেকই ভুল বুঝিয়ে

নাদিয়াকে নিয়ে আসে এখানে। আমাদের দু'জনকে কাপড় খুলতে বাধ্য করে সে…'

কি ঘটেছে বুঝতে পেরে রানার সারা শরীর ঘৃণায় রী রী করে উঠল। অথচ রোপা ইরিনা বোটে ফিরে আসায় সে ভেবেছিল নাদিয়ার কোন অসুবিধে হবে না। নাদিয়ার পিছনে কেন লেগেছিল আলেক, পরিষ্কার হয়ে গেল এখন। ওদের বিকৃত রুচি চরিতার্থের জন্যে নাদিয়াকে দরকার ছিল। নিজের ওপর রাগ হলো রানার, সে-ই তো নাদিয়াকে এই জঘন্য পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে।

রোপার কথা কি বিশ্বাস করা যায়? সত্যিই কি কাল রাতে মেসেজ পাঠায়নি আলেক? সত্যি মিথ্যে যাচাই করার কোন উপায় দেখল না। 'কাপড় পরো!'

মেঝে থেকে কাপড় তুলে নিয়ে রানার দিকে পিছন ফিরল রোপা। কাপড় পরার সময় হাত দুটো কাঁপতে থাকল। ওদের দিকে চোখ রেখে বাথরুমটা পরীক্ষা করল রানা। রোপার কাপড় পরা শেষ হতে বলল, 'বাথরুমে ঢোকো, দু'জনেই।'

ছোট্ট বাথরুম, দু'জনে ঢুকলে কোনরকমে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা হয়েছে খাদিম সারওয়ারের, চোখে দিশেহারা ভাব। বাথরুমে ঢুকে তার পাশে মাথা নিচু করে দাঁড়াল রোপা। মাঝে মধ্যে নিচের ঠোঁট কামড়ে মাথাটাকে ঠাণ্ডা করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। হাউজবোট সার্চ করতে শুরু করল ও।

সবক'টা কাবার্ড আর দেরাজ খুলল রানা। ভেতরে যা দেখল সব টেনে মেঝেতে নামাল। কিচেন থেকে ধারাল একটা ছুরি নিয়ে এসে বিছানার গদি, বালিশ, সোফা, কাউচ সব এক এক করে কাটল। বড় একটা ছাইদানী পেল ও। ভেতরে পোড়া কাগজ। আইসবক্সটা খালি করল। খানিকটা বরফ আর শ্যাম্পেনের একটা বোতল ছাড়া কিছু নেই। ডেকে উঠে এসে প্রত্যেকটি লকার খুলে পরীক্ষা করল। খোলের বাইরের দিকও চেক করল, পানির ওপর জেগে থাকা প্রতিটি ইঞ্চি। দেখল, বোটের কিনারা থেকে একটা রশি নেমে গেছে পানিতে।

আধঘণ্টা পর বুঝল, হাউজবোটে রেডিও নেই। রেবেকা বা কোড কী-ও পাওয়া গেল না।

বাথরুম থেকে বের করল ওদের। লকার থেকে রশি নিয়ে এসেছে, সেটা দিয়ে প্রথমে রোপার কব্জি দুটো এক করে বাঁধল ও। তারপর দু'জনকে একসাথে জড়িয়ে বাঁধল। ওদের পিছনে থাকল ও, ছাগল খেদাবার ভঙ্গিতে বোট থেকে নামিয়ে নিয়ে এল।

টোপাথ থেকে রাস্তায় উঠে এল ওরা। চারদিকে দিনের আলো ফুটেছে, যদিও সূর্য ওঠেনি এখনও। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছে কেউ কেউ, রোপা আর খাদিম সারওয়ারকে দেখে থমকে দাঁড়াল তারা। কিন্তু রানার হাতে রিভলভার দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হন হন করে যে যার পথে হাঁটা ধরল, একটা টুঁ-শব্দও করল না কেউ। ব্রিজ পেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি পেল রানা। ড্রাইভার কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই তাকে বলল ও, 'এরা ইসরায়েলি গুপ্তচর, জেনারেল হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাচ্ছি!'

ব্যাপারটা বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল ড্রাইভার। ধীরে ধীরে ঘৃণা আর ক্ষোভ ফুটে উঠল তার চেহারায়। বন্দী আর বন্দিনীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে রানাকে বলল, 'এত ঝামেলা না করে, নদীর পাড়ে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মেরে ফেললেই তো পারেন! বড় সাহেবদের হাতে পড়লে ঘুষ খেয়ে ছেড়ে না দেয়!'

সরকারি অফিসারদের সম্পর্কে এই হলো সাধারণ লোকের ধারণা! ড্রাইভারের কথায় যে অভিযোগটা লুকিয়ে রয়েছে, রানা জানে, সেটা মিথ্যে অভিযোগ নয়। প্রায় সব অফিসারই ঘুষ খায়, গোপনে নেশা করে, একাধিক ইহুদি মেয়েকে রক্ষিতা হিসেবে রাখে, এদের ভেতর দেশপ্রেমের ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেশের জন্যে প্রাণ যদি কারও কাঁদে, তো এই খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষদের।

অভয় দিয়ে একটু হাসল রানা। বলল, 'এবার অন্তত সেটি হবে না। কিছু কিছু ঘুষখোর বড় সাহেবের লেজেও পা ফেলার ব্যবস্থা হচ্ছে।'

'খোদা আপনার মঙ্গল করুন!' দোয়া করল ড্রাইভার।

ওদেরকে পিছনের সীটে বসাল রানা। নিজে বসল ড্রাইভারের পাশে। কিন্তু পিছন দিকে চোখ রাখল একটা। জেনারেল হেডকোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে ওদেরকে ইন্টারোগেট করবে ও। যদিও মাত্র তিনটে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আছে।

আলেক কোথায়?

কাল সে মেসেজ পাঠিয়েছে?

নাদিয়া কোথায়?

ফ্ল্যাট বাড়ির পাকা উঠান পেরিয়ে এসে গাড়ি-বারান্দার শেষ প্রান্তে থামল কার। স্টার্ট বন্ধ করল আলেক। কিন্তু গাড়ি থেকে নামল না।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর নাদিয়া জিজ্ঞেস করল, 'এখানে বসে থাকার মানে কি?'

'দিনের আলো আরও একটু ফুটুক,' বলল আলেক। 'ছ'টায় ক্লাস, ডন স্কুলে যাবে সম্ভবত সাড়ে পাঁচটায়, তাই না?'

হাতঘড়ি দেখল নাদিয়া। পৌনে পাঁচটা।

পনেরো মিনিট পর হঠাৎ নাদিয়ার কব্জি চেপে ধরল আলেক। চমকে উঠে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল নাদিয়া, কিন্তু আলেকের সাথে জোরে পারল না। ছুরি বের করে তার হাতের উল্টোপিঠে হালকাভাবে একটা আঁচড় কাটল আলেক। ধারাল ফলা, একটু ছোঁয়াতেই কাজ হলো। চোখে আতঙ্ক নিয়ে হাতের দিকে তাকিয়ে থাকল নাদিয়া। প্রথমে পেন্সিল দিয়ে টানা সরু একটা রেখার মত দেখাল আঁচড়টাকে। ধীরে ধীরে লাল রক্তে ভরে উঠল রেখাটা। জ্বালা করতে লাগল।

'আমার একেবারে গা ঘেঁষে থাকবে তুমি, নাদিয়া। একটা কথাও বলবে না!'

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল নাদিয়া। বিড়বিড় করে বলল, 'ডনের কোন ক্ষতি হলে রানাকে আমি মুখ দেখাতে পারব না!'

কথাটা শুনতে পেয়ে নির্দয় হাসল আলেক। 'মুখ থাকলে তবে তো দেখানোর কথা!'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে ঝট করে শিরদাঁড়া খাড়া করল নাদিয়া। তার দু'চোখ ভরে আছে পানিতে। 'সেই ভাল!' বলল সে। 'আপনি আমাকে মেরে ফেলুন! দিন, ছুরিটা বসিয়ে দিন…'

'তোমাকে আগে নয়,' বলল আলেক, চোখ জোড়া ঢুলু ঢুলু করে হাসল একটু, 'আগে ডনকে। অবশ্য যদি আমার কথা না-শোনো তুমি। মনে থাকবে তো?'

দরজা খুলে গাড়ি থেকে নামল আলেক। নাদিয়া নড়ল না, নিঃশব্দে কাঁদছে। গাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে উল্টোদিকের দরজার সামনে থামল আলেক। দরজা খুলে নাদিয়ার কব্জি চেপে ধরে টান দিল। নেমে এল নাদিয়া। তারপর আলেকের নির্দেশে হ্যান্ডব্যাগ থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছল। সেই রুমালটা জড়িয়ে নিল রক্তাক্ত হাতে।

মাত্র ভোর হয়েছে, সিঁড়িতে কাউকে দেখা গেল না। নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেলের বোতামে আঙুলের চাপ দিল আলেক। মাত্র ক'দিন আগে এখানে দাঁড়িয়ে কলিংবেলের বোতামে চাপ দিয়েছে নাদিয়া, মনে হলো কত বছর আগের ঘটনা সেটা!

দরজা খুলে গেল। কুরবান আলিকে চিনতে পারল নাদিয়া। সে-ও চিনতে পারল নাদিয়াকে। বলল, 'গুড মর্নিং, ম্যাডাম।'

'ভাল আছ, কুরবান আলি?' জানতে চাইল নাদিয়া।

'এই যে কুরবান আলি,' তাড়াতাড়ি বলল আলেক। 'আমি ক্যাপ্টেন আলম। মেজর রানা আমাকে পাঠালেন। ভেতরে ঢুকে বসতে পারি তো?'

'অবশ্যই, স্যার,' বলে একপাশে সরে দাঁড়াল প্রৌঢ় কুরবান আলি। নাদিয়াকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল আলেক, এখনও নাদিয়ার কনুই ধরে আছে সে।

দরজা বন্ধ করে ওদের পিছন থেকে কুরবান আলি বলল, 'স্যারের খবর ভাল তো?'

'হ্যাঁ, ভাল,' বলল আলেক। 'হাতে জরুরী অনেক কাজ পড়েছে, তাই আসতে পারলেন না। খবরটা তোমাকে জানাবার জন্যে আর ডনকে স্কুলে পৌঁছে দেয়ার জন্যে পাঠালেন আমাকে।'

নাদিয়ার ইচ্ছে হলো, চিৎকার করে বাধা দেয়। ডনকে কিডন্যাপ করতে চাইছে আলেক। কনুইয়ের ওপর হাতটা খুব জোরে চাপ দিল, ভয় পেয়ে সাবধান হয়ে গেল নাদিয়া। কিন্তু বুঝল, এভাবে ভয় পেলে সর্বনাশ ঠেকানো যাবে না। ভাবল, কুরবান আলিকে গোপনে সাবধান করে দিতে পারলে সে হয়তো ডনকে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু পালাতে পারবে কি? লোকটার বয়স হয়েছে, নিরস্ত্র। আলেকের কাছে ছুরি আছে।

কুরবান আলির চেহারায় ইতস্তত একটু ভাব দেখা গেল।

'বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলে যে!' ধমক লাগাল আলেক। হাতঘড়ি দেখাল সে। 'ডনের স্কুলে যাবার সময় পেরিয়ে যাবে না? তাড়াতাড়ি করো!'

'জ্বী-স্যার,' ব্যস্ত হয়ে উঠে বলল কুরবান আলি। 'ছোট সাহেবকে ব্রেকফাস্ট দিয়ে এসেছি। আপনারা একটু বসুন।' বলে কোমর থেকে চাবির গোছা বের করে বৈঠকখানার দরজা খুলে দিল সে।

নাদিয়াকে নিয়ে ঘরে ঢুকল আলেক। পিছন ফিরে দরজার দিকে তাকাল, কুরবান আলি চলে গেছে দেখে নাদিয়ার কনুই ছেড়ে দিয়ে ধাক্কা দিল পিঠে। ছিটকে গিয়ে একটা সোফার ওপর পড়ল সে।

ডেস্কের সামনে বসল আলেক। দেরাজ খুলে রাইটিং প্যাড আর পেন্সিল বের করে লিখতে শুরু করল, কিন্তু একটা চোখ থাকল নাদিয়ার ওপর।

সোফায় বসে খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল নাদিয়া। কি করছে কুরবান আলি? আলেকের উপস্থিতি, আচরণ তার কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয়নি? জেনারেল হেডকোয়ার্টারে টেলিফোন করে সে কি ব্যাপারটা যাচাই করে নিচ্ছে? অত বুদ্ধি কি আছে তার? হঠাৎ ডেস্কের ওপর টেলিফোনটা দেখতে পেয়ে দমে গেল নাদিয়ার মন। কুরবান আলি এখান থেকে ফোন করার চেষ্টা করলে আলেক তাকে বাধা দেবে।

'ডন আপনার সাথে যাবে না!' হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠল নাদিয়া। 'আমিও আপনার সাথে যাব না। যা পারেন করুন আপনি!'

প্যাড থেকে মুখ তুলে নাদিয়ার দিকে তাকাল আলেক। 'মুখে বলছ বটে, কিন্তু ডনের বুকে ছুরি চালাতে দেখলে হাউমাউ করে কেঁদে উঠবে,' বলল সে। 'আমার কথা শুনলে তোমার বা ডনের কারও কোন ক্ষতি হবে না।'

'কিন্তু কেন! কেন আপনি আমাদের…'

'তোমাকে নিয়ে যাব, তুমি যাতে ডনকে শান্ত রাখতে পারো,' নরম সুরে বলল আলেক। 'অনেক দূর যেতে হবে কিনা।'

'ওকে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না। প্লীজ! ও একটা মাসুম বাচ্চা…'

'এত কেন দরদ, ও তো আর তোমার ছেলে নয়!'

'কিন্তু কেন…!'

'কোথায় যেতে পারি আমি, রানা ঠিক সেটা আন্দাজ করে নেবে। আমি চাই সে যেন আমাকে ধাওয়া না করে। আমার সাথে ডন থাকলে, তার সাহস হবে না।'

'আপনি তাকে চেনেন না। ডনের নিরাপত্তার কথা ভেবেই আপনার পিছু নেবে সে।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল আলেক। 'হয়তো তাই,' বলল সে। 'তবু ডনকে সাথে নিলে আমার কোন ক্ষতি নেই। ওকে সাথে না নিলেও আমাকে ফলো করবে সে।'

অনেক কষ্টে চোখের পানি আটকাল নাদিয়া। 'আপনার মনে কি দয়া রহম বলে কিছুই নেই?'

'চোপ!' চোখ রাঙাল আলেক। 'আর একটা কথাও নয়।' আবার চিঠি লেখায় মন দিল সে।

উত্তেজিত হয়ে কোন লাভ নেই, বুঝল নাদিয়া। বোকার মত কিছু একটা করে বসলে আরও বিপদ ডেকে নিয়ে আসা হবে। এখন থেকে শুধু নিজের কথা ভাবলে চলবে না, এর মধ্যে ডনও জড়িয়ে পড়েছে। মাথা ঠাণ্ডা করে সব কথা মনে করার চেষ্টা করল সে।

অনেক দূরে যেতে হবে ওদেরকে। আলেকের ভয়, রানা ওদেরকে ফলো করবে। খাদিম সারওয়ারকে সে বলেছে, আরও একটা রেডিও আছে তার। কোথায় যাবে সে, রানা সেটা আন্দাজ করতে পারবে। গন্তব্য যেখানেই হোক, সেখানে একটা রেডিও আছে, এক কপি রেবেকা আছে, আছে কোড কী।

সিদ্ধান্ত হলো, যেভাবেই হোক রানা যাতে ওদেরকে ফলো করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। ওকে সাহায্য করতে পারে নাদিয়া। কিভাবে··· কিভাবে! আলেকের গন্তব্য রানা যদি আন্দাজ করতে পারে, সে কেন পারবে না? অতিরিক্ত রেডিওটা কোথায় রাখতে পারে আলেক? বলল, অনেক দূরে যেতে হবে। অনেক দূর মানে কত দূরে? কায়রোর বাইরে কোথাও? হয়তো কায়রোয় ঢোকার আগে কোন এক জায়গায় রেডিওটা রেখে এসেছে আলেক। সম্ভবত মরুভূমির কোথাও হবে, কিংবা কায়রো আর আসিউতের মাঝখানে কোথাও···।

ঘরে ঢুকল ডন। 'হ্যালো,' নাদিয়াকে বলল সে, 'আন্টি! নিশ্চয়ই সেই বইটা নিয়ে এসেছেন?'

ডনের কথা বুঝতেই পারল না নাদিয়া। 'বই?' অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল সে। ভাবল, নিজেকে বড় বলে মনে করতে শুরু করলেও আসলে একেবারে বাচ্চা ছেলে। ধূসর রঙের ফ্ল্যানেলের শর্টস, আর হাতকাটা সাদা শার্ট পরে আছে। কাঁধের সাথে ঝুলছে ব্যাগ, বুকের মাঝখানে স্কুল টাই।

'আপনি একটা কি!' কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করল ডন। 'এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন! মনে নেই, আমার কাছ থেকে বই নেবেন, বদলে আপনি আমাকে···'

'ও, হ্যাঁ,' বলল নাদিয়া। 'মনে পড়েছে। দুঃখিত, ডন।'

'কবে পাব তারিখ দিন তাহলে।'

'আবার যেদিন আসব।'

ডন ঘরে ঢোকার পর থেকে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আলেক, ঠিক যেভাবে গুপ্তধনের দিকে তাকিয়ে থাকে হাড়কিপটে। নাদিয়ার কথা শেষ হতেই উঠে দাঁড়াল সে। 'হ্যালো,' নরম হেসে বলল, 'ডন। আমি ক্যাপ্টেন আলম।' হাতটা লম্বা করে দিল ডনের দিকে।

হ্যান্ডশেক করল ডন। 'হাউ ডু ইউ ডু, স্যার।'

'মেজর রানা পাঠালেন আমাকে,' বলল আলেক। 'তিনি খুব ব্যস্ত কিনা, তাই···'

বাধা দিয়ে ডন বলল, 'কিন্তু এমন তো কখনও হয় না। যত কাজই থাকুক, ব্রেকফাস্ট খাবার জন্যে বাড়িতে একবার ফেরেনই!'

হাসল আলেক। 'মেজরও কথাটা বলেছেন আমাকে। বলেছেন, তুমি খুব অসন্তুষ্ট হবে। কিন্তু কাজগুলো এত জরুরী···'

'না না,' তাড়াতাড়ি বলল ডন, 'অসন্তুষ্ট হব কেন! ক্যাপ্টেন, দেখা হলে ফ্রেন্ডকে বলে দেবেন, আমি তার ওপর অসন্তুষ্ট হইনি!'

'ফ্রেন্ড?' নাদিয়ার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল আলেক।

'আপনি জানেন না?' সগর্বে বলল ডন। 'মেজর রানা তো আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু!'

'ও, তাই? তা বেশ, বেশ! ঠিক আছে, দেখা হলে অবশ্যই বলে দেব!'

ঘরে ঢুকল কুরবান আলি, জিজ্ঞেস করল, 'আপনি বলছেন, স্যার, ডনকে স্কুলে নিয়ে যাবার জন্যে আপনাকে পাঠিয়েছেন মেজর সাহেব?'

নাদিয়া বুঝল কুরবান আলির সন্দেহ হয়েছে।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' বলল আলেক। 'কেন, হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

'না, মানে, মেজর যখন বাড়িতে থাকেন না, ডনের ভাল-মন্দের দায়িত্ব তো আমারই, তাই জিজ্ঞেস করছি। আপনাকে আমি চিনিও না...'

'কিন্তু ম্যাডাম তো চেনে,' বলল আলেক। হাসি হাসি মুখ। 'মেজর যখন আমাকে ডেকে এখানে আসতে বললেন, উনি ছিলেন সেখানে। তাই না, নাদিয়া?' কুরবান আলির দিকে ফিরল আবার। 'ডনকে তুমি আমার সাথে না-ও পাঠাতে চাইতে পারো, সেজন্যেই তো আমার সাথে পাঠালেন...'

কথা শেষ না করে নাদিয়ার দিকে তাকাল আলেক।

'হ্যাঁ,' সায় দিয়ে বলল নাদিয়া। ঠিক করেছে, এখনই কোন ঝুঁকি নেবে না সে। আগে ডনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার।

কুরবান আলির দিকে ফিরে প্রশংসার হাসি হাসল আলেক। 'তোমার এই সাবধানতা, এর দরকার আছে। দিন কাল যা পড়েছে, কিছুই বলা যায় না। দিনে দুপুরে ছিনতাই, কিডন্যাপিং রোজকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমার সন্দেহ এখনও যদি দূর না হয়ে থাকে, জেনারেল হেডকোয়ার্টারে ফোন করো। সরাসরি মেজর রানার সাথে কথা বলে নিশ্চিত হয়ে নাও।'

মনে মনে নাদিয়া বলল, না! খবরদার! ওর কথায় ভুল কোরো না, কুরবান আলি! তুমি ডায়াল শেষ করার আগেই তোমাকে খুন করবে ও!

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে কুরবান আলি বলল, 'তার কোন দরকার নেই, স্যার। আপনার সাথে ম্যাডাম যখন রয়েছেন, ডনকে পাঠাতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

নাদিয়া ভাবল, সব আমার দোষ!

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল কুরবান আলি। নাদিয়াকে আলেক বলল, 'ডনের সাথে এক মিনিট গল্প করো তুমি। হাতের কাজটা শেষ করে নিই।' আবার লিখতে শুরু করল সে।

ডনের দিকে, তারপর তার কাঁধ থেকে ঝুলতে থাকা ব্যাগের দিকে তাকাল নাদিয়া। মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যেতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারা। 'আমাকে তোমার বইগুলো দেখাও তো, আজ কি কি পড়ানো হবে স্কুলে?'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ডন।

'কি হলো, ডন?' নাদিয়া দেখল, খোলা ব্যাগ থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা অ্যাটলাস। সেদিকে হাত বাড়াল সে। 'ভূগোলে কত নম্বর পেয়ে পাস করেছ?'

'বাষট্টি।'

'আজ কি পড়ানো হবে?' জানতে চাইল নাদিয়া।

'নরওয়ের জলাশয়।'

চিঠি লেখা শেষ করে কাগজটা সাদা এনভেলাপে ভরছে আলেক।

'এসো তাহলে নরওয়ের ম্যাপটা বের করি,' আলেকের দিকে একটা চোখ রেখে বলল নাদিয়া।

ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করতে শুরু করল আলেক। নাদিয়ার দিকে ফিরল সে, তারপর জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।

পাতা ওল্টাতে শুরু করে মিশরের ম্যাপ বের করল নাদিয়া।

'কিন্তু ওটা তো...' শুরু করল ডন।

তাড়াতাড়ি ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে কথা বলতে নিষেধ করল নাদিয়া। চুপ করে গেল ডন, কিন্তু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল নাদিয়ার মুখের দিকে।

'হ্যাঁ, এটা স্ক্যান্ডিনেভিয়া, কিন্তু নরওয়ে স্ক্যান্ডিনেভিয়াতেই,' বলল নাদিয়া। 'এই দেখো।' হাতে জড়ানো রুমালটা খুলে ফেলল। রক্তাক্ত আঁচড়টার দিকে চোখ পড়তে ভুরু কুঁচকে উঠল ডনের। অপর হাতের আঙুল দিয়ে লম্বা ক্ষতটা ফাঁক করল নাদিয়া, আবার বেরোতে শুরু করল রক্ত।

সাদা হয়ে গেল ডনের চেহারা। কথা বলতে যাবে, আবার ঠোঁটে আঙুল রাখল নাদিয়া। চোখে ফুটে উঠল আবেদন ভরা দৃষ্টি।

আলেক যে আসিউতে যাবে, সে-ব্যাপারে নাদিয়ার মনে কোন সন্দেহ নেই। আন্দাজ করতে গেলে প্রথমেই আসিউতের কথা মনে আসে, এবং আলেক বলেছেও তার গন্তব্য নির্ভুল ভাবে আন্দাজ করতে পারবে রানা। এই সব ভাবছে নাদিয়া, এই সময় আলেককে বলতে শুনল, 'হ্যালো? আসিউতের ট্রেন কখন ছাড়বে জানতে চাই আমি।'

তাজা রক্তে আঙুল ছোঁয়াল নাদিয়া। তিনটে লাল আঁচড় টেনে মিশরের ম্যাপে একটা তীর চিহ্ন আঁকল সে। তীর চিহ্নটা আসিউতকে নির্দেশ করছে, কায়রো থেকে তিনশো মাইল দূরে।

অ্যাটলাস বন্ধ করল নাদিয়া। বইটার কাভারে রক্ত মাখানো দরকার, তা না হলে রানার দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে না। রুমালের খানিকটা ভিজে আছে রক্তে, কাভারের ওপর সেটা বার কয়েক ঘষল সে। তারপর পিঠের কাছে লুকিয়ে ফেলল বইটা।

'হ্যাঁ,' টেলিফোনে বলল আলেক। 'পৌঁছুবে কখন?'

'কিন্তু,' নাদিয়া জানতে চাইল, 'নরওয়ের জলাশয় পড়ানোর আগে মিশরের জলাশয় পড়ানো হয়নি কেন?'

হতভম্ব দেখাল ডনকে। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে নাদিয়ার হাতের দিকে। মনে মনে প্রমাদ গুণল নাদিয়া, বেফাঁস কিছু বলে ফেলে ফাঁসিয়ে না দেয়! 'আচ্ছা, তুমি কি আগাথা ক্রিস্টির সেই বইটা পড়েছ, দ্য ক্লু অভ ব্লাডস্টেইনড

অ্যাটলাস?'

'ওই নামের কোন বই…'

'পড়োনি! সাংঘাতিক বই, বুঝলে! মাত্র একটা সূত্র ছিল গোয়েন্দার হাতে, তাতেই এমন ভাবে মাত করে দিল না!'

নাদিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল ডন। চেহারায় হতভম্ব ভাবটা নেই এখন। কি যেন বোঝার চেষ্টা করছে সে।

ক্রাডলে রিসিভার রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল আলেক। 'চলো।' দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'কই, এসো। স্কুলে পৌছুতে দেরি হয়ে যাবে যে, ডন!'

ব্যাগ তুলে নিয়ে কাঁধে ঝোলাল ডন। ধীর পায়ে এগোল দরজার দিকে। কিন্তু নাদিয়া সোফা ছেড়ে উঠতে পারছে না। তার ভয়, সে উঠলেই অ্যাটলাসটা দেখে ফেলবে আলেক।

'কি হলো!' তাড়া লাগাল আলেক।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল নাদিয়া। এমনভাবে এগোল, যাতে বই আর আলেকের মাঝখানে একটা আড়াল হয়ে থাকে সে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় আড়চোখে তাকাল আলেকের দিকে। স্বস্তির সাথে লক্ষ করল, সোফার দিকে নজর নেই আলেকের।

নিচের হলঘরে নেমে এল ওরা। একটা টেবিলের ওপর অনেক চিঠি পড়ে রয়েছে, এনভেলাপটা সেগুলোর ওপর রাখল আলেক। ডনের হাত ধরে বেরিয়ে এল গাড়ি-বারান্দায়। 'ড্রাইভ করতে জানো?' নাদিয়াকে জিজ্ঞেস করল সে।

কিছু চিন্তা না করেই জবাব দিল নাদিয়া, 'একটা ড্রাইভিং স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম, এক-আধটু চালাতে পারি।' বলেই বুঝল, ভুল করে ফেলেছে। অস্বীকার করা উচিত ছিল।

'তোমরা দু'জন সামনে বসো,' নির্দেশ দিল আলেক। ওদেরকে উঠিয়ে দিয়ে পিছনের সীটে বসল সে।

গাড়ি নিয়ে রাস্তায় উঠে এল নাদিয়া। লক্ষ করল, পিছন থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে আলেক।

'এটা দেখছ?'

পাশে তাকাল নাদিয়া। ডনকে হাতের ছুরিটা দেখাচ্ছে আলেক।

'হ্যাঁ,' ডনের গলা কেঁপে গেল।

'যদি কোন গোলমাল বা চেঁচামেচি করো,' বলল আলেক, 'এই ছুরি দিয়ে তোমার গলা ফাঁক করে দেব আমি।'

দুই চোখ বিস্ফারিত, বোবা হয়ে গেল ডন।

সাত

'অ্যাটেনশন!' বিস্ফোরণের মত আওয়াজ বেরিয়ে এল ফরহাদের গলা থেকে।

সিধে হয়ে দাঁড়াল খাদিম সারওয়ার।

একটা টেবিল ছাড়া ইন্টারোগেশন রুমে আর কোন আসবাব নেই। ফরহাদের পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল রানা। ওর এক হাতে একটা চেয়ার, অপর হাতে কাপ পিরিচ। টেবিলের সামনে চেয়ারটা ফেলে ধীরে সুস্থে তাতে বসল ও।

প্রশ্ন করল, 'আলেক কোথায়?'

'আমি জানি না,' বলল খাদিম সারওয়ার। তার দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যে একটু ঢিল পড়ল।

'অ্যাটেনশন!' আবার হুঙ্কার ছাড়ল ফরহাদ। 'বুক উঁচু, পিঠ সোজা!'

আবার টান টান হলো খাদিম সারওয়ার।

আয়েশ করে চায়ের কাপে চুমুক দিল রানা। নিয়মেরই অংশ এটা, বন্দীকে বুঝতে দেয়া যে কোন ব্যাপারেই ওর কোন তাড়া বা উদ্বেগ নেই, বিপদ যদি কারও হয়ে থাকে তো সেটা বন্দীরই।

যদিও, আসলে ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো।

'হাউজবোট জাইদানে নজর রাখা হচ্ছিল,' বলল রানা, 'কাল রাতে ওয়াচারের কাছ থেকে তুমি একটা রিপোর্ট পাও।'

হাঁক ছাড়ল ফরহাদ, 'জবাব! মেজরের প্রশ্নের জবাব! জলদি!'

'হ্যাঁ,' বলল খাদিম সারওয়ার।

'ওয়াচার কি বলল তোমাকে?'

'বলল, আলেক বোগান একটা মেয়েকে নিয়ে জাইদানে উঠেছে, ওদেরকে ফলো করে এসে ঝোপের ভেতর লুকিয়ে আছে একজন লোক। লোকটার চেহারার যা বর্ণনা দিল...'

'স্যার কোথায়?' চিৎকার করে জানতে চাইল ফরহাদ। 'স্যার শব্দটা কোথায়? প্রত্যেক কথার শেষে স্যার বলতে হবে!'

'স্যার, চেহারার যে বর্ণনা দিল...'

'কি করলে তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ব্যক্তিগতভাবে ব্যাপারটা কি জানার জন্যে টোপাথে যাই আমি, স্যার।'

'তারপর?'

'ঝোপের ভেতর ঢুকতেই কয়েকজন লোক আমাকে ঘিরে ধরে। তারা আমাকে মারধর করল। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। জ্ঞান ফেরার পর দেখি, ওরা আমাকে বেঁধে রেখে গেছে। আমি নিজের চেষ্টায় বাঁধন খুলি...'

'স্যার!' বজ্রকণ্ঠে বলল ফরহাদ।

'তারপর, স্যার, মেজর রানাকে, মানে স্যার আপনাকে খুঁজে পাই। কিন্তু আপনি, স্যার, আমাকে আঘাত করেন।'

খাদিম সারওয়ারের মুখের কাছে মুখ সরিয়ে নিয়ে এসে ফরহাদ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তুমি একটা মিথ্যেবাদী! জঘন্য মিথ্যেবাদী! তুমি কি?'

এক পা পিছিয়ে গেল খাদিম সারওয়ার। কথা বলল না।

'এগোও!' গর্জে উঠল ফরহাদ। 'যতটুকু পিছিয়েছ ততটুকু এগোও! কুইক!'

এক পা এগোল খাদিম সারওয়ার।

শান্ত সুরে বলল রানা, 'শোনো, খাদিম। তোমার কীর্তিকলাপ যতটুকু জানা গেছে, তাই যথেষ্ট, এতেই তোমাকে স্পাই হিসেবে গুলি করে মেরে ফেলা হবে। কিন্তু,' বলে একটু বিরতি নিল রানা।

সুযোগটা কাজে লাগাল ফরহাদ। 'অ্যাটেনশন! মেজরের কথা মন দিয়ে শোনো!'

'কিন্তু,' আবার শুরু করল রানা, 'যা যা জানো সব যদি বলো আমাদের, গুলি করার বদলে তোমাকে হয়তো যাবজ্জীবন দেয়া হবে। একেবারে মরে যাওয়ার চেয়ে সারাজীবন জেল খাটা—মন্দের ভাল না? তাই বলছি, আর বোকামি কোরো না। ওয়াচারের কাছ থেকে খবর পেয়ে তুমি একদল লোককে পাঠাও, তাই না? তারাই আমার ওপর হামলা করে। কাছাকাছি তুমিও ছিলে। ওরা পেরে উঠছে না দেখে আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে গুলি করো তুমি, ঠিক?'

'না,' বলল খাদিম সারওয়ার, 'স্যার।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। বুঝল, নিজের তৈরি ব্যাখ্যা যতক্ষণ সম্ভব আঁকড়ে ধরে থাকবে এই লোক। আলেক কোথায় গেছে তা যদি জানেও বা আন্দাজ করতে পারে, ওকে বলবে না। রানা জানতে চাইল, 'এসবের সাথে তোমার স্ত্রী কতটুকু জড়িত?'

লোকটা কথা বলল না, কিন্তু চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠল।

'প্রশ্নের উত্তর না পেলে, তোমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে হবে,' বলল রানা।

ভয় পেলেও, গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাকল খাদিম সারওয়ার।

উঠে দাঁড়াল রানা। 'ঠিক আছে, ফরহাদ,' বলল ও। 'ওর স্ত্রীকেও গ্রেফতার করে নিয়ে এসো। ওই একই অভিযোগে—গুপ্তচরবৃত্তি।'

'এটা অবিচার!' শরীরের পাশে ঝুলে থাকা হাতদুটো মুঠো পাকিয়ে বলল খাদিম সারওয়ার।

তার দিকে তাকাল রানা। 'আলেক কোথায়?'

'জানি না।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এল রানা। দরজার পাশে ফরহাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল ও। ক্যাপ্টেন বেরিয়ে আসতে তাকে বলল, 'পুলিস তো, এসব টেকনিক জানা আছে। মচকাবে, কিন্তু আজ নয়।' অথচ আলেক বোগানকে আজই খুঁজে পেতে হবে ওর।

'ওর বউকে গ্রেফতার করে আনব, স্যার?' জানতে চাইল ফরহাদ।

'এখনই নয়। পরে দেখা যাবে।' রানা ভাবল, নাদিয়াই বা কোথায়?

কয়েক পা হেঁটে আরেকটা সেলের দরজায় এসে দাঁড়াল ওরা। রানা জানতে চাইল, 'এখানে সব রেডি আছে তো?'

'ইয়েস, স্যার।'

দরজা খুলে সেলের ভেতর ঢুকল রানা। এটা প্রথমটার মত অত খালি নয়। হাতলহীন শক্ত কাঠের চেয়ারে বসে আছে রোপা, পরনে ধূসর রঙের কয়েদীর

পোশাক। তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন মহিলা আর্মি অফিসার। কখনও যদি এই মহিলা অফিসারের বন্দী হতে হয় রানাকে, আতঙ্কেই আধমরা হয়ে যাবে ও। একটু বেঁটে, তার ওপর চওড়ায় বেশি, ফলে গড়নটা প্রায় চৌকো আকৃতি পেয়েছে। ছোট করে কাটা চুল, পুরুষালি চেহারা। হাতদুটো লম্বা লম্বা কালো রোমে ঢাকা, নিচে শক্ত পেশির অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। অফিসারের কপালে আঙুর আকৃতির লাল জরুল আছে, ওটাকে নিয়ে লালচে চোখ জোড়া প্রায় নিখুঁত একটা ত্রিভুজ তৈরি করেছে।

সেলের এক কোণে একটা কট, আরেক কোণে ড্রেন আর পানির কল।

রানাকে ঢুকতে দেখে মহিলা অফিসার বলল, 'স্ট্যান্ড আপ!'

রানা আর ফরহাদ পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসল। রানা বলল, 'বসো, রোপা।'

রোপা বসছে না দেখে মহিলা অফিসার তাকে ধরে নিচের দিকে টেনে বসিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ কোন কথা না বলে রোপার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। এর আগে পুলিস হেডকোয়ার্টারে মুখোমুখি হয়েছিল ওরা, কিন্তু সেবার রানা তেমন সুবিধে করতে পারেনি। এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আলেক মিশর ছেড়ে পালিয়ে যাবার আগেই তাকে ধরতে চায় রানা। নাদিয়াকে অক্ষত, সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে চায়। কেউ ওর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালে তার কপালে খারাবি আছে।

জানতে চাইল, 'আলেক কোথায়?'

'আমি কি জানি!'

'নাদিয়া?'

'কি করে বলব!'

'আলেক ইসরায়েলি স্পাই, তুমি তাকে সাহায্য করছিলে।'

'উদ্ভট!'

'ফেঁসে গেছ, এখন আর ভান করে লাভ নেই,' বলল রানা।

চুপ করে থাকল রোপা। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা। চেহারায় গর্ব, আত্মবিশ্বাস আর অহমিকার কোন অভাব নেই। শেষ রাতের দিকে হাউজবোটে ঠিক কি ঘটেছে কল্পনা করার চেষ্টা করল রানা। বোঝাই যায়, রোপাকে কিছু না জানিয়ে কেটে পড়েছে আলেক। তার সাথে যে বেঈমানী করা হয়েছে, বুঝতে পারছে না?

'আলেক ইচ্ছে করেই তোমাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে গেছে,' বলল রানা। 'পুলিস সুপার খাদিম সারওয়ার বিপদের কথা জানায় তাকে, আরেকটা মেয়েকে নিয়ে কেটে পড়ে সে। তোমাকে সাথে নিতে চায়নি বলেই তোমার ঘুম ভাঙায়নি। এর পরও কি তুমি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে?'

রোপা চুপ।

'তোমার বোটেই রেডিওটা রেখেছিল আলেক। মাঝরাতে ইসরায়েলে

মেসেজ পাঠায় সে। তুমি সেটা জানো, কাজেই স্পাই হিসেবে তোমারও বিচার করা হবে। অভিযোগ প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট এভিডেন্সও পাওয়া যাবে। ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে গুলি খেয়ে মরবে তুমি।'

'আপনি বোকার স্বর্গে বাস করছেন, মেজর রানা!' ব্যঙ্গের সুরে বলল রোপা। 'আমাকে ছুঁতেই পারবে না কেউ, বলে কিনা গুলি করবে! সারাদেশে দাঙ্গা বেধে যাবে না!'

'তোমার বুঝি তাই ধারণা?' মুচকি একটু হাসল রানা। 'দাঙ্গা অবশ্য বাধবে, সত্যি, সবাই যখন জানবে যে তুমি ইসরায়েলের একজন স্পাই—কিন্তু সে দাঙ্গা আর তোমার কল্পনার দাঙ্গা এক জিনিস হবে না। সবাই তোমাকে খুন করার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠবে, আর তাতেই বেধে যাবে দাঙ্গা।'

'আমাকে ভয় দেখিয়ে…'

'আলেক কোথায়?'

'আমি জানি না।'

'কোথায় গেছে, ধারণা করতে পারো?'

'না।'

'তুমি সহযোগিতা করছ না। এর পরিণতি তোমার জন্যে খারাপ হবে।'

'আপনার দৌড় জানা আছে আমার!' ঝাঁঝের সাথে বলল রোপা। 'আমার গায়ে হাত দেয়ার সাহস আপনার কখনোই হবে না! আপনি বহিরাগত, আর আমি জন্মসূত্রে এদেশের মেয়ে—কথাটা ভুলে যাবেন না!'

'তুমি পুরুষ নও,' বলল রানা, 'সেজন্যেই এতটা সময় নষ্ট করলাম। এবার প্রমাণ হয়ে যাক, তোমার গায়ে হাত দিতে পারি কিনা।' মহিলা অফিসারের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল ও।

রোপার চেয়ারের পিছনে চলে গেল অফিসার। শক্ত করে ধরে রাখল সে, চেয়ারের সাথে নাইলনের কর্ড দিয়ে তাকে বাঁধল ফরহাদ। হাত-পা ছুঁড়ে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল রোপা, কিন্তু ওদের দু'জনের সাথে পারবে কেন। রানার দিকে তাকাল সে, এই প্রথম তার চোখে ভয়ের ছায়া দেখতে পেল রানা।

'ইউ বাস্টার্ড! কি পেয়েছ আমাকে তুমি!'

'সস্তা।'

মহিলা অফিসার তার ব্যাগ থেকে একখানা কাঁচি বের করল। রোপার ঘন কালো সুন্দর চুলের একটা গোছা এক হাতে ধরে অপর হাতে কাঁচি চালাল। কাটা চুলগুলো রোপার কোলের ওপর ফেলল সে।

'চোখ কানা হয়ে যাবে, ওই হাতে কুষ্ঠ ফুটবে…' অভিশাপ দিতে শুরু করল রোপা।

নির্বিকার চেহারা অফিসারের, দ্রুত হাতে চুল কেটে চলেছে। বাধা দেয়ার ব্যর্থ প্রয়াসে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে রোপা, তবু বিরক্ত হলো না। এক গোছা করে চুল কাটে, গোছাটা রোপার কোলের ওপর ফেলে। চিৎকার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল রোপা। এরপর শুরু করল খিস্তি। এমন নোংরা শব্দ জীবনে কখনও

শুনবে বলে আশা করেনি রানা।

চুল কাটার প্রথম পর্ব শেষ করল অফিসার। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছোট একটা কাঁচি ব্যবহার করল সে, ছোট হতে হতে চুলগুলো এবার খুলির কাছাকাছি নেমে এল।

চিৎকার আর খিস্তি থামিয়ে এবার কান্না শুরু করল রোপা। তার বিলাপ যতবার থামল, ততবার কথা বলার সুযোগ নিল রানা। 'বুঝতেই পারছ, বিচার, ভদ্রতা, নিয়ম এসবের আর ধার ধারছি না আমরা। তোমার যারা ভক্ত, জানি তাদের মধ্যে হোমরা-চোমরা অনেকেই আছেন, তাদেরকেও আমরা পরোয়া করছি না। আলেক বোগানকে না পাওয়া পর্যন্ত তোমার ওপর টরচার হতে থাকবে।'

শেভিং ব্রাশের সাহায্যে রোপার মাথায় সাবানের ফেনা তৈরি করল মহিলা অফিসার, তারপর মাথাটা কামাতে শুরু করল সে।

'জেনারেল হেডকোয়ার্টারের কারও কাছ থেকে টপ সিক্রেট ইনফরমেশন পাচ্ছিল আলেক,' জানতে চাইল রানা, 'কার কাছ থেকে?'

'একটা অসহায় মেয়ের ওপর এই অত্যাচার খোদা সহ্য করবে না!' ফুঁপিয়ে উঠল রোপা।

'তুমি অসহায়? হাসালে দেখছি!'

সবশেষে ব্যাগ থেকে ছোট একটা আয়না বের করল মহিলা অফিসার, বাড়িয়ে দিল রোপার দিকে। কিন্তু রোপা সেটা নিল না। অগত্যা রোপার মুখের সামনে আয়নাটা ধরল সে। রোপা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। তবে কয়েক সেকেন্ড পর নিজে থেকেই আয়নায় তাকাল সে। প্রথমে নিজেকে চিনতেই পারল না। তারপর আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ জোড়া। নিখুঁত ভাবে কামানো ন্যাড়া মাথার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল সে। তার চেহারায় ঘৃণার ভাবটুকু নিঃশেষে মুছে গেল। সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল সে।

নরম সুরে জানতে চাইল রানা, 'তথ্যগুলো কোত্থেকে, কার কাছ থেকে পাচ্ছিল আলেক?'

'মেজর তারেকের কাছ থেকে।'

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল রানা। ফরহাদের দিকে তাকাল ও। এই মেজর তারেকই নিখোঁজ হয়েছে। নিখোঁজ সংবাদ পাবার পর ওরা ধারণা করেছিল, আলেক সম্ভবত এই মেজরের কাছ থেকেই তথ্য পেয়ে আসছে।

'কিভাবে পেত?'

'লাঞ্চের সময় আমার কাছে হাউজবোটে আসত তারেক। আমরা বিছানায় ওঠার পর আলেক তার ব্রীফকেস খুলত।'

মাই গড, ভাবল রানা, এত সহজে!

ইন্টেলিজেন্স আর প্রেসিডেন্ট হাউসের মাঝখানে লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে কাজ করত মেজর তারেক। প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে কোন সামরিক তথ্য চাওয়া হলে, সেটা বয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব ছিল তার ওপর। এই সূত্রে অনেক টপ সিক্রেট ইনফরমেশন ব্রীফকেসে নিয়ে জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে বেরোতে পারত সে। লোকটা নিখোঁজ হবার পর তদন্ত চালাতে গিয়ে এরই মধ্যে জেনেছে রানা,

তারেক জেনারেল হেডকোয়ার্টারে বলে যেত অফিসে লাঞ্চ খাবে, আর নিজের অফিসে বলত জেনারেল হেডকোয়ার্টারে খাবে, কেউ যাতে টের না পায় একজন বেলি ড্যান্সারের সাথে চুটিয়ে প্রেম করছে সে।

'মেজর তারেক এখন কোথায়?'

'আলেক হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়,' বলল রোপা। 'দু'জন ধস্তাধস্তি করে ওরা। তারপর তারেককে খুন করে আলেক।'

'লাশ?'

'নদীতে। হাউজবোটের পাশেই।'

ফরহাদের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল রানা। কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ফরহাদ।

'এবার, পুলিস সুপার খাদিম সারওয়ার সম্পর্কে যা জানো বলো।'

কথা চেপে রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে গেছে, গড় গড় করে সব বলে গেল রোপা। মানুষের কাছ থেকে ভাল আচরণ পাবার জন্যে যা করতে বলা হবে তাই করবে সে এখন। 'প্রথম দিন হাউজবোটে এসে আমাকে জানাল, আপনি তাকে বোটের ওপর নজর রাখার দায়িত্ব দিয়েছেন। বলল, নজর রাখার প্রতিটা রিপোর্ট সেন্সর করবে সে, আমি যদি তার সাথে আলেকের দেখা করিয়ে দিতে রাজি থাকি।'

'খাদিমের সাথে আর কে আছে জানো?'

'একবার একজন পাইলটের নাম বলেছিল, দাঁড়ান, নামটা মনে করি···ঈমান সাফারী,' বলল রোপা। 'ফাইটার প্লেনের পাইলট। সুপার ঘুর ঘুর করছিল আলেকের কাছ থেকে রেডিও পাবার আশায়, ইসরায়েলের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবে বলে। রেডিও সম্পর্কে ঈমানের অভিজ্ঞতা আছে, পাবার পর তারই সেটা অপারেট করার কথা।'

এর মধ্যে এতসব ব্যাপার থাকতে পারে, ভাবল রানা, কল্পনাতেও আসেনি। নিজের ওপর একটু অসন্তুষ্ট হলো। এ ধরনের সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত ছিল তার। জানতে চাইল, 'কোথায় থাকে ঈমান?'

'তা জানি না।'

মহিলা অফিসারের দিকে ফিরল রানা। 'ফাইটার পাইলট, ঈমান সাফারী—ঠিকানাটা জানতে চাই।'

সেল থেকে বেরিয়ে গেল অফিসার।

'আলেক তোমার বোটেই তাহলে রেডিওটা রেখেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'মেসেজ পাঠাবার জন্যে একটা কোড ব্যবহার করত সে।'

'হ্যাঁ,' বলল রোপা। 'কোডের শব্দ তৈরি করার জন্যে একটা ইংরেজী উপন্যাস ব্যবহার করত।'

'রেবেকা।'

'হ্যাঁ।'

'কোডের একটা কী ছিল তার কাছে।'

'কী?'

'ছোট এক টুকরো কাগজ,' বলল রানা। 'কোড তৈরি করার নিয়ম, বইয়ের কোন্ পাতা ব্যবহার করতে হবে, এইসব লেখা ছিল।'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল রোপা। 'হ্যাঁ, এই ধরনের কি যেন একটা ছিল বোধহয়।'

'রেডিও, বই, কী—হাউজবোটে কিছুই নেই। ওগুলো কোথায় জানো?'

'না,' বলল রোপা। চেহারায় ভয় আর আবেদন ফুটে উঠল। 'সত্যি জানি না! বিশ্বাস করুন! জানলে...'

'ঠিক আছে, বিশ্বাস করলাম,' বলল রানা। 'বলতে পারো, কোথায় যেতে পারে আলেক?'

'শহরে তার একটা বাড়ি আছে... ভিলা লে অলিভিয়ার্স...'

'গুড আইডিয়া। আর কোন সাজেশন?'

'খলিফা। খলিফার কাছে আশ্রয় চাইতে পারে সে।'

'গুড। আর?'

'মরুভূমিতে যেতে পারে আলেক,' বলল রোপা। 'সেখানে তার জ্ঞাতি ভাইরা আছে।'

'কোথায় তাদের পাওয়া যাবে?'

'কেউ জানে না। ওরা বেদুইন যাযাবর।'

'আলেক হয়তো জানে বছরের কোন্ সময়টা কোথায় থাকে ওরা।'

'হয়তো।'

রোপার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা। মিথ্যে কথা বলছে বলে মনে হয় না। চোখমুখই বলে দেয়, বন্ধুদের সাথে বেঈমানী করে সব কথা ফাঁস করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে। 'তোমার সাথে পরে আরও কথা হবে,' বলল ও। বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

করিডরে দেখা হলো মহিলা অফিসারের সাথে। ঈমান সাফারীর ঠিকানা লেখা এক টুকরো কাগজ দিল রানাকে। নিজের অফিস কামরায় ফিরে রানা দেখল, ওর জন্যে অপেক্ষা করছে ফরহাদ।

'নেভির কাছ থেকে দু'জন ডাইভারকে ধার করেছি, স্যার,' বলল সে। 'রওনা হয়ে গেছে, যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে।'

'গুড,' বলল রানা। সিগারেট ধরাল ও। 'মনে থাকবে, নাকি নোট করবে?'

'মনে থাকবে, স্যার।'

'খলিফার বাড়ি আর সবগুলো আস্তানায় রেইড করতে হবে। ওকে গ্রেফতার করে এখানে নিয়ে এসে আটকে রাখবে, কেউ ছেড়ে দেয়ার সুপারিশ করলে বলবে আমার সাথে যোগাযোগ করতে হবে।' হঠাৎ গলা একেবারে খাদে নামাল রানা, বলল, 'গ্রেফতার হবার সময় খলিফা যদি কোথাও ফোন করতে চায়, ওকে বাধা দিয়ো না।' ফরহাদের চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠল, কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না সে।

'কারও কথায় কান দেবে না, ওকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে এখানে। কেউ যদি চাকরি বা কোর্ট মার্শালের ভয় দেখায়, আমি আছি।'

'ধন্যবাদ, স্যার,' গম্ভীর সুরে বলল ফরহাদ। 'ওসবে আমি ভয় পাই না। আপনি তো আছেনই, তাছাড়া, আমার দুই চাচা মেজর জেনারেল—আমার ওপর কেউ অন্যায় কিছু চাপাতে পারবে না।'

'ঈমান সাফারীকে গ্রেফতার করতে যাচ্ছি আমি,' বলল রানা। 'তুমি ছোট একটা টীমকে ভিলা লে অলিভিয়ার্সে পাঠিয়ে দাও। ওখানে ওরা কিছু পাবে বলে মনে হয় না, তবু সাবধানের মার নেই। কোন প্রশ্ন আছে?'

'না, স্যার,' বলল ফরহাদ। 'ওরা জানে, আমরা একটা ওয়্যারলেস সেট, এক কপি রেবেকা, আর এক সেট কোড কী খুঁজছি।'

নিজের চারদিকে তাকিয়ে এই প্রথম কয়েকজন সার্জেন্ট আর করপোরালকে দেখল রানা। 'তার বেশি কিছু না জানলেও চলবে ওদের। খলিফার ওখান থেকে ফিরে আমার সাথে দেখা কোরো, হাউজবোটে থাকব।'

'ইয়েস, স্যার।'

সিগারেটে টান দিয়ে সেটা ছাইদানীতে গুঁজে রাখল রানা, বলল, 'চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।'

সকালের রোদে বেরিয়ে এল ওরা। দশ বারোটা আর্মি জীপ স্টার্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রেইডিং পার্টির সার্জেন্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল ফরহাদ, তারপর রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। সৈনিকরা জীপে উঠে বসল, রওনা হয়ে গেল টীম।

কায়রো থেকে মাইল তিনেক দূরে, হেলিওপোলিসের দিকে যাবার পথে, রাস্তার ধারেই ঈমান সাফারীর একতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে ছোট্ট একটা বাগান। পিছনে ঝোপ-ঝাড়। গেটের কাছে সশব্দে থামল চারটে জীপ, সৈনিকরা লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। দেখতে দেখতে গোটা বাড়ি ঘিরে ফেলল তারা, সার্চ শুরু হলো বাগান থেকে। সামনের দরজায় নক করল রানা। ঘেউ ঘেউ করতে লাগল একটা কুকুর। আবার নক করল রানা। দরজা খুলে গেল।

'ক্যাপ্টেন ঈমান সাফারী?'

'ইয়েস।'

লম্বা, একহারা চেহারার তরুণ ঈমান সাফারী, বিপদ টের পেয়েও এতটুকু চঞ্চল হয়নি। সম্পূর্ণ শান্ত দেখাল তাকে, চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি। মাথায় ফেজ, পরনে ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম, মনে হলো কোথাও বেরোতে যাচ্ছিল।

'তোমাকে গ্রেফতার করা হলো,' বলল রানা। তাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল ও। একটা দরজা খুলে দোরগোড়ায় বেরিয়ে এল আরও একজন লোক। 'ও কে?' জানতে চাইল রানা।

'আমার ভাই, সামাদ,' বলল ঈমান। 'জানতে পারি, এসবের মানেটা কি?'

ঈমানের দিকে তাকাল রানা। লোকটার চেহারা শান্ত হলেও, ঠাণ্ডা চোখে চাপা উত্তেজনার ক্ষীণ আভাস টের পাওয়া যায়। লোকটা ভয় পেয়েছে, কিন্তু গ্রেফতার হওয়া সেটার কারণ নয়। এই লোক জেল খাটাকে ভয় পায়, বিশ্বাস

করতে ইচ্ছে করল না রানার। মনে হলো, বিপদ হবে জেনেই যারা ঝুঁকি নেয় ঈমান সাফারী সেই দলেরই একজন। তার ভয় পাবার অন্য কোন কারণ আছে।

দ্রুত ভাবছে রানা। আলেকের সাথে আজ সকালে কি ধরনের চুক্তিতে এসেছে পুলিস সুপার? ইসরায়েলের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার জন্যে আলেকের সাহায্য দরকার ছিল এই বিদ্রোহী গ্রুপের। রেডিওর বিনিময়ে এরা কি তাহলে আশ্রয় দিয়েছে আলেককে?

'মানে যদি এখনও বুঝে না থাকো, আর একটু অপেক্ষা করো, নিজেই দেখতে পাবে,' বলল রানা। 'তোমার কামরা কোন্টা?'

হাত বাড়িয়ে দেখাল ঈমান। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা। ওর পিছু পিছু একজন সার্জেন্ট আর দু'জন সৈনিকও ঢুকল। সার্জেন্টকে নির্দেশ দিল রানা, 'কাজ শুরু করো।'

বেডরূম সার্চ করতে শুরু করল তারা।

'মেজর...,' শুরু করল ঈমান।

তাকে বাধা দিয়ে বলল রানা, 'আলেক বোগান ওরফে আলেক আব্বাসকে তুমি চেনো।'

'আলেক বোগান? আলেক আব্বাস? না!'

বাড়িতে মিলিটারি হানা দিয়েছে তাই দেখে ভয় পাবার লোক ঈমান সাফারী নয়, বুঝল রানা। প্রমাণ ছাড়া অপরাধ স্বীকার করানো কঠিন হবে। হলঘরে বেরিয়ে এসে একটা দরজা দেখাল রানা, 'ওটা কার ঘর?'

'আমার স্টাডি।'

সেদিকে এগোল রানা।

'ও-ঘরে মেয়েরা আছে,' পিছন থেকে দ্রুত রানার পাশে চলে এসে বলল ঈমান, 'ওদেরকে খবর দিই সরে যাক, তারপর...'

'আমরা এসেছি ওরা জানে। দরজা খোলো।'

ঘরের ভেতর ঈমানকে আগে ঢুকতে দিল রানা। পিছু পিছু ভেতরে ঢুকে দেখল, কেউ নেই। তবে পিছনের একটা দরজা খোলা রয়েছে। মনে হলো, এইমাত্র কেউ বেরিয়ে গেছে। কিছু এসে যায় না, গোটা বাড়ি ঘিরে রেখেছে সৈনিকরা। ডেস্কে আরবী লেখা কিছু কাগজের ওপর একটা আর্মি পিস্তল পড়ে রয়েছে। বুক শেলফের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। পরীক্ষা করল বইগুলো। এগুলোর মধ্যে রেবেকা নেই।

বাড়ির আরেক অংশ থেকে চিৎকার ভেসে এল, 'মেজর রানা!'

আওয়াজটা অনুসরণ করে কিচেনে এসে ঢুকল রানা। একজন সার্জেন্ট এম. পি. দাঁড়িয়ে রয়েছে আভনের পাশে। তার বুট পরা পায়ের কাছে ঘেউ ঘেউ করছে কুকুরটা। আভনের দরজা খোলা, রানাকে দেখে সেটার ভেতর থেকে একটা সুটকেস বের করে আনল সার্জেন্ট। সুটকেসটা আগেই খুলেছে সে।

রেডিওটা এক সেকেন্ড দেখে ঈমানের দিকে ফিরল রানা। হতাশায় ঝুলে পড়েছে ক্যাপ্টেনের মুখ। আলেকের সাথে বিদ্রোহীদের তাহলে এই চুক্তিই হয়েছে!

বিপদের কথা বলে আলেককে সাবধান করে দিয়েছে তারা, বিনিময়ে তার রেডিওটা চেয়ে নিয়েছে। এর মানে কি আরও একটা রেডিও আছে তার? নাকি ঠিক হয়েছে, ব্রডকাস্ট করার জন্যে এখানে আসবে আলেক?

'ওয়েল ডান,' সার্জেন্টকে বলল রানা। 'ক্যাপ্টেন ঈমানকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাও।'

'আমি প্রতিবাদ করছি,' বলল ঈমান। 'আইন বলে, ঈজিপশিয়ান বাহিনীর একজন অফিসারকে গ্রেফতার করে শুধু অফিসার্স মেসে নিয়ে যেতে পারা যাবে, এবং নিয়ে যাবার সময় তার সহ-যাত্রী থাকবে একজন একই পদের অফিসার।'

'কিন্তু আইন আরও বলে, স্পাইকে দেখা মাত্র গুলি করে মেরে ফেলা যাবে,' বলল রানা। সার্জেন্টের দিকে ফিরল ও। 'আমার ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দাও। বাড়ি সার্চ করা শেষ করে ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে এসপিওনাজের অভিযোগ আনবে।'

সার্জেন্টের ইঙ্গিতে কয়েকজন সৈনিক ঘিরে ফেলল ঈমানকে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে জীপে চড়ল রানা। এক মিনিট পর ছুটতে ছুটতে চলে এল ড্রাইভার। রানা তাকে বলল, 'জামালেক।'

'ইয়েস স্যার!' স্টার্ট দিয়ে জীপ ছেড়ে দিল ড্রাইভার।

হাউজবোটের কাছে পৌঁছে রানা দেখল, কাজ শেষ করে পানি থেকে উঠে এসেছে ডাইভাররা, টোপাথে দাঁড়িয়ে গা থেকে ডাইভিং গিয়ার খুলছে তারা। দু'জন সৈনিক রশি টেনে বীভৎস কি যেন একটা তুলছে নীল নদ থেকে। নদীর তলায় লাশ পেয়ে রশি দিয়ে বেঁধেছে ডাইভাররা, রশির আরেক প্রান্ত সৈনিকদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব শেষ করেছে।

রানার সামনে এসে দাঁড়াল ফরহাদ। 'এটা দেখুন, স্যার।' পানিতে ভিজে ফুলে ওঠা একটা বই ধরিয়ে দিল রানার হাতে। মোটা কাভার ছিল, সেটা ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখল রানা। রেবেকা!

রেডিও পেল ঈমান, কোড বুক পড়ল নদীতে। রানার মনে পড়ল, হাউজবোটের একটা ছাইদানীতে পোড়া কাগজ দেখেছে সে। তবে কি কোডের কী পুড়িয়ে ফেলেছে আলেক?

রেডিও, বই আর কী, তিনটে জিনিসই হাতছাড়া করল আলেক। অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা মেসেজ ইসরায়েলে পাঠাতে হবে তার। এর একটাই অর্থ করা যেতে পারে—আর একটা রেডিও, বই এবং কী অন্য কোথাও লুকানো আছে তার।

নদীর পাড়ে লাশ তুলে পিছিয়ে এল সৈনিকরা। এগিয়ে গিয়ে লাশের পাশে দাঁড়াল রানা। গলাটা কেটে ফেলা হয়েছে, ধড়ের সাথে সামান্য একটু লেগে আছে মাথা। কোমরের সাথে রশি দিয়ে বাঁধা রয়েছে একটা ব্রীফকেস। ঝুঁকে পড়ে সেটা খুলল রানা। ভেতরে শ্যাম্পেনের কয়েকটা বোতল ছাড়া আর কিছু নেই। 'বেজন্মা কুকুর!' বিড়বিড় করে বলল ও।

'গলা কেটে তারপর ডুবিয়ে দিয়েছে,' রানার পাশ থেকে বলল ফরহাদ।

'এই লোক ছুরি চালানোয় ওস্তাদ,' বলল রানা। নিজের অজান্তেই একটা হাত চোয়ালে উঠে গেল। কয়েক দিনের না কামানো দাড়িতে ক্ষতটা ঢাকা পড়ে আছে।

মনে মনে প্রার্থনা করল, নাদিয়াকে যেন ছুরির মুখে পড়তে না হয়। ফরহাদের দিকে ফিরল ও। 'তোমার কাজ শেষ হয়েছে?'

'কোথাও কিছু পাইনি, স্যার,' বলল ফরহাদ। 'স্যার!' হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। 'আপনি যা বলেছিলেন, তাই ঘটেছে। খলিফাকে গ্রেফতার করতে চাইলে বলল, একটা ফোন করবে সে।'

'আচ্ছা?' আগ্রহী হয়ে উঠল রানা, 'কাকে ফোন করল?'

'তা বলতে পারব না। ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছিলাম আমি। ফোনে কথা শেষ করে যখন বেরিয়ে এল সে, দেখে চেনাই যায় না। গ্রেফতার করব শুনে একটুও ঘাবড়ায়নি, কিন্তু ফোনে কথা বলার পর ভয়ে একেবারে কেঁচো হয়ে গেল। আমি তো এর কিছুই বুঝতে পারছি না, স্যার। ফোন করতে চাইবে, আপনি আগে থেকে জানলেন কিভাবে, স্যার?'

'জানতাম বলা ঠিক হবে না,' বলল রানা। 'আন্দাজ করেছিলাম আর কি!'

আরও প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল ফরহাদ, চট করে রানা বলল, 'এ-ব্যাপারে পরে সব জানতে পারবে তুমি।'

'খলিফার বাড়ি সার্চ করে কিছুই পাইনি, স্যার,' বলল ফরহাদ। 'এখানে আসার পথে আলেকের বাড়ি ওরা যারা সার্চ করছে তাদের সাথে কথা বলে এসেছি। ওখানেও নেই কিছু।'

'বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম নেব,' বলল রানা। 'এই ঘন্টাখানেকের মত। তারপর আবার আমরা জেরা করব বন্দীদের।' বিশ্রামের জন্যে নয়, কেন যেন বাড়ি ফেরার একটা তাগাদা অনুভব করছে বলেই ফিরতে চাইছে রানা।

একটু অবাক দেখাল ফরহাদকে। বলল, 'ঠিক আছে, স্যার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এদিকে সব আমি সামলে নিতে পারব।'

ফেরার পথে জীপে বসে চোখ বুজে থাকল রানা। কোথায় গেছ তুমি, আলেক বোগান? তোমার জ্ঞাতি ভাইদের কাছে, আসিউতে? নাকি তোমার জন্মস্থান আলেকজান্দ্রিয়ায়? কোন্ পথ ধরে গেছ তুমি—নদী, নাকি রাস্তা? তুমি কি খুন করেছ নাদিয়াকে, নাকি সাথে করে নিয়ে যাচ্ছ? কোথায় পালাবে তুমি, আলেক! আমার হাত থেকে তোমার নিস্তার নেই। দরকার হলে তোমার খোঁজে আমি পাতালে নামব, আকাশের গ্রহ-তারা তছনছ করব। অপেক্ষা করো, আলেক, আসছি আমি।

একটা ঝাঁকি খেলো রানা। চোখ মেলে দেখল, ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে জীপ। নেমে পড়ল ও। ড্রাইভারকে বলল, 'আবার বেরুব আমি। তুমি বরং ভেতরে এসে নাস্তা সেরে নাও।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

হল টেবিলে চিঠির স্তূপ দেখল রানা। ওপরের একটা এনভেলাপে কোন স্ট্যাম্প নেই, গায়ে ওর নাম লেখা রয়েছে। হাতের লেখাটা চেনা চেনা লাগল। এনভেলাপটা তুলে নিল ও।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময় এরপর কি করতে হবে মনে মনে তার একটা খসড়া তৈরি করল রানা। আলেকের আসিউতের দিকে যাবার সম্ভাবনাই সবচেয়ে

বেশি। কায়রো আর আসিউতের মাঝখানে যে ক'টা বড় শহর আছে সবখানে রোড-ব্লক দরকার। রেলপথেও যেতে পারে সে, কাজেই প্রতিটি স্টেশনে লোক রাখতে হবে। নদী পথেও যাওয়া যায়, কাজেই নৌ-বাহিনীকে সতর্ক করা দরকার।

যদিও সবটাই পণ্ডশ্রম হবে আলেক যদি কায়রোতেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকে। কায়রোয় পোড়োবাড়ির কোন অভাব নেই। অসংখ্য ছোট ছোট ঘর আছে, তার ভেতর দু'একটা করে কবর, শবে বরাতের রাত ছাড়া সারাবছর সেখানে কারও পা পড়ে না। আলেক এই শহরের ছেলে, এসব খবর জানা আছে তার।

আবার, উত্তর দিকে আলেকজান্দ্রিয়ায়ও যেতে পারে সে। যেতে পারে পুব বা পশ্চিম মরুভূমির দিকে।

ফ্ল্যাটে ঢুকে বৈঠকখানায় এল রানা। ডেস্কের ওপর লেটার ওপেনার খুঁজল, পেল না। মনের ভেতর সমস্যাটা নাড়াচাড়া করছে। এতদিক নজর রাখার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কয়েক হাজার লোক লাগবে। পুলিসের ওপর তেমন বিশ্বাস নেই ওর, টাকা খেয়ে আলেককে ছেড়ে দিতে পারে তারা। বিশেষ করে আসিউতের দিকেই নজর রাখতে হবে, কারণ ওদিক থেকেই মিশরে ঢুকেছিল আলেক, গোটা ব্যাপারটা শুরুও হয়েছে ওখান থেকে। ক্যাপ্টেন আহসানের কথা মনে পড়ল। যোগাযোগ করে তাকে সাবধান করে দিতে হবে।

লেটার ওপেনারটা গেল কোথায় ছাই! দরজার কাছে গিয়ে ডাকল, 'কুরবান আলি!'

ঘরের মাঝখানে ফিরে এসে দেখল, ডনের স্কুল অ্যাটলাসটা সোফার ওপর পড়ে রয়েছে। কাভারে ওগুলো কিসের দাগ? আঙুল ছোঁয়াতেই চটচটে লাগল। কাদা বা অন্য কোন ময়লা হবে। কিন্তু ভাল করে তাকাতে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। এ যে রক্ত!

ভেতরে ঢুকল প্রৌঢ় কুরবান আলি।

'এতে রক্ত কেন বলতে পারো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

অ্যাটলাসের কাভারটা দেখল কুরবান আলি। 'কি জানি, স্যার! ক্যাপ্টেন আলম ডেস্কে বসে লিখছিলেন, আর সোফায় বসে ওরা দু'জন ম্যাপ দেখছিল…'

'ক্যাপ্টেন আলম কে? ওরা কারা?' কুরবান আলির মুখের ওপর স্থির হয়ে গেল রানার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

'ক্যাপ্টেন আলম, স্যার! ছোট সাহেবকে স্কুলে নিয়ে যাবার জন্যে আপনি যাকে পাঠিয়েছিলেন…'

'থামো!' একটা অমঙ্গল আশঙ্কা করে বুক কেঁপে উঠল রানার। 'একজন লোক এসে তোমাকে বলল, আমি তাকে পাঠিয়েছি ডনকে স্কুলে নিয়ে যাবার জন্যে?'

'জ্বী, স্যার,' ঢোক গিলে বলল কুরবান আলি। 'ছোট সাহেবকে নিয়ে গেলেন তিনি…'

'কুরবান আলি, আমি কাউকে পাঠাইনি!'

প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল কুরবান আলি।

'তুমি চেক করেও দেখলে না লোকটা সত্যি কথা বলছে কিনা?'

'কিন্তু, স্যার, তার সাথে মিস নাদিয়া রয়েছেন দেখে আমি ভাবলাম...'

মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজল রানা। 'ওহ্, গড!' হাতের এনভেলাপটার দিকে তাকাল ও। এতক্ষণে বুঝল, হাতের লেখাটা চেনা চেনা লেগেছিল কেন। নাদিয়ার কাছে ছোট একটা চিরকুট পাঠিয়েছিল আলেক, দুটো লেখা একই হাতের। এনভেলাপ ছিঁড়ে ফেলল ও। পড়তে শুরু করল চিঠি।

প্রিয় মেজর রানা,

আপনার দোয়ায় বহাল তবিয়তেই আছি। আশা করি আপনিও সুস্থ সবল দেহে পরমানন্দে আছেন। পর সমাচার এই যে খোদার ফজলে মিশরে আমার মিশন ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা সফল হয়েছে।

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, আপনার জন্যে একটি দুঃসংবাদ আছে। উপায় ছিল না, তাই মাস্টার ডনকে সাথে করে নিয়ে যেতে হচ্ছে আমার। না-না, উদ্বিগ্ন হবেন না, নাদিয়া ওর দেখাশোনা করছে।

বন্ধু হিসেবে আপনার প্রতি আমার পরামর্শ এই ক'দিন শরীরের ওপর দিয়ে সাংঘাতিক ধকল গেছে, হপ্তাখানেকের ছুটি নিয়ে ঘরে বসে বিশ্রাম নিন, কাজের কথা ভুলে থাকুন। বাচ্চাকাচ্চাদের সাথে শত্রুতা বা যুদ্ধ চলে না, কাজেই আমার দ্বারা মাস্টার ডনের কোন ক্ষতি হবে না বলে বিশ্বাস রাখুন। তবে সেই সাথে এ-কথাও তো সত্যি যে একটা জাতির বৃহত্তর স্বার্থের তুলনায় একটা ছেলের জীবনের কি-ই বা এমন মূল্য! কাজেই এই কথাটা মনে ঠাঁই দেবেন, আমাকে কোনভাবে বাধা দেয়া হলে প্রতিশোধ হিসেবে আমি মাস্টার ডনের গলায় ছুরি চালাব। নাদিয়াকে নিয়ে কি করব সে আমার মনই জানে।

আপনার শুভ বুদ্ধির উদয় হোক, এই কামনা করি।

ইতি, আলেক বোগান।

উন্মাদ! লোকটা উন্মাদ!—চিঠিটা কুরবান আলির হাতে গুঁজে দিয়ে ভাবল রানা। কাঁপা হাতে চোখে চশমা পরল কুরবান আলি। ডনের মুখটা স্মরণ করল রানা। ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল ওর। ডনের বোনের কথা মনে পড়ল। ছেলেটার কোন ক্ষতি হলে, মুখ দেখাবে কি করে সে?

ধারণা করল, হাউজবোট থেকে পালিয়ে যাবার সময় নাদিয়াকে সাথে নেয় আলেক। ডনকে কিডন্যাপ করবে শুনে নাদিয়া নিজেই হয়তো আলেকের সাথে থাকতে চেয়েছে। দু'একদিনের পরিচয়েই ডনকে ভালবেসে ফেলেছিল নাদিয়া। কিন্তু কোন্‌দিকে গেছে ওরা? 'রক্ত...ওটা কার রক্ত?'

নিঃশব্দে কাঁপছে কুরবান আলি। দু'চোখ থেকে ঝর ঝর করে পানি ঝরছে। রানা তার কাঁধে একটা হাত রেখে জানতে চাইল, 'কেউ নিশ্চয়ই জখম হয়েছিল। রক্তটা কার হতে পারে?'

'ধস্তাধস্তি বা ওই ধরনের কিছু হতে দেখিনি, স্যার,' চোখ মুছতে মুছতে বলল কুরবান আলি। 'ম্যাডামের হাতে রুমাল জড়ানো ছিল, তাতে রক্তের দাগও দেখেছিলাম, উনি বোধহয় হাত কেটে ফেলেছিলেন...'

নিজের রক্ত ডনের অ্যাটলাসে কেন মাখাল নাদিয়া? কোন সঙ্কেত? ওকে কিছু বলে যেতে চেয়েছে নাদিয়া? নিশ্চয়ই তাই।

বইটা খুলল রানা। লেটার ওপেনারটা পাওয়া গেল বইয়ের ভেতর। মিশরের ম্যাপের ওপর চোখ বুলাল রানা। রক্ত দিয়ে আঁকা হয়েছে একটা তীর চিহ্ন। চিহ্নটা আসিউতকে নির্দেশ করছে।

হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলল রানা, জেনারেল হেডকোয়ার্টারের নাম্বারে ডায়াল করল। সুইচবোর্ড অপারেটর সাড়া দিল, কিন্তু রিসিভার নামিয়ে রাখল ও। কাকে খবর দিতে চাইছে সে? মিলিটারির এ-ব্যাপারে কিছুই করার নেই। লে. কর্নেল মোসাদ্দেক হাসান বা আর কেউ খবরটা একবার শুনলে হয়, আলেককে গ্রেফতার করার জন্যে লাইট ইনফ্যানট্রির একটা স্কোয়াড পাঠিয়ে দেবে আসিউতে। ওখানে গুলি বিনিময় হবে। আলেক বুঝবে, তার হার হয়েছে। মার্ডার আর কিডন্যাপিং বাদ দিলেও গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গুলি করে মারা হবে তাকে। এই পরিস্থিতিতে কি করবে সে?

লোকটা উম্মাদ, ভাবল রানা, কোন সন্দেহ নেই, ডন আর নাদিয়াকে খুন করবে সে।

ভয়ে নিজেকে পঙ্গু লাগল রানার। হ্যাঁ, আলেক চেয়েছেও ঠিক তাই, ভেবেছে ডনকে সাথে নিয়ে গেলে পঙ্গু হয়ে যাবে মেজর রানা।

মিলিটারি পাঠালে ডন আর নাদিয়া তাদের গুলি খেয়েও মারা পড়তে পারে। কাজেই পথ শুধু একটাই খোলা। একা যেতে হবে তাকে।

'দু'বোতল পানি দাও আমাকে,' কুরবান আলিকে বলল ও। কামরা থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

নিচে নেমে এল রানা। সিঁড়ি ঘরে ঢুকে গগলস জোড়া পরল। মোটর-সাইকেলের সাইড ক্যারিয়ার থেকে একটা স্কার্ফ বের করে মাথা আর গলায় পেঁচিয়ে নিল। পানি নিয়ে সিঁড়ি ঘরে এল কুরবান আলি। বোতল দুটো ক্যারিয়ারে ভরে মোটরসাইকেলটাকে ঠেলে নিয়ে এল রানা গাড়ি-বারান্দায়। স্টার্ট দিয়ে উঠে বসল সীটে। পাশে এসে দাঁড়াল কুরবান আলি। ঝর ঝর করে কাঁদছে। তার কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। বলল, 'চিন্তা কোরো না, ওদেরকে আমি ফিরিয়ে আনব।'

ফ্ল্যাট বাড়ির গেট দিয়ে তীর বেগে বেরিয়ে গেল মোটরসাইকেল। দু'হাত তুলে প্রার্থনা করছে কুরবান আলি।

আট

স্টেশনে ঢুকে আপ্রনমনে খুব এক চোট হাসল আলেক। ভাবল, কি একটা বুদ্ধি বের করেছে সে! স্টেশনে এত ভিড়, পিছন দিকে নাদিয়া কোথায় রয়েছে মাঝে মধ্যে দেখাই যাচ্ছে না। অথচ জানে, ঠিকই আসছে। আসতেই হবে! ডনের হাত ধরে

আছে যে! একেই বলে আইডিয়া। হ্যাঁ, স্মার্ট বলা যায় তাকে, অন্তত মেজর রানার চেয়ে বুদ্ধিমান সে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নাদিয়ার কাছ থেকে যা শুনল, বোঝা যায়, লোকটা আসলে খুব নরম, হৃদয়টা কোমল। ডনকে নাকি বড় বেশি ভালবাসে। কেমন জব্দ, মেজর রানা? হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকা ছাড়া উপায় আছে তোমার?

ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট কাটল আলেক। সময় হয়ে গিয়েছিল, ওরা উঠে বসতেই ছেড়ে দিল ট্রেন। রোপার কথা মনে পড়ল আলেকের। গুলি মারো! ওর প্রয়োজন ফুরিয়েছে তার। তেলআবিবে ফিরে গেলে ওই রকম কত রোপা জুটবে!

নাদিয়ার দিকে তাকাল সে। সন্ত্রস্ত মেয়েদের খুব ভাল লাগে তার। ভয় পাওয়া মেয়ে রোমাঞ্চিত করে তোলে তাকে। নাদিয়াকে কি সুন্দরই না লাগছে! ভয়ে শুকিয়ে আছে মুখ। ঘন ঘন ডনের দিকে তাকাচ্ছে, আড় চোখে দেখে নিচ্ছে তাকে। ওর সাথে ইয়ে করা হয়নি। কিন্তু হবে, আসিউতে পৌঁছে নিই আগে।

আসিউতে পৌঁছে প্রথম কাজ মাহমুদকে খুঁজে বের করা। বছরের এই সময়টা বেদুইন পরিবারটি কোথায় থাকতে পারে, তার জানা আছে। খুঁজে বের করতে অসুবিধে হবে না। রেডিওটা মাহমুদের কাছ থেকে নিয়ে মাঝরাতে মেসেজ পাঠাবে সে। মিশরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ নীল-নকশা, পাবার সাথে সাথে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীতে উৎসবের ঢল নামবে। কয়েক ডজন পদক পাবে সে। হয়তো জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের চীফ বানানো হবে তাকে। যেদিন ইসরায়েলি সেনাবাহিনী মিশর দখল করবে, সেদিনই কায়রোয় বেড়াতে আসবে সে। গ্রেফতার করে তার সামনে নিয়ে আসা হবে মেজর রানাকে।

দৃশ্যটা কল্পনা করে আপনমনে হাসতে লাগল আলেক বোগান। আমি নই কাপুরুষ, নই আমি কাপুরুষ! ডনের মনে হলো, বার বার এই কথাই বলছে ট্রেনটা। আসলে, ভাবল সে, আমি ছোট তো, তাই আমাকে এই বিপদে সাহস যোগাবার চেষ্টা করছে ট্রেন।

বিপদ? হ্যাঁ, মস্ত বিপদে পড়ে গেছে তারা। ডিটেকটিভ বইতে এ-ধরনের গল্প পড়ার সময় কি মজাই না লাগে, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, আসলে ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো।

আন্টি তাকে চকলেট কিনে দিতে চেয়েছিল, সে রাজি হয়নি। চকলেট খাবার বয়স কবেই পেরিয়ে এসেছে সে। ওই পিরামিড দেখা যায়! একটা, দুটো, তারপর আরও একটা ছোট—মোট তিনটে। তারমানে এটা গিজা। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে তারা? লোকটা বলল, স্কুলে নিয়ে যাবে। তা না, গাড়িতে উঠিয়ে ছুরি দেখাল। বলল, গলা কেটে দেবে।

প্রথমে খুব ভয় লেগেছিল। কিন্তু ফ্রেন্ডের কথা মনে পড়তেই অর্ধেক ভয় দূর হয়ে গেছে। জানে, তার ফ্রেন্ড যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি সাহসী। তাকে এত ভালবাসে যে আপামণির অভাবটাও অনুভব করে না সে। ফ্রেন্ড নিশ্চয়ই খবর পাবে। আর অমনি ছুটে আসবে সে। লোকটাকে ধরে এমন উচিত শিক্ষা দেবে, কেঁদে কূল পাবে না।

লোকটার কাছে ছুরি আছে। কথাটা কোনভাবেই মন থেকে তাড়াতে পারছে না সে। ভাবলেই তো হয়, ওটা নেই। কিন্তু ভাবতে পারছে না। যে জিনিস আছে, নেই বলে কল্পনা করবে কিভাবে? সে যদি গভীর ভাবে চিন্তা করে যে ছুরিটা নেই, তাহলে ছুরিটা আছে নিজেকে এই বাস্তবতাই মনে করিয়ে দেয়া হয়। মানুষ যদি কোন কথা ভুলে থাকতে চায়, নিয়মটা কি? একটা বিষয়ে চিন্তা বন্ধ করার উপায়টা কি?

চিন্তা কি? চিন্তা আসলে অ্যাক্সিডেন্ট। সব চিন্তাই অ্যাক্সিডেন্টাল। এই তো, এক সেকেন্ডের জন্যে ছুরির কথাটা ভুলে ছিল সে! আচ্ছা, পুলিস দেখলে কি করবে সে? তার কি বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করা উচিত হবে?

নিজের কথাও এখন আর ভাবছে না সে, ভাবছে শুধু ডনের কথা। তার একমাত্র লক্ষ্য, বাচ্চা ছেলেটার যেন কোন ক্ষতি না হয়। কিন্তু এই অসহায় অবস্থায় ডনকে রক্ষার জন্যে কি-ই বা করতে পারবে সে! অনেক বুদ্ধিই আসছে মাথায়, কিন্তু কোনটাই ঝুঁকি ছাড়া নয়। ট্রেনের কামরায় আরও লোকজন রয়েছে, হঠাৎ বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার জুড়ে দিলে তারা হয়তো সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসবে। কিন্তু আলেক যদি ছুরি বের করে একটা অঘটন ঘটিয়ে বসে? তা সে করবে!

তারচেয়ে অপেক্ষা করাই ভাল। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়। ডন খুব ভয় পেয়েছে, কিন্তু চেহারা দেখে বোঝা যায়, সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টাও করছে সে। বুদ্ধিমান ছেলে বলেই এখনও কোন সীন ক্রিয়েট করেনি, জানে, তাতে হিতে বিপরীত হবে। কিন্তু দুশ্চিন্তার বিষয় হলো, ডনের চেহারা প্রতি ঘণ্টায় ম্লান হয়ে আসছে। ও যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, আলেক কি করবে কে জানে!

নাদিয়া উপলব্ধি করল, ডনকে ভোলানো দরকার। কিভাবে সম্ভব সেটা? কিছু খেললে কেমন হয়? মন্দ নয়, আমরা কাটাকুটি খেলতে পারি। ওর ব্যাগ থেকে একটা খাতা আর পেন্সিল নিয়ে শুরু করা যেতে পারে।

খাতায় সমান্তরাল দুটো রেখা আঁকল নাদিয়া, লম্বালম্বিভাবে। জোড়া সরল রেখার মাঝখানে, এবার আড়াআড়ি ভাবে, আরেক জোড়া সরল রেখা টানল। দেখতে হলো, যেন একজোড়া রেল লাইন আরেক জোড়ার ওপর দিয়ে চলে গেছে।

খেলাটা চিনতে পেরে ডনের মুখে হাসি ফুটে উঠল। নাদিয়ার কাছ থেকে পেন্সিল নিয়ে নয়টা ভাগের একটায় কাটা চিহ্ন আঁকল সে। কোনাকুনি, পাশাপাশি বা ওপর নিচে পরপর তিনটে ভাগে কেউ যদি নিজের চিহ্ন বসাতে পারে, সেই জিতবে। এবার নাদিয়ার পালা। মাঝখানের চৌকো ঘরে একটা গোল বৃত্ত আঁকল সে।

প্রথমে খেলায় নাদিয়া জিতল। ঠিক করল এবার সে ডনকে জিততে দেবে। খেলা শুরু হয়েছে, ডনের হাত থেকে ছোঁ দিয়ে খাতাটা নিয়ে নিল আলেক। খাতার পাতাটা খুঁটিয়ে দেখল সে। তারপর ছুঁড়ে দিল নাদিয়ার কোলে।

ডন আর নাদিয়া পরস্পরের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল। তারপর

আবার খেলা শুরু করল। একটু পরই মনোযোগ হারিয়ে ফেলল নাদিয়া। মাথায় কতরকম চিন্তা আসছে। রানার চোখে কি অ্যাটলাসটা পড়েছে? হয়তো বাড়িতেই ফেরেনি সে! সারাদিন ফিরবেও না। ডনের কাটা চিহ্ন। এবার তার পালা। লিখল, 'আমাদের পালাতে হবে—তৈরি থেকো!' আরেকটা কাটা চিহ্ন আঁকল ডন, তারপর ধীরে ধীরে লিখল, 'ঠিক আছে।' বৃত্ত আঁকল নাদিয়া, লিখল, 'কিন্তু তুমি নিজে থেকে কিছু করে বোসো না!' পেন্সিল নিয়ে ডন লিখল, 'আচ্ছা। কিন্তু কখন পালাব?' নাদিয়া লিখল, 'পরের স্টেশনে।'

ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে এল। মুখ তুলে নাদিয়ার দিকে তাকাল ডন।

রানা জানে, ট্রেনটা এখনও ওর অনেক সামনে। পিরামিডগুলোর কাছে গিজা স্টেশনে থেমেছিল ও, জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছে কতক্ষণ আগে স্টেশনকে পাশ কাটিয়েছে ট্রেন। পর পর আরও তিনটে স্টেশনে থেমে ওই একই প্রশ্ন করেছে ও। তারপর এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, এখন আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। কারণ রেললাইন আর রাস্তা সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে গিয়ে হারিয়ে গেছে দিগন্তরেখার ওপারে। মাঝখানে একটা খাল, একপাশে রাস্তা, আরেক পাশে রেল লাইন। কাছাকাছি পৌঁছলে ট্রেনটাকে দেখতে পাবে ও।

যতবার থেমেছে, প্রতিবার বোতল থেকে পানি খেতে হয়েছে ওকে। ইউনিফর্ম ক্যাপ, গগলস আর মাথা ও গলায় জড়ানো স্কার্ফ থাকায় ধুলোর হামলা থেকে অনেকটাই বেঁচে গেছে ও। কিন্তু রোদের প্রচণ্ড দাপটে প্রাণ আর বাঁচে না, পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যাবার অবস্থা। মোটরসাইকেলের ওপর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে থাকতে হয়েছে ওকে, লোহার চেইনের সেই বাড়িটা হাড়ের কোন ক্ষতি না করলেও, কাঁধের মাংস একেবারে থেঁতলে দিয়েছে একটু নাড়া খেলে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে ব্যথা।

খুব সতর্কতার সাথে মোটরসাইকেল চালাচ্ছে ও। এটাই একমাত্র রাস্তা, মিশরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত লম্বালম্বিভাবে চলে গেছে, কায়রো থেকে আসওয়ান। পাকা রাস্তা, কিছুদিন পর পর মেরামতের কাজও করা হয়, তবু ঢাল, উত্থান, গর্ত, টোল এসবের কোন অভাব নেই। যানবাহনের ভিড় নয় বললেই চলে, কিন্তু রাস্তার কিনারা দিয়ে ছাগল আর ভেড়ার পাল মিছিল করে চলেছে, কখন যে তারা মাঝ রাস্তায় চলে আসবে, কেউ তা বলতে পারে না। একটু অসতর্ক হলেই দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা। গ্রাম আর ছোট ছোট শহরগুলোর ভেতর দিয়ে যাবার সময় স্পীড একেবারে কমিয়ে আনতে হলো ওকে।

এখন পর্যন্ত মাত্র দুটো গাড়িকে ওভারটেক করেছে রানা। তার মধ্যে একটা রোলসরয়েস, চালাচ্ছিল উর্দি পরা এক শোফার, পিছনের আসনে আরোহী ছিল পাগড়ী পরা এক বুড়ো শেখ। অপর গাড়িটা ফোর্ড, অল্প-বয়েসী জনাকয়েক তরুণ ছিল আরোহী।

হঠাৎ করেই হুইসেলের ক্ষীণ আওয়াজ পেল রানা। সামনে এবং বাঁদিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে দেখল, মাইলখানেক দূরে, দিগন্তরেখার একটু ওপরে সাদা খানিকটা

ধোঁয়া। নিশ্চয়ই স্টীম ইঞ্জিন থেকে বেরোচ্ছে। ডনের চেহারা ভেসে উঠল চোখের সামনে, স্পীড বাড়িয়ে দিল ও।

একটা শহরে ঢুকছে ট্রেন। সাথে ম্যাপ আনেনি, এদিকের জায়গার নামও জানে না ও। কায়রো থেকে কত দূরে চলে এসেছে, তারও হিসেব রাখেনি। দূর থেকে দেখে বোঝা গেল, ছোট একটা শহর। দু'তিনটে ভবন দেখা গেল, স্টেশনের লাগোয়া একটা বাজারও আছে।

ট্রেনটা ওর চেয়ে আগে পৌঁছবে ওখানে। কি করবে, ভেবে নিল রানা। স্টেশনে পৌঁছে লাফ দিয়ে ট্রেনে উঠতে পারে ও, কিন্তু প্রস্তুতি না নিয়ে সেটা করা বোকামি হয়ে যাবে। যা করবে বলে ভেবেছে, তার জন্যে সময় দরকার। শহরে ঢুকে মোটরসাইকেল থামাল ও। চৌরাস্তার মাঝখানে ভেড়ার পাল। একটা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে প্রৌঢ় এক লোক হুঁকো টানছে, রানার সাথে চোখাচোখি হতে সৌজন্য দেখিয়ে হাসল। গাছের সাথে বাঁধা রয়েছে একটা গাধা, মোটর-সাইকেলটাকে মুখ ভেঙচাল। বিড়াল দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠল লোম ওঠা কুকুর। গায়ে নোংরা কম্বল জড়ানো দুটো বাচ্চা ছেলে কাল্পনিক হাতল ধরে পাশাপাশি ছুটল, মুখ দিয়ে আওয়াজ করছে 'ব্রম-ব্রম, ব্রম-ব্রম-ব্রম, ব্রম-ব্রম'। চৌরাস্তা থেকে প্ল্যাটফর্মটা দেখা গেল না, নিচু একটা স্টেশন বিল্ডিং আড়াল করে রেখেছে। তবে গেটটা পরিষ্কার দেখা গেল, বেরিয়ে আসার সময় কেউ ওর চোখ ফাঁকি দিতে পারবে না।

এই স্টেশনে আলেক নামবে বলে মনে হয় না। তবু বলা যায় না। তাই ট্রেন আবার না ছাড়া পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করবে রানা।

পরের স্টেশনে ট্রেনের অনেক আগে পৌঁছবে ও। যা করার করবে ওখানেই।

ধীর গতিতে একটা লেভেল ক্রসিং পেরোচ্ছে ট্রেন। গেটের পিছনে ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকে দেখল নাদিয়া। গাধার পিঠে মোটা এক লোক, খুব ছোট একটা বাচ্চা ছেলে রশি আর ছড়ি হাতে উটের আগে আগে চলেছে, ঘোড়ায় টানা গাড়ি, সামনের দিকে ঝুঁকে থাকা তোবড়ানো চেহারার একদল বুড়ি, তাদের কারও মুখে কথা নেই। হঠাৎ গোঁ ধরে বসে পড়ল উট, ছড়ি দিয়ে সেটার মুখে বাড়ি মারতে শুরু করল ছেলেটা, তারপর পিছিয়ে গেল দৃশ্যটা, হারিয়ে গেল চোখের আড়ালে। কয়েক মুহূর্ত পর স্টেশনে থামবে ট্রেন। যাও বা একটু সাহস সঞ্চয় করেছিল, কখন যেন সেটা উবে গেছে নাদিয়ার মন থেকে। অজুহাত খাড়া করল, প্ল্যান-পরিকল্পনা কিছুই করা হয়নি, কাজেই এখানে নয়, পরের স্টেশনে পালাবার চেষ্টা করবে তারা।

তারপরই ভাবল, কিন্তু ডনকে অন্য কথা বলা হয়েছে। সে যদি এই স্টেশনেই কিছু একটা করে বসে? গাড়ি থামলে ও যদি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে, ভবিষ্যতে ডন আর ওর কোন কথায় বিশ্বাস রাখবে না। উঁহুঁ, পরের স্টেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলবে না। যা করার এখানেই করতে হবে।

কিভাবে কি করা যায় ভাবতে লাগল নাদিয়া। সবচেয়ে আগের কাজ কোনটা?

আলেকের হাত থেকে ডনকে দূরে কোথাও সরিয়ে দেয়া। ডন যদি পালিয়ে যেতে পারে, আর কিছু চায় না সে। তারপর তার নিজের কপালে কি আছে না আছে দেখা যাবে। হঠাৎ ছোটবেলার একটা ঘটনা ভেসে উঠল চোখের সামনে। গ্রামের একটা হোঁৎকা ছেলে অকারণে ধরে মারছিল ওকে, এই সময় রোগা-পাতলা একটা ছেলে এসে ওকে উদ্ধার করার দুঃসাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। হোঁৎকার সাথে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়ে নাদিয়ার উদ্দেশে চিৎকার করছিল রোগা ছেলেটা, 'পালাও, দিয়া. পালাও!' কিন্তু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েই ছিল নাদিয়া, পালাতে পারেনি। রোগা ছেলেটার কথা ভেবে আতঙ্ক অনুভব করছিল সে। জানত, হোঁৎকা তার হাড়গোড় গুঁড়ো করে দেবে।

ঘটনার সবটা আজ আর মনে নেই নাদিয়ার। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত স্মরণ হলো, রোগা ছেলেটা ছিল কাদির!

সমস্ত চিন্তা-ভাবনা থমকে দাঁড়াল মনের ভেতর। কাদিরের সরু, কালো, সুদর্শন চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। আপনমনে বলল নাদিয়া, সেই একেবারে ছোটবেলা থেকে আমার পেছনে লেগে আছে ও! ওই ঘটনার সময় খুব বেশি হলে কাদিরের বয়স ছিল আট কি নয়, আজ ত্রিশ-বত্রিশের কম নয়। বিশ-বাইশ বছর ধরে একটি মেয়ের পেছনে লেগে থাকা, প্রায় কঠিন একটা সাধনার মত। আল্লাই জানে, তার মধ্যে কি দেখেছে কাদির! সে যদি পুরুষ হত, নাদিয়া নামের এই বোকা মেয়েটাকে কখনোই ভালবাসত না। এক সময় চাকরি ছিল না কাদিরের, খাওয়াও জুটত না ঠিকমত, তখনকার কথা না হয় আলাদা। কিন্তু আজ তার হাতে টাকা এসেছে, আন্দাজ করা যায়, পাঁচ গ্রামের লোক তাকে সম্মান করে, নিষ্ঠাবান সৎ মানুষ হিসেবে জানে। তবু কেন তাকে ভুলে গিয়ে বিয়ে করছে না ও? সুন্দরী কনে, যৌতুক··· কি না পেতে পারে ও!

দুচ্ছাই, কোত্থেকে কোথায় চলে এল সে। কাদির, তোমাকে নিয়ে পরে আবার মাথা ঘামানো যাবে কেমন? প্লীজ, কিছু মনে কোরো না।

দ্রুত নিজের চারদিকে তাকাল নাদিয়া। খোলা একটা ক্যারিজে রয়েছে তারা। পনেরো কি বিশ সারি সীট। ডন আর সে বসে আছে পাশাপাশি, সামনের দিকে মুখ করে। ওদের উল্টোদিকে বসেছে আলেক। তার পাশের সীটটা খালি। তার পিছনেই দরজা, তারপর প্ল্যাটফর্ম। আর সব আরোহীদের মধ্যে রয়েছে দু'জন বুড়ো ভদ্রলোক, সারাক্ষণ চোখ বুজে ঝিমাচ্ছে। রয়েছে একজোড়া নব দম্পতি, নিচু গলায় হাসতে আর কথা বলতে এত ব্যস্ত যে বজ্রপাত হলেও বোধহয় টের পাবে না। রয়েছে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তার আবার একটা পা নেই, ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটে। সাথে তার কিশোরী মেয়ে, বাপের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে নব দম্পতির দিকে প্রায় সারাক্ষণই আড়চোখে তাকিয়ে আছে। সবার কাছ থেকে দূরে বসে রয়েছে দু'জন রাশিয়ান ভদ্রলোক, কারও দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না, দু'জনেই খবরের কাগজে নাক ডুবিয়ে আছে। বয়স হয়েছে ওদের, মনে হলো সিভিলিয়ান।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে একটা মসজিদ দেখতে পেল নাদিয়া। তারপর একটা খেলার মাঠ। তারপর স্টেশন। পাকা প্ল্যাটফর্মের পাশে নোংরা মাটিতে

কয়েকটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে, একটা গাছের নিচে হেলান দিয়ে বসে সিগারেট ফুঁকছে বুড়ো এক লোক। ছেলেমানুষ চেহারার ছয়জন সৈনিক লম্বা একটা বেঞ্চে বসে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে এক অন্তঃসত্ত্বা মেয়েলোক, কোলে দুগ্ধপোষ্য শিশু। ট্রেন থামল।

এখনই নয়, মনে মনে আওড়াল নাদিয়া। আবার যখন ছাড়বে ট্রেন, তখন। তাহলে ডনকে ধরার জন্যে বেশি সময় পাবে না আলেক।

বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল নাদিয়ার। অসুস্থ লাগছে, কিন্তু বসে আছে শিরদাঁড়া খাড়া করে। মারাত্মক ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে সে। মনে মনে প্রার্থনা করছে, আল্লা, ডনের যেন কোন ক্ষতি না হয়। ছেলেটা যেন নিরাপদে পালাতে পারে। প্ল্যাটফর্মের দেয়ালে একটা ঘড়ি, পাঁচটা বাজতে পাঁচে অচল হয়ে গেছে কাঁটাগুলো। জানালা দিয়ে ভেতরে মাথা গলিয়ে দিল একজন লোক, হকার, ফলের রস লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করল। হাত ঝাপটা দিয়ে তাকে বিদায় করে দিল আলেক।

তালগাছের সমান লম্বা এক মৌলভী সাহেব ট্রেনে উঠল। পরনে ঢোলা জোব্বা। আলেকের পাশে খালি সীটে বসল সে। দাড়ির ভেতর এক গাল হাসল সে। বলল, 'আসসালামো আলায়কুম।'

'ওয়ালাইকুম সালাম!' সবিনয়ে হাসল আলেক।

ডনের কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে ফিসফিস করছে নাদিয়া, 'ট্রেন ছাড়ার ঠিক আগে একবার বাঁশি বাজবে, বাজলেই ছুটে গিয়ে খুলে ফেলবে দরজা। আমার কথা ভাবতে হবে না, ট্রেন থেকে নেমে যেদিক পারো ছুটতে থাকবে...'

ডন কিছু বলার আগেই জানতে চাইল আলেক, 'কি হচ্ছে কি!'

মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল নাদিয়া। বাঁশি বাজল।

নাদিয়ার দিকে তাকাল ডন, ইতস্তত করছে।

আলেকের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে তার ওপর হিংস্র বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল নাদিয়া। বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে পড়ল আলেক, গালে নখের আঁচড় লাগায় জ্বালা করে উঠল চামড়া। নাদিয়া যেন আর মানুষ নেই, আলেকের প্রতি ঘৃণায় উন্মাদিনী হয়ে উঠেছে। একবার যখন সমস্ত বাধা টপকে শুরু করতে পেরেছে, তাকে আর থামায় কে! অপমানের প্রতিশোধ নিতে হলে লোকটার চোখ দুটো উপড়ে ফেলতে হবে, তাই আলেকের চোখ লক্ষ্য করে তার দশটা আঙুল ছোবল মারল। লোহার মত শক্ত কনুই চালিয়ে নাদিয়ার থুতনিতে আঘাত করল আলেক।

প্রচণ্ড ব্যথায় নেতিয়ে পড়ল নাদিয়া। মনে হলো, মাথার মগজ পর্যন্ত ঝাঁকি খেয়েছে। কয়েক সেকেন্ড কিছুই দেখতে পেল না চোখে। ট্রেনের মেঝেতে পড়ে গেছে, নাকি সীটে ফিরে এসেছে, বুঝতে পারল না। আলেককে বলতে শুনল, 'বজ্জাত মেয়েছেলে! আমার নেই চাকরি, ওনার বায়না শহরে বাসা ভাড়া করে থাকতে হবে! তা নাহলে যে রোজ সিনেমা দেখা হবে না! ছেলেটাকেও নিজের দোসর বানিয়ে নিয়েছে। আজ তোর একদিন কি আমার একদিন! দাঁড়া, আসছি!'

চোখের সামনে থেকে ঝাপসা ভাবটা কেটে যেতে নাদিয়া দেখল, ডনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, দরজা দিয়ে লাফ দিয়ে নেমে গেল আলেক।

সামনের দিকে ঝুঁকে নাদিয়ার মাথায় একটা হাত রাখল মৌলভী সাহেব। 'শান্ত হয়ে বসো, মা। তোমাকে আমি দুটো ধর্মোপদেশ দিই। বেপর্দা হওয়া মুসলমান মেয়েদের জন্যে মহাপাপ! আর স্বামীর অবাধ্য হলে আল্লা তাকে...'

লাফ দিয়ে দরজার কাছে চলে এল নাদিয়া।

'আরে করো কি! করো কি!' আঁতকে উঠল মৌলভী সাহেব।

প্ল্যাটফর্ম ধরে পাগলা বাতাসের মত ছুটছে ডন। তার হাত দশেক পিছনে আলেক, ধাওয়া করছে। প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিছু লোক, অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখছে তারা, কিন্তু যার যার জায়গা ছেড়ে নড়ল না কেউ। ট্রেন থেকে নেমে আলেককে লক্ষ্য করে ছুটল নাদিয়া।

'শালার অবাধ্য ছেলে!' জোর গলায় অভিযোগ করছে আলেক। 'যেমন মা তেমনি তো হবে! চুরি, মিথ্যেকথা কিছু শেখাতে আর বাকি রাখেনি! আজ ব্যাটা তোকে এমন শিক্ষা দেব...' ছুটতে ছুটতেই ছুরি বের করল সে। 'মেরেই ফেলব...'

ট্রেন কেঁপে উঠল। এবার ছাড়বে। ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল আলেক। তার পিছন থেকে চিৎকার করে বলল নাদিয়া, 'পালাও, ডন, পালাও!' কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল ডন। গেটের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে সে। তার সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন টিকেট কালেক্টর। নাদিয়া ভাবল, ডনের কাছে টিকেট নেই, লোকটা ওকে আটকাবে। যদিও তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ, ট্রেন চলতে শুরু করেছে, ডনের আশা ছেড়ে ট্রেনে ফিরে আসতে হবে আলেককে।

ঘাড় ফিরিয়ে ট্রেনের দিকে তাকাল আলেক, কিন্তু গতি কমাল না। নাদিয়া উপলব্ধি করল, নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে ডন, তাকে ধরা এখন আর সম্ভব নয় আলেকের পক্ষে। আনন্দে চোখে পানি এসে গেল তার। ঝুঁকিটা নেয়ায় কাজ হয়েছে। কিন্তু গেটের কাছে পৌঁছেই দড়াম করে আছাড় খেলো ডন।

একটু বালি অথবা কলার খোসায় পা পড়েছিল। পড়ে যাবার পরও তার শরীর স্থির হলো না, কয়েক পাক গড়াল। তার কাছে পৌঁছে ঝুঁকে পড়ল আলেক, দু'হাত দিয়ে ধরে তুলতে গেল তাকে। পিছন থেকে হামলা করল নাদিয়া। আলেকের গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ল সে। টলে উঠল আলেক, হাত থেকে ছুটে গেল ডন। ট্রেন চলছে, কিন্তু গতি বেশি নয়। কাঁধ খামচে ধরা নাদিয়ার হাতের কব্জি ধরল আলেক, হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছড়িয়ে নিল, তারপর চওড়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিঠ থেকে ফেলে দিল ওকে।

এক মুহূর্ত নড়ল না নাদিয়া। মুখ তুলতেই দেখল, ডনকে কাঁধের ওপর তুলে নিয়েছে আলেক। ডন গলা ছেড়ে কাঁদছে আর আলেকের পিঠে ঘুসি মারছে, কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই আলেকের, ট্রেন লক্ষ্য করে ছুটছে সে। ট্রেনের সাথে কয়েক গজ দৌড়াল, তারপর লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। পরাজয়ের দুঃখে নড়তে ইচ্ছে করল না নাদিয়ার। আলেকের আর মুখ দেখতে চায় না ও। কিন্তু ডনকে

তার হাতে ছেড়ে দেয়াও সম্ভব নয়। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল নাদিয়া।

ট্রেনের সাথে ছুটল নাদিয়া। কিন্তু ট্রেনের গতির সাথে পেরে উঠছে না সে। খোলা দরজা দিয়ে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সেই মৌলভী সাহেব, সেটা ধরে ফেলল নাদিয়া। ছোট্ট একটা লাফ দিতেই উঠে পড়ল ট্রেনে।

নিজের সীটে বসে হাঁপাতে লাগল সে। আরোহীরা সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করল তার। ডনের পাছায় চটাস করে একটা চাপড় কষাল আলেক, তারপর ঠুকে বসিয়ে দিল তার সীটে। হাতে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে শুরু করল ডন।

নাদিয়ার দিকে তাকাল আলেক।

'স্বামী-স্ত্রী মনোমালিন্য হয়েই থাকে,' শুরু করল মৌলভী সাহেব, 'কিন্তু তাই বলে কি...'

চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল নাদিয়ার, ও আমার স্বামী নয়! ও খুনী! আমাকে আর ডনকে খুন করার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে...। কিন্তু মুখ খোলার আগেই ওর চোয়ালে ঠাস করে একটা চড় কষাল আলেক। চোখে অন্ধকার দেখল নাদিয়া। কিন্তু আলেক থামল না। মৌলভী সাহেব তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার কথায় কান দিল না সে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে আবার নাদিয়ার গালে চড় মারল সে। চিৎকার করে প্রতিবাদ করতে যায় নাদিয়া, এই সময় প্রতিবার একটা করে প্রচণ্ড চড় খায়। প্রতিটি আঘাত ওর শক্তি আর দম কেড়ে নিচ্ছে।

'তোকে আমি তালাক দেব, ঢেমনী মাগী! লোক হাসাতে লজ্জা করে না তোর!'

সীটের ওপর নেতিয়ে পড়ল নাদিয়া। তাই দেখে ক্ষান্ত হলো আলেক। পিছিয়ে এসে নিজের সীটে বসল।

একটু পর সিধে হলো নাদিয়া। ডনকে নিজের গায়ের ওপর টেনে নিয়ে এসে তার মাথায় হাত বুলাতে লাগল। লক্ষ করল, আরোহীরা সবাই তাকে দেখছে। কিন্তু কারও চেহারায় সহানুভূতির লেশমাত্র নেই। মনে মনে এই সমাজকে ধিক্কার দিল নাদিয়া। পুরুষরা মাঝে মধ্যেই মেয়েদেরকে ধরে পেটাবে, এটা এদেশের রীতি।

খানিক পর ঘুমিয়ে পড়ল ডন। ঘুমের মধ্যেও বারবার ফুঁপিয়ে উঠল সে। মনে মনে আলেককে অভিশাপ দিতে শুরু করল নাদিয়া।

নয়

স্টেশন বিল্ডিঙের মাথায় সাদা ধোঁয়া দেখল রানা। বাঁশি বাজল। তারপর শোনা গেল যান্ত্রিক ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ। স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে ট্রেন।

বোতল থেকে আরেক ঢোক পানি খেলো রানা। কয়েকটা শেষ টান দিয়ে

ফেলে দিল সিগারেট। কয়েকজন কৃষক ছাড়া ট্রেন থেকে আর কেউ নামেনি। স্টার্ট দিয়ে মোটরসাইকেল ছেড়ে দিল ও।

খানিক পরই শহর থেকে বেরিয়ে এসে খালের পাশে সরু, সরল রাস্তায় পড়ল মোটরসাইকেল। এগিয়ে গেল রানা, পিছনে পড়ে থাকল ট্রেন। এখন দুপুর, রোদ এত কড়া যে মনে হলো ছোঁয়া যাবে, হাত পাতলে তালুতে জমবে তরল আগুন। মোটরসাইকেল নিয়ে সোজা খালের মধ্যে গিয়ে পড়লে কি রকম আরাম লাগবে ভাবতে বড় ভাল লাগল রানার।

ইতোমধ্যে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে রানা। কায়রো থেকে রওনা হবার সময় ডন আর নাদিয়াকে উদ্ধার করার কথাই শুধু ভেবেছিল ও। পরে আরও একটা দায়িত্বের কথা মনে পড়ে ওর।

ওর যুদ্ধ পরিকল্পনাটা গ্রহণ করেছে হাই কমান্ড। কিন্তু এই ডিসেপশন প্ল্যানকে বাস্তব রূপ দিতে হলে আলেক বোগানকে শুধু গ্রেফতার করলেই চলবে না, সেইসাথে তার রেডিও, কোড বেস, কোড কী এসবও হাতে আসা দরকার।

রেডিওটা একজনকে দিয়ে দিয়েছে আলেক, নদীতে ফেলে দিয়েছে উপন্যাস, আর কোড কী পুড়িয়ে ফেলেছে। তার মানে তিনটে জিনিসই অন্য কোথাও একটা করে রাখা আছে তার। অন্য কোথাও মানে নিশ্চয়ই আসিউতে। কাজেই আলেককে আসিউতে যেতে দিতে হবে, তার আগে ওকে গ্রেফতার করাটা বোকামি হয়ে যাবে। আসিউতে পৌঁছে জিনিসগুলো উদ্ধার করুক সে, তখন ওগুলো তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে।

অবশ্য এর একটা খারাপ দিক হলো, আসিউতে না পৌঁছে বা পৌঁছেই ডন আর নাদিয়াকে উদ্ধার করা যাচ্ছে না। তবু এই সিদ্ধান্তেই অটল থাকল রানা। জানে, আলেককে এখনই গ্রেফতার করে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে জেরা করা যায়, টরচার করা যায়। কিন্তু আলেক যে মুখ খুলবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এমন অনেক স্পাই দেখেছে রানা, মুখ খোলার চেয়ে মৃত্যুবরণ করাকে শ্রেয় বলে মনে করে। আলেক বোগান তাদেরই একজন নয়, বুঝবে কিভাবে।

তার আগে, ভাবল রানা, ট্রেনে সত্যি ওরা আছে কিনা সেটা নিশ্চিত ভাবে জানতে হবে। কিভাবে জানা যায়, চিন্তা-ভাবনা করে একটা উপায় বের করে ফেলল। ঠিক করল, সেই সাথে ডন আর নাদিয়াকে দেখা দিয়ে ওদেরকে দুশ্চিন্তা থেকে খানিকটা হলেও রেহাই দেয়ার চেষ্টা করবে ও।

পরের স্টেশনে পৌঁছে রানার ধারণা হলো, ট্রেনের চেয়ে পনেরো মিনিট এগিয়ে আছে ও। এটাও ফেলে আসা শহরটার মত, সবদিক থেকে মিলে যায়। সেই নোংরা রাস্তা-ঘাট, সেই উট আর গাধা, একই প্রকৃতির অলস লোকজন। পার্থক্য এই যে পুলিস স্টেশনটা চৌরাস্তার মুখেই, রেলওয়ে স্টেশনের ঠিক উল্টোদিকে। থানার পাশেই বিরাট এক মসজিদ। থানার সামনে মোটরসাইকেল থামিয়ে কয়েকবার হর্ন বাজাল রানা।

থানা থেকে দু'জন আরব পুলিস বেরিয়ে এল। একজন লোকের চুলে পাক ধরেছে, পরনে সাদা ইউনিফর্ম, কোমরের কাছে হোলস্টারে পিস্তল। ব্যাজ দেখে

বোঝা গেল, সার্জেন্ট। শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বেরিয়ে এল সে। তার পিছু পিছু এল আঠারো কি উনিশ বছরের ছোকরা এক কনস্টেবল। এর সাথে কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই। মোটরসাইকেল থেকে নেমে পড়ল রানা। পুলিস দু'জন স্যালুট করল ওকে। স্যালুটের উত্তরে মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'বিপজ্জনক একজন ক্রিমিন্যালকে ধাওয়া করছি আমি। আপনাদের সাহায্য দরকার।' কথাগুলো নিজের কানেই একটু নাটকীয় শোনাল। লক্ষ করল, সার্জেন্টের চেহারায় উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠল। 'চলুন ভেতরে যাই।'

ওদের আগে চলে এল রানা, যেন পথ দেখিয়ে সে-ই ওদেরকে নিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি কাজ আদায় করতে হলে আচরণের মধ্যে এই ধরনের উৎসাহ আর তৎপরতা না থাকলে চলে না। কায়রো থেকে এতদূরের এই অখ্যাত মফস্বল শহরে ওই অফিশিয়াল মর্যাদা কতটুকু আদায় হবে সে-সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। এরা সহযোগিতা করতে রাজি না হলে কিছুই বলার থাকবে না ওর। থানায় ঢুকে একটা খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে দেখল, মাঝারি একটা কামরায় টেলিফোন রয়েছে। সোজা ওই কামরাতেই ঢুকল ও। পুলিস দু'জনও এল পিছু পিছু।

সার্জেন্টকে বলল রানা, 'মিলিটারি হেডকোয়ার্টার, কায়রোয় ফোন করুন, প্লীজ।' নাম্বারটা দিল রানা, লোকটা রিসিভার তুলে ডায়াল করল। অল্প-বয়েসীর দিকে ফিরল রানা। 'মোটরসাইকেলটা দেখেছ?'

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল সে। 'ইয়েস, ইয়েস!'

'চালাতে জানো?'

একগাল হাসল ছোকরা। 'বলতে পারেন আমি একজন এক্সপার্ট, স্যার।'

'তাই? যাও তাহলে, চৌরাস্তায় কয়েকটা চক্কর লাগিয়ে এসো।'

চেহারায় সঙ্কোচ নিয়ে তার সুপরিয়রের দিকে তাকিয়ে থাকল ছোকরা। সুপরিয়র ফোনের রিসিভারে চিৎকার করছে।

'কি হলো, যাও!' উৎসাহ যোগাল রানা।

দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ছোকরা।

রিসিভারটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সার্জেন্ট। 'জেনারেল হেডকোয়ার্টারের লাইন পাওয়া গেছে, স্যার।'

রিসিভার নিয়ে অপারেটরকে বলল রানা, 'মেজর রানা বলছি। ক্যাপ্টেন ফরহাদকে চাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

দেড় মিনিট পর ফরহাদের গলা পেল রানা। 'হ্যালো, ইয়েস?'

'মেজর রানা। মনের একটা খুঁতখুঁতে ভাব, ফরহাদ, একেবারে দক্ষিণে টেনে নিয়ে এসেছে আমাকে।'

'স্যার! আপনি! দক্ষিণে! এদিকে তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে, স্যার! কাল রাতের ঘটনা জানার পর হাইকমান্ড জরুরী মীটিঙে বসেছে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোসাদ্দেক হাসান খলিফাকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আপনাকে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ব্রিগেডিয়ার নুরুদ্দীন হাফিজের সাথে যোগাযোগ

করি আমি। তিনি টেলিফোন করার পর লে. কর্নেল তাঁর নির্দেশ ফিরিয়ে নিয়েছেন। দক্ষিণে, স্যার?' একসাথে এত কথা বলায় হোক, বা উত্তেজিত হয়ে আছে বলেই হোক, হাঁপাতে লাগল ফরহাদ। 'দক্ষিণের ঠিক কোথা থেকে বলছেন আপনি, স্যার?'

'আছি মাত্র কিছুক্ষণ, কাজেই না জানলেও চলবে তোমার,' বলল রানা। 'তাছাড়া, আপাতত একা কাজ করতে চাই আমি। তোমাকে ফোন করার কারণ হলো, জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে এই থানাকে জানানো দরকার, আমার সাহায্য চাই।'

'ঠিক আছে, স্যার,' বলল ফরহাদ। 'ওদের ইনচার্জকে রিসিভারটা দিন, যা বলার বলে দিচ্ছি আমি।'

লোকটার হাতে রিসিভার ধরিয়ে দিয়ে পিছিয়ে এল রানা। ফরহাদ কি বলছে তাকে, আন্দাজ করতে অসুবিধে হলো না। নিজের অজান্তেই শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল লোকটার। বার বার ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার করতে লাগল সে। এক মিনিট পর রিসিভার নামিয়ে রেখে ফিরল রানার দিকে।

'মেজর রানা, আপনি শুধু মুখ ফুটে বলুন কি সাহায্য দরকার আপনার...'

খোলা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। বাইরে তাকিয়ে দেখল চৌরাস্তার ওপর মোটরসাইকেল নিয়ে বার বার চক্কর দিচ্ছে ছোকরা। হর্নের ওপর চেপে রেখেছে আঙুল, সরাবার কোন লক্ষণ নেই। তাকে ঘিরে, রাস্তার দু'ধারে লোকজনের ভিড় জমে উঠেছে, একদল বাচ্চা ছুটছে মোটরসাইকেলের পিছু পিছু। সীটের ওপর খাড়া হয়ে বসে হাতল ধরে আছে ছোকরা, চেহারায় গর্ব। রানার দিকে চোখ পড়তেই দুই কান ছুঁলো তার হাসিটা। রানা ভাবল, ওকে দিয়ে হবে।

'শুনুন,' বলল রানা। 'আসিউত ট্রেন এই এল বলে। এখান থেকে উঠে পরের স্টেশনে নামব আমি।' জানালা দিয়ে ছোকরা পুলিসকে দেখাল। 'আমার মোটরসাইকেল নিয়ে ওখানে আমার সাথে দেখা করবে ও। ঠিক আছে?'

'ইয়েস, স্যার,' লোকটা বলল। 'ট্রেন তাহলে এই স্টেশনে থামছে?'

'তার মানে থামে না?'

'কদাচ, স্যার।'

'তাহলে স্টেশন মাস্টারকে কিছু একটা বলে থামাবার ব্যবস্থা...'

'এখুনি যাচ্ছি, স্যার...।' কামরা থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল সার্জেন্ট।

একটু পরই জানালা দিয়ে রানা দেখল, লোকটা চৌরাস্তা পেরোচ্ছে। ট্রেনের আওয়াজ পাওয়া যায় কিনা শোনার চেষ্টা করল ও, কিন্তু পেল না। আরেকটা ফোন করার সময় পাওয়া যাবে। রিসিভার তুলে ডায়াল করল ও, আসিউত আর্মি বেসের অপারেটরকে বলল, 'ক্যাপ্টেন আহসানকে চাই—আমি মেজর রানা। কুইক!'

'ইয়েস, স্যার। দেখছি উনি আছেন কিনা।'

অপেক্ষা করতে লাগল রানা। ক্যাপ্টেন বেস থেকে বেরিয়ে গেছে কিনা কে জানে। লোকটাকে না পেলে অসুবিধে হবে। তিন মিনিটের মাথায় লাইনে এল

ক্যাপ্টেন আহসান।

'আমি মেজর রানা। তোমার সেই আলেক বোগান এখনও আমাকে নাকানিচোবানি খাওয়াচ্ছে, ক্যাপ্টেন।'

'আপনি নিশ্চয়ই কায়রো থেকে বলছেন না, স্যার!' বলল ক্যাপ্টেন।

'কি করে বুঝলে?'

'পরিষ্কার গলা।'

এর আগেও প্রমাণ পেয়েছে রানা, সাধারণ লোকের চেয়ে ক্যাপ্টেনের উপস্থিত বুদ্ধি বেশি।

'বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি, স্যার।' আবার বলল ক্যাপ্টেন।

'আমি ওর পিছু নিয়েছি, আহসান,' বলল রানা। 'তোমাকে ফোন করছি সাহায্য দরকার বলে। শোনো, আমাদের কাজ করতে হবে চুপিসারে, কাক-পক্ষীও যেন টের না পায়। কারণ আমি তোমাকে পরে ব্যাখ্যা করে বলব। ওর পিছনে আর্মি স্কোয়াড লেলিয়ে দিলে হিতে বিপরীত হবার বেশি সম্ভাবনা, তাই একা কাজ করছি আমি।'

'বুঝেছি, স্যার।'

'দু'ঘণ্টার মধ্যে আসিউতে পৌঁছব,' বলল রানা। 'আমার একটা ট্যাক্সি, একটা গালাবাইয়া একজন মোটর মেকানিক আর ছোট একটা ছেলে দরকার হবে।'

'ঠিক আছে, স্যার। সব ব্যবস্থা করে রাখব আমি।'

'মেকানিক কেন দরকার, সেটা শুনে রাখো,' মেকানিককে দিয়ে কি করাতে হবে ব্যাখ্যা করে জানিয়ে দিল রানা।

'আপনি কি, স্যার গাড়ি নিয়ে আসছেন?'

'তোমার সাথে আমি সিটি লিমিটে দেখা করলে কেমন হয়?'

'ফাইন, স্যার।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। থানা থেকে বেরিয়ে এল চৌরাস্তায়। উত্তর দিকে ধোঁয়া দেখল ও, ট্রেন আসছে। ওর পাশে থামল মোটরসাইকেল। রানা বলল, 'পরের স্টেশনে ট্রেনের আগেই পৌঁছুতে হবে তোমাকে। পারবে তো?'

একগাল হাসল ছোকরা। 'পেরে বেশি, স্যার!'

মানি ব্যাগ থেকে একশো পাউন্ডের একটা নোট বের করল রানা। ছোকরার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। নোটটা মাঝখান থেকে ছিঁড়ে দু'টুকরো করল রানা, এক টুকরো নিজের কাছে রেখে ছোকরার হাতে গুঁজে দিল দ্বিতীয় টুকরোটা। 'এটা রাখো, পরের স্টেশনে আমার কাছ থেকে বাকিটুকু চেয়ে নিয়ো মনে করে।'

'ঠিক আছে।' রাজি হয়ে ঘাড় কাত করল ছোকরা।

প্রায় পৌঁছে গেছে ট্রেন। চৌরাস্তার ওপর দিয়ে ছুটল রানা। গেটের কাছে দেখা হলো সার্জেন্টের সাথে।

'স্টেশন মাস্টার ট্রেন থামাচ্ছে, স্যার।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আপনার নামটা বলুন।'

'করিম আবদুল জব্বার।'

. 'পুলিস হেডকোয়ার্টারে আপনার কথা বলব, গুডবাই।' স্টেশনে ঢুকে প্ল্যাটফর্ম ধরে দক্ষিণ দিকে ছুটল রানা। ট্রেন থামলে সামনের অংশে উঠতে চায় ও, আরোহীরা যাতে জানালা দিয়ে দেখতে না পায় ওকে।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে স্টেশনে ঢুকল ট্রেন। হন হন করে এগিয়ে এসে রানার পাশে দাঁড়াল স্টেশন মাস্টার। ট্রেন থামতে ইঞ্জিন ড্রাইভার আর ফুটপ্লেটম্যানের সাথে কথা বলল সে। ওদের দু'জনকে বকশিশ দিয়ে ট্রেনে চড়ল রানা।

এটা একটা ইকোনমি ক্যারিজ। আলেক নিশ্চয়ই ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে। একের পর এক কামরার ভেতর দিয়ে ট্রেনের পিছন দিকে এগোল রানা। আরোহীরা তাদের বাক্স-প্যেটরা নিয়ে গাদাগাদি করে বসে আছে, এই দম আটকানো ভিড়ের মধ্যে ছাগল ভেড়ারও কোন অভাব নেই। কাঠের বেঞ্চের ওপর বসেছে পুরুষরা, সিগারেট ফুঁকছে আর গরম চায়ের কাপে আয়েশ করে চুমুক দিচ্ছে। মেঝেতে বসেছে মেয়েলোক আর বাচ্চাকাচ্চারা, কষ্ট আর ধকল সবটুকু তাদের কপালেই জুটছে। কিছু মেয়েলোক কেরোসিনের চুলো জ্বেলে রান্নাবান্নার কাজটাও ট্রেনে বসে সেরে নিচ্ছে। মেঝেতে হামাগুড়ি দিচ্ছে দুগ্ধপোষ্য একটা শিশু, দেখতে না পেয়ে আরেকটু হলেই তাকে মাড়িয়ে দিচ্ছিল রানা।

চার পাঁচটা ইকোনমি কামরা পেরিয়ে এসে প্রথম শ্রেণী কোচের সামনে থামল রানা। বাইরে একজন গার্ডকে দেখল ও। কাঠের টুলে বসে চা খাচ্ছে। রানাকে দেখে কাপ রেখে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল। 'দীর্ঘজীবী হোন, স্যার, জেনারেল! চায়ের ব্যবস্থা করব, স্যার-জেনারেল?'

'না, ধন্যবাদ,' হাসি চেপে বিশুদ্ধ আরবীতে বলল রানা। ওদের পায়ের নিচে বিকট আওয়াজ করছে ট্রেনের চাকা, কথা বলার সময় চিৎকার করতে হয়। 'প্রথম শ্রেণীতে যারা রয়েছে, তাদের সবার কাগজ-পত্র চেক করতে চাই আমি।'

'সব ঠিক-ঠাক, স্যার-জেনারেল!' বলল গার্ড। 'কোথাও কোন গোলমাল নেই।'

'ফার্স্ট ক্লাস কাউচ ক'টা?' জানতে চাইল রানা।

কি বুঝল কে জানে, প্রৌঢ় গার্ডের চেহারা কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠল। ইনিয়ে বিনিয়ে শুরু করল সে, 'স্যার-জেনারেল, আপনি মা-বাপ! হারাম, এক পয়সাও ঘুষ খাইনি! খোদার কসম...'

ঝুঁকে পড়ে লোকটার কানের কাছে চিৎকার করল রানা। 'ফার্স্ট ক্লাস কোচ ক'টা?'

থমকে গেল গার্ড। স্যার-জেনারেল কোন অভিযোগ করেননি বুঝতে পেরে স্বস্তি বোধ করল সে। হাত তুলে দুটো আঙুল দেখাল সে।

সিধে হলো রানা, তাকাল দরজার দিকে। হঠাৎ করেই দ্বিধায় পড়ে গেল ও, কাজটা বোকামি হয়ে যাচ্ছে না তো? ওর ধারণা, ওকে ভাল করে দেখার সুযোগ হয়নি আলেকের। ওদের মধ্যে মারপিট হয়েছিল অন্ধকার গলিতে। কিন্তু আবার বলাও যায় না। চোয়ালের ক্ষতটা দেখে ওকে অবশ্য চিনতে পারবে না আলেক, কারণ দাড়ির নিচে চাপা পড়ে আছে সেটা। সাবধানের মার নেই, মুখের ওই

দিকটা আলেকের চোখে পড়তে দেবে না ও। আসল সমস্যা ডনকে নিয়ে। তাকে রানার সাবধান করে দিতে হবে, ওকে চিনেও যেন না চেনার ভান করে সে। কিন্তু সাবধান করার আগেই যদি চেঁচিয়ে ওঠে ডন? মুশকিল হলো, এ-ব্যাপারে আগে থেকে কোন বুদ্ধি করে রাখার উপায় নেই। সরাসরি ঢুকে পড়তে হবে ওকে, পরিস্থিতি দেখে উপস্থিত বুদ্ধি মত কাজ করতে হবে।

বুক ভরে বাতাস নিল রানা, তারপর দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

সামনের কয়েকজনের ওপর দ্রুত চোখ বুলাল রানা। কাউকে চিনতে পারল না। আরোহীদের দিকে পিছন ফিরল ও, ধীরে-সুস্থে বন্ধ করল দরজা। তারপর আবার সামনের দিকে ফিরল। এবার আরোহীদের যে-ক'জনকে এখান থেকে দেখা যায়, তাদের সবার ওপর চোখ বুলাল। কোথাও নেই ডন।

সবচেয়ে কাছের একজন আরোহীকে বলল ও, 'আপনার আইডেনটিটি কার্ড, প্লীজ?'

'কি ব্যাপার, মেজর?' ভদ্রলোক কর্নেল।

'হাই কমান্ডের নির্দেশ, স্যার। পুলিস চেক করে, কিন্তু ওদের কাজে আমরা সন্তুষ্ট নই।'

আরোহীদের কাগজ-পত্র চেক করতে করতে দু'সারি সীটের মাঝখান দিয়ে সামনের দিকে এগোল রানা। কোচের মাঝামাঝি এসে নিশ্চিতভাবে বুঝল, এই কামরায় নেই ওরা। ইচ্ছে হলো এখুনি পাশের কোচে ঢোকে, কিন্তু চেক করার অভিনয়টা শেষ না করলে লোকের মনে সন্দেহ জাগবে।

শেষ পর্যন্ত যদি দেখা যায়, এই ট্রেনে নেই ওরা! যদি এমন হয়, আসিউতে নয়, ওদেরকে নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় যাচ্ছে আলেক? কে জানে, অ্যাটলাসে রক্ত আর তীর চিহ্ন আসলে একটা চালাকি, চালাকিটা হয়তো আলেকই করেছে।

কাজ শেষ করে প্রথম কোচ থেকে বেরিয়ে এল রানা। দুই কোচের মাঝখানে ছোট্ট একটু জায়গা। ট্রেনে যদি আলেক থাকে, এবার তার সাথে দেখা হবে ওর। দ্বিতীয় কোচের দরজা খুলল ও।

ভেতরে চোখ পড়তেই ডনকে দেখতে পেল রানা। বুকের ভেতরটা নড়ে উঠল। সীটের ওপর এলিয়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে ডন, পা দুটো মেঝের কাছে নেমে গিয়ে ঝুলছে। মাথার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে প্রায় ঢেকে দিয়েছে চোখ দুটো। মাথাটা নাদিয়ার কোলে। নাদিয়া তাকে একহাতে জড়িয়ে ধরে আছে।

মুখ তুলে তাকাল নাদিয়া।

রানা দেখল, ওর ওপর চোখ পড়তেই মুখের চেহারা বদলে যেতে শুরু করল নাদিয়ার। বিস্ময়ের ধাক্কায় বিস্ফারিত হয়ে উঠছে চোখ, আওয়াজ করার জন্যে খুলে যাচ্ছে মুখ। তৈরিই ছিল রানা, ঠোঁটে আঙুল রাখল একটা। আর কেউ যদি তাকিয়ে থাকে, তাকে ব্যাপারটা বুঝতে না দেয়ার জন্যে আঙুলটা ঠোঁট থেকে নামাবার আগে নাকের ফুটোর নিচেটা নখ দিয়ে একটু চুলকে নিল ও, যেন সেজন্যেই আঙুলটা ওখানে তুলেছে। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি মুখ বন্ধ করল নাদিয়া, চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল। কিন্তু পরিষ্কার কিছু না দেখেও, কিছু একটা

সন্দেহ হলো আলেকের। এক সেকেন্ড আগে নাদিয়া যেদিকে তাকিয়ে ছিল, অর্থাৎ রানার দিকে তাকাল সে।

রানার বাঁদিকে রয়েছে ওরা, আলেকের ছুরিও রানার বাঁ চোয়ালে লেগেছিল। কোচের দিকে পিছন ফিরল ও, আলেকের উল্টোদিকের সীটে বসা আরোহীকে বলল, 'আপনার আইডেনটিটি কার্ড, প্লীজ।'

ডন ঘুমিয়ে থাকবে, এটা রানা আশা করেনি। ভেবেছিল, ডনের সাথে চোখাচোখি হলেই দ্রুত একটা ইশারা করে চুপ থাকতে বলবে তাকে। বুদ্ধিমান ছেলে, ইঙ্গিত পেলে বিস্ময় আর আনন্দের ভাবটুকু গোপন রাখতে পারত। কিন্তু ডন ঘুমিয়ে থাকায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়ে গেল। জেগে থাকা মানুষ আর সদ্য ঘুম থেকে জাগা মানুষ, দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। হঠাৎ যদি ঘুম থেকে জেগে রানাকে দেখতে পায় ডন, রানা ইঙ্গিত করলেও সেটা বুঝবে না সে। চেঁচিয়ে উঠবে, লাফ দিয়ে ধরতে আসবে ওকে।

আলেকের দিকে ফিরল রানা। 'কার্ড, প্লীজ!'

শত্রুকে এই প্রথম সামনে থেকে দেখছে রানা। ঠিক সুদর্শন বলা যায় না, তবে সুপুরুষ বলতেই হয়। পেশল শরীর, যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। গায়ের রঙ রোদে পোড়া তামাটে। চওড়া কাঁধ, হাত-পা লম্বা লম্বা, চোয়াল দুটো উঁচু। বোঝাই যায়, প্রচণ্ড শক্তিশালী। শুধু চোখদুটো ছোট ছোট, ঘন ভুরুর নিচে চোখের পাতা কুঁচকে আছে। চেহারায় বিদেশী ভাব থাকলেও, খুঁটিয়ে না দেখলে ধরার উপায় নেই। রানার হাতে আইডেনটিটি কার্ড ধরিয়ে দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে, ঝামেলা বোধ করছে।

কার্ডে নাম রয়েছে, আলেক বোগান, ভিলা লে অলিভিয়ার্স, গার্ডেন সিটি, কায়রো। রানা ভাবল, লোকটার নার্ভ আছে বলতে হবে!

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?' জানতে চাইল রানা।

'আসিউত।'

'ব্যবসা?'

রানার দিকে ফিরল আলেক। একটু চড়া গলায় বলল, 'না। আত্মীয়ের কাছে যাচ্ছি।'

ডন আর নাদিয়ার দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আপনি একা?'

'না,' বলল আলেক। ডন আর নাদিয়াকে ইঙ্গিতে দেখাল সে। 'এঁরাও আমার সাথে আছে।'

'এরা আপনার…?'

'আমার স্ত্রী আর ছেলে।' রানার বাড়ানো হাত থেকে আইডেনটিটি কার্ড নিয়ে আবার অন্যদিকে ফিরল আলেক। নাদিয়ার দিকে তাকাল রানা। 'আপনার কাগজ, প্লীজ।'

হ্যান্ডব্যাগ খুলল নাদিয়া, দেখল, এদিকে ফিরে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে আলেক।

নাদিয়ার হাত থেকে কাগজ নিয়ে না দেখেই ফিরিয়ে দিল সেটা। বলল,

'বাচ্চাটাকে আর ঘুম থেকে তোলার দরকার নেই।' আলেকের পাশে বসে থাকা মৌলভী সাহেবের দিকে তাকাল ও। মৌলভী সাহেব আগেই তার কার্ড বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরে আছে।

'হঠাৎ এরকম চেক করা হচ্ছে, কি ব্যাপার, মেজর?' জানতে চাইল আলেক।

মুখ তুলে তার দিকে তাকাল রানা। দেখল, লোকটার মুখে তাজা কিছু আঁচড়ের দাগ। তাহলে বোধহয় নাদিয়ার কাছ থেকে এক-আধটু বাধা পেয়েছে। 'সিকিউরিটি।' বলল ও।

মৌলভী সাহেব বলল, 'আমিও আসিউতে যাচ্ছি, মেজর।'

'আচ্ছা!' বলল রানা। 'নিশ্চয়ই বারো গম্বুজ মসজিদে? নাকি...'

'তার মানে আসিউতে গেছেন আপনি!'

'না,' বলল রানা, 'এখনও যাবার সৌভাগ্য হয়নি। তবে যাব বলে আশা রাখি।' মৌলভী সাহেবের কাগজ ফিরিয়ে দিল ও। 'ধন্যবাদ।'

পিছিয়ে এসে পরের সারির লোকদের কাগজ দেখতে শুরু করল ও। খানিক পর আবার মুখ তুলতে আলেকের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল ওর। আলেকের চেহারায় কোন ভাব নেই, কিন্তু তাকিয়ে আছে রানার দিকে। রানা ভাবল, এমন কোন ভুল করেছি যাতে ওর সন্দেহ হতে পারে? একটু পর আবার যখন তাকাল, দেখল, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে আলেক।

কি ভাবছে নাদিয়া? ভাবছে, রানা তাদেরকে এখুনি উদ্ধার করবে? বোধহয় তা ভাবছে না। উদ্ধার করার প্ল্যান থাকলে এতক্ষণে কাজ শুরু করে দিত ও, ঘুর ঘুর করত না—এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি নাদিয়ার আছে। এখন সে জানে, তারা অসহায় আর একা নয়।

আর আলেক কি ভাবছে? চেহারা দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। হয়তো অধৈর্য হয়ে উঠছে। উঁহুঁ, তা নয়। লোকটা আসলে একঘেয়ে বোধ করছে। বিরক্ত।

কোচের শেষ মাথায় এসে শেষ লোকটারও কাগজ দেখা শেষ করল রানা। চোখ বুলিয়ে কাগজটা ফিরিয়ে দিচ্ছে, এই সময় তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক।

'ফ্রেন্ড! ফ্রেন্ড, বাঁচাও!'

ঝট্ করে মুখ তুলল রানা। সীট থেকে নেমে পড়েছে ডন, দু'সারি সীটের মাঝখান দিয়ে ছুটে আসছে ওর দিকে, হাত দুটো সামনে বাড়ানো।

সর্বনাশ!

ডনের পিছনে আলেক আর নাদিয়াকে দেখল রানা, দু'জনেই উঠে দাঁড়াচ্ছে। দু'জনেই ওরা তাকিয়ে আছে রানার দিকে। আলেকের চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, নাদিয়ার চোখে আতঙ্ক।

পিছনের দরজাটা খুলে ফেলল রানা। ভান করল, ডনের ব্যাপারটা লক্ষ করেনি ও। দরজা দিয়ে পিছিয়ে এল। ঝড়ের মত ডনও বেরিয়ে এল কোচ থেকে। দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা।

রানাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল ডন। তাকে আলিঙ্গন করে পিঠে মাথায়

হাত বুলাল রানা। 'শান্ত হও, ডন। তোমার কোন ভয় নেই। শান্ত হও।'

যে কোন মুহূর্তে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে পারে আলেক।

'লোকটা আমাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে,' ফুঁপিয়ে উঠল ডন। 'আমাকে স্কুলে নিয়ে যাবার নাম করে...'

'সব জানি আমি, ডন,' বলল রানা। ইচ্ছে হলো, প্ল্যানটা বাতিল করে দেয়। এই মুহূর্তে আলেককে খুন করে ওদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় কায়রোয়। কিন্তু সেই সাথে বাতিল হয়ে যাবে তার ডিসেপশন প্ল্যান। আলেকের রেডিও আর কোড কী চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে। না, ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়। মনটাকে শক্ত করল রানা। 'শোনো,' ডনকে বলল ও। 'কিসের ভয় তোমার, ডন? সব সময় তোমাদের কাছাকাছি আছি আমি। লোকটাকে কায়দামত ধরতে হবে তো, তাই তোমার এমন ভান করতে হবে, আমাকে যেন চিনতে না পারে ও। বুঝেছ? তোমাকে একজন ইসরায়েলি স্পাইয়ের কথা বলেছিলাম, মনে আছে? এই সেই লোক।'

'বুঝেছি,' বলল ডন। 'কিন্তু ওর সাথে থাকতে ভয় করছে আমার...'

'তোমার সাথে নাদিয়া রয়েছে, আমি রয়েছি, তাহলে আর ভয় কি? ভেবে দেখো, পারবে ওর কাছে ফিরে যেতে? গিয়ে বলবে, লোক চিনতে ভুল হয়েছিল তোমার। পারবে, ডন?'

হতভম্ব দেখাল ডনকে। সে তার বন্ধুর কাছ থেকে এ-ধরনের একটা প্রস্তাব পাবে বলে দুঃস্বপ্নেও আশা করেনি। উদ্ধার করার সুযোগ পেয়েও বন্ধু তাকে আবার সেই শত্রুর হাতে ফেরত পাঠাচ্ছে! মুখে কিছু বলল না বটে, কিন্তু চেহারাই বলে দিল তার সমগ্র অস্তিত্ব না-না-না বলে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে।

'এটা সত্যিকার একটা গোয়েন্দা গল্প, ডন,' বলল রানা। 'আমি গোয়েন্দা, তুমি আর নাদিয়া আমার সহকারী। আর ওই লোকটা, ওর নাম আলেক বোগান, ও হলো ভিলেন। কোন বইতে পড়েছ, ভিলেন জিতে যায়? প্রকৃতির বিচার এমনই যে তা কখনও ঘটে না। যে অপরাধী, তাকে ধরা পড়তেই হবে।'

ডন কথা বলল না। তবে এখন আর কাঁদছে না।

দরজা খুলে কোচ থেকে বেরিয়ে এল আলেক। তার একটা হাত কোমরের বেল্টের কাছে। রানা আন্দাজ করল, ওখানে ছুরি আছে।

'এসবের মানে কি?' জানতে চাইল আলেক।

চেহারাটা ভাবশূন্য করে তুলে জোর করে হাসল রানা। 'যতদূর বুঝতে পারছি, হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে আমাকে অন্য কেউ বলে ভুল করেছে ও।' ডনের মাথায় হাত বুলিয়ে একটু আদর করল ও। 'তোমার নাম কি, খোকা?'

ডনের দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকাল আলেক। 'হোয়াট ননসেন্স! এত বয়স হলো, আর কবে মানুষ হবে? এসো, ফিরে এসো।'

গ্যাট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডন।

'কি,' হাসিমুখে জানতে চাইল রানা, 'তোমার নামটা যে বললে না?'

'আমার ডাক নাম ডন...'

'ডন? বানান করো তো!'

'ডি ও এন।'

'বাহ্, খুব সুন্দর নাম তো! তা, ডন মানে জানো?' ডন চুপ করে আছে দেখে আবার বলল রানা, 'ডন স্প্যানিশ শব্দ, মনীষীদের উপাধি বা পদবী হিসেবে ব্যবহার হয়, শিক্ষকের শিক্ষক হিসেবেও অর্থ করা হয়। তা, বড় হয়ে তুমি কি হবে?'

সব ভুলে গিয়ে মুচকি একটু হাসল ডন। 'বড় হয়ে আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ হতে চাই।'

'তাই? ভেরি গুড!'

'দুঃখিত, স্যার,' বলল ডন। 'আমি আসলে আপনাকে চিনতে ভুল করেছিলাম!' ঘুরে দাঁড়াল সে, খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল কোচে। তাকে অনুসরণ করল আলেক। রানা থাকল সবার পিছনে। এতটুকু ছেলের সাহস দেখে মুগ্ধ হলো ও, সেই সাথে তার মনের অবস্থার কথা ভেবে মনটা কেঁদে উঠল।

দু'সারি সীটের মাঝখান দিয়ে এগোবার সময় রানা অনুভব করল, ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে আসছে। তার মানে পরের স্টেশনে প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা। মোটরসাইকেল নিয়ে ছোকরা এসেছে তো? নাকি রাস্তার ধারে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে আছে কোথাও? নিজের সীটে ফিরে এসে বসল ডন। রানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে নাদিয়া, তার হাত ধরে ডন বলল, 'আমারই ভুল হয়েছিল। উনি আমার ফ্রেন্ড নন। হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে চিনতে পারিনি।' ডনের দিকে তাকাল নাদিয়া, তারপর আবার রানার দিকে। তার চোখে আশ্চর্য একটা জ্বল জ্বলে ভাব ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল রানা, মনে হলো, এই বুঝি কেঁদে ফেলবে নাদিয়া।

ওদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে মন চাইল না। ইচ্ছে হলো ওদের কাছে বসে কথা বলে, কিছুক্ষণ সঙ্গ দেয়। জানালা দিয়ে তাকিয়ে আরেকটা ধুলো মাখা শহর দেখল ও। ইচ্ছেটার গলা টিপে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ডনের দিকে। বলল, 'মি. ডিটেকটিভ, বিদায়।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

কোচ থেকে বেরিয়ে এল রানা।

স্টেশনে ঢুকে থামল ট্রেন। প্ল্যাটফর্মে নেমে কয়েক পা হেঁটে একটু দূরে সরে এল রানা। দাঁড়াল শামিয়ানা টাঙানো একটা রেস্তোরাঁর দরজায়। ট্রেন থেকে আর কেউ নামল না, ইকোনমি ক্লাসে উঠল দু'একজন। একটু পরই বাঁশি বাজল। রাশ রাশ ধোঁয়া ছেড়ে আবার চলতে শুরু করল ট্রেন। দু'নম্বর কোচের জানালায় চোখ রেখে অপেক্ষা করছে রানা।

জানালাটা ওর সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে, এই সময় ডনকে দেখতে পেল ও। জানালা দিয়ে হাত বের করে সামান্য একটু নাড়ল ডন। উত্তরে চোখ মটকাল রানা। পর মুহূর্তে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে গেল ট্রেন।

রানা অনুভব করল, একটু একটু কাঁপছে ও।

দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে ট্রেন, প্রখর রোদে ঝাপসা দেখাল সেটাকে। কত বড় ঝুঁকি

নিয়েছে ও ভাবতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিল ওর। এখন যদি কোন বিপদ হয় ডনের, জীবনেও নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না ও।

মাথা নিচু করে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল রানা। মুখ তুলতেই রাস্তার ধারে মোটরসাইকেলটাকে দেখতে পেল, সীটের ওপর রাজকীয় ভঙ্গিতে বসে আছে ছোকরা। তাকে ঘিরে ছোট একটা ভিড় জমে উঠেছে, হাত নেড়ে রহস্যটা ব্যাখ্যা করছে সে। রানাকে আসতে দেখে সীট থেকে নেমে স্যালুট করল, বলল, 'বান্দা হাজির, স্যার!'

নোটের বাকি অর্ধেকটা তার হাতে গুঁজে দিল রানা। বলল, 'ধন্যবাদ।' মোটরসাইকেলে উঠে বসে স্টার্ট দিল ও। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ফিরবে কিভাবে?'

'ট্রেন পাই তো ভাল, তা না হলে ঘোড়ার গাড়ি তো আছেই, স্যার।'

মোটরসাইকেল ছেড়ে দিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে এল রানা। সরাসরি মাথার ওপর থেকে একটু নেমেছে সূর্য, কিন্তু তার তেজ এখনও কমেনি। পানি খেতে ইচ্ছে করল ওর। ভাবল, কিন্তু খাব না। ওদেরকে বিপদের মধ্যে ফেলে রাখার জন্যে এই শাস্তিটুকু পাওনা হয়েছে ওর।

খানিক পরই ট্রেনটাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে এল মোটরসাইকেল। রানা আন্দাজ করল, ট্রেনের চেয়ে পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ মিনিট আগে আসিউতে পৌঁছবে ও। সেখানে ক্যাপ্টেন আহসান অপেক্ষা করবে ওর জন্যে।

নিজেকে আরেকবার বোঝাল রানা, যা করেছে ঠিকই করেছে ও। সব দিক রক্ষার জন্যে এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু মনের আড়াল থেকে একটা কণ্ঠস্বর তিরস্কার করতে লাগল ওকে—নিষ্ঠুর, তুমি নিষ্ঠুর!

দশ

স্টেশনে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন। বড় কালো বোর্ডে সাদা রঙ দিয়ে আঁকা একটা শব্দ দেখল নাদিয়া। আসিউত। পৌঁছে গেছে বুঝতে পেরে হঠাৎ আতঙ্কের একটা ধাক্কা অনুভব করল সে।

ট্রেনে রানাকে দেখে স্বস্তি বোধ করেছিল নাদিয়া। তার এবং ডনের নিরাপত্তার দায়িত্ব রানা নিজের হাতে তুলে নেবে, এই ভেবেছিল সে। সমস্ত দুশ্চিন্তা আর আতঙ্ক থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল সে, এমন কি কল্পনার চোখে দেখতে শুরু করেছিল, রানার হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে রক্তাক্ত আলেক বোম্মান হাত জোড় করে মাফ চাইছে। আরোহীদের কাগজ পরীক্ষা করছিল রানা, আর প্রতি মুহূর্তে আশা করছিল সে, পকেট থেকে রিভলভার বের করে আলেককে সারেন্ডার করাবে ও, কিংবা হঠাৎ বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর। কিন্তু কোথায় কি! ধীরে ধীরে বুঝতে পারে নাদিয়া, তার আশা পূরণ হতে দেরি আছে। ব্যাপারটা এত সহজ নয়। রানা অন্য কোন প্ল্যান করেছে।

সে প্ল্যান সম্পর্কে কিছু জানে না নাদিয়া, কিন্তু রানার নার্ভ দেখে অবাকই হয়েছে সে। ডনের সাথে ওর রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও, আপন ছোট ভাইয়ের মতই তাকে ভালবাসে ও। সেই ছোট ভাইটিকে আলেকের মত একজন নিষ্ঠুর খুনীর হাতে ছেড়ে রেখে গেল! ডনের সাহসেরও বলিহারি। গোটা ব্যাপারটা এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না নাদিয়া।

ভাবতে চেষ্টা করল, কি করবে বলে ঠিক করেছে রানা? সন্দেহ নেই, রেবেকা কোড রানার মাথা থেকে নামেনি। নিশ্চয়ই এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাইছে ও। ভুল হলো, এক ঢিলে তিন পাখি। কোড কী হাত করবে, আলেককে গ্রেফতার করবে, আবার তাকে আর ডনকে উদ্ধারও করবে। একসাথে অনেক বেশি কাজ হয়ে যাচ্ছে না?

হতে পারে, রানা হয়তো এমন একটা বুদ্ধি বের করেছে, এক ঢিলে এই তিন পাখিই মারা সম্ভব হবে। নাদিয়া ভাবতে লাগল সেই ঢিলটা কি হতে পারে। হঠাৎ হাসি পেল নাদিয়ার, সেইসাথে বোকা মনে হলো নিজেকে। এটাই তো সেই ঢিল, ওদের দু'জনকে আলেকের হাতে রেখে যাওয়া!

ডন ব্যাপারটাকে সহজ আর হালকা ভাবে নিয়েছে, সেটা একটা বিরাট স্বস্তি। ফ্রেন্ডের ওপর অগাধ আস্থা তার, জানে, খোঁজ যখন বের করতে পেরেছে, উদ্ধার তারা পাবেই। ডনের পরিবর্তনটাও লক্ষ করল নাদিয়া। আগে কাঁদো কাঁদো ভাব ছিল চেহারায়, এখন তাকে একটু গম্ভীর দেখাচ্ছে। নাদিয়া জানে, তার এই গাম্ভীর্যটুকু আসলে মুখোশ। হাসতে দেখলে কিছু সন্দেহ করবে আলেক, তাই মুখোশ পরে আছে। ট্রেন থেকে রানা নেমে যাবার পর ডনকে কড়া ধমক লাগিয়েছে আলেক। সবাইকে আড়াল করে ছুরিটাও বের করে দেখিয়েছে, বলেছে, 'ফের যদি বোকার মত কিছু করো, পেটের ভেতর এটা ঢুকিয়ে দেব সবটুকু।'

'ঘুমের ঘোরে ভুল করে ফেলেছি,' আলেককে বলেছে ডন। তার চেহারায় ভয় আর ক্ষমা প্রার্থনার ভাব ফুটে উঠতে দেখে শান্ত হয়েছে আলেক। আর নাদিয়া অবাক হয়ে ভেবেছে, এতটুকুন ছেলে, তার পেটে পেটে এত বিদ্যে! কি অভিনয়টাই না করল!

একটু পর সরল চেহারা নিয়ে, নিরীহ ভাল মানুষের সুরে জানতে চেয়েছে ডন, 'ওই ছুরিটা আপনার বুঝি খুব প্রিয়? কোত্থেকে এল আপনার কাছে? এইরকম ছুরি আগে কখনও দেখিনি আমি।'

ডনের এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়নি আলেক। স্রেফ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়েছে মুখ।

ডনের কাণ্ডটা আলেককে ভয় পাইয়ে দিলেও, ব্যাপারটা স্রেফ ভুল বোঝাবুঝি ধরে নিয়ে মনের শান্তি ফিরে পেয়েছে সে। রানাকে ট্রেন থেকে নেমে যেতে দেখে একটু যা সন্দেহ ছিল, সেটাও দূর হয়ে গেছে তার। তবে, নাদিয়া লক্ষ করছে, যতই গন্তব্যের কাছে চলে আসছে, ততই কঠিন আর গম্ভীর হয়ে উঠছে তার চেহারা। প্রথম যেদিন আলেকের সাথে পিকনিক করেছিল, সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল নাদিয়ার। সেই কোমল, ভদ্র আচরণ, মার্জিত হাসি কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

আসলে এই গাম্ভীর্য আর কাঠিন্যই হয়তো লোকটার চেহারার আসল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু লোকটা যে নার্ভাস বোধ করছে, তাও ধরা যায়। ঠোঁটের কোণ হঠাৎ হঠাৎ কুঁচকে বা কেঁপে উঠছে। দু'একবার মনে হলো, নিঃশব্দে হাসতে গিয়েও হাসল না।

একটা কথা ভেবে অবাক লাগল নাদিয়ার, আলেক এমন নিষ্ঠুর হওয়া সত্ত্বেও প্রতিযোগিতার শেষ দিকে নার্ভাস, মরিয়া হয়ে উঠছে। আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী রানা? অস্থিরতা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেছে ও, হাবেভাবে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। আলেকের হাতে তাদেরকে ছেড়ে যাওয়াতেই কি সেটা প্রমাণ হয় না?

তারপর ভাবল নাদিয়া, মেজর রানা, শান্ত হয়েছ ভাল কথা, কিন্তু এত শান্ত হয়ো না যাতে আমাদের কথা একেবারে ভুলে যাও। তুমি ছাড়া আমাদের গতি নেই, কথাটা মনে রেখো।

সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আলেক। লাগেজ র‍্যাক থেকে সুটকেসটা নামাল। তার পিছু পিছু ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে এল নাদিয়া আর ডন। পিছনে ফেলে আসা শহরগুলোর চেয়ে এই শহরটা বড়, স্টেশনে তাই বেশ ভিড় দেখা গেল। যারা উঠতে চায় ট্রেনে তাদেরকে ঠেলে এগোনো দায় হয়ে উঠল। আশপাশে যারা রয়েছে তাদের সবার চেয়ে এক মাথা উঁচু আলেক, এদিক ওদিক তাকিয়ে গেটটা দেখতে পেল সে, তারপর এলোপাতাড়ি কনুই চালিয়ে এগোতে চেষ্টা করল সেদিক। হঠাৎ খালি পায়ের নোংরা এক ছেলে ছুটে এসে আঁকড়ে ধরল আলেকের সুটকেস, চিৎকার জুড়ে দিল, 'ট্যাক্সি মিলবে! ট্যাক্সি মিলবে!'

আলেক কোনমতে সুটকেস ছাড়বে না, ছেলেটিও নাছোড়বান্দা, সে-ও ছাড়তে রাজি নয়। অগত্যা পরাজয়ের হাসি হেসে সুটকেসটা ছেড়ে দিল আলেক। সুটকেস মাথায় তুলে নিয়ে পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলল ছেলেটি, বিজয়ের হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা।

গেটের কাছে থামতে হলো ওদেরকে। চেকার টিকেট দেখতে চাইল। দ্রুত চারদিকে তাকাল নাদিয়া। চেকারটা টিকেটগুলো পরীক্ষা করতে দেরি করছে লক্ষ করে তার ধারণা হলো, রানা সম্ভবত এখানেই কোথাও ওত্ পেতে আছে। যে-কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে আলেকের ওপর।

হাত নেড়ে এগিয়ে যেতে বলল চেকার। গেট দিয়ে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা।

শেষ বিকেল, তবু রোদ এখনও খুব গরম। রাস্তার দু'ধারে লম্বা আকৃতির বিল্ডিং। একটা সাইনবোর্ড দেখল নাদিয়া, সিটি হোটেল। রাস্তার দু'ধারে সার সার দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘোড়ার গাড়ি। বাইরে বেরিয়ে এসেও দ্রুত একবার চারদিকে তাকাল নাদিয়া। আশা করছে, সৈনিকদের একটা দল নিয়ে হঠাৎ উদয় হবে রানা, কিন্তু কোথাও তাকে দেখল না সে।

আরব ছেলেটিকে আলেক বলল, 'ঘোড়া ট্যাক্সি নয়, আমার দরকার মোটর ট্যাক্সি। কোথাও পাওয়া যাবে বলতে পারো?' ভাষাটা আরবী, তবে আঞ্চলিক।

ছোট ছোট সাদা দাঁত বের করে একগাল হাসল ছেলেটা। ঘোড়ার গাড়ির

ভিড়ে এতক্ষণ দেখা যায়নি, ছেলেটার পিছু পিছু একটা গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। চৌরাস্তায় মোটর গাড়ি বলতে এই একটাই। বহুদিনের পুরানো একটা মরিস।

'সামনে ওঠো,' নাদিয়াকে বলল আলেক। ছেলেটার হাতে এক পাউন্ডের একটা নোট গুঁজে দিল সে, ডনকে নিয়ে উঠে পড়ল পিছনে। ড্রাইভার লোকটাকে অল্প-বয়েসী বলে মনে হলো। গালাবাইয়া পরে আছে, মাথাটা সাদা কাপড়ে জড়ানো, তাতে মুখের দু'পাশ ঢাকা পড়ে গেছে। 'দক্ষিণে যাও,' আলেক, বলল তাকে। 'বারো গম্বুজের দিকে।'

'ঠিক আছে,' বলল ড্রাইভার।

ধড়াস করে উঠল নাদিয়ার বুক। এই গলা ওর চেনা! ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে থাকল ও। ড্রাইভার আর কেউ নয়, মাসুদ রানা।

এগারো

মরিস নিয়ে স্টেশন এলাকা থেকে বেরিয়ে এল রানা। কোথাও কোন অসুবিধে নেই, শুধু আঞ্চলিক ভাষাটা ছাড়া। স্থানীয় ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাথে আঞ্চলিক আরবীতে কথা বলবে আলেক, এটা ওর আগে মনে হয়নি। আঞ্চলিক হলেও, বিশুদ্ধ আরবীর কাছাকাছি উচ্চারণ, তাই আলেকের প্রথম কথাটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি ওর। দিক নির্দেশ বোঝা হয়তো কঠিন নয়, কিন্তু আলেক যদি আবহাওয়া বা ফসল সম্পর্কে আলাপ করতে চায়, ফেঁসে যাবে ও। ঠিক করল, প্রশ্নের উত্তরে হুঁ-হ্যাঁ করবে, ভাব দেখাবে বেশি কথা বলা পছন্দ করে না সে। দরকার হলে ইংরেজীও বলা যেতে পারে। একজন আরব সামান্য ইংরেজী জানলেও সেটা ব্যবহার করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকে, কাজেই আলেকের কাছে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগার কোন কারণ নেই।

রানার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে ক্যাপ্টেন আহসান। নিজের লোড করা ল্যুগারটাও ধার দিয়েছে রানাকে। রানার অনুরোধে ঝুঁকি নিয়ে কিছু দায়িত্ব পালন করছে সে। সময়ের অভাবে আরেকটা পিস্তল যোগাড় করা সম্ভব হয়নি, তার সাথে একটা ছোরা ছাড়া কোন অস্ত্র নেই।

ট্যাক্সি নিয়ে স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করার সময় আহসানের কাছ থেকে পাওয়া আসিউতের ম্যাপটা খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছে রানা। কোন্ রাস্তা ধরে শহর থেকে বেরিয়ে দক্ষিণের পথ ধরতে হবে, বুঝে নিতে অসুবিধে হলো না। শহর থেকে বেরিয়ে আসতে প্রচুর সময় লাগল। ঘোড়ার গাড়ির ভিড়ে এগোনো দায়। হর্ন বাজালেও কোচওয়ানরা ফিরে তাকায় না। কিন্তু ঘোড়াগুলো লাফালাফি শুরু করে রাস্তা একেবারে বন্ধ করে দেয়। ফুটপাথে দোকান-পাট তো বসেছেই, কোথাও কোথাও মাঝ রাস্তা পর্যন্ত বেদখল হয়ে গেছে। খানিক পরপরই ঘোড়ার গাড়ির চাকা

মেরামতের কারখানা। প্রতিটি কারখানায় ঘোড়া, চাকা আর মানুষের মাথা গিজগিজ করছে। কাঁচা রাস্তা, তার ওপর বালি আর কাঁকর ছড়ানো। সারাক্ষণ ধুলো উড়ছে, বেশি দূর দেখতে পাওয়া যায় না। রিয়্যার-ভিউ মিররে চোখ পড়ল একবার, চার পাঁচটা ছেলে পিছনের বাম্পারে চড়ে বসেছে।

কিছু বলল আলেক। বুঝল না রানা। ভান করল, যেন শুনতে পায়নি। কিন্তু একই কথা আবার বলল আলেক। এবার মাত্র একটা শব্দ বুঝতে পারল ও। পেট্রল। ঘাড় না ফিরিয়ে দেখল ও, জানালা দিয়ে হাত বের করে একটা পেট্রল পাম্প স্টেশনের দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে সে। ড্যাশবোর্ডের গজের ওপর টোকা দিল রানা। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে গজটা দেখল আলেক। বুঝল, ট্যাংক ভর্তি আছে।

আয়নাটা ঠিকঠাক করার অজুহাতে পিছনে বসা ডনের দিকে তাকাল রানা। ভাবল, ও কি তাকে চিনতে পেরেছে? দেখল, তার মাথার পিছন দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ডন, চোখেমুখে চাপা উত্তেজনার আভাস। তাড়াতাড়ি আয়না থেকে চোখ সরিয়ে নিল ও। মনে মনে বলল, চিনতে পেরেছ ভাল কথা, বন্ধু, কিন্তু ব্যাপারটা যেন ফাঁস না হয়।

শহর থেকে বেরিয়ে এসে মরুভূমির সোজা রাস্তা ধরে দক্ষিণ দিকে ছুটল গাড়ি। ওদের বাঁ দিকের মরুতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ফসল ফলাবার ব্যাপক আয়োজন চোখে পড়ল। ডান দিকে গ্র্যানিট পাথরের প্রায় খাড়া পাহাড়, মিহি বালির একটা আবরণ ঢেকে রেখেছে। গাড়ির ভেতর পরিবেশটা অদ্ভুত। নাদিয়ার টেনশন, ডনের কৌতূহল আর আলেকের অস্থিরতা অনুভব করতে পারল রানা। ও নিজেও উত্তেজিত হয়ে আছে। কিন্তু আলেকের চোখে সেটা ধরা পড়ছে না। সম্ভবত রেডিওর কথা ভাবছে বলেই তাকে এমন অন্যমনস্ক আর অস্থির লাগছে।

ড্রাইভারের মুখ দেখেনি আলেক। ভাল করে একবার তাকালেই দেখবে, এই লোকই ট্রেনে তাদের কাগজ-পত্র চেক করেছিল।

আবার কথা বলল আলেক।

অর্থটা বুঝতে পেরে ডান দিকে বাঁক নিল রানা। সামনে, কিন্তু কয়েক মাইল দূরে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড় শ্রেণী। মনে হলো রাস্তাটা সোজা ঢুকে গেছে পাহাড়ের ভেতর। কাছাকাছি এসে গিরিখাদটা দেখতে পেল, তার পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে একটা গিরিপথ।

অন্ধকার গিরিপথ থেকে বেরিয়ে এসে আলেকের নির্দেশে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা। চিন্তিত হয়ে পড়ল ও। আহসানের ম্যাপ অনুসারে বাঁক না নিয়ে সোজা আরও দক্ষিণে গেলে বারো গম্বুজ মসজিদ আর লোকালয় দেখতে পেত ওরা। কিন্তু এই গিরিপথ পেরিয়ে আসার পর যেদিক যতদূর খুশি যাও, কোথাও লোকালয়ের দেখা মিলবে না, চারদিকে শুধু খাঁ খাঁ করছে পশ্চিম মরুভূমি। তাহলে এদিকে কি মনে করে এসেছে আলেক?

রেডিওটা কি সে বালির ভেতর কোথাও লুকিয়ে রেখেছে? তাই যদি রেখে থাকে, সেটা আর আলেক খুঁজে পাচ্ছে না। দূর, তা কি করে হয়! আলেক গাধা

নয় যে এতবড় একটা বোকামি করবে। মনে মনে প্রার্থনা করল রানা, আল্লা, রেডিওটা যেখানেই রেখে থাকুক, ওকে সেটা পাইয়ে দাও। আলেকের রেডিও আর কোড কী ছাড়া আমার ডিসেপশন প্ল্যান ভেস্তে যাবে।

রাস্তাটা ক্রমশ ওপর দিকে উঠতে শুরু করেছে। আলেকের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও স্পীড কমিয়ে আনল রানা। পুরানো গাড়ি, চড়াই ঠেলে উঠতে গিয়ে প্রতিবাদ মুখর হলো। একবার গিয়ার বদল করল রানা, তারপর আরেকবার। শেষ পর্যন্ত সেকেন্ড গিয়ারে চূড়ায় উঠতে পারল ওরা। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত ঊষর মরু।

কোথায় যেতে চাইছে আলেক, বুঝল না রানা। একবার ভাবল জিজ্ঞেস করে। সন্ধের আগে আসিউতে না ফিরতে পারলে অসুবিধে হবে, অন্ধকারে মরু পথ চেনা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু ভাষা একটা বাধা হয়ে দাঁড়াল, ইংরেজী বা শুধু আরবীতে প্রশ্ন করলে আলেকের মনে সন্দেহ জাগানো হবে।

রাস্তাটা শেষ পর্যন্ত আর রাস্তা থাকল না, পায়ে চলা পথ ধরে ছুটল গাড়ি। অপেক্ষা করে আছে রানা, আলেকের কাছ থেকে পথ-নির্দেশ আসবে। নাক বরাবর সামনে দিগন্তরেখার দিকে নেমে যাচ্ছে সূর্য। এক ঘণ্টা পর পথের একপাশে খানিকটা শুকনো কাঁটা-ঝোপ দেখল রানা। কয়েকটা উট চরছে, পাহারায় রয়েছে দু'জন বেদুইন আরব। সীটের ওপর সিধে হয়ে বসল আলেক, জানালা দিয়ে এদিক ওদিক চোখ বুলাচ্ছে। একটু পর সামনে একটা মরুদ্যান দেখা গেল, ওটার মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেছে পথ। মরুদ্যানের পাশেই সরু, শুকিয়ে যাওয়া একটা খাল বা নদী, সেটার পাড় ধরে এগোল গাড়ি। আলেকের নির্দেশে বাঁ দিকে বাঁক নিল রানা। মরুদ্যানের ভেতর ঢুকে লোকজন, উট আর তাঁবু দেখতে পেল ও। একটা কুয়ার পাশে থামতে বলল আলেক।

গাড়ি থামাল রানা, কিন্তু নিচে নামল না আলেক। জানালা দিয়ে মুখ বের করে কুয়া থেকে যারা পানি তুলছে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। গাড়ির উপস্থিতি টের পাওয়া সত্ত্বেও তারা কেউ পিছন ফিরে ওদের দিকে তাকায়নি। রানার ধারণা হলো, বেঁচে থাকা এখানে এতই কঠিন যে বিস্ময়কর কিছু ঘটতে দেখলেও সেদিকে খেয়াল দেয়ার মানসিকতা বেদুইনদের থাকে না। আলেকের ডাক শুনে একজন লোক অবশ্য এগিয়ে এল। দ্রুত কয়েকটা প্রশ্ন করল আলেক। হাত তুলে আরও দূরে কিছু একটা দেখাল লোকটা। রানাকে উদ্দেশ্য করে আলেক বলল, 'চালাও।'

গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। আরও প্রায় মাইল দুয়েক এগিয়ে এসে আবার থামল গাড়ি। এখানেও একটা মরুদ্যান দেখা গেল, প্রথমটার চেয়ে ছোটই হবে। বেশ অনেকগুলো তাঁবু রয়েছে। উট, গাধা আর ছাগল চরছে চারদিকে। ফাঁকা একটা জায়গায় খানিকটা আগুন জ্বলছে, পাশে বসে রয়েছে এক লোক। হাত তুলে লোকটাকে দেখাল আলেক, ওর পাশে গাড়ি থামাতে বলল রানাকে।

গাড়ির আওয়াজ পেয়ে আগুনের সামনে থেকে উঠে দাঁড়াল লোকটা। ঘুরল। ব্রেক করে তার সামনে গাড়ি থামাল রানা। জানালা দিয়ে মুখ বের করে চেঁচিয়ে উঠল আলেক, 'মাহমুদ!'

ভুরু কুঁচকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল মাহমুদ, তারপর আলেককে চিনতে

পেরেই দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে এল কয়েক পা। আলেকের বাড়ানো হাত জোড়া ধরে ঝাঁকাতে লাগল সে। 'আব্বাস ভাই! আমার আব্বাস ভাই!'

'তোমরা সবাই ভাল তো?' জানতে চাইল আলেক।

মাথা ঝাঁকাল মাহমুদ। 'খোদার ফজলে আমরা সবাই ভালই আছি। আল্লার রহমতে তোমার সব খবর ভাল তো, আব্বাস ভাই?'

'আল্লার রহমতে আমার সব খবর ভালই, মাহমুদ।'

এতক্ষণে গাড়ির ভেতর চোখ পড়ল মাহমুদের। 'মেহমান দেখছি, আব্বাস ভাই! নামো, নামো! দুম্বা জবাই করতে বলি,...'

'না, মাহমুদ,' শান্ত সুরে বলল আলেক। 'আজ তোমার মেহমান হওয়া সম্ভব নয়। আসিউতে জরুরী কাজ আছে, এখুনি ফিরতে হবে...'

'তা কি করে হয়!'

'তোমাকে কি বলেছিলাম মনে আছে?' জিজ্ঞেস করল আলেক। 'খুব বড় একটা যুদ্ধ বাধবে?'

'মনে আছে, আব্বাস ভাই,' বলল মাহমুদ। 'ইসরায়েলের গুপ্তচর আছে কায়রোয়, তাদেরকে ধরতে গিয়েছিলে তুমি।'

জ্ঞাতি ভাইকে তাহলে এই কথা বুঝিয়েছে আলেক! রাগে সারা শরীর জ্বালা করে উঠল রানার।

'শালাদের সব ক'টাকে জেলে ভরে রেখে এসেছি,' বলল আলেক। 'কিন্তু জরুরী একটা কাজ এখনও বাকি রয়ে গেছে। সেজন্যেই আজ আবার আমাকে আসিউতে ফিরতে হবে। কথা দিচ্ছি, আরেকদিন এসে তোমার দুম্বা খেয়ে যাব...'

'কি আর করা, কাজের ওপর তো আর কথা চলে না,' বলল মাহমুদ। 'কিন্তু চা তোমাদের খেতেই হবে।'

'ঠিক আছে, আমাকে শুধু এক কাপ দাও,' বলল আলেক। 'আমার মেহমানরা কেউ চা খায় না।'

দাঁতে দাঁত চাপল রানা, বাস্টার্ড!

আগুনের দিকে ফিরে বসে পড়ল মাহমুদ। আগুন থেকে কেটলী তুলে একটা কাপে চা ঢালতে শুরু করল। সূর্য ডুবতে আর বেশি দেরি নেই, হাত-মুখ ধুয়ে কোরান মুখস্থ করতে বসে গেছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, তাদের কচি গলার মিষ্টি তেলাওয়াতের সুর শুনতে পেল ওরা। মেয়েরা সম্ভবত রাতের রান্নাবান্নার কাজে ব্যস্ত।

চায়ের কাপ নিয়ে উঠে দাঁড়াল মাহমুদ। গাড়ির দরজার সামনে ফিরে এসে বলল, 'গাড়ি থেকে নামবে না, আব্বাস ভাই?'

'না, ভাই,' বলল আলেক। মাহমুদের হাত থেকে কাপটা নিল সে। 'শুধু শুধু দেরি হয়ে যাবে।'

'যুদ্ধে তাহলে কারা জিতবে, আব্বাস ভাই?' জানতে চাইল মাহমুদ। আড়চোখে নাদিয়ার দিকে তাকাল সে। ভাবল, কে হতে পারে? আব্বাস ভাইয়ের বউ নয়। বউ হলে পরিচয় করিয়ে দিত। বান্ধবী? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই।

'কে আবার জিতবে, আমরা!'

মাহমুদের দৃষ্টি লক্ষ করে মুচকি একটু হাসল আলেক। লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল মাহমুদ।

'লোভ হয়?' মুচকি হেসে জানতে চাইল আলেক।

'জ্বী!' সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল মাহমুদের।

'লোভ থাকলে লজ্জা কি, বলো আমাকে,' বলল আলেক। 'কাল আবার ফিরছি আমি, তোমার জন্যে ওকে নাহয় নিয়েই ফিরব।'

গাড়ির ভেতর শিউরে উঠল নাদিয়া। ভাবল, রসো, রানা তোমাকে মজা দেখাচ্ছে!

আব্বাস ভাইয়ের কাছ থেকে এ-ধরনের কথা শুনবে বলে আশা করেনি মাহমুদ। মেয়েমানুষের ওপর নেশা আছে ঠিক, কিন্তু তাই বলে আব্বাস ভাইয়ের মেয়েমানুষকে তো আর সে কামনা করতে পারে না। অবশ্য, আব্বাস ভাই শহুরে মানুষ, তার সঙ্কোচ কম।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল মাহমুদ।

'ঠিক আছে, বুঝেছি,' সহাস্যে বলল আলেক। 'ইচ্ছে আছে, কিন্তু বলতে পারছ না। আনব, যাও। এখন তাড়াতাড়ি করো, আমার সেই সুটকেসটা নিয়ে এসে দাও।'

পালাতে পেরে যেন বেঁচে গেল মাহমুদ। ভাবল, কথা যখন দিয়েছে, মেয়েলোকটাকে নিশ্চয়ই কাল নিয়ে আসবে আব্বাস ভাই। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল সে।

সুটকেস নিয়ে একটু পরই ফিরে এল মাহমুদ।

ছোট সুটকেস, জানালা দিয়ে ঢুকল ভেতরে। 'ধন্যবাদ,' মাহমুদকে বলল আলেক। 'তৈরি হয়ে থেকো, তোমার জিনিস পেয়ে যাবে কাল।'

'খোদা আপনার মঙ্গল করুন,' বলল মাহমুদ।

'ভাল খেয়েদেয়ে গায়ে জোর করো, কাল কাজে লাগবে,' বলে বাইরে থেকে গাড়ির ভেতর মাথাটা ঢুকিয়ে নিল আলেক। নাদিয়া ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে চোখ মটকাল। 'ওকে তুমি চেনো না, যা আদর করতে জানে না!'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল রানা। রিভলভার বের করে সীটের ওপর ঘুরে বসতে পারে ও, কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা সম্ভব নয়। আলেকের কথা শুনে রাগে হিংস্র বাঘিনীর মত চেহারা করে আছে নাদিয়া। তাই দেখে সাবধান হয়ে গেছে আলেক। ছুরি বের করে ডনের গলার কাছে ধরেছে সে।

'গাড়ি ছাড়ো,' রানাকে নির্দেশ দিল আলেক। 'আসিউতে ফিরে যাব আমরা।'

স্টার্ট দেয়ার সময় লক্ষ করল রানা, হাত দুটো কাঁপছে।

পিছনে আর কিছু ঘটছে না। আলেকের বোধহয় রেডিওটা ফিরে পাবার ব্যাপারে একটু সন্দেহ ছিল। সেটা পেয়ে আনন্দে বেসামাল হয়ে পড়েছিল, নাদিয়ার সাথে অভদ্র আচরণ করা থেকে সেটাই বোঝা যায়। ভিউ মিররে আরেকবার তাকিয়ে রানা দেখল, ছুরিটা এখনও হাতে রেখেছে আলেক।

কুয়া আর বড় মরুদ্যানটা পেরিয়ে এল গাড়ি। কেউ কোন কথা বলছে না। গিরিপথের ভেতর দিয়ে খুব আস্তে, সাবধানে গাড়ি চালাল রানা। তারপর রাস্তায় উঠে আসতেই আলেকের নির্দেশ পেল, 'জোরে!'

সুটকেসটার কথা ভাবছে নাদিয়া। নিজের উরুর ওপর রেখে একহাতে ধরে আছে আলেক। ওটার ভেতর রেডিও, রেবেকা আর কোড কী আছে, সন্দেহ নেই। ওটা নিজের হাতে রাখার জন্যে প্রাণের ওপর ঝুঁকি নেবে আলেক। আবার, তার কাছ থেকে ওটা ছিনিয়ে নেয়ার জন্য রানাও দরকার হলে ভয়ঙ্কর সব ঝুঁকি নেবে। এতকিছুর পর সে নিজেও আলেকের হাত থেকে ওটা কেড়ে নেয়ার জন্যে যে-কোন ঝুঁকি নিতে পারে।

হঠাৎ ভীষণ ক্লান্ত লাগল নাদিয়ার। কাল সারারাত হাউজবোটে ওদের সাথে জেগে থাকতে হয়েছে, তারপর সারাটা দিন ট্রেন আর মোটর জার্নি, এক মিনিট বিশ্রাম জোটেনি কপালে। দিগন্তরেখা ছুঁই ছুঁই করছে সূর্য, ডুবতে আর বেশি সময় নেবে না। নুড়ি পাথর, ঝোপ, ঘাসের চাপড়া, এই ধরনের ছোট ছোট জিনিসগুলো লম্বা ছায়া ফেলেছে। দূর পাহাড়ের মাথায় কালো মেঘ দেখল সে।

'সূর্য ডুবল বলে,' তাগাদা দিল আলেক, 'ড্রাইভার, আরও জোরে চালাও গাড়ি।'

গাড়ির স্পীড বেড়ে গেল দেখে নাদিয়া বুঝল, নির্দেশটা বুঝতে পেরেছে রানা। একে ক্লান্ত, তার ওপর খিদে আর তৃষ্ণায় অস্থির লাগছে। হঠাৎ রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতিটা অসহ্য লাগল নাদিয়ার। বিরক্ত বোধ করল রানার ওপর। আলেকের হাতে রেডিও ইত্যাদি এসে গেছে, এখনও তাহলে কিসের জন্যে অপেক্ষা করছে ও? আলেককে কিভাবে গ্রেফতার করবে, নিশ্চয়ই তার একটা উপায় ভেবে রেখেছে? তাহলে দেরি করছে কেন?

কেন দেরি করছে রানা, এক সেকেন্ড পর কারণটা নিজেই দেখতে পেল নাদিয়া। আলেকের হাতে ছুরি রয়েছে।

রানাও বিষয়টা নিয়ে ভাবছে। পিস্তল বের করতে সময় লাগবে না। কিন্তু গাড়ি দাঁড় করিয়ে সীটের ওপর ঘুরতে একটু সময় লাগবে। ততক্ষণে ডনের গলায় ছুরির ফলা চেপে ধরবে আলেক। সেই অবস্থায় লোকটাকে সারেন্ডার করানো বা গুলি করা সম্ভব নয়। ছুরিটা যদি তার হাতে না থাকত, এক সেকেন্ডও দেরি করত না ও।

হঠাৎ কথা বলে উঠল ডন। 'আমার বমি বমি লাগছে।'

লাগারই কথা। ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পীডে ছুটছে গাড়ি।

পাশে বসা ড্রাইভারের দিকে তাকাল নাদিয়া। শিরদাঁড়া খাড়া করে আছে রানা। 'আস্তে চালাও,' ইংরেজীতে বলল নাদিয়া। তারপর আরবীতে। 'অসুস্থ বোধ করছে ছেলেটা।'

ধীরে ধীরে গাড়ির স্পীড কমিয়ে আনতে শুরু করল রানা। কিন্তু আলেক বলল, 'ওর কথায় কান দিয়ো না, ড্রাইভার। জোরে চালাও!' নাদিয়ার দিকে ফিরল সে। 'কে অসুস্থ বোধ করল কি সুস্থ বোধ করল তাতে আমার কিছু আসে যায় না!'

গতি আবার বাড়িয়ে দিল রানা।

ডনের দিকে তাকিয়ে নাদিয়া দেখল, ছেলেটার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে। সারাদিন কিছু খাওয়ানো যায়নি তাকে, তার ওপর এই আতঙ্ক, অসুস্থ তো হবেই। রীতিমত হাঁপাচ্ছে ছেলেটা। নাদিয়ার ভয় হলো, জ্ঞান না হারিয়ে ফেলে। তার চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল। বিড়বিড় করে আলেককে বলল, 'বেজন্মা!'

'গাড়ি থামাও!' চিৎকার করল ডন।

আলেক গ্রাহ্য করল না। আর রানাকে ভান করতে হলো, শুনতে পায়নি।

সামনে একটা ঢাল, হঠাৎ নেমে গিয়ে আবার একটু উঠে সমতল হয়েছে। গাড়ি নামল, কিছু ঘটল না। কিন্তু ঢালের মাথায় ওঠার পর লাফ দিল মরিস। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে ডন বলল, 'ফ্রেন্ড, আমি আর পারছি না! গাড়িটা একবার থামাও!'

ঘ্যাচ করে ব্রেক করল রানা।

ড্যাশবোর্ড আঁকড়ে ধরে ঝাঁকিটা সামলাল নাদিয়া, ঝট করে ফিরল আলেকের দিকে।

পলকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে থাকল আলেক। তিনবার নড়ে উঠল তার চোখ, একবার রানার দিকে, একবার ডনের দিকে, আরেকবার রানার দিকে। ওই এক পলকের মধ্যেই তার চেহারা তিনবার বদলে যেতে দেখল নাদিয়া। প্রথমে হতভম্ব দেখাল তাকে, তারপর বিস্মিত, সবশেষে সন্ত্রস্ত। নাদিয়া বুঝল, ট্রেনের ঘটনাটা স্মরণ করছে আলেক। স্মরণ করছে আসিউত স্টেশনে খালি পায়ের সেই নোংরা ছেলেটাকে। স্মরণ করছে ড্রাইভারের মুখ আর মাথা ঢাকা সাদা কাপড়টার কথা। ঝিক্ করে উঠল আলেকের চোখ। মুহূর্তের মধ্যে সব পরিষ্কার বুঝে নিল সে।

ব্রেক করেছে রানা, কিন্তু গাড়ি থামেনি, রাস্তার সাথে ঘষা খেয়ে এগোচ্ছে চাকা। আবার একটা তীব্র ঝাঁকি খেয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল আরোহীরা। তাল ফিরে পেয়ে এক ঝটকায় ডনের গলা পেঁচিয়ে ধরল আলেক, ঊরু থেকে পায়ের কাছে পড়ে গেল সুটকেস, ছুরিটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিল সে।

গাড়ি থামল।

কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। সেই সাথে নাদিয়া দেখল, রানার একটা হাত তার গালাবাইয়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। কিন্তু পিছনের দৃশ্যটা দেখে স্থির হয়ে গেল রানার হাত। নাদিয়াও আবার পিছন দিকে তাকাল।

ডনের গলার কাছে ছুরি ধরে আছে আলেক। ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে আছে ডনের চোখ। রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে থাকল রানা। নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। আলেকের ঠোঁটের কোণে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল বেপরোয়া হাসির আভাস।

'কি কাণ্ড দেখো দেখি,' সকৌতুকে বলল সে। 'আরেকটু হলে দিয়েছিলে তো হারিয়ে!'

ওরা সবাই তার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল।

'তোমার মাথার ওই ঘোমটা, ওটা সরাও তো বাপু,' রানাকে বলল সে।

সাদা কাপড়টা সরিয়ে মুখ আর মাথা উন্মুক্ত করল রানা।

'আন্দাজ করতে দাও,' বলল আলেক। রানাকে অসহায় অবস্থায় পেয়ে মজা

করছে সে। 'মেজর মাসুদ রানা? কি, ঠিক হয়েছে আন্দাজ?'

'তা হয়েছে, কিন্তু আরেকটু আন্দাজ করতে না পারলে ব্যাপারটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে,' বলল রানা। 'বলো তো, তোমাকে ধরার জন্যে সৈনিকদের যে দলটা রওনা হয়েছে, তারা এই মুহূর্তে ঠিক কোথায়?'

'হোয়াট?' চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল আলেকের। 'কি বললে?'

'তুমি ইচ্ছে করলে আমার সাথে যেতে পারো, আলেক—প্রাণ নিয়ে। ওরা এসে পড়লে গুলি করে তোমার লাশ নিয়ে যাবে।' হাতঘড়ি দেখল রানা। 'যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে ওরা। কি করবে ভেবে দেখো।'

হতভম্ব চেহারা নিয়ে রানার দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল আলেক। তারপর ধীরে ধীরে তার মুখে হাসি ফুটে উঠতে শুরু করল। 'চমৎকার অভিনয়, মেজর! এই ক্ষমতা আর চেহারা নিয়ে এ লাইনে না এসে তোমার উচিত ছিল হলিউডে চলে যাওয়া, আমি বাজি ধরে বলতে পারি তোমার মত প্রতিভাকে লুফে নিত ওরা।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে বলছি না। অপেক্ষা করো, নিজের চোখেই দেখতে পাবে।'

'আর্মিকে তুমি এর সাথে জড়াওনি, কারণ, তুমি ভাল করেই জানো স্পাই ধরতে পাঠালে এলোপাতাড়ি গুলি করতে করতে আসে ওরা,' বলল আলেক। 'ডন রয়েছে, তাই সে-ঝুঁকি তুমি নিতে পারো না। আমার বিশ্বাস, তুমি কাউকে কিছু না জানিয়েই আমার পিছু নিয়েছ।'

প্রথমে রানার কথাই বিশ্বাস করল নাদিয়া, কিন্তু আলেকের কথায় যুক্তি দেখতে পেয়ে হতাশায় মুষড়ে পড়ল সে। এখন আলেক কি করবে আন্দাজ করতে না পারলেও বুঝল, রানা হেরে গেছে। রানার চোখের দিকে তাকাল সে। সেখানে নিখাদ পরাজয় দেখতে পেল।

রানার দিকে চোখ রেখে আলেক বলল, 'নাদিয়া, মেজর রানা গালাবাইয়ার নিচে খাকী ট্রাউজার পরে আছে। ওটার পকেটে হাত ঢোকালেই তুমি একটা পিস্তল বা রিভলভার পাবে বলে মনে করছি আমি। একটু কষ্ট করে হাতটা ঢোকাবে নাকি?'

অনড় বসে থাকল নাদিয়া।

ছুরির ফলা দিয়ে ডনের কানের লতিতে আলতোভাবে একটু খোঁচা দিল আলেক। উহ্ করে উঠল ডন। তার কানের লতি থেকে এক ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ল আলেকের বুকের ওপর। আর কিছু বলতে হলো না, রানার গালাবাইয়ার ফাঁকে হাত গলিয়ে দিল নাদিয়া। এক মুহূর্ত পর পিস্তলটা বের করে আনল সে।

পিস্তল চালাতে জানলে এখন সেটা কাজে লেগে যেত, ভাবল নাদিয়া। তারপর মনে হলো, ডনকে ধরে থাকা অবস্থায় পিস্তলটা নিতে পারবে না আলেক। আর ডনকে যদি ছেড়ে দেয়, এক সেকেন্ডের জন্যে হলেও, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে রানা।

কিন্তু নিরাশ হতে হলো নাদিয়াকে। সম্ভাবনাটা আলেকের মনেও উঁকি

দিয়েছে। নাদিয়াকে বলল সে, 'তোমার বুড়ো আঙুলের কাছে রয়েছে ম্যাগাজিন রিলিজ ক্যাচ। দেখো, ভুল করে আবার ট্রিগারে চাপ দিয়ে বোসো না। পেয়েছ ওটা?'

ক্যাচটা পেল নাদিয়া, চাপ দিতেই সড়াৎ করে বেরিয়ে এল গুলিভরা ম্যাগাজিন।

'এবার ওটা গাড়ির বাইরে ফেলে দাও,' নির্দেশ দিল আলেক।

তাই করল নাদিয়া।

'এবার পিস্তলটা ফেলো আমার পায়ের কাছে।'

ফেলে দিল নাদিয়া।

স্বস্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আলেক। এখন আবার সেই আগের মতই, একমাত্র অস্ত্র বলতে তার হাতের ছুরিটা। রানাকে বলল সে, 'দুঃখিত, মেজর। তোমাকে আমরা সঙ্গে রাখতে পারছি না। দয়া করে গাড়ি থেকে নেমে যাও।'

পাথর হয়ে থাকল রানা।

হঠাৎ গর্জে উঠল আলেক। 'এই শেষ বার বলছি! নামো! তা না হলে ছেলেটার একটা কান কেটে নেব!'

দরজা খুলল রানা। ধীরে ধীরে নেমে গেল গাড়ি থেকে।

'নাদিয়া, সরে গিয়ে ড্রাইভিং সীটে বসো,' আদেশ করল আলেক।

রানার ছেড়ে যাওয়া সীটে বসল নাদিয়া।

'দরজাটা বন্ধ করো,' বলল আলেক।

দরজা বন্ধ করার সময় নাদিয়া দেখল, গাড়ির পাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। ওর চোখ দুটো চকচক করছে।

'গাড়ি ছাড়ো!' হুকুম করল আলেক।

গিয়ার নিউট্রালে দিয়ে চাবি ঘোরাল নাদিয়া। খক্ খক্ করে উঠে থেমে গেল ইঞ্জিন। আল্লা, প্রার্থনা করল নাদিয়া, গাড়ি যেন না চলে। আবার চাবি ঘোরাল সে। কিন্তু স্টার্টার আবার ব্যর্থ হলো।

'চাবি ঘোরাবার সময় অ্যাকসিলারেটার পেডালে পা রাখো,' পরামর্শ দিল আলেক।

তাই করল নাদিয়া। চালু হলো ইঞ্জিন।

'ছাড়ো।'

গাড়ি চলতে শুরু করল। ভিউ মিররে তাকিয়ে নাদিয়া দেখল, রানাকে ফেলে প্রায় বিশ গজ এগিয়ে এসেছে ওরা, দূরত্বটা বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে। সূর্য ডুবে গেছে কিছুক্ষণ আগে, দ্রুত কমে আসছে দিনের আলো। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল তার।

'জোরে।'

গিয়ার বদলাল নাদিয়া। ভিউ মিররে তাকিয়ে দেখল, ছুরি সরিয়ে নিয়ে ডনকে ছেড়ে দিল আলেক। গাড়ির পিছনে, প্রায় দুশো গজ দূরে মরু রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। পাথরের একটা মূর্তির মত লাগল রানাকে। দ্রুত অস্পষ্ট হয়ে

আসছে।

'ওর সাথে পানি নেই!' ফুঁপিয়ে উঠল নাদিয়া।

'জানি। তাতে আমার কি? হারামজাদা কষ্ট পেয়ে মরলে আমি খুশিই হই।'

সীটের ওপর নেতিয়ে পড়েছে ডন। চোখ দুটো আধবোজা। বোধহয় জ্ঞান নেই, কিংবা সাংঘাতিক অসুস্থ বোধ করছে।

চোখে পানি নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে নাদিয়া। রানার কথা ভাবছে সে। এদিকের মরুভূমিতে হিংস্র প্রাণী থাকা খুবই সম্ভব, লোকালয়ে ফিরতে হলে কম করেও বিশ-পঁচিশ মাইল হাঁটতে হবে ওকে। অন্ধকারে পথ চিনতে পারলে, তবে। পথ হারালে সারারাত নির্জন, বিপদসঙ্কুল মরুভূমিতে একা কাটাতে হবে ওকে। সে কি কোন সাহায্যই করতে পারে না? এখন যদি গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে রানার দিকে এগোয় সে, কি করবে আলেক? সন্দেহ নেই, তার গলায় ছুরি চালাবে পিশাচটা, লাশটা ফেলে দেবে গাড়ি থেকে, তারপর নিজেই ড্রাইভ করে ফিরে যাবে আসিউতে। না, তা করবে না। তার চোখের সামনে ডনের গলায় ছুরি চালাবে সে।

ডনের কথা মনে পড়তে আবার দায়িত্বের বোঝা অনুভব করল নাদিয়া। নিজের তো বটেই, নিষ্পাপ ছেলেটার জীবন মরণ নির্ভর করছে তার বোধ-বুদ্ধি আর আচরণের ওপর। মাথা গরম করে কিছু করা উচিত হবে না। কথায় বলে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত কি হয়।

রানাকে ফেলে কতদূর এগিয়েছে ওরা? আধ মাইল? আল্লা, গাড়িটাকে তুমি খারাপ করে দাও!

খক খক করে উঠল ইঞ্জিন, আল্লা তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছে ভেবে গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল নাদিয়ার।

'ব্যাপার কি?' ধমকের সুরে জানতে চাইল আলেক।

আল্লা তোমার ওপর খেপছেন, আমি তার কি করব!—ভাবল নাদিয়া। বলল, 'বুঝতে পারছি না।'

আবার খক্ খক্ করে উঠল ইঞ্জিন, তারপর থেমে গেল। দ্রুত গতি কমে যাচ্ছে দেখে ব্রেক করে গাড়িটাকে একেবারে দাঁড় করিয়ে ফেলল নাদিয়া।

'বোধহয় কোন কানেকশন ছুটে গেছে,' বলল আলেক। 'যাও, সামনের বনেট তুলে দেখো।'

'গাড়ির ইঞ্জিন সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই,' বলল নাদিয়া।

'এই শালী, ফের যদি মুখের ওপর কথা বলিস, জিভ কেটে বের করে আনব। যা,—মারানী!'

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল নাদিয়া। দরজা খুলে নেমে এল সে। সামনের বনেট খুলে ভেতরে তাকাল। এক মিনিট পর বনেট খোলা রেখেই জানালার সামনে ফিরে এসে বলল, 'আমার চোখে কিছু ধরা পড়ছে না।'

দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ করে দরজা খুলল আলেক। গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে গেল খোলা বনেটের সামনে। ইঞ্জিনটা পরীক্ষা করতে শুরু করল সে।

খুট করে একটা আওয়াজ শুনল নাদিয়া। মনে হলো, গাড়ির পিছন দিক থেকে এল। জানালার কাছ থেকে সেদিকে দু'পা এগিয়েছে, ভূত দেখার মত চমকে উঠল। পিছনের বনেট ধীরে ধীরে খুলে গেল, ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে একজন লোক। লোকটা কে, আবছা অন্ধকার চিনতে পারল না নাদিয়া। রাস্তায় নেমে সোজা হয়ে দাঁড়াল লোকটা। নিচের ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে এগিয়ে এল তার দিকে।

অনেকক্ষণ ধরে ইঞ্জিনটা পরীক্ষা করল আলেক। তার চোখেও কোন যান্ত্রিক গোলযোগ ধরা পড়ল না। তারপর হঠাৎ করেই আবিষ্কার করল সে, ইঞ্জিনে ফুয়েল সাপ্লাই হচ্ছে না। তারপর দেখল, একফোঁটা পেট্রল নেই, ট্যাংক খালি।

'নাদিয়া!' ডাকল সে।

নাদিয়া সাড়া দিল না। শুনতে পেলে তো!

'নাদিয়া!' এবার কড়া সুরে ডাকল আলেক।

তবু সাড়া নেই নাদিয়ার।

'বড় বাড় বেড়েছিস!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল আলেক। বনেট বন্ধ করে গাড়ির কাছে চলে এল সে। গাড়ির ভেতর আলো জ্বলছে দেখে অবাক হবার কথা তার, কিন্তু সেটা তার খেয়ালেই এল না। দেখল, গাড়ির ভেতরটা ফাঁকা। নাদিয়া নেই, ডন নেই, সুটকেসটাও নেই।

মুহূর্তের জন্যে পাথর হয়ে গেল আলেক। তারপর থরথর করে কাঁপতে শুরু করল সে। প্রচণ্ড রাগে কয়েক সেকেন্ড তার মুখে কথা সরল না। তারপর ছুটে এল গাড়ির পিছন দিকে। ফেলে আসা পথটা সন্ধের কালিমায় আবছা হয়ে এসেছে, যতদূর দৃষ্টি চলে কাউকে দেখল না সে। আরেক ছুটে গাড়ির উল্টোদিকে চলে এল। ডানে বাঁয়ে বার বার তাকাল।

'নাদিয়া!' হুঙ্কার ছাড়ল সে। 'ভাল চাও তো আড়াল থেকে বেরিয়ে এসো। কোথায় লুকিয়েছ, দেখেছি আমি। আমাকে যদি যেতে হয়, তোমাদের দু'জনকে জবাই করে সুটকেসটা নিয়ে আসব।'

রাস্তার দু'পাশেই অসংখ্য উঁচু-নিচু বালিয়াড়ি, আলেকের ধারণা হলো ওগুলোরই কোন একটার আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে ওরা।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, নাদিয়া?' চিৎকার করল আলেক। 'এদিকে নেকড়ে আছে, তোমাদের বিপদ হবে।'

আলোর শেষ রেশটুকুও দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে চরাচরের বুক থেকে। অস্থির, উন্মাদ হয়ে উঠল আলেক। ওদেরকে এখন খুঁজে বের করে কিভাবে! রাত নামছে, অন্ধকারে…। যা করার এখুনি করতে হবে। ছুটে রাস্তা পেরোল সে। কাছের বালিয়াড়িটা পঁচিশ গজ দূরে। ঢাল বেয়ে অর্ধেকটা দ্রুত উঠল সে, তারপর মন্থর হয়ে এল ওঠার গতি। ঝুরঝুরে বালি, পায়ের নিচ থেকে নেমে যাচ্ছে। অগত্যা হামাগুড়ি দিতে শুরু করল সে।

বালিয়াড়ির ওপর উঠে এসে নিরাশ হলো আলেক। কোথায় ওরা! দু'পাশে, আর সামনে আরও বালিয়াড়ি রয়েছে, অনেক, অসংখ্য। এগুলোর কোন্‌টার আড়ালে লুকিয়ে আছে ওরা বুঝবে কিভাবে? মুখের সামনে হাত দিয়ে একটা চোঙ

তৈরি করে আবার ডাকল আলেক, এবার প্রলম্বিত সুরে; 'নাদিয়া-আ-আ-আ…।'

কোন জবাব নেই।

মাথায় যেন আগুন ধরে গেল আলেকের। কিন্তু কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। অথচ মনের ভেতর থেকে একনাগাড়ে তাগাদা আসছে, রাত নামছে, যা করার তাড়াতাড়ি করো, আলেক, তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!

রাস্তার এপারের আরও কয়েকটা বালিয়াড়ির মাথায় চড়ল আলেক। ফলাফল সেই একই। রাস্তা পেরিয়ে গাড়ির কাছে চলে এল সে। এদিকের কয়েকটা বালিয়াড়ির ওপরও চড়ল। কিন্তু আবছা আলোয় কিছুই দেখল না সে।

গাড়ির কাছে আবার ফিরে এসে রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছল সে। মাথা ঠাণ্ডা করা দরকার, উপদেশ দিল নিজেকে। এত ভয় পাবার কিছু নেই, অসুস্থ একটা ছেলেকে নিয়ে খুব বেশি দূর যেতে পারবে না নাদিয়া। লুকিয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু রাত নামার সাথে সাথে বিপদ বুঝতে পারবে, তখন বাধ্য হয়ে ফিরে আসবে গাড়ির কাছে। আর রাতে যদি নাও ফিরে আসে, সকাল বেলা দিনের আলোয় সে-ই দেখতে পাবে ওদেরকে।

বাস্তব অবস্থাটা মেনে নেয়া উচিত, নিজেকে বোঝাল আলেক। যা ঘটে গেছে সেটা বদলাবার সাধ্য নেই তার। অপেক্ষা করা ছাড়া কি-ই বা করতে পারে সে।

গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগল আলেক। একে একে আরও অনেকগুলো সমস্যার কথা মনে পড়তে লাগল তার। রাতে খাব কি? আসিউতে আজ রাতেই ফিরবে মনে করে খাবার বা পানি কিছুই সাথে আনেনি। সারারাত উপোস থাকা কি যে কঠিন! কাল রাত থেকে শরীরের ওপর নিদারুণ অত্যাচার চলছে, অথচ বিশ্রাম নেবার উপায় নেই। আজও তাকে না ঘুমিয়ে বসে কাটাতে হবে। তারপর মনে পড়ল, মেসেজ পাঠাবার কি হবে?

আবার সিধে হলো আলেক। উপলব্ধি করল, চুপচাপ দাঁড়িয়ে না থেকে ওদেরকে খোঁজা দরকার।

'নাদিয়া!' ডাকল সে।

এবার সাড়া পাওয়া গেল, 'ঘেউ!'

আলেকের মনে হলো, ভুল শুনেছে সে। চারদিক ধু-ধু মরু, এখানে কুকুর আসবে কোত্থেকে!

'নাদিয়া, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

'ঘেউ!'

কুকুর! কিন্তু কিভাবে সম্ভব? অথচ শুনতে ভুল হয়নি এবার। আচ্ছা, নাদিয়া নয়তো? দূর! ভয়েই আধমরা হয়ে থাকার কথা, আমাকে ব্যঙ্গ করার সাহস পাবে কোত্থেকে!

'ঘেউ! ঘেউ!'

হঠাৎ টের পেল আলেক, ব্যাপারটা সিরিয়াস। কুকুর নয়, মানুষ, কোন পুরুষমানুষ! কুকুরের ডাক নকল করে ব্যঙ্গ করছে তাকে। মনে হলো, রাস্তার ওপারের কোন বালিয়াড়ির আড়াল থেকে আওয়াজটা ভেসে এল। রানার একটা

কথা মনে পড়ে যেতে ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল তার। তবে কি সত্যি কথাই বলেছিল রানা? আর্মিকে খবর দিয়েছিল ও, তারা পৌঁছে গেছে?

'মিয়াও! মিয়াও!'

'ঘেউ! ঘেউ!'

থরথর করে কাঁপতে শুরু করল আলেক। আর কোন সন্দেহ নেই, আর্মিরা ঘিরে ফেলেছে ওকে। বিড়ালের ডাকটা এল রাস্তার এপারের বালিয়াড়ি থেকে।

'মিয়াও।'

'ঘেউ।'

ছুটে পালাতে ইচ্ছে করল আলেকের। কিন্তু কোথায় পালাবে সে? গাড়ির দিকে পিছন ফিরে বালিয়াড়ির দিকে তাকাল সে। ওদিক থেকেই বিড়ালের ডাক এসেছে। কি যেন নড়ে উঠতে দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠল তার বুক।

বিড়ালের ডাকটা আলেককে ভয় দেখানোর জন্যে ডাকেনি রানা, ডেকেছিল ক্যাপ্টেন আহসানের সাড়া পাবার জন্যে। দু'জন আলোচনা করে এই সঙ্কেত আদান-প্রদানের ব্যাপারে আগেই একমত হয়েছিল ওরা। ঠিক হয়েছিল, গাড়ি থেকে কোন কারণে ডন আর নাদিয়াকে রেখেই যদি নেমে যেতে হয় রানাকে, সীটের একপাশে লাগানো একটা হাতল ধরে টান দেবে ও, তারপর নামবে। ওই হাতলে টান দিলে ট্যাংকে যেটুকু তেল থাকবে সব একটা ফুটো দিয়ে পড়ে যাবে রাস্তায়, আধ মাইলটাক যাবার পরই অচল হয়ে যাবে গাড়ি। আর গাড়ি অচল হলেই পিছনের বনেট খুলে বেরিয়ে আসবে আহসান। তার প্রথম এবং একমাত্র কাজ হবে ডন আর নাদিয়াকে নিরাপদ কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। ছোরা ছাড়া কোন অস্ত্র থাকছে না আহসানের কাছে, তাই আলেকের সামনে না পড়ারই চেষ্টা করবে সে।

আরও ঠিক হয়, আধ মাইল দৌড়ে অচল গাড়ির কাছে এসে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে রানা। তখনও যদি আশপাশে থাকে আহসান, নিজের নিরাপদ উপস্থিতি ঘোষণা করার জন্যে কুকুরের একটা ডাক ছাড়বে সে। দু'বার কুকুর ডাকলে মনে করতে হবে, ডন আর নাদিয়াকে আলেকের হাত থেকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে সে।

আর রানার মিয়াও মিয়াও-এর অর্থ হলো, আমি পৌঁছেছি।

সন্ধে, কিন্তু অন্ধকার এখনও জাঁকিয়ে বসেনি। আলেক দেখল, একজন লোক একটা বালিয়াড়ির মাথায় উঠে দাঁড়াল। সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে থাকল এক সেকেন্ড, তারপর ঢাল বেয়ে নেমে আসতে শুরু করল রাস্তার দিকে।

দ্রুত চারদিকে চোখ বুলাল আলেক। কি ঘটছে, বুঝল না সে। পিছনে বা দু'পাশে আর কাউকে দেখল না, আবার লোকটার দিকে তাকাল। একা আসছে লোকটা, হাতে কিছু আছে বলে মনে হলো না। ব্যাপারটা কি? সৈনিকরা তাকে যদি ঘিরেই ফেলে থাকে, লোকটা একা আসছে কেন?

লোকটার দিকে আরও তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল আলেক। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে আসছে ও। হাবভাবে কোনরকম আড়ষ্টতা নেই। আরও একটু সামনে চলে

আসতে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত ওকে চিনতে পারল আলেক। মেজর রানা!

আলেকের দশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেল রানা। হঠাৎ দাঁড়াল ও। ধীরে ধীরে সামনে নিয়ে এল হাত দুটোকে, সেই সাথে একটু ঝুঁকে পড়ল। ওর গতিবিধির মধ্যে আশ্চর্য একটা সতর্ক অথচ সাবলীল ভাব এসে গেল। মনে হলো, যে-কোন মুহূর্তে ওর শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যাবে। আলেক একজন প্রফেশনাল, এটা যে আক্রমণের পূর্ব মুহূর্তের ভঙ্গি, বুঝতে অসুবিধে হলো না তার।

'ওদেরকে বললাম, তোমাকে আমি নিজ হাতে শায়েস্তা করতে চাই,' হিস হিস করে বলল রানা।

রানার এই চেহারা দেখে ভয় পেল আলেক। গত দু'মাসে রানা সম্পর্কে যে ধারণা হয়েছে তার, তাতে ওকে নিষ্ঠুর বলে একবারও মনে হয়নি। অথচ এই মুহূর্তে ভয়ঙ্কর হিংস্র লাগছে মেজরকে।

সামনে বাড়তে শুরু করল রানা। হঠাৎ রানার মতই হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে একটু ঝুঁকে পড়ল আলেক। রানা নিরস্ত্র, কিন্তু তার হাতে ছুরি।

পিছিয়ে রাস্তায় উঠে এল আলেক। রানা সামনে বাড়ছিল, তারপর মনে হলো কি এক কারণে ইতস্তত করছে ও। ছুরি ধরা হাতটা বিদ্যুৎ গতিতে লম্বা করে দিয়ে ওকে আঘাত করতে চেষ্টা করল আলেক, কিন্তু রানাকে ইতস্তত করতে দেখে দ্বিধায় পড়েছিল সে, লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হলো। সেই মুহূর্তে এল ঘুসিটা। ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে এল আলেক। দর দর করে তাজা রক্ত বেরিয়ে এল তার নাক থেকে।

ওরা দু'জনেই ঘুরছে। রিঙের ভেতর বক্সারদের মত। লাফ দিল রানা। কিন্তু এবার ঝট্ করে নিচু হয়ে রানাকে ফাঁকি দিতে পারল আলেক। রানা পা চালাল, কিন্তু নাগালের বাইরে সরে এল আলেক। পরমুহূর্তে ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। রানার ট্রাউজার চিরে ভেতরে ঢুকে গেল ছুরির ফলা, খাকি ট্রাউজার কালচে হয়ে উঠল এক জায়গায়। আবার ছুরি চালাল আলেক, কিন্তু পিছিয়ে যাবার ভঙ্গি করে ইচ্ছে করেই পা দুটোকে হড়কে দিয়ে ধপাস করে রাস্তার ওপর পড়ে গেল রানা। ওর পা দুটো আলেকের গোড়ালিতে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল, তাল হারিয়ে ফেলল আলেক, পড়ে যেতে শুরু করল। একটা পা ভাঁজ করল রানা, তারপর বিদ্যুৎ গতিতে বাড়িয়ে দিল সামনে। আলেকের পতনটা হঠাৎ অস্বাভাবিক গতি লাভ করল। রাস্তার ওপর মাথা দিয়ে পড়ল সে, মনে হলো খুলিটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। হাতের ছুরিটা ছিটকে কোথায় পড়ল বোঝা গেল না।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা। রাস্তার ওপারে চোখ পড়তে দেখল ডনকে কাঁধে নিয়ে এগিয়ে আসছে ক্যাপ্টেন আহসান, পাশে নাদিয়া। দু'হাতে দুটো বোঝা নিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছে নাদিয়া।

চোখের কোণ দিয়ে নড়াচড়ার আভাস পেয়ে আলেকের দিকে ফিরল রানা। পরমুহূর্তে ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত লাফ দিল আলেক, মাথা নিচু করে গণ্ডারের মত ছুটে এল রানাকে লক্ষ্য করে।

নাদিয়ার আঁতকে ওঠার শব্দটা পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। আলেককে এভাবে ছুটে আসতে দেখে বুঝল, উন্মাদ হয়ে গেছে লোকটা। তার মাথা কাজ

করছে না, কৌশলের কথা ভুলে গিয়ে শুধু গায়ের জোরের ওপর নির্ভর করতে চাইছে। এই রকম খেপে ওঠা লোকের সাথে লাগতে নেই, গায়ের জোর দেখাতে নেই। আলেক কাছে এসে পড়তে দ্রুত একপাশে সরে দাঁড়াল রানা, তারপর ছুটন্ত অবস্থাতেই পরপর দুটো মোক্ষম ঘুসি এবং মাজা বরাবর প্রচণ্ড এক লাথি লাগিয়ে দিল। দড়াম করে আবার আছাড় খেলো আলেক। উঠল কিনা, তাকিয়েও দেখল না রানা। রাস্তার কিনারায় এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে ওরা, ওদের দিকে এক পা এগোল সে। জানতে চাইল, 'ডন কি···?' প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না রানা।

'জ্ঞান ছিল না, স্যার,' বলল ক্যাপ্টেন। 'এখন ঘুমাচ্ছে।'

'তোমার হাতে ওগুলো কি, নাদিয়া?'

'সুটকেস,' বলল নাদিয়া, 'মানে, রেডিও। আর এই হাতে ঠাণ্ডা পানি ভরা থার্মোস।'

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল রানা। 'তোমরা গাড়িতে উঠে বসো। আহসান, ফুয়েল ট্যাংকের ফুটোটা···'

'জ্বী, স্যার।' হাতলটা ওপরে তুললেই ট্যাংকের তলার ফুটোয় ফিরে আসবে তামার চাকতিটা।

'কিন্তু পেট্রল কোথায় পাব···?' শুরু করল নাদিয়া।

ক্যাপ্টেন হাসল। 'দুঃখিত, ম্যাডাম, আপনাকে বলা হয়নি। আপনি যেখানে বসেছিলেন, ঠিক তার নিচেই, আপনার পায়ের পাশে এক টিন তেল আছে।'

গাড়ির দিকে এগোল ওরা দু'জন।

আলেকের দিকে ফিরল রানা। উঠে দাঁড়াল আলেক। মনে হলো, আবার রানার দিকে ছুটে আসবে সে। কিন্তু তারপর সে যা করল, কেউই সেটা আশা করেনি।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল আলেক। তারপর ছুটল।

দাঁড়িয়ে থাকল রানা। ভাবল, ঠিকই ধরেছি, লোকটা পাগল হয়ে গেছে। বার বার ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল আলেক, রানা তাকে ধাওয়া করছে কিনা দেখছে। তার বিশাল শরীরটা অন্ধকারে ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে এল। খানিক পর তাকে আর দেখা গেল না।

ট্যাংকে তেল ভরে গাড়ি স্টার্ট দিল আসহান। পিছনের সীটে নাদিয়ার কোলে রয়েছে ডন, অঘোরে ঘুমাচ্ছে এখনও। নাদিয়ার পাশে উঠে বসে রানা আহসানকে বলল, 'হ্যাঁ, ছাড়ো।'

দু'মিনিট পরই রাস্তার ওপর দেখা গেল আলেককে। আসিউত এখান থেকে বিশ-বাইশ মাইল দূরে, সেদিকেই ছুটছে সে। হেডলাইটের আলো দেখে পিছন ফিরে তাকাল একবার। ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল।

আলেককে একবার দেখে চোখ ফিরিয়ে নিল রানা। নাদিয়ার মাথাটা ধরে নিজের কাঁধের ওপর নামাল ও। নিঃশব্দে কাঁদছে নাদিয়া। রুমাল দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিল ও।

ছুটতে ছুটতে বার বার পিছন দিকে তাকাচ্ছে আলেক। একটা পাগল মনে

হচ্ছে তাকে। চোখ দুটো বিস্ফারিত। এলোমেলো চুলে ঢাকা পড়ে গেছে কপাল। ঘামের সাথে ধুলোবালি লেগে কিম্ভূত হয়ে উঠেছে চেহারা। পরাজিত, উদ্‌ভ্রান্ত দানবের মত লাগল তাকে।

'স্যার…?'

'ওকে চোখের আড়াল কোরো না,' আহসান কি জানতে চায় বুঝতে পেরে জবাব দিল রানা। 'আমাদের এখানে বিশ্রাম নিতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। দেরি করে আসিউতে ফিরলেও চলবে।'

আরও আধ মাইল ভাল ভাবেই দৌড়াল আলেক। তারপর মন্থর হয়ে এল তার গতি। বার-বার হোঁচট খেতে শুরু করল সে। মাঝখানের দূরত্ব বিশেষ কমতে বা বাড়তে দিচ্ছে না আহসান, সেটা মোটামুটি বিশ গজ।

প্রথম আছাড় খেলো আলেক আরও আধ মাইল এগোবার পর। সাথে সাথে ব্রেক করে গাড়ি থামাল ক্যাপ্টেন। 'পড়ে গেছে, স্যার।'

'পায়ের ওপর দিয়ে চালিয়ে দাও,' বলল রানা। সামনের দিকে একবার তাকালও না।

'কি!' আঁতকে উঠল নাদিয়া। রানার কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজে ছিল সে, তন্দ্রা মত এসেছিল।

'কিছু না,' নাদিয়ার মাথাটা আবার কাঁধে নিয়ে এসে ঠেকাল রানা। 'তুমি ঘুমাও।'

গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল আলেক। ছুটল আবার।

'উঠে পড়েছে,' বলল আহসান। 'ছুটছে।'

'আবার পড়বে,' বলল রানা। 'চিন্তা কোরো না, ওর পায়ের ওপর দিয়ে গাড়ি চালাবার সুযোগ তুমি পাবেই। তারপর তোমার আগের জায়গায় তুলে নিয়ো ওকে। কিন্তু বাইরে থেকে তালা দিতে ভুলো না।'

'ইয়েস, স্যার!'

ওদের উদ্দেশ্য বোধহয় আন্দাজ করতে পারল আলেক, রাস্তা ছেড়ে বালির ওপর দিয়ে ছুটল সে। তাতে ছোটার গতি আরও কমে গেল তার। গাড়ি চলে এল আরও কাছে, তিন গজ পিছনে। এই অবস্থায় সে যদি আছাড় খায়, ব্রেকে চাপ দিতে দিতেই গায়ের ওপর চড়ে বসবে গাড়ি।

আবার রাস্তার ওপর ফিরে এল আলেক। দূরত্ব বাড়িয়ে সাত আট গজ পিছনে থাকল আহসান। দ্বিতীয়বার আছাড় খেলো আলেক আরও দশ মিনিট পর। পড়ল, পড়েই উঠে বসল। গাড়ির দিকে মুখ, হাপরের মত হাঁপাচ্ছে। স্পীড কমাল আহসান, কিন্তু সাথে সাথে ব্রেক করল না। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দিয়ে গাড়িটাকে ঠেকাবার চেষ্টা করল আলেক। তার বুকে এসে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মরিস।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল আলেক। মুখ খুলে ঘন ঘন বাতাস টানছে সে, তবু যেন চাহিদা একটুও মিটছে না। মন্থর গতিতে সামনে বাড়ল গাড়ি। এবার দৌড়ল

না আলেক, সে শক্তি নেই আর। পিছাতে শুরু করল সে। গতি সামান্য একটু বাড়াল আহসান। দ্রুত পিছু হটতে শুরু করল আলেক। তারপর হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার, পড়ে গেল আবার।

তার পায়ের ওপর গাড়ির চাকা উঠল। হাড় ভাঙার পরিষ্কার আওয়াজ পেল আহসান। তীক্ষ্ণ আর্তনাদের শব্দে নির্জন রাতের মরু-নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

কিন্তু কি হলো না হলো পিছন থেকে রানা একবার জানতেও চাইল না।

বারো

দরজা খুলে নাদিয়াকে দেখেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার চেহারা।

'আরে তুমি! এসো, এসো! হাতে…'

'ফুল,' বলল নাদিয়া। লাল আর নীল ঢোলা সালোয়ার কামিজ পরেছে সে, সিল্কের। স্বচ্ছ ওড়না দিয়ে বুক আর মাথার খানিকটা ঢাকা। 'টেলিফোনে বললে কাল তুমি দেশে ফিরে যাচ্ছ, তাই বিদায় নিতে এলাম।'

পথ দেখিয়ে নাদিয়াকে বৈঠকখানায় নিয়ে এল রানা। 'খুব ঘটা করে বিদায় দেবে মনে হচ্ছে?' মুচকি হেসে জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ,' ক্ষীণ একটু দুষ্টামি ভরা হাসি ফুটে উঠল নাদিয়ার ঠোঁটে। 'সেজন্যেই তো রোজ একবার করে টেলিফোন করে জানতে চেয়েছি কবে ফিরে যাচ্ছ তুমি। ভাল কথা, তোমার বন্ধুকে দেখছি না যে? কেমন আছে সে?'

'কাল স্কুল ছুটি, পড়াশোনার চাপ নেই, দুলাভাইয়ের সাথে সিনেমায় গেছে।…আসলে ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে আর কি।'

'কায়রোয় থাকি বা না থাকি,' বলল নাদিয়া, 'ডনের খোঁজ মাঝে-মধ্যে নিতে পারব। বেচারা খুব কাঁদবে তোমাকে হারিয়ে।'

'তুমি কাঁদবে না?' প্রসঙ্গ বদলাতে চেষ্টা করল রানা।

'কাঁদব। কিন্তু ওর মত অবুঝ, বোবা, অসহায় কান্নায় গুমরে গুমরে কষ্ট পাব না। ছেলেটা সত্যি তোমাকে ভালবাসে।'

'আর তুমি?'

'আমি কৃতজ্ঞতাও বোধ করি সেই সাথে।…যাকগে, ওসব কথা থাক। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।'

অবাক হলো রানা। 'কোথায়?'

'ও, বলিনি বুঝি?' মিষ্টি করে হাসল নাদিয়া। 'বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। একটা বাস্কেটে রাজ্যের খাবার ভরে নিয়ে এসেছি। আমরা পিকনিকে যাচ্ছি, রানা।'

'এই সন্ধেবেলা?'

'সন্ধে কোথায়?' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল নাদিয়া। 'সূর্যই তো ডোবেনি এখনও।'

'কিন্তু পৌঁছতে সেই তো সন্ধেই হয়ে যাবে···তা, কোথায় যেতে চাও, শুনি?'

'পিরামিডের কাছে···'

হেসে উঠল রানা। 'আলেক যেখানে তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল?'

'মন্দ কি!'

'বেশ,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমার আপত্তি নেই।'

'তাড়াতাড়ি করো!'

কাপড় পরতে শুরু করল রানা। ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নাদিয়া। রানা কিন্তু এই মুহূর্তে তার কথা ভাবছে না। গত কয়েকদিন অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে, সেগুলো এক এক করে মনে পড়ে গেল ওর।

আলেককে গ্রেফতার করা হলো বটে, কিন্তু তাকে ইন্টারোগেট করার আগেই ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে সে। জেলখানার বাথরুমে গলায় ব্লেড চালিয়ে আত্মহত্যা করেছে লোকটা।

আলেকের সুটকেসের ভেতর রেডিও, রেবেকা আর কী—তিনটেই পেয়েছিল ওরা। আলেক বোগানের নামে ইসরায়েলে মেসেজ পাঠাতে কোন অসুবিধে হয়নি ওর। ডিসেপশন প্ল্যানটা আশ্চর্য রকম সফল হয়েছে। সিনাইয়ের দুর্বল জায়গা দিয়ে প্রচুর সৈন্য নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল ইসরায়েলি জেনারেল দারহাম। অ্যাম্বুশের অস্তিত্ব যখন টের পেল সে, তখন আর পিছু হটার কোন উপায় ছিল না তার। গভীর খাদ তৈরি করে ওপরে মাচা বানানো হয়েছিল, মাচার ওপর কয়েক ইঞ্চি পুরু বালি। এই খাদগুলোয় একুশটা ট্যাংক হারিয়েছে জেনারেল দারহাম। যেখানে মাইন থাকার কথা ছিল না, সেখানে প্রতি একহাত পর পর মাইন বিস্ফোরণ ঘটে। কায়রোয় পাঠানো স্পাইয়ের মাধ্যমে খবর পেয়েছিল, এই এলাকায় মিশরের সৈন্য সংখ্যা নগণ্য, কিন্তু আসল সময় দেখা গেল ট্রেঞ্চের ভেতর থেকে পিঁপড়ের মত সারি সারি বেরিয়ে আসছে তো আসছেই। গুলি খেয়ে মরার আগে নিজেদের স্পাইকে অভিশাপ দিয়ে গেছে জেনারেল।

এতদিনে মিশরীয় ইন্টেলিজেন্স সম্পূর্ণ নতুন একটা চেহারা পেয়েছে। এখন যারা কাজ করছে ওখানে, তারা সত্যি কাজের এবং যোগ্য লোক। হাই কমান্ডকে দীর্ঘ একটা তালিকা দিয়েছে রানা, তাতে অযোগ্য আর বেঈমান কর্মচারীদের নাম আছে। এরই মধ্যে বরখাস্ত করা হয়েছে তাদেরকে, কেউ কেউ গ্রেফতারও হয়েছে। যতদূর জানতে পেরেছে রানা, এদের মধ্যে অন্তত দু'জনের কোর্ট মার্শাল হবে। একজন রানার বস্ লে. কর্নেল মোসাদ্দেক হাসান, অপরজন মেজর জেনারেল আসলাম হোবায়দা। রানার তালিকায় এরা দু'জন সহ আর যারা ছিল, তাদের প্রত্যেকের অফিসে গোপনে আড়িপাতা যন্ত্র রোপণ করা হয়েছিল।

গ্রেফতার হবার আগে চোরদের সর্দার খলিফা টেলিফোন করেছিল লে. কর্নেলকে। ওদের কথা টেপ হয়ে গিয়েছিল রেকর্ডারে। তা থেকেই জানা গেছে, খলিফার কাছ থেকে প্রতি মাসে মোটা টাকা ঘুষ খেত মোসাদ্দেক হাসান, বিনিময়ে

পুলিস খলিফাকে গ্রেফতার করতে চাইলে ব্যক্তিগত ভাবে বাধা দিত সে, কারণ হিসেবে বলত, খলিফা নাকি গোপন তথ্য দিয়ে তাকে সাহায্য করে। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে।

আর মেজর জেনারেল আসলাম হোবায়দা সম্পর্কে জানা গেছে, অবৈধ ভাবে কয়েকটি ইহুদি মেয়েকে রক্ষিতা রেখেছিল, এদেরকে দিয়ে ড্রাগসের ব্যবসাও চালু করেছিল সে। আরও জানা গেছে, রোপা ইরিনার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল তার, কি এক অজ্ঞাত কারণে তাকে বিশেষ পাত্তা দিত না রোপা।

সামরিক আদালতে বিচার হবে রোপার, প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে তার আসল চেহারা প্রকাশ করে দিয়ে জাতীয় দৈনিকগুলোয় বিশেষ সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে। সারাদেশের লোক ছি ছি করছে তাকে।

'এত সাজগোজ কোরো না তো!' ধৈর্য হারিয়ে ফেলে বলল নাদিয়া। 'পরতে যত সময় লাগছে, খুলতেও তো…'

হেসে উঠল রানা। বলল, 'চলো।'

নিচে নেমে এসে ট্যাক্সিটাকে বিদায় করে দিল ওরা। বাস্কেটটা মোটরসাইকেলের সামনে ক্যারিয়ারে জায়গা করে নিল। মোটরসাইকেলে চড়ল রানা, পিছনে বসল নাদিয়া, রানাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রাখল সে।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে বিপদে পড়ে গেল ওরা। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ কালো মেঘে ঢাকা পড়ে গেল আকাশ, শুরু হলো ঝম ঝম বৃষ্টি।

মোটরসাইকেল নিয়ে রাস্তার ধারের একটা গেটের নিচে আশ্রয় নিল ওরা। তবে ভাগ্য ভালই বলতে হবে, দশ মিনিট পরই থেমে গেল বৃষ্টি।

আবার রওনা হলো ওরা।

রানার পিঠে মুখ ঠেকিয়ে চোখ বুজে আছে নাদিয়া। গুন গুন করে কি যেন বলছে সে, বোধহয় গানের সুর ভাঁজছে। মরুভূমিতে পৌঁছল ওরা। কিন্তু রানা মোটরসাইকেল না থামানো পর্যন্ত বিস্ময়কর দৃশ্যটা দেখতে পেল না নাদিয়া। তারপর ওরা দু'জনই স্তম্ভিত হয়ে চারদিকে তাকাল। কারও মুখে কথা নেই।

ফুলে ফুলে ঢাকা পড়ে গেছে মরুভূমি।

'বৃষ্টির জন্যে… বোঝাই যাচ্ছে,' বলল রানা, 'কিন্তু…'

লক্ষ লক্ষ কীট-পতঙ্গও কোত্থেকে যেন জুটে গেছে। আনাগোনা শুরু হয়েছে মৌমাছি আর প্রজাপতিদের। দল বেঁধে এক ফুল থেকে আরেক ফুলে ছোটাছুটি করছে তারা।

'তার মানে,' অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে বলল নাদিয়া, 'বীজগুলো বছরের পর বছর ধরে এখানে ছিল, অপেক্ষা করছিল।'

'তাই,' বলল রানা। 'এই বৃষ্টির অপেক্ষাতেই ছিল ওরা।'

'তার মানে,' রানার চোখে চোখ রাখল নাদিয়া, 'শুধু আমি নই, রানা, আমার দেশের প্রকৃতিও তোমাকে ঘটা করে বিদায় জানাচ্ছে!'

'মাই গড!' হেসে উঠল রানা। 'একেই বলে কল্পনা শক্তি! অ্যাই, তুমি কবিতা

লেখো না কেন?'

খুব ধীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল নাদিয়া, নিচু স্বরে বলল, 'লিখবই তো!'

আকাশের দিকে তাকাল রানা। একটা দুটো করে তারা জ্বলছে। একটু পর ঘনিয়ে আসবে সন্ধের অন্ধকার। 'এসো,' বলল নাদিয়া। বলে পিরামিডের দিকে পা বাড়াল সে। রানা তার পিছু নিল। মোটরসাইকেলটা ঠেলে নিয়ে চলেছে।

পিরামিডের আড়ালে বসে নানান গল্পের ফাঁকে ফাঁকে খাওয়া সারল ওরা।

রাত সাড়ে দশটায় হুঁশ হলো রানার। 'বাড়ি ফিরবে না?'

'উঁ? হ্যাঁ, ফিরব। যদি না ফিরলেও চলত, তাহলে ফিরতাম না।'

'চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।'

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নাদিয়ার ঠোঁটে চুমো খেলো রানা। কিন্তু সরে আসতে গিয়ে দেখল মৃণাল দুই বাহু আঁকড়ে ধরেছে ওর গলা। ওর একটা হাত জড়িয়ে ধরল নাদিয়ার ক্ষীণ কটি। মৃদু আকর্ষণে চুম্বনরত অবস্থায় একপা দু'পা করে ঘরের ভেতরে চলে এল রানা। পা দিয়ে ঠেলে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

বেডরুমে ঢুকে ওকে মুক্তি দিল নাদিয়া। বলল, 'দাঁড়াও, দু'গ্লাস শ্যাম্পেন নিয়ে আসি।'

খাটের কিনারে বসে সিগারেট ধরাল রানা। একটু পরেই দু'হাতে দুটো গ্লাস নিয়ে ফিরে এল নাদিয়া। মৃদু হেসে বলল, 'দরজায় তালা দিয়ে দিলাম—পাছে সেদিনের মত আবার কেউ এসে ডিসটার্ব করে!'

হাসল রানাও।

আধঘন্টা পর হুঁশ ফিরে পেয়ে দেখল রানা ওর বাম বাহুর ওপর মাথা রেখে এপাশ ফিরে শুয়ে রয়েছে নাদিয়া। চোখ বোজা, কিন্তু পাপড়িগুলো নড়ছে দেখে বুঝল জেগেই আছে। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'এবার? কি করবে, ভেবেছ কিছু, নাদিয়া?'

'কেন, তোমাকে বলিনি বুঝি?' হাসল ও।

'কই?'

'অনেক ভেবে দেখলাম, কাদিরের ভালবাসা ফিরিয়ে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়,' বলল নাদিয়া। হঠাৎ সিরিয়াস দেখাল তাকে। 'কাল ওকে চিঠি লিখব, রানা। এসে নিয়ে যাবে আমাকে।'

'এরচেয়ে খুশির খবর আর কিছু হতে পারে না,' বলে ইতস্তত করতে লাগল, রানা, তারপর আবার শুরু করল, 'কিন্তু···আজ আমার সাথে তুমি···মানে··· কাদিরের ওপর অন্যায় হয়ে গেল না?'

'না, রানা,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল নাদিয়া। 'তা তুমি বলতে পারো না; তোমার দু'একটা কথাতেই আমার চোখ খুলে গেছে, বুঝেছি, জীবন সঙ্গী হিসেবে কাদিরই আমার জন্যে সবচেয়ে ভাল। ওর এই ভালবাসা, এর বুঝি কোন তুলনা হয় না।'

চুপ করে থাকল রানা।

নিচু গলায় আবার বলল নাদিয়া, 'আজ যা ঘটল, এর মধ্যে লালসা ছিল না,

রানা। আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আর কোন উপায় জানা ছিল না আমার। তোমার মত একজন পুরুষকে যাই দিতে চেয়েছি, মনে হয়েছে বড় তুচ্ছ হবে সেটা। তাই···'

নাদিয়ার মুখে হাত চাপা দিল রানা। 'থাক, নাদিয়া, আমি বুঝেছি।'

রানার হাত সরিয়ে দিয়ে উঠে বসল নাদিয়া। 'আমার মনে কোন অপরাধ বোধ নেই। কাদিরকে ঠকিয়েছি, এ-কথাও মনে হবে না কোনদিন। কাদিরকে বিয়ে করার পর আমার সতীত্ব··· সেটার মর্যাদা আমি রাখব। তার আগে, আজ পর্যন্ত যা ঘটেছে, জেনে হোক না জেনে হোক সব মেনে নিতে হবে কাদিরকে।'

'ও তো জানিয়েই দিয়েছে, তোমার অতীত মনে রাখবে না সে।'

'তাই তো ওকে ভালবাসতে পেরেছি।'

'গুড। এবার আমি উঠব, নাদিয়া। কায়রোয় আবার যদি কখনও আসি, তোমার সাথে দেখা হবে?'

'কেন হবে না?' হাসল নাদিয়া। 'ইন্টেলিজেন্সের চাকরিটা তো করবই। আসার আগে একটা খবর দিয়ো। এবং মনে মনে জেনো, তোমার একটা বোন এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করবে।'

নাদিয়ার চোখে চোখ রাখল রানা, জানতে চাইল, 'সে বোন কি আধুনিক বোন, নাকি খ্রিস্টের দু'হাজার বছর আগেকার বোন?'

গম্ভীর নাদিয়া। বলল, 'না, আধুনিক বোন।'

'বাঁচালে, নাদিয়া,' আলতো করে চুমো খেলো রানা ওর ঠোঁটে। 'গ্লানিবোধ থেকে মুক্তি দিলে তুমি আজ আমাকে।'

● ● ●

মাসুদ রানা

সংকেত

তিনখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

দুর্গমগিরি কান্তার মরু পার হয়ে
মিশরে প্রবেশ করল
দুর্ধর্ষ এক ইসরায়েলি এজেন্ট—আলেক বোগান।
রানা সে-সময়ে মিশরে।
নানান ভাবে টের পাচ্ছে রানা, অনুভব করছে
ওর উপস্থিতি, নিঃশব্দ নড়াচড়া—কিন্তু
কিছুতেই পাচ্ছে না ওকে হাতের মুঠোয়।
আশ্চর্য এক ধূর্ত, আত্মবিশ্বাসী, ঠাণ্ডা মাথার লোক
মিশরীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার খবর সংগ্রহ করে পাচার করছে
ইসরায়েলে। আর ধীর, কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপে
ওর দিকে এগিয়ে আসছে মেজর মাসুদ রানা।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০